এডগার এ্যালান পো

রচনাবলী

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2011.02.15 08:15:59 +06'00'

তুলি·কলম

প্রথম প্রকাশ
নববর্ষ, ১৩৯৬
এপ্রিল, ১৯৮৯

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক : অলকানন্দা প্রেস
৯, এ্যাণ্টনীবাগান লেন কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : কুমারঅজিত

দাম : তিরিশ টাকা

সূচীপত্র

কালো বিড়াল	গল্প	১
বন্ধুর পর্বতের কাহিনী	,,	৮
বেলুন নিয়ে পরিহাস	,,	১৬
ভন্ কেম্পেলেন ও তার আবিষ্কার	,,	২৩
বোতলবন্দী পান্ডুলিপি	,,	২৭
শবের সঙ্গে সংলাপ	,,	৩৫
লাল মৃত্যু	,,	৪৭
এমন্টি লাডোর সুরাপাত্র	,,	৫২
মুখর হৃৎপিণ্ড	,,	৫৮
রু মর্গের হত্যাকান্ড	,,	৬৩
মৈস্মারিক সংলাপ	,,	৮৮
এম. ভল্ডিমারের প্রকৃত ঘটনা	,,	৯৩
শেহেরজাদির সহস্র-ও-দ্বিতীয় কাহিনী	,,	১০০
জলভ্রমিতে অবতরণ	,,	১১০
মারি রোগেতের রহস্য	,,	১২০
"আশার বংশ"-এর অবসান	,,	১২৯
অণ্ডাকৃতি প্রতিকৃতি	,,	১৪২
অভিসার	,,	১৪৫
বেরেনিস	,,	১৫৪
ইলিওনোরা	,,	১৬০
মোরেল্লা	,,	১৬৫
মেজেংগারস্টিন	,,	১৬৯
ছায়ামূর্তি—একটি নীতিগল্প	,,	১৭৫
নৈঃশব্দ্য—একটি উপকথা	,,	১৭৭
জেরুজালেমের কাহিনী	,,	১৭৯
আয়তাকার বাক্স	,,	১৮২
এক সপ্তাহে তিনটি রবিবার	,,	১৯১
ঘন্টা-ঘরের শয়তান	,,	১৯৬
নাক নিয়ে নাকাল	,,	২০১
শয়তানের কাছে তোমার মাথাটা বাজি রেখো না	,,	২০৫

“তুমিই সেই মানুষ”	গল্প	২১০
স্ফিংস	”	২১৯
ভেকবাবাজী	”	২২২
একাধারে চারমূর্তি	”	২৩০
চোরাই চিঠি	”	২৩৬
লিজিয়া	”	২৪৮
আর্নহিমের স্বপ্ন-রাজ্য	”	২৫৮
উলিয়াম উইল্‌সন	”	২৬৩
ডাক্তার টার ও অধ্যাপক ফেদারের চিকিৎসা-পদ্ধতি	”	২৭৩
কিম্ভূত দেবদূত	”	২৮৬
স্বর্ণ-পতঙ্গ	”	২৯৩
জনৈক হান্স-ফাল-এর অদ্বিতীয় অভিযান		৩১৬
আর্থার গর্ডন পিম-এর বিবরণ	”	৩২৯

ভূমিকা

জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মাসাচুসেট্‌স্‌-এর অন্তর্গত বোস্টন শহরে ১৮০৯ খৃস্টাব্দে। বাবা-মা দুজনেই ছিলেন ভ্রাম্যমান নাট্যদলের সঙ্গে যুক্ত। পো বাবা-মাকে হারায় জন্মের দুই বছর পরেই। তারপর আশ্রয় পায় ভার্জিনিয়ার তামাক-ব্যবসায়ী জন এ্যালানের বাড়িতে ; অবশ্য এ্যালান তাকে কোনদিনই আইনসম্মতভাবে দত্তক নেন নি। বি-পিতা এ্যালানের সঙ্গে ইংলণ্ডে থাকাকালে পো লণ্ডনের ম্যানর স্কুলে ভর্তি হয়। ১৮২০-এ যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পরে ভর্তি হয় ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বি-পিতা এ্যালানের সঙ্গে পো-র সম্পর্ক কোনদিনই ভাল ছিল না ; সেটা অধিকতর তিক্ত হল যখন অর্থাভাবে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হল। যাই হোক, বাবার অর্থানুকূল্যেই পো ভর্তি হল ওয়েস্ট পয়েন্ট-এর মিলিটারি একাডেমিতে ১৮৩০-এ। আবার আকাশ ঘিরে এল দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ। পো-র উচ্ছৃংখল আচরণ আর এ্যালানের কৃপণ স্বভাবের ফলে ১৮৩১-এ পো অসম্মানজনকভাবে বিতাড়িত হল মিলিটারি একাডেমি থেকে। ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে বি-পিতা এ্যালান পো-র সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। যুবক এডগার পো সংসার-সমুদ্রে ভাসলো সহায়হীন, সম্বলহীন, একাকি।

সেই সংকট-কালে কে যেন তার কানে কানে বলে দিল ঃ মাভৈ, লেখনি তুলে নাও হাতে ; তোমার জন্য অপেক্ষা করছে সাহিত্য-কীর্তি। সাহিত্যের আঙিনায় পা ফেললেন এডগার এ্যালান পো। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্যের দেখা মিলল না। অগত্যা সাংবাদিকের কাজ নিতে হল রিচ্‌মন্ড, ফিলাডেল্‌ফিয়া, ও নিউইয়র্কের নানা পত্র-পত্রিকায়। সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে খ্যাতিও জুটল। কিন্তু উচ্ছৃংখল জীবন যাপনে অভ্যস্ত পো কোন কাজেই দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারেন নি। তাই খ্যাতি জুটলেও আর্থিক সঙ্গতির দেখা মিলল না। সারাটা জীবনই দারিদ্র্য তাকে তাড়া করে ফিরল। সেই অবস্থাতেই বিয়ে করলেন সম্পর্কিত বোন চতুর্দশী ভার্জিনিয়াকে ১৮৩৬-এ। বিয়ের এগারো বছর পরে স্ত্রীর মৃত্যু হল যক্ষারোগে। পো-র ভগ্ন-স্বাস্থ্যেরও ঘটল দ্রুত অবনতি। মদের মাত্রা বাড়ল। উচ্ছৃংখলতা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। ১৮৪৯-এ একটি দারিদ্র্যবিধ্বস্ত সাহিত্যিক-জীবনের অবসান ঘটল। বাল্টিমোর-এ স্ত্রীর সমাধির পাশেই তাঁর মৃতদেহ সমাহিত হল।

১৮৪৫-এ কাব্যগ্রন্থ The Raven and other Poems প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পো-র সাহিত্যিক খ্যাতি সমালোচক-পাঠক মহলের স্বীকৃতি লাভ করে। সে স্বীকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় Tales of mystry and Imagination-এর বিচিত্র সব রোমহর্ষক ও গা-ছমছমকরা গল্প এবং মেরু-অভিযানের কল্পকাহিনী প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পো-র নানা স্বাদের রচনা যতখানি আকর্ষক ঠিক ততখানি আকর্ষক তার বিচিত্র জীবন ও ব্যক্তিত্ব। তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্যায়নে যত মত-বিরোধই

থাকুক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মাত্র চল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তাঁকে পার হতে হয়েছে দুঃখ, দৈন্য ও যন্ত্রণায় দীর্ণ অনেক কণ্টক-পথ। আর তাঁর অনেক চরিত্রের মতই তাঁর জীবনেও বার বার দেখা দিয়েছে উন্মাদের লক্ষণ। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তিনি লিখেছেন ঃ I became insave, with a long intervals of horrible society. During these fits of unconsciousness, I drink... my enemies referred the insanity to the drink, rather than the drink to the insanity.

মণীষী. ইমার্সন The jingle (ডুগডুগি বাদক) এই একটি মাত্র অভিধা দিয়েই পো-কে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ইয়েটস তাঁকে বলেছেন always and for all lands a great lyric poet. পোর Selected works-এর ভূমিকায় ডেভিড গ্যালওয়ে লিখেছেন: Even those tales and poems which seem to depend almost entirely on the conventional devices of horror...represent a profound disruption of man's mind and soul, a spiritual agony which transcends the age in which it was written, as well as the agonised life which created it. আর একটি মাত্র মন্তব্য করে পো-পরিচিতি পর্ব শেষ করব। ইংরেজি সাহিত্যে গোয়েন্দা-উপন্যাসের যে বেগবতী স্রোতস্বতী নানা বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত, তার উৎস-সন্ধানে যাত্রা করলে এডগার এ্যালান পোর বেশ কিছু রহস্য-গল্প-কথার জটাজালের জটিলতায় পৌঁছতেই হবে। এই প্রসঙ্গে "স্বর্ণ-পতঙ্গ", "রু মর্গের হত্যাকাণ্ড", "মারি রোগেত রহস্য" প্রভৃতি বিখ্যাত গল্প অবশ্যই স্মর্তব্য। ভাবতে ভাল লাগে, ভাগ্য-বিড়ম্বিত এই কথাশিল্পীর নিজস্ব রহস্য-সন্ধানী চরিত্র অগাস্ত দুপেঁ বিখ্যাত শার্লক হোমসেরই পূর্বসূরী।

॥ সুদর্শন ॥ কলকাতা—৪২ —শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

কালো বিড়াল

The Black Cat

অত্যন্ত দুরন্ত, অথচ অত্যন্ত ঘরোয়া যে কাহিনীটি আমি লিখতে বসেছি, সেটা লোকে বিশ্বাস করবে তা যেমন আমি আশা করি না, তেমনি কাউকে তা বিশ্বাস করতে বলবও না। যেখানে আমার নিজের চোখ-কানই নিজেদের বিশ্বাস করে না, সেখানে অন্যের কাছ থেকে সেই বিশ্বাস আশা করাই তো পাগলামি। অথচ, আমি তো পাগল নই—আর নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখাটাও আমার কাজ নয়। কিন্তু আগামীকাল আমি মারা যাব, তাই আজ আমার মনের বোঝাটা হাল্কা করতে চাই। একটি নেহাৎই পারিবারিক ঘটনা-শৃংখলকে সহজ কথায়, সংক্ষেপে, ও বিনা মন্তব্যে জগতের সামনে তুলে ধরাই আমার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। সেই সব ঘটনা আমাকে সন্ত্রস্ত করেছে—নির্যাতিত করেছে—আমাকে ধ্বংস করেছে। তবু তাদের ব্যাখ্যা করার চেষ্টা আমি করব না। আমার কাছে সেই সব ঘটনা আতংকেরই অন্য নাম,—হয়তো অন্যের কাছে সেগুলি ততটা ভয়ংকর নাও হতে পারে। হয় তো পরবর্তীকালে এমন সব বুদ্ধিমান মানুষ আসবে যারা আমার ভৌতিক কল্পনাকে সাধারণ ঘটনার পর্যায়ে নামিয়ে আনবে—যে সব ঘটনা আমাকে ভয়ার্ত করে তুলেছে তারা হয়তো তার মধ্যে স্বাভাবিক কার্য-কারণ পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই দেখতে পাবে না।

ছোটবেলা থেকেই নম্রতা ও মানবিকতাই ছিল আমার স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। আমার মনটা এতই নরম ছিল যে সঙ্গীরা পর্যন্ত তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করত। বিশেষ করে জীব-জন্তু ছিল আমার অতিশয় প্রিয়। বাবা-মাও আমাকে নানা রকম জীব-জন্তু এনে দিতেন আদর করে পুষবার জন্য। তাদের নিয়েই আমার বেশী সময় কাটত; তাদের খাইয়ে, আদর যত্ন করে আমি খুব খুশি হতাম। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চরিত্রের এই বিশিষ্ট্যও বাড়তে লাগল।

অল্প বয়সেই আমার বিয়ে হল। আমার স্ত্রীর স্বভাবটিও আমার স্বভাবের অনুরূপ হওয়ায় আমি বেশ খুশি হলাম। পোষা জীব-জন্তুর প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করে সেও সুযোগ পেলেই নানা রকম জীব-জন্তুর বাচ্চা আমাকে এনে দিত। এইভাবে আমাদের চিড়িয়াখানায় জমা হল নানা রকম পাখি, সোনালী মাছ, একটা কুকুর, খরগোস, একটা ছোট বানর। আর একটা বিড়াল।

এই শেষোক্ত প্রাণীটি ছিল বেশ বড়-সড় ও সুন্দর। কালো কুচকুচে, আর অসাধারণ তীক্ষ্ণধী। তার বুদ্ধির কথা উঠলেই আমার স্ত্রী প্রায়ই একটি প্রাচীন প্রবাদবাক্যের উল্লেখ করে বলত, সব কালো বিড়ালই নাকি ছদ্মবেশী ডাইনি। সে যে খুব গুরুত্ব দিয়ে কথাটা বলত তা কিন্তু নয়, আর আমিও কথাটা উল্লেখ করলাম হঠাৎই মনে পড়ে গেল বলেই, অন্য কোন কারণে নয়।

প্লুটো—বিড়ালটার নাম—ছিল আমার খুবই প্রিয় এবং খেলার সাথী। একমাত্র আমিই তাকে খাওয়াতাম আর সেও বাড়ির মধ্যে সব সময় আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। এমন কি অনেক কষ্ট করে তার রাজপথে আমার সঙ্গে যাওয়া থেকে তাকে বিরত রাখতে হত।

আমাদের এই রকম বন্ধুত্ব বেশ কয়েক বছর চলল। ইতিমধ্যে আমার সাধারণ মেজাজ ও চরিত্রেরও—পাষণ্ড সুরাসক্তির পদসঞ্চারের ফলে—আমূল পরিবর্তন ঘটল। যত দিন যেতে লাগল ততই আমি আরও বদমেজাজী, আরও খিটখিটে, অন্যের অনুভূতি সম্পর্কে আরও বেশী উদাসীন হয়ে উঠলাম। স্ত্রীর প্রতিও অসংযত ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত তার গায়ে হাত তুলতে পর্যন্ত দ্বিধা করতাম না। পোষা প্রাণীগুলোও আমার মেজাজের এই পরিবর্তন অনুভব করতে লাগল। শুধু যে তাদের অবহেলা করতাম তাই নয়, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করতাম। অন্য সব জীব-জন্তু যেমন খরগোস, বানর, এমন কি কুকুরটাও যখনই আমার কাছে এসে দাঁড়াত তখনই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতাম; অবশ্য প্লুটোর ব্যাপারে বলব, আমি যথেষ্ট সংযত আচরণই করতাম। কিন্তু রোগ আমাকে পেয়ে বসল—মদের মত ব্যাধি আর কী আছে।—আর শেষ পর্যন্ত প্লুটোও—এতদিনে সেও বুড়ো হয়েছে, একটু খিট্‌খিটে হয়েছে—আমার বদমেজাজের শিকার হতে লাগল।

একদিন রাতে বেশ নেশা করে শহরের আড্ডা থেকে ফিরে এসেই মনে হল, বিড়ালটা আমাকে এড়িয়ে চলছে। সেটাকে পাকড়াও করলাম। সেও ভয় পেয়ে আমার হাতে দাঁত বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অসুরের ক্রোধ জাগল আমার মনে। নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলাম। মনে হল, সেই মুহূর্তে আমার আত্মা আমার দেহকে ছেড়ে পালিয়ে গেছে; শয়তানের অধিক এক প্রতিহিংসা—প্রবৃত্তি সুরার প্রভাবে আচ্ছন্ন আমার দেহের প্রতিটি স্নায়ুকে বুঝি উত্তেজিত করে তুলল। ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে কলম-কাটা ছুরিটা বের করে ধারালো ফলাটা খুলে বেচারি বিড়ালটার গলা চেপে ধরলাম; তার একটা চোখকে কোটর থেকে কেটে তুলে নিলাম। সেই আসুরিক নির্যাতনের কথা লিখতে বসে লজ্জায় আমার মাথা নুয়ে পড়ছে, বুকের ভিতরটা জ্বলছে, সারা শরীর শিউরে উঠছে।

রাতের অমিতাচারের সব কালো ধোঁয়া একটা গভীর ঘুমের আমেজে কাটিয়ে ফেলে সকালে যখন আমার সুবুদ্ধি ফিরে এল তখনও রাতে যে দুষ্কর্মটি করেছি তার দরুন আধা আতংক ও আধা অনুশোচনার একটা মিশ্র অনুভূতি আমার মনকে ছুঁয়েছিল; কিন্তু সে অনুভূতি ছিল বড়ই দুর্বল, অতএব আমার আত্মাকে স্পর্শ করতে পারে নি। পুনরায় অমিতাচারে ডুব দিলাম; অচিরেই সেই দুষ্কৃতির স্মৃতি মদের সাগরে ডুবে গেল।

ইতিমধ্যে বিড়ালটা ধীরে ধীরে ভাল হয়ে উঠল। হারানো চোখের কোটরটি দেখতে ভয়াবহ হলেও মনে হল এখন আর তার চোখে কোন যন্ত্রণা নেই। সে আগের মতই বাড়িময় ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমাকে দেখলেই তীব্র ভয়ে পালিয়ে যায়। তখনও

www.boighar.blogspot.com

বোধ হয় আগেকার অন্তরটিকে সম্পূর্ণ হারাই নি, তাই যে প্রাণীটি একদিন আমাকে এত ভালবাসত, আমার প্রতি তার এই বিতৃষ্ণা দেখে প্রথম দিকে আমার কষ্ট হত। কিন্তু অচিরেই সেই কষ্টের বদলে জন্ম নিল বিরক্তি। আর তার পরেই দেখা দিল—বুঝি বা আমার চরম ও অনিবার্য পতনকে ডেকে আনতেই—দেখা দিল এক ধরনের মানসিক বিকৃতি। দর্শনশাস্ত্রে এই বিকৃতির কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু আমি তো জানি তার স্বরূপ। আগেই বলেছি, আমার চরম পতন ঘটাতেই দেখা দিল এই মানসিক বিকৃতি। একদিন এই নির্দোষ জন্তুটির যে ক্ষতি আমি করেছিলাম, এই বিকৃত মানসিকতার তাড়নাতেই এবার আমি সেই ক্ষতির পূর্ণতা সাধন করলাম। একদিন সকালে ঠাণ্ডা মাথায় বিড়ালটার গলা একটা ফাঁস পড়িয়ে দিয়ে তাকে একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিলাম;—সে কাজ করতে আমার চোখে অশ্রুর ধারা বয়ে গেল; তিক্ততম অনুশোচনায় কেঁদে উঠল আমার অন্তর;—তাকে ফাঁসিতে ঝোলালাম কারণ আমি জানতাম সে একদিন আমাকে ভালবাসত, আরও বুঝতাম যে সে আমার প্রতি কোন অন্যায় করে নি;—তাকে ঝুলিয়ে দিলাম কারণ আমি জানতাম এই কাজটা করে আমি পাপ করছি—যে পাপ এতই মারাত্মক যে তার ফলে আমার অমর আত্মা এতদূরে বিপন্ন হয়ে পড়বে যে—যদি তার কোন সম্ভাবনা থাকে—পরম দয়ালু ও চরম ভয়ংকর ঈশ্বরের অপার করুণাও তার কাছে কোনদিন পৌঁছবে না।

যেদিন এই নিষ্ঠুর ঘটনাটি ঘটেছিল সেই রাতেই "আগুন-আগুন"—চীৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আমার বিছানার মশারিতে আগুন লেগেছিল। সমস্ত বাড়িটাই পুড়ে গেল। বহু চেষ্টার ফলে আমার স্ত্রী, একটি ভৃত্য ও আমি নিজে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। সেই আগুন আমার সমস্ত পার্থিব সম্পদ গ্রাস করল। আর সেই থেকেই আমি হলাম এক তীব্র হতাশার শিকার।

যে ঘটনা-শৃংখলের বিবরণ লিখতে বসেছি তার কোন কথাই আমি বাদ দেব না। অগ্নিকাণ্ডের পরদিন ধ্বংসস্তূপ দেখতে গেলাম। একটি ছাড়া অন্য সব দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। যে দেওয়ালটি খাড়া আছে সেই দিকেই ছিল আমার শয্যার মাথা। দেখলাম, সেই দেওয়ালের কাছে বেশ ভিড় জমেছে; অনেকেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেওয়ালের একটি বিশেষ অংশ পরীক্ষা করছে। "আশ্চর্য! অদ্ভুত!" এবং অনুরূপ সব মন্তব্য শুনে আমারও কৌতূহল জাগল। একটু এগিয়েই দেখতে পেলাম একটি প্রকাণ্ড বিড়ালের মূর্তি যেন সাদা পটভূমিতে খোদাই করা রয়েছে। বাস্তবের সঙ্গে ছবিটির হুবহু মিল সত্যি বিস্ময়কর। জন্তুটির গলায় একটা দড়িও ছিল।

প্রথম যখন এই প্রেতমূর্তি দেখলাম—এর চাইতে অন্য কিছু তখন আমি ভাবতে পারি নি—তখন আমার বিস্ময় ও আতংক একেবারে চরমে উঠেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচার-বিবেচনাই আমার সহায় হল। মনে পড়ল, আমাদের গৃহসংলগ্ন বাগানেই বিড়ালটাকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। আগুনের সতর্কবাণী শুনে বহু মানুষ বাগানে জমায়েত হয়েছিল—হয়তো তাদেরই কেউ জন্তুটিকে গাছ থেকে কেটে নামিয়ে খোলা জানালা দিয়ে আমার ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল। সম্ভবত আমাকে ঘুম থেকে

জাগিয়ে তোলার জন্যই এ কাজটা করা হয়েছিল। তারপর ধ্বসে-পড়া অন্য দেওয়ালের চাপে এবং পলস্তারা ও চুণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উল্লেখিত ছবিটি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। আর সেটা দেখেই আমি আঁতকে উঠেছিলাম।

বিবেককে না হলেও আমার বিচার-বুদ্ধিকে ব্যাপারটা এইভাবে বোঝাতে পারলেও আমার কল্পনার উপর তার প্রভাব কিন্তু গভীরভাবেই আঁকা পড়ল। মাসের পর মাস বিড়ালের অপচ্ছায়া আমাকে তাড়া করে ফিরতে লাগল। হয়তো কিছুটা অনুশোচনার ভাবও মনে জেগেছিল। এমনও মনে হত যে বিড়ালটাকে হারিয়ে আমি নিজেরই ক্ষতি করেছি। তাই এখানে সেখানে ওই জাতের আর একটা দেখতে অনেকটা সেই রকম—বিড়ালের খোঁজ করতে শুরু করলাম, যাতে আগের বিড়ালটার শূন্যস্থানটি পূর্ণ করা যায়।

একদিন রাতে প্রায় হতবুদ্ধি অবস্থায় একটা কুখ্যাত আড্ডাখানায় বসেছিলাম। হঠাৎ একটা কালো বস্তুর উপর আমার নজর পড়ল। ঘরে যে সব বড় বড় জিন ও রামের পিপে ছিল তারই একটার মাথার উপর তিনি আরাম করে শুয়ে ছিলেন। একটু এগিয়ে গিয়ে তার গায়ে হাত রাখলাম। একটা কালো বিড়াল—প্রকাণ্ড বড় চেহারা—প্লুটোর মতই; মাত্র একটি ছাড়া আর সব বিষয়েই প্লুটোর সঙ্গে বিড়ালটার মিলও যথেষ্ট। প্লুটোর দেহে কোথাও সাদা লোম ছিল না; কিন্তু এই বিড়ালটার বুকের প্রায় সবটাই সাদা লোমে ঢাকা।

আমি হাত ছোঁয়াতেই বিড়ালটি উঠে বসল। জোরে গর-গর শব্দ করে উঠল, মনে হল তার দিকে আমার নজর পড়ায় সে বেশ খুশিই হয়েছে। তাহলে তো একেই এতদিন খুঁজে বেড়িয়েছি। তখনই মালিকের কাছে বিড়ালটিকে কিনে নেবার প্রস্তাব করলাম; কিন্তু মালিক বিড়ালটাকে তার সম্পত্তি বলে দাবীই করল না—সে ওটাকে চেনেই না—আগে কখনও চোখেই দেখে নি।

আরও কিছুক্ষণ আদর করে যখন বাড়ি ফেরার জন্য পা বাড়ালাম তখন মনে হল বিড়ালটাও আমার সঙ্গী হতে ইচ্ছুক। সঙ্গে নিলাম; পথে যেতে যেতে মাঝে মাঝে নীচু হয়ে তাকে আদরও করলাম। বাড়িতে পৌঁছেই বিড়ালটা যেন অনেক দিনের পোষা হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার স্ত্রীর খুব প্রিয় হয়ে গেল।

আমার মনে কিন্তু বিড়ালটির প্রতি একটা বিরূপ ভাবই দেখা দিল। যা ভেবেছিলাম বাস্তবে ঘটল তার ঠিক উল্টো। কিন্তু—কেমন করে বা কেন এটা ঘটল তা জানি না—বিড়ালটা যে আমার ন্যাওটা হয়ে পড়ল তাতে আমি বিরক্ত ও উত্যক্তই হলাম। আমার এই বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে তীব্র ঘৃণায় পৌঁছে গেল। বিড়ালটাকে আমি এড়িয়েই চলি; একটা লজ্জাবোধের ফলে, এবং একদা যে নিষ্ঠুর কাজটি করেছি সে কথা মনে করে তার গায়েও হাত তুলতে পারি না। কয়েক সপ্তাহ তাকে মারধর কিছুই করলাম না; কিন্তু আস্তে আস্তে—খুবই আস্তে আমার মনে তার প্রতি একটা অকথ্য ঘৃণা দেখা দিল; মহামারীর নিঃশ্বাস থেকে মানুষ যেভাবে পালায়। আমিও তার ন্যাক্কারজনক সান্নিধ্য থেকে

নিঃশব্দে পালিয়ে যেতে লাগলাম।

জীবটির প্রতি এই বিদ্বেষের অন্য একটি কারণ আবিষ্কার করেছিলাম সেটাকে বাড়িতে আনার পরদিন সকালেই—প্লুটোর মতই সে বিড়ালটারও একটা চোখ ছিল না। অবশ্য ঐ একই কারণে আমার স্ত্রীর কাছে সে আরও বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিড়ালটি যত বেশী করে আমার দিকে ঘেঁষতে আসে ততই যেন তার প্রতি আমার বিদ্বেষ বেড়েই চলে। এমন একগুঁয়েভাবে সে আমার পিছন পিছন হাঁটে যে তা আমি কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি যখনই বসি, সে আমার চেয়ারের নীচে গুড়িসুড়ি হয়ে বসে থাকে; কখনও বা আমার হাঁটুর উপর লাফিয়ে উঠে আমাকে জবরদস্তি আদর করতে থাকে। যখনই হাঁটতে শুরু করি, সেও আমার পায় পায় হাঁটে, দুই পায়ের মাঝখানে ঢুকে আমাকে ফেলে দেবার উপক্রম করে, অথবা তার লম্বা লম্বা ধারালো থাবা আমার পোশাকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এইভাবে আমার বুকে পর্যন্ত উঠে দাঁড়ায়। অনেক সময়ই মনে হত—দেই দু'ঘা লাগিয়ে। কিন্তু তাও করতে পারতাম না আগেকার অপরাধের কথা স্মরণ করে। কিন্তু—অকপটেই স্বীকার করছি প্রধানত জন্তুটাকে আমি বড় ভয় করতাম বলে।

ভয়টা যে কোনরকম শারীরিক ক্ষতির তা কিন্তু ঠিক নয়—অথচ আর কি ভাবে যে সেটাকে প্রকাশ করব তাও বুঝতে পারি না। তবু স্বীকার করতেও লজ্জা করে যে বিড়ালটাকে দেখে আমার এই ভয়, এই আতংক আমার নিজেরই একটা অলীক কল্পনার ফল। এই বিড়ালটির গায়ের সাদা লোমের কথা আগেই বলেছি। এখানে পাঠককে স্মরণ রাখতে হবে যে এই সাদা লোমের চিহ্নটা বেশ বড় বলে গোড়ায় খুবই অস্পষ্ট ছিল, কিন্তু একটু একটু করে বেড়ে কখন যে সেটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠছে তা বুঝতেও পারি নি। এখন সেই চিহ্নটা এমন একটা বস্তুর প্রতীক হয়ে উঠছে যার নাম করতেই আতংকে আমি শিউরে উঠি—আর সেই কারণেই আমি তাকে ঘৃণা করি, তাকে ভয় করি। আর সাহসে কুলোলে সেই রাক্ষসটার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাই—আমার কাছে সেটা এখন ফাঁসির দড়ির এক বীভৎস প্রতিমূর্তি!—হায়! কত আতংকের ও অপরাধের—কত যন্ত্রণার ও মৃত্যুর এক শোকাবহ ভয়ঙ্কর যন্ত্র!

আজ আমার মত হতভাগ্য মানুষ আর কে আছে। একটি ইতর পশু—যার এক জাত-ভাইকে আমি শোচনীয়ভাবে খুন করেছি—একটি ইতর পশুর ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিরূপে গড়া আমার মত একটি মানুষের জন্য এনেছে কী দুঃসহ দুঃখ! হায়! কি দিনে কি রাতে শান্তির আশীর্বাদ আমার ললাটকে একটু স্পর্শও করে না। দিনে সেই জীবটি মুহূর্তের জন্যও আমাকে একলা থাকতে দেয় না; আর রাত হলে অকথ্য ভয়ের স্বপ্ন ভেঙে যেতেই আমার মুখের উপর এসে পড়ে সেই জীবটিরই উষ্ণ নিঃশ্বাস—একটা মূর্তিমান দুঃস্বপ্নের বিরাট বোঝা আমার বুকের উপর চিরকালের মত চেপে বসে, তাকে এতটুকু সরিয়ে দেবার ক্ষমতা আমার নেই!

এই সব যন্ত্রণার চাপে তখনও পর্যন্ত যেটুকু ভাল আমার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল তাও শেষ হয়ে গেল। অন্যায় চিন্তা—নিকৃষ্টতম পাপ-চিন্তা আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠল। এমন কি আমার যে সরলা স্ত্রীটি মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করেছে সেও হয়ে উঠল আমার অত্যাচারের নীরব শিকার।

একদিন পারিবারিক প্রয়োজনে সেই বিড়ালটা আমার সঙ্গে পুরনো বাড়ির ভূগর্ভ-কক্ষে গেল। দারিদ্র্যের চাপে পড়ে আমরা তখন বাধ্য হয়ে সেই বাড়িতেই বাস করি। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে নামবার সময় আমাদের অনুসরণ করে সে আমাকে প্রায় উল্টে ফেলে দেবার যোগাড় করেছিল। তাতেই আমার মাথায় খুন চড়ে গেল। একটা কুড়ুল তুলে নিয়ে বিড়ালটাকে লক্ষ্য করে এক কোপ বসিয়ে দিলাম। কোপটা সঠিক লক্ষ্যে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বাছাধনের ভবলীলা সাঙ্গ হত। কিন্তু কোপটা আটকে গেল আমার স্ত্রী হাত বাড়িয়ে বাধা দেওয়ায়। বাধা পেয়ে আমার রাগ আসুরিক মূর্তি ধারণ করল। নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সজোরে কুড়ুলের কোপ বসিয়ে দিলাম স্ত্রীর মাথায়। সেখানেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। একটা আর্তনাদও বের হল না তার মুখ থেকে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ডটি করে মৃতদেহটিকে লুকিয়ে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আমি জানতাম দিনে হোক রাতে হোক মৃতদেহটাকে বাড়ি থেকে সরাতে গেলেই কেউ না কেউ দেখে ফেলবে। অনেক রকম ফন্দি মাথায় এল। একবার ভাবলাম, মৃতদেহটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলব। আবার ভাবলাম, ভূগর্ভ-কক্ষের মেঝেতে ওটাকে কবর দেব। আবার, উঠোনের কুয়োর মধ্যে ফেলে দেব—মালপত্রের মত একটা বাক্সের মধ্যে প্যাক করে কুলি ডেকে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাব। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম, ভূগর্ভ-কক্ষে সেটাকে পাঁচিল তুলে আটকে দেব—মধ্যযুগে সন্ন্যাসীরা যে ভাবে তাদের শত্রুদের শাস্তি দিতেন।

বাড়ির ভূগর্ভ-কক্ষটাকে সহজেই এই কাজে ব্যবহার করা গেল। একটা শাবল দিয়ে দেওয়ালের ইঁট খুলে মৃতদেহটাকে সেই ফোকরের মধ্যে বসিয়ে হুবহু আগেকার মত করেই দেওয়ালটাকে পলস্তরা বসিয়ে দিতে মোটেই অসুবিধা হল না। কাজ শেষ হলে তা দেখে খুব খুশি হলাম। নতুন পলস্তরার চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ছে না; সবটাই দেখাচ্ছে ঠিক আগেকার পলস্তরারই মত। মেঝেতে ইটের টুকরো, চুণ ও বালি যা পড়েছিল বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তুলে দিলাম। বিজয়ীর ভঙ্গীতে চারদিকে তাকিয়ে নিজেকেই বললাম, "অন্তত এক্ষেত্রে আমার চেষ্টা বিফল হয় নি।"

আমার পরবর্তী কাজ হল সব নষ্টের গোড়া সেই বিড়ালটাকে খুঁজে বের করা; কারণ এবার আমি মনস্থির করে ফেলেছি যে সেটাকেও শেষ করে ফেলব। সেই মুহূর্তে তাকে হাতের কাছে পেলে তার ভবলীলা সাঙ্গ হতে বিলম্ব ঘটত না; কিন্তু চতুর জন্তুটি আমার রাগের বহর দেখে যথাসময়েই সেখান থেকে সরে পড়েছে। রাতেও তার দেখা পেলাম না—আর এই ভাবে নতুন বিড়ালটা এ বাড়িতে আসার পর থেকে এই প্রথম একটা রাতে আমি শান্তিতে গভীর ঘুম ঘুমলাম; হ্যাঁ, একটা

খুনের বোঝা বুকে নিয়েও ঘুমলাম !

দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন কেটে গেল, তখনও আমার যন্ত্রণাদাতা এল না। আবার আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। রাক্ষসটা ভয়েই এ-বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে! আর তাকে চোখে দেখতে হবে না! আমার কী অপার আনন্দ! আমার পাপ কাজ নিয়েও বিশেষ গোলমাল হল না। অল্প কিছু খোঁজ-খবর হল বটে, কিন্তু সে ঝামেলা সহজেই মিটে গেল। একটা খানা-তল্লাসীও হল, কিন্তু তাতেও কিছু পাওয়া গেল না। অতএব আমার ভবিষ্যৎ নিরাপদ।

খুনের চতুর্থ দিনে খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে একদল পুলিশ বাড়িতে এল। সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজল। আমি তো জানতাম, শত চেষ্টাতেও পুলিশ কিছুই খুঁজে পাবে না; কাজেই আমি মোটেই বিব্রত হলাম না। পুলিশ-অফিসারদের নির্দেশে তল্লাসীর সময় আমিও তাদের সঙ্গে গেলাম। বাড়ির এ-কোণ সে-কোণ কোন জায়গায়ই তারা বাকি রাখল না। শেষ পর্যন্ত, তৃতীয় বা চতুর্থ বারে তারা ভূগর্ভ-কক্ষে নেমে গেল। আমার একটা মাংসপেশীও কাঁপল না। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত আমি হাঁটতে লাগলাম। দুই হাত বুকের উপর ভাঁজ করে রেখে আমি সহজভাবেই ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। পুলিশরা কোন কিছু না পেয়ে ফিরে যেতে উদ্যোগী হল। মহা আনন্দে আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না। জয়ের আনন্দকে প্রকাশ করতে অন্তত একটা কথাও বলার জন্য আমার মনটা উসখুস করে উঠল; ভাবলাম, তা'হলেই আমি যে সম্পূর্ণ নির্দোষ সে সম্পর্কে তারা দ্বিগুণ নিশ্চিত হবে।

পুলিশের দলটি সিঁড়িতে পা দিতেই আমি বলে উঠলাম, “মশায়রা, আপনাদের সব সন্দেহ দূর করতে পারায় আমি আনন্দিত। আপনারা সুস্থ থাকুন এই কামনা করি। হ্যাঁ—ভাল কথা মশায়রা, এই—এই যে বাড়িটা দেখছেন—এটা খুব ভালভাবে নির্মিত—বরং বলতে পারি খুবই উৎকৃষ্ট এর নির্মাণ-কার্য। এই দেওয়ালগুলি—আপনারা কি চলে যাচ্ছেন না কি?—এই দেওয়ালগুলি খুব নিরেটভাবে গাঁথা।” কথাগুলি বলার সময় সাহসিকতা প্রদর্শনের অতি-উৎসাহে আমি হাতের বেতের লাঠিটা দিয়ে দেওয়ালের ঠিক সেই জায়গাটাতেই সজোরে আঘাত করলাম যার পিছনেই রাখা ছিল আমার প্রিয়তমা পত্নীর মৃতদেহটি!

কিন্তু—সেই মহাশয়তানের থাবা থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন! আমার আঘাতের প্রতিধ্বনিটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই কবরের ভিতর থেকে কার কণ্ঠস্বর আমার কথার উত্তর দিল!—একটা কান্নার শব্দ, প্রথমে চাপা ও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা, একটি শিশুর ফুঁপিয়ে কান্নার মত, ক্রমে অতি দ্রুত বা উদ্বেলিত হয়ে উঠল একটি দীর্ঘ, উচ্চ, অবিরাম আর্তনাদে, একান্ত সামঞ্জস্যহীন এবং অমানবিক—একটা ক্রুদ্ধ গর্জন—একটা করুণ আর্তনাদ, অর্ধেক ত্রাসের, অর্ধেক জয়ের; এমন কণ্ঠস্বর আসতে পারে একমাত্র নরক থেকে—যারা নির্যাতিত হয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, আর যে দানবরা নির্যাতন করে উল্লাসে চীৎকার করছে সেই দুইয়ের মিলিত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়ে।

আমার নিজের কথা তো বলাই বোকামি। টলতে টলতে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম বিপরীত দিকের দেওয়ালের উপর। মুহূর্তের জন্য তদন্তকারী দলটি আতংকে ও ভয়ে সিঁড়ির উপর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরমুহূর্তেই একডজন বলিষ্ঠ হাত পড়ল দেওয়ালের গায়ে। দেওয়াল ভেঙ্গে পড়ল। জমাট রক্তমাখা গলিত মৃতদেহটি দর্শকবৃন্দের চোখের সামনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার উপর বিস্ফারিত লাল মুখ ও একটিমাত্র অগ্নিময় চোখ নিয়ে বসে আছে সেই বীভৎস প্রাণীটি যার চাতুরি আমাকে এই খুনের পথে ভুলিয়ে এনেছিল, আর যার কণ্ঠস্বর আমাকে তুলে দিয়েছিল ফাঁসির জল্লাদের হাতে। দেওয়াল তুলে সেই রাক্ষসটাকেও আমি কবরের মধ্যে আটকে রেখেছিলাম!

বন্ধুর পর্বতের কাহিনী

A Tale of the Ragged Mountains

১৮২৭ সালের গোড়ার দিকে ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত চার্লোটেস্‌ভিলে-তে বাস করার সময় আকস্মিকভাবেই মিঃ অগস্টাস বেড্‌লোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই যুবকটি সব দিক থেকেই ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক; তাই তার সম্পর্কে আমার মনে গভীর আগ্রহ ও কৌতূহল জেগেছিল। নৈতিক অথবা দৈহিক সম্পর্কের দিক থেকেও তাকে ঠিকমত জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তার পরিবারের কোন সন্তোষজনক বিবরণ আমি যোগাড় করতে পারি নি। তিনি কোথা থেকে এসেছেন তাও জানি না। এমন কি তার বয়সের ব্যাপারেও—আমি তাকে যুবক ভদ্রলোক বলে উল্লেখ করলেও—এমন কিছু ছিল যা নিয়ে আমি যথেষ্ট বিচলিত বোধ করেছি। তাকে দেখলে যুবক বলেই মনে হত—যৌবনের কথা তিনি মাঝে মাঝেই বলতেন—তথাপি এমন অনেক সময় এসেছে যখন তাকে একটি একশ' বছরের মানুষ বলেও আমরা সে কল্পনা করতে পারতাম। কিন্তু অন্য সব কিছুর চাইতে ব্যক্তিগত চেহারাটাই ছিল তার বড় বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন বিশেষ রকমের ঢ্যাঙা আর শীর্ণ। অত্যন্ত ঝুঁকে চলতেন। হাত-পাগুলো ছিল যেমন লম্বা, তেমনি শুকনো। কপাল চওড়া ও নীচু। মুখে রক্তের লেশমাত্র ছিল না। মুখখানি চওড়া ও নমনীয়, আর দাঁতগুলি শক্ত হলেও এত বেশী অসমান যে কোন মানুষের মুখে এ ধরনের দাঁত আমি আগে দেখিনি। তবে মুখের হাসিটা বৈচিত্র্যহীন হলেও মোটেই বিরক্তিকর নয়; কেমন এক ধরনের গভীর বিষণ্ণতা মাখানো। চোখ দুটি অস্বাভাবিক বড়, আর বিড়ালের চোখের মত গোল। চোখের মণিদুটিও বিড়াল জাতীয় প্রাণীর মতই আলোর হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত বা সংকুচিত হত। উত্তেজনার মুহূর্তে অক্ষি-গোলক দুটি

ধারণাতীতভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠত ; তা থেকে যে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হত সেটা প্রতিফলিত আলো নয়, মোমবাতি বা সূর্যের মত মৌলিক আলো ; অথচ সাধারণ অবস্থায় দুটি গোলকই সম্পূর্ণ নিস্তেজ, আবছা, ও অস্পষ্ট ; সেদিকে তাকালেই দীর্ঘদিন সমাহিত মৃতদেহের চোখের কথা মনে পড়ে যেত।

চেহারার এই সব বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি নিজেও অনেক সময়ই ক্ষোভ প্রকাশ করতেন, সব কিছু বোঝাবার চেষ্টা করতেন। তিনি যা বলতেন তার মর্মার্থ হল—আজ তাকে যে রকম দেখছি চিরদিন তিনি সে রকম ছিলেন না—পর পর অনেকগুলি স্নায়বিক রোগের আক্রমণের ফলেই তার চেহারার এই দশা হয়েছে। অতীতে অনেক বছর ধরে তিনি টেম্পল্‌টন নামক জনৈক চিকিৎসকের চিকিৎসাধীন ছিলেন। ভদ্রলোকের বয়স তখন সত্তর বছর—সারাটোগাতেই প্রথম তার সঙ্গে পরিচয় হয়, আর তার চিকিৎসায় তিনি খুবই ভাল ফল পান। ফলে ধনবান বেড্‌লো ডাক্তার টেম্পল্‌টনের সঙ্গে এমন একটা বন্দোবস্ত করেন যে একটা মোটা রকমের বার্ষিক ভাতার বিনিময়ে তিনি কেবলমাত্র এই পঙ্গু লোকটির চিকিৎসাই করবেন।

যৌবনকালে ডাক্তার টেম্পল্‌টন একজন পর্যটক ছিলেন, এবং এক সময় প্যারিসে থাকা কালে মেস্‌মার-এর দলে ভিড়ে যান। এখন, নানা রকম চুম্বক ঘটিত ওষুধের সাহায্যেই তিনি রোগীর তীব্র যন্ত্রণার উপশম ঘটান ; আর তার ফলে যে মূল মৈস্মরিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সেই ওষুধগুলির উৎপত্তি তার প্রতি বেড্‌লোর বিশ্বাসও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অবশ্য নতুন ছাত্রটিকে নিজের চিন্তা-ভাবনায় পুরোপুরি দীক্ষিত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান এবং শেষ পর্যন্ত অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রোগীকে সম্মত করে তোলেন। তারপর থেকে মাঝে মাঝেই এই ধরনের ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে একটু একটু করে ডাক্তার টেম্পল্‌টন ও বেড্‌লোর মধ্যে একটা পরিষ্কার সমঝোতা বা চৌম্বক সম্পর্ক গড়ে উঠল। আমি বলছি না যে এই সমঝোতা সরল ঘুম-পাড়ানি শক্তির সীমার বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল ; কিন্তু সেই শক্তিটাই যথেষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছিল। চৌম্বক নিদ্রালুতা সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টায় মৈস্মর বিদ্যার পণ্ডিতটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলেন। পঞ্চম বা ষষ্ঠ প্রচেষ্টায় অনেক সময় কাটাবার পরে আংশিক সফল হলেন। কেবলমাত্র দ্বাদশ প্রচেষ্টাতেই তার বিজয় সম্পূর্ণ হল। তারপর থেকেই রোগীর ইচ্ছাশক্তি অতি দ্রুত ডাক্তারের ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করত। ফলে দুজনের সঙ্গে আমি যখন প্রথম পরিচিত হলাম সেই সময়ে কেবলমাত্র ডাক্তারের ইচ্ছাশক্তির জোরেই মুহূর্তের মধ্যে রোগী ঘুমিয়ে পড়ত, এমন কি পঙ্গু লোকটি ডাক্তারের উপস্থিতি সম্পর্কে অনবহিত থাকলেও এ রকমটা ঘটত। আজকের দিনে, অর্থাৎ ১৮৪৫ সালে এ রকম অলৌকিক ঘটনা হাজার হাজার লোক প্রতিদিন দেখছে, কিন্তু যে সময়ের কথা আমি লিখছি সে সময়ে এটা একটা গুরুতর ঘটনা বলেই পরিগণিত হত।

বেডলোর মেজাজটাই ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল, উত্তেজনাপ্রবণ, ও আগ্রহী। তার কল্পনা ছিল বিশেষ রকমের শক্তিশালী ও সৃষ্টিশীল ; অবশ্য নিয়মিতভাবে আফিম সেবনের ফলেই—আর সে বস্তুটি তিনি প্রচুর পরিমাণেই গিলতেন এবং আফিম ছাড়া

তার পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব ছিল—তার কল্পনা-শক্তি আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। প্রত্যহ সকালে প্রাতরাশের পরে—অথবা এককাপ কড়া কফি খাবার ঠিক পরেই বেশ বড় মাপের একদলা আফিম খাওয়া ছিল তার দৈনন্দিন অভ্যাস ; তারপরেই কখনও একাকি, কখনও বা একটি কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হতেন চার্লোটেস্‌ভিলের পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অরণ্যশোভিত উষর পর্বত শ্রেণীর পথে পথে। সে অঞ্চলে ঐ পর্বত শ্রেণীকে সম্মান করে বলা হয় "বন্ধুর পর্বতমালা"।

একদা নভেম্বরের শেষের দিকে এক স্তিমিত আলো, গরম, ও কুয়াসা ভরা দিনে মিঃ বেডলো যথারীতি সেই পাহাড়ের দিকে বেড়াতে গেলেন। দিন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু তিনি ফিরে এলেন না।

রাত আটটা নাগাদ তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে শংকিত হয়ে আমরা তাঁকে খুঁজতে বের হব এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে তিনি এসে হাজির হলেন। শরীরের অবস্থা যথাপূর্বম্‌, তবে মেজাজটা একটু বেশীমাত্রায় খুশি। তার অভিযানের, এবং যে সব ঘটনা তার বিলম্বের কারণ তার যে বিবরণ তিনি দিলেন সেটা সত্যি অসাধারণ।

তিনি বললেন, "আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, সকাল নটা নাগাদ আমি চার্লোটেস্‌ভিল থেকে বের হয়েছিলাম। প্রথমেই পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করে প্রায় দশটার সময় এমন একটা গিরি-খাতের মধ্যে ঢুকলাম যেটা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বেশ আগ্রহ নিয়েই সেই আঁকা-বাঁকা গিরি-খাত ধরে কিছুক্ষণ হাঁটলাম।—চারদিকের দৃশ্যকে খুব আহা-মরি না বলতে পারলেও তার মধ্যে এমন একটা অবর্ণনীয় ভয়ংকর নির্জনতা ছিল যা আমার বেশ ভাল লাগছিল। কেন যেন মনে হল, এই যে সবুজ ঘাস ও ধূসর পাহাড়ের উপর দিয়ে আমি হাঁটছি আগে কোন দিন কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন তার উপর আঁকা পড়ে নি। গিরি-খাতের মুখটা বড়ই নির্জন, আর দুর্গম ; তাই আমিই প্রথম অভিযাত্রী—প্রথম এবং একমাত্র অভিযাত্রী যে এই গিরি-খাতের মধ্যে প্রথম ঢুকেছে সেটা মোটেই অসম্ভব নয়।

"একটা ঘন কুয়াসা বা ধোঁয়া সব কিছুর উপর ভারী হয়ে ছড়িয়ে আছে ; ফলে তাদের সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণাটা আরও গভীর হয়ে উঠছে। কুয়াসাটা এত ঘন যে আমার সমুখের পথটার বারো গজ দূরের কোন কিছুই আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। পথটা বড় বেশী কুটিল। সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে না। কাজেই অচিরেই আমার দিক-ভ্রম ঘটল। কোন্‌ দিকে এগিয়ে চলেছি তাই বুঝতে পারছিলাম না। ইতিমধ্যে আফিমের ক্রিয়াও শুরু হয়ে গেল—সমস্ত বহির্জগৎটা সম্পর্কেই আমার আগ্রহ অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। একটা পাতার কাঁপনে—একটা ঘাসের শিসের রং-এ—একটা ত্রিপত্রের আকৃতিতে—একটা মৌমাছির গুঞ্জনে—একটা শিশির-বিন্দুর ঝিলিমিলিতে—একটা বাতাসের নিঃশ্বাসে—বনের ভিতর থেকে ভেসে আসা একটা অস্পষ্ট গন্ধে—আমি যেন খুঁজে পেলাম একটা বিশ্ব-জোড়া ইঙ্গিত—অসংলগ্ন ও শৃংখলবিহীন চিন্তার এক আনন্দময় বিচিত্র ধারা।

"এই সব নিয়ে ব্যস্ত থেকেই আরও কয়েক ঘণ্টা হাঁটলাম ; ইতিমধ্যে চারদিকের

www.boighar.blogspot.com

কুয়াসা এত ঘন হয়ে নামল যে শেষ পর্যন্ত আমার হাতড়ে পথ চলার মত অবস্থা দেখা দিল। আর তখনই একটা অবর্ণনীয় অস্বস্তি—এক ধরনের স্নায়বিক দ্বিধা ও কম্প আমাকে পেয়ে বসল।—পা ফেলতেও ভয় হতে লাগল, পাছে কোন গভীর খাদে পড়ে যাই। এই বন্ধুর পাহাড়ী অঞ্চলের অনেক অদ্ভুত গল্প-গুজব মনে পড়তে লাগল ঃ এখানকার ঝোঁপ-ঝাড়ে ও খানা-খন্দে নাকি বাস করে অদ্ভুতদর্শন হিংস্র সব মানুষ। হাজার আবছা কল্পনা আমাকে চেপে ধরল—আবছা বলেই যেন তারা আরও ভয়াবহ। হঠাৎ একটা ঢাকের জোরালো বাদ্য আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"আমার বিস্ময় চরমে উঠল। এই সব পাহাড়ে কেউ তো ঢাক দেখে নি, বা তার বাজনা শোনে নি। শ্রেষ্ঠ দেবদূতের ভেঁপুর শব্দ শুনলেও তো আমি এর চাইতে বেশী আশ্চর্য হতাম না। কিন্তু আগ্রহ ও বিহ্বলতার আর একটি নতুন ও অধিকতর বিস্ময়কর কারণ এসে হাজির হল। একগোছা চাবির ঝনঝনানির মত একটা এলোমেলো বিচিত্র শব্দ কানে আসার পরক্ষণেই একটি কৃষ্ণকায় অর্ধনগ্ন মানুষ আর্তনাদ করে আমার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল। সে আমার এত কাছ দিয়ে গেল যে আমার মুখের উপর তার গরম নিঃশ্বাস আমি অনুভব করলাম। তার হাতে অনেকগুলি ইস্পাতের আংটা একত্র করে তৈরী একটা যন্ত্র ; সে দৌড়চ্ছে আর যন্ত্রটাকে ভীষণভাবে দোলাচ্ছে। লোকটি কুয়াসার মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল একটা প্রকাণ্ড জন্তু ; তার মুখটা হা-করা, চোখ দুটো জ্বলছে। আমার চিনতে ভুল হল না। একটা হায়েনা।

"এই রাক্ষসটাকে দেখে আমার আতংক না বেড়ে বরং কমে গেল—কারণ আমি যে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এবার আমি জাগ্রত চেতনায় ফিরে আসতে সচেষ্ট হলাম। সাহসে ভর করে সামনে এগিয়ে গেলাম। চোখ দুটি কচলে চীৎকার করে উঠলাম। নিজের শরীরে চিমটি কাটলাম। একটা ছোট ঝর্ণা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে নীচু হয়ে হাতে, মুখে, ঘাড়ে জল দিলাম। তাতেই মনের সব ঘোর কেটে গেল। উঠে দাঁড়ালাম যেন এক নতুন মানুষ। স্থির, শান্ত পদক্ষেপে অজ্ঞাত পথে চলতে শুরু করলাম।

"শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে একটা গাছের নীচে বসে পড়লাম। সূর্যের একটা ক্ষীণ রশ্মি দেখা দিল ; গাছের পাতার ছায়া আঁকা পড়ল ঘাসের বুকে। বেশ কয়েক মিনিট সেই ছায়ার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তার আকৃতি আমাকে বিস্ময়ে হতবাক করে দিল। উপরে তাকালাম। একটা তাল গাছ।

"তড়িৎগতিতে উঠে দাঁড়ালাম। স্বপ্ন দেখার সময় নেই। আমি দেখলাম—বুঝতে পারলাম আমার ইন্দ্রিয়গুলি এখনও আমার বশে আছে, আর সেই ইন্দ্রিয়গুলিই আমার মনের সামনে খুলে দিল একটা নতুনতর অনুভূতির জগৎ। হঠাৎই গরমটা অসহ্য হয়ে উঠল। বাতাসে ভেসে এল এক আশ্চর্য সুরভি।—ভরা নদীর শান্ত স্রোতধারার মত একটা চাপা, একটানা মর্মর শব্দ আমার কানে এল—তার সঙ্গে মিশে আছে অসংখ্য মানব-কণ্ঠের মিলিত গুঞ্জন।

"পরম বিস্ময়ে সেই গুঞ্জন-ধ্বনি শুনতে শুনতেই কোথা থেকে একটা দমকা হাওয়া এসে সব কুয়াসা উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন যাদুকরের যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায়।

"দেখলাম, একটা উঁচু পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আমি নীচের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে আছি ; প্রান্তরের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটা বিশাল নদী। সেই নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচ্য চেহারার একটি শহর—যে রকম শহরের কথা আমরা আরব্য উপন্যাসে পড়ে থাকি, কিন্তু তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। আমি দাঁড়িয়েছিলাম শহর থেকে অনেকটা উঁচুতে ; তাই শহরের সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম মানচিত্রে আঁকা ছবির মত। অসংখ্য রাস্তা এখানে সেখানে পরস্পরকে ছেদ করে নানা দিকে চলে গেছে ; তবে বড় রাস্তার চাইতে সরু আঁকাবাঁকা গলির সংখ্যাই বেশী ; লোকজন একেবারে গিজগিজ করছে। বাড়িগুলো সুন্দর, তবে সুশৃংখলভাবে সাজানো নয়। অসংখ্য অলিন্দ, বারান্দা, মিনার, আর অদ্ভুত কারুকার্যকরা বাতায়ন। প্রচুর বাজার—তাতে নানা রকম মূল্যবান জিনিসপত্র সাজানো—রেশমী বস্ত্র, মসলিন, ঝকঝকে ছুরি-কাঁচি, আর বহু মূল্যবান হীরে জহরত, মণি মুক্তো। তাছাড়া, চতুর্দিকেই দেখা যাচ্ছে নিশান ও পাল্কি, অবগুণ্ঠনে ঢাকা মহিলাসহ শিবিকা, জমকালো সাজে সজ্জিত হাতির দল, নানা রকম পুতুল, ঢাক, শংখ, বর্শা, আর রুপোর ও গিল্টি-করা আটা-সোটা। হৈ-হট্টগোল ও ভিড়ের মধ্যে পাগড়ি মাথায়, রাজপোশাক গায়ে, লম্বা দাড়িওয়ালা লক্ষ লক্ষ কালো ও হলুদ মানুষদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য পবিত্র ষাঁড় ; মসজিদের কার্নিসে, মিনার ও বাতায়নে ঝুলে আছে হাজার হাজার নোংরা অথচ পবিত্র হনুমান। জনবহুল রাজপথ থেকে নদীর তীর পর্যন্ত অসংখ্য সিঁড়ি নেমেছে স্নানের ঘাটে। নদীর বুকেও মাল-বোঝাই বড় বড় জাহাজের ভিড়। শহরের সীমানার বাইরে মাঝে মাঝেই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি তাল ও অন্যান্য বড় গাছ ; এখানে ওখানে চোখে পড়ছে ফসলের খেত, চাষীর খড়ের ঘর, একটা পুকুর, নির্জন মন্দির, বেদের তাঁবু, মাথায় কলসি নিয়ে একলা মেয়ে মানুষ চলেছে নদীতীরের দিকে।

"আপনারা হয়তো বলবেন, আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম ; কিন্তু তা নয়। যা দেখেছি যা শুনেছি, যা অনুভব করেছি, যা ভেবেছি—তার মধ্যে স্বপ্নের খাম-খেয়ালিপনার কিছুই ছিল না। সব কিছুই ছিল কঠোরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথমে আমার মনেও সন্দেহ জেগেছিল সত্যি তখন আমি জেগেছিলাম কি না ; অনেক রকম পরীক্ষা করেও দেখেছিলাম ; তার পরেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সত্যি সত্যি আমি জেগেছিলাম। কাজেই এ সব কিছুকেই আমি প্রকৃত ঘটনা বলেই মনে করি।

ডাক্তার টেমপল্‌টন বলে উঠলেন, "আমি অবশ্য এ বিষয়ে খুব নিশ্চিত নই ; তবু আপনি বলে যান। আপনি উঠে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে নামতে লাগলেন। তারপর ?"

অবাক হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বেড্‌লো বলতে লাগলেন, "ঠিকই বলেছেন,

আমি উঠে শহরের দিকে নামতে লাগলাম। পথে প্রচুর লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। সকলেই ভিড় করে একই দিকে চলেছে; সকলেই ভীষণ উত্তেজিত। কেন জানি না হঠাৎ সমস্ত ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি খুবই কৌতূহলী হয়ে পড়লাম। ভিড়ের লোকজনের প্রতি একটা তীব্র শত্রুতার ভাব জাগল মনে। তাড়াতাড়ি তাদের ভিতর থেকে ছিটকে গিয়ে একটা ঘুর পথে শহরে পেঁৗছে গেলাম। সেখানে তখন তুমুল গোলমাল; শুরু হয়ে গেছে সংঘর্ষ। একদিকে আধা-বৃটিশ ইউনিফর্ম পরিহিত পদস্থ অফিসারবৃন্দ ও আধা-ভারতীয় আধা-ইউরোপীয় পোশাক পরা মানুষের একটা ছোট দল, আর অন্যদিকে নানা অলি-গলি থেকে বেরিয়ে আসা ইতরজনের মস্ত ভিড়। জনৈক মৃত অফিসারের অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে আমিও ভিড়ে গেলাম দুর্বলতর দলটার সঙ্গে। কার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে না জেনেই বেপরোয়াভাবে যুদ্ধ করতে শুরু করলাম। প্রবল সংখ্যাধিক্যের চাপে অচিরে আমরা হেরে গেলাম; পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলাম একটা খোলা ছাদের নীচে। সেখানেই চারদিকে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে আপাতত কিছুটা নিরাপদ হলাম। চালাটার মাথার দিকে একটা বড় ফোকরের ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম, একটা বিরাট জনতা উত্তেজিতভাবে নদীর একেবারে উপরের একটা সুন্দর প্রাসাদকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ চালাচ্ছে। আরও দেখলাম, সেই প্রাসাদের উপরকার একটা জানালার ভিতর দিয়ে পাগড়ির কাপড় দিয়ে বানানো দড়ি বেয়ে নেমে এল মেয়েলি চেহারার একটি মানুষ। কাছেই নৌকো বাঁধা ছিল। লোকটি সেই নৌকোতে চড়ে নদীর অপর পারে পালিয়ে গেল!

"এবার আমার মাথায় একটা নতুন মতলব ঢুকল। খুব অল্প কথায় সঙ্গীদের সেটা বোঝাতেই তারাও আমার সঙ্গে একমত হল; আর তখনই আমরা সবেগে ছুটে বেরিয়ে পড়লাম চালাঘর থেকে। আমাদের আক্রমণের চাপ প্রতিপক্ষ দল বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। হতবুদ্ধি হয়ে তারা আবার অলি-গলিতে ছড়িয়ে পড়ল। সেখান থেকেই তারা নতুন করে আমাদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল বর্শা ও তীরের সাহায্যে। তীরগুলি খুবই সাংঘাতিক, দেখতে অনেকটা মালয় দেশের বাঁকা কিরিচের মত। তীরগুলি সর্পাকৃতি, লম্বা আর কালো; মুখে বিষ মাখানো। একটা তীর এসে আমার কপালে বিঁধে গেল। মাথা ঘুরে সেখানেই পড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লাম। তার সঙ্গে অনেক লড়লাম, হাঁপাতে লাগলাম—মরে গেলাম।"

আমি হেসে বললাম, "এখনও নিশ্চয় বলবেন না যে আপনার গোটা অভিযানই একটা স্বপ্নমাত্র নয়। আপনি নিশ্চয় বলতে রাজী হবেন না যে আপনি মৃত?"

আশা করেছিলাম, বেড্‌লোর কাছ থেকে একটা মুখের মত জবাব পাব; কিন্তু কী আশ্চর্য, সে ইতস্তত করতে লাগল, তার শরীর কাঁপতে শুরু করল, মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল, তিনি চুপ করে রইলেন। আমি টেম্পল্‌টনের দিকে তাকালাম। কাঠের মত খাড়া হয়ে তিনি চেয়ারে বসে আছেন—দাঁতে দাঁত লেগে ঠক্-ঠক্ শব্দ হচ্ছে; চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত কর্কশ গলায়

বেড্‌লোকে বললেন, "বলে যান।"

বেড্‌লো আবার কথা শুরু করলেন, "অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার একমাত্র অনুভূতি ছিল অন্ধকারের ও অস্তিত্বহীনতার, তার সঙ্গে মিশে ছিল মৃত্যু-চেতনা। শেষ পর্যন্ত মনে হল আমার মনের ভিতর দিয়ে সহসা একটা তীব্র বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। এটা আমার অনুভূতি মাত্র, চোখে দেখা নয়। মুহূর্তের মধ্যে আমি যেন উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু দৃষ্টিগোচর, শ্রুতিগোচর, বা শারীরিক দিক থেকে আপাতগ্রাহ্য কোনরকম উপস্থিতিই আমার ছিল না। জনতা চলে গেল। গোলযোগ থেমে গেল। শহর অপেক্ষাকৃত শান্ত হল। আমারই পায়ের নীচে পড়ে আছে আমারই শব, কপালে তীর বিঁধে আছে, মাথাটা ভীষণ ফুলে বিকৃত হয়ে গেছে। এ সবই আমার অনুভূতি মাত্র, চোখে দেখা নয়। কোন কিছুতেই তিলমাত্র আগ্রহ নেই। এমন কি মনে হল আমার শবদেহ নিয়েও আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। মনের ইচ্ছা না থাকলেও মনে হল কেউ যেন আমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছে; অতএব যে ঘুর পথে এসেছিলাম সেই পথেই সবেগে শহর থেকে বেরিয়ে গেলাম। গিরিখাতে যেখানে হায়েনার দেখা পেয়েছিলাম সেখানে পৌঁছনোমাত্রই আবার যেন তড়িতাহত হলাম; ভার, ইচ্ছাশক্তি ও অস্তিত্বের চেতনা ফিরে পেলাম। আবার আমার সত্তাকে ফিরে পেলাম; সাগ্রহে বাড়ির পথে পা বাড়ালাম—কিন্তু অতীত তার স্পষ্ট বাস্তবতাকে মোটেই হারাল না—আর এখনও মুহূর্তের জন্য আমি সেই অতীতকে স্বপ্ন বলে ভাবতে পারি না।"

গম্ভীর গলায় টেম্পল্‌টন বললেন, "সেটা স্বপ্ন ছিলও না, তথাপি সেটাকে আর কি নামে যে অভিহিত করা যায় সেটা বলাও কঠিন। আমরা শুধু এইটুকু ধরে নিতে পারি যে আজকের মানুষের মন একটা বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। এইটুকু জেনেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বাকিটার কদাচিৎ ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি। এই যে জল-রং-এর ছবিটা দেখছেন, এটা আপনাকে আগেই দেখানো আমার উচিত ছিল, কিন্তু একটা ব্যাখ্যাতীত আতংকের জন্যই এতদিন দেখাতে পারি নি।"

আমরা ছবিটার দিকে তাকালাম। আমি তো অসাধারণ কিছু দেখতে পেলাম না; কিন্তু বেড্‌লোর উপর তার প্রতিক্রিয়া হল অসাধারণ। তার প্রায় মূর্ছা যাবার মত অবস্থা হল। কিন্তু ছবিটা তো তারই একটা ছোট প্রতিকৃতি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না—অবশ্য প্রতিকৃতিটা ছিল তার নিজের চেহারার এক আশ্চর্য রকমের হুবহু প্রতিরূপ। অন্তত ছবিটা দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল।

টেম্পল্‌টন বললেন, "লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, প্রতিকৃতির এক কোণে অস্পষ্টভাবে সময়টা লেখা আছে—১৭৮০। ঐ বছরেই ওটা আঁকা হয়েছিল। ওটা আমার এক মৃত বন্ধু—জনৈক মিঃ ওল্ডেব-এর প্রতিকৃতি—লোকটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল কলকাতায় ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে। তখন আমার বয়স মাত্র বিশ বছর। মিঃ বেড্‌লো, সারাটোগাতে আপনাকে প্রথম দেখেই আপনার সঙ্গে

এই প্রতিকৃতির অলৌকিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই আমি যেচে আপনার সঙ্গে পরিচয় করি, আপনার বন্ধুত্ব প্রার্থনা করি, এমন এমন সব ব্যবস্থা করি যাতে আমি আপনার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠি। এই কাজটা করার পিছনে দুটি কারণ ছিল—এক, মৃতের অনুশোচনাহীন স্মৃতি; দুই, আপনার সম্পর্কে অস্বস্তিকর ও কিছুটা ভয়ার্ত কৌতূহল।

“পর্বতের ভিতরে ঢুকে আপনি যে দৃশ্য দেখেছেন এবং তার যে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, সেটা আসলে পবিত্র নদীর তীরবর্তী ভারতীয় শহর বেনারসেরই হুবহু বর্ণনা। সেই দাঙ্গা, সেই সংঘর্ষ, সেই হত্যাকাণ্ড—এ সবই সত্যি সত্যি ঘটেছিল ১৭৮০ সালে চৈৎ সিংয়ের বিদ্রোহের সময়—যখন ওয়ারেন হেস্টিংসের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। প্যাগড়ির দড়ি বেয়ে যে মানুষটি পালিয়ে গেল আসলে তিনি চৈৎ সিং স্বয়ং। চালা-ঘরে আশ্রয় নিয়েছিল হেস্টিংসের নেতৃত্বাধীন একদল সিপাই ও বৃটিশ অফিসার। আমিও সেই দলে ছিলাম; জনৈক বাঙালীর বিষাক্ত তীরে বিদ্ধ হয়ে যে অফিসারটি মারা যায় তাকে ঐ মারাত্মক অভিযান থেকে বিরত করতে সাধ্যমত চেষ্টা আমি করেছিলাম। সেই অফিসারটি ছিলেন আমার প্রিয়তম বন্ধু। তার নাম ওল্ডেব। এই পাণ্ডুলিপিটা পড়লেই (এইখানে বক্তা আমার হাতে একটা নোটবই তুলে দিলেন যার বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠা সদ্য লিখিত বলে মনে হল) বুঝতে পারবেন “পর্বত শ্রেণীর ভিতরে থেকে আপনি যে সময়কার এইসব দৃশ্য ও ঘটনাকে কল্পনায় দেখেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আমি এখানে আমার বাড়িতে বসে সেই বিবরণকে লিপিবদ্ধ করার কাজে ব্যস্ত ছিলাম।”

এই কথাবার্তার প্রায় এক সপ্তাহ পরে চার্লোটেস্‌ভিল পত্রিকায় নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি প্রকাশিত হয়ঃ

“অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমরা মিঃ অগাস্টাস বেড্‌লোর মৃত্যুর কথা ঘোষণা করিতেছি; অমায়িক ব্যবহার এবং বহুবিধ সৎগুণের জন্য তিনি দীর্ঘদিন চার্লোটেস্‌ভিল-এর নাগরিকদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

“গত কয়েক বছর যাবৎ মিঃ বি. স্নায়ু-শূল রোগে ভুগছিলেন; প্রায়শই আশংকা হইত যে এই রোগেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে; কিন্তু এটা তাহার মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ হইলেও প্রত্যক্ষ কারণটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কয়েকদিন আগে “বন্ধুর পর্বতমালা” অভিযানের ফলে তিনি সামান্য সর্দি জ্বরে আক্রান্ত হন এবং তাহার ফলে মস্তিষ্কে প্রচুর পরিমাণ রক্ত-সঞ্চালন ঘটে। সেই উপসর্গটি হ্রাস করিতে ডাক্তার টেম্পল্‌টন রক্তক্ষরণ পদ্ধতির আশ্রয় নেন এবং তাহার কপালে জোঁক বসানো হয়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। পরে দেখা যায়, যে পাত্রের মধ্যে জোঁকগুলি রাখা হইয়াছিল ভুলবশত তাহার ভিতর এমন কিছু বিষাক্ত জলজ কীট ছিল যাহা আশপাশের পুকুরগুলিতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাণীটি তাহার কপালের দক্ষিণদিকস্থ ক্ষুদ্র ধমনীর উপর জাঁকিয়া বসিয়াছিল। সেই বিষাক্ত কীট দেখিতে অনেকটা চিকিৎসাকার্যে ব্যবহৃত জোঁকের অনুরূপ বলিয়াই এই ভুলটা ঘটিয়াছিল এবং সেটাও ধরা পড়িল বড় বেশী বিলম্বে; তখন আর কিছুই করিবার ছিল না।

“বিশেষ দ্রষ্টব্য। চার্লোটেস্‌ভিলের এই বিষাক্ত কীটকে চিকিৎসাকার্যে ব্যবহৃত জোঁক হইতে সহজেই আলাদা করিয়া চিনিতে পারা যায় তাহার কালো রং এবং সাপের মত আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলার ভঙ্গী দেখিয়া।”

পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করার সময় আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, নিহত লোকটির নাম “Bedlo” লেখা হয়েছে কেন।

বললাম, “এই ভাবে নামের বানান লেখার কোন বিশেষ যুক্তি নিশ্চয় আপনাদের আছে। আমি তো আগাগোড়াই জানি, নামের শেষে একটা “ৎ” দিয়েই ওটা লিখতে হয়।”

তিনি বললেন, “যুক্তি? না, না, ওটা ছাপার ভুল মাত্র। জগৎশুদ্ধ সকলেই জানে “Bedlo” নাম লিখতে শেষে একটা “e” বসাতেই হয়। এর অন্য কোন রকম বানানের কথা আমি জীবনে শুনি নি।”

সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি নিজের মনেই বললাম, “তাহলে দেখা যাচ্ছে অন্তত একটা ক্ষেত্রে প্রকৃত সত্য উপন্যাস অপেক্ষাও বিস্ময়কর—কারণ “e” ছাড়া “Bedlo” “Oldeb” নামটাকেই উল্টো করে লেখা ছাড়া আর কি হতে পারে? আর এই ভদ্রলোকও বললেন যে, এটা ছাপাখানারই ভুল।”

বেলুন নিয়ে পরিহাস

The Balloon-Hoax

“এক্সপ্রেস”-প্রেরিত (নরফোক হয়ে) বিস্ময়কর খবর!—তিন দিনে অতলান্তিক অতিক্রম! মিঃ মংক ম্যাসনের উড়ন-যন্ত্রের অসাধারণ জয়লাভ!—মিঃ ম্যাসন, মিঃ রবার্ট হল্যাণ্ড, মিঃ হেন্‌সন, মিঃ হ্যারিসন আইসওয়ার্থ ও অপর চারজন মনুষ্য চালিত বেলুন “ভিক্টোরিয়া”তে চেপে এক দেশ থেকে অন্য দেশের পথে পঁচাত্তর ঘণ্টা পাড়ি দিয়ে চার্লস্টন, এস. সির নিকটবর্তী সুলিভান দ্বীপে উপনীত! সমুদ্র-যাত্রার পূর্ণ বিবরণ!

[মাঝে মাঝে বিস্ময়-চিহ্ন-বসানো বড় বড় অক্ষরের এই শিরোনামের পরের নিম্নলিখিত রসিকতাটুকু মূলতঃ ছাপা হয়েছিল দৈনিক পত্রিকা “নিউইয়র্ক স্যন”-এ এবং তার ফলে চার্লস্টনের দুটো ডাক বিলির মাঝখানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই দুষ্পাচ্য খবর জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড হৈ-চৈ ফেলে দিয়েছিল। যে কাগজে খবরটি ছাপা হয়েছিল সেটা যোগাড় করার জন্য অভূতপূর্ব হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল; বস্তুত, “ভিক্টোরিয়া” যদি (যেমন অনেকে মনে করেন) উল্লিখিত সমুদ্রযাত্রাটি সম্পূর্ণ নাও করে থাকে, সেক্ষেত্রেও কেন সে যাত্রাটি সম্পূর্ণ করতে পারে নি তার কোন কারণ দর্শানোও বেশ শক্ত।]

অবশেষে একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল! স্থল ও জলের মত আকাশও বিজ্ঞানের পদানত হল; এবার আকাশও হয়ে উঠবে মানুষের একটি সাধারণ সুবিধা-জনক ভ্রমণ-পথ। সত্যি সত্যি একটা বেলুনে চেপে অতলান্তিককে অতিক্রম করা হয়েছে! আর তাতে কোন অসুবিধা ঘটে নি—বড় ধরনের কোন বিপদ দেখা দেয় নি। যন্ত্রটি ছিল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে—আর এ-কূল থেকে অন্য-কূলের যাত্রাটি সম্পন্ন হয়েছে ধারণাতীতভাবে মাত্র পঁচাত্তর ঘণ্টায়! এই অতি অসাধারণ সমুদ্র-যাত্রাটির সময়-কাল চলতি মাসের ৬ই শনিবার সকাল ১২টা থেকে ৯ই মঙ্গলবার দুপুর ২টা; যাত্রা-সঙ্গী ছিলেন স্যার এভারার্ড ব্রিংহার্স্ট, লর্ড বেন্টিংকের ভাই-পো মিঃ অসবোর্ন, বিখ্যাত বৈমানিকদ্বয় মিঃ মংক ম্যাসন ও মিঃ রবার্ট হল্যান্ড, "জ্যাক শেপার্ড" প্রভৃতি বইয়ের লেখক মিঃ হ্যারিসন আইন্সওয়ার্থ, পূর্বেকার অসফল উড়ন-যন্ত্রের আবিষ্কর্তা মিঃ হেনসন, এবং উলউইচের দুজন নাবিক—মোট আটজন। চার্লস্টন, এস. সি-র জনৈক এজেন্টের কর্ম-তৎপরতায় এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ আমরাই প্রথম উপস্থাপিত করতে পেরেছি জনসাধারণের সামনে। নীচে যে বিশদ বিবরণ দেওয়া হল সব দিক থেকেই তাকে প্রামাণ্য ও সঠিক বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, কারণ একটিমাত্র তুচ্ছ ব্যতিক্রম ছাড়া এই বিবরণ আক্ষরিক অর্থেই নেওয়া হয়েছে মিঃ মংক ম্যাসন ও মিঃ হ্যারিসন আইন্সওয়ার্থের যুগ্ম দিনলিপি থেকে। তাছাড়া, বেলুনটির ব্যাপারে, তার গঠন-পদ্ধতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকাংশ মৌখিক তথ্যাদির জন্যও আমাদের এজেন্টটি এই দুই ভদ্রলোকের বিনম্র ব্যবহারের জন্য তাদের কাছে ঋণী। মূল পাণ্ডুলিপিতে একটিমাত্র পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে আমাদের এজেন্ট মিঃ ফরসাইয়ের দ্রুত লিখিত বিবরণটিতে একটি সুসংবদ্ধ অর্থবহ রূপ দেবার উদ্দেশ্যে।

সেই বেলুনটি

মিঃ হেনসন ও স্যার জর্জ ক্যালির দুটি সাম্প্রতিক ব্যর্থতার জন্য আকাশপথে সমুদ্র পাড়ি দেবার বিষয়টির প্রতি জনসাধারণের আগ্রহ বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। মিঃ হেনসনের পরিকল্পনাটিকে বিজ্ঞানীরাও প্রথমে খুবই কার্যকরী বলে মনে করেছিলেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সে পরিকল্পনার মূল ভিত্তিটাই ভ্রান্ত। স্যার জর্জ কেলি সেই ভুল শুধরে নিয়ে যন্ত্রটির আমূল পরিবর্তন করলেন, এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউশনে তার একটা মডেলের পরীক্ষার ব্যবস্থাও করলেন। কিন্তু এত করেও বেলুনটিকে মোটেই আকাশে ওড়ানো গেল না। এইভাবে গোটা পরিকল্পনাটাই পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ঠিক সেই সময়ে মিঃ মংক ম্যাসন (১৮৩৭ সালে তিনি যখন "নাসাউ" নামক বেলুনে ডোভার থেকে উইলবার্গে পাড়ি দিলেন তখন খুব হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল) আর্কিমিডিসের নীতি অনুসরণ করে একটি বেলুন বানিয়ে "উইলিশ-এর কক্ষে" সেটাকে জনসমাবেশে চালিয়ে দেখালেন, এবং পরে মডেলটিকে নিয়ে গেলেন এডিলেড গ্যালারিতে।

স্যার জর্জ কেলির বেলুনের মতই তার বেলুনটিও ছিল অণ্ডাকার; দৈর্ঘ্য তেরো ফুট ছয় ইঞ্চি—উচ্চতা ছয় ফুট আট ইঞ্চি। এই মডেলটিকে এডিলেড গ্যালারিতে

চালিয়ে দেখানো হল। যন্ত্রটি ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে উড়েও গেল। কিন্তু—কী আশ্চর্য—যন্ত্রটির গঠন পদ্ধতি বড় বেশী সরল হওয়ায় জনসাধারণ তার কাজকর্মে খুব একটা আগ্রহ দেখাল না। মিঃ ম্যাসন কিন্তু নিজের আবিষ্কার দেখে খুব সন্তুষ্ট হলেন। তিনি স্থির করলেন অনতিবিলম্বে এমন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেলুন তৈরী করবেন যাতে চড়ে "নাসাউ" বেলুনের মতই বৃটিশ চ্যানেল পাড়ি দেওয়া যাবে। এই পরিকল্পনাকে সফল করার কাজে তিনি স্যার এভারার্ড ব্রিংহার্স্ট ও মিঃ অসবোর্ণের পৃষ্ঠপোশকতা প্রার্থনা করলেন এবং পেয়েও গেলেন। মিঃ অসবোর্ণের ইচ্ছামত এই প্রকল্পটিকে জনসাধারণের কাছ থেকে একান্তভাবেই গোপন রাখা হল। যন্ত্রটির নক্সার খবর জানল কেবলমাত্র তারাই যাদের উপর সেটা তৈরী করার ভার দেওয়া হল। আর সে কাজটা করা হল মিঃ ম্যাসন, মিঃ হল্যাণ্ড, স্যার এভারার্ড ব্রিংহার্স্ট ও মিঃ অসবোর্ণের তত্ত্বাবধানে, ওয়েলসের অন্তর্গত পেন্সট্রুথালের নিকটবর্তী মিঃ অসবোর্ণের বাড়িতে। গত শনিবারে মিঃ হেন্সন বন্ধু মিঃ আইন্সওয়ার্থকে সঙ্গে নিয়ে গোপনে বেলুনটি দেখলেন এবং এই বিমান-ভ্রমণে অংশীদার হবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। দু'জন নাবিককে কেন এই দলে নেওয়া হয়েছিল সে খবর আমরা জানি না—কিন্তু, দু'এক দিনের মধ্যেই এই অসাধারণ সমুদ্রযাত্রার পুংখানুপুংখ বিবরণ আমরা পাঠকদের জানিয়ে দেব।

মূল পরিকল্পনা ছিল বৃটিশ চ্যানেল অতিক্রম করা এবং প্যারিসের যতটা কাছে সম্ভব অবতরণ করা। তাই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে যাত্রীরা ইয়োরোপের যে কোন দেশের পাশপোর্ট যোগাড় করে নিয়েছিল এবং তার ফলে অভিযাত্রীরা সরকারী আইন-কানুনের ফাঁদ থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছিল; অবশ্য অপ্রত্যাশিত কতকগুলি ঘটনার জন্য সেই সব পাশপোর্ট শেষ পর্যন্ত কোন কাজেই লাগে নি।

চলতি মাসের ৬ তারিখ শনিবার ভোর থেকেই উত্তর ওয়েলসের অন্তর্গত পেন্সট্রুথলের প্রায় মাইলখানেক দূরে অবস্থিত মিঃ অস্বোর্ণের "উইল-ভর হাউস-" এর প্রাঙ্গণে বেলুনে হাওয়া ভরার কাজ শুরু হয়ে গেল; এবং ১১টা বেজে ৭ মিনিটের পরে যাত্রার সব আয়োজন সারা হলে বেলুনটাকে খুলে দেওয়া হল এবং সেটা ধীর স্বচ্ছন্দ গতিতে ঈষৎ দক্ষিণ দিকে উঠতে লাগল; প্রথম আধ ঘণ্টা স্ক্রু বা হাল কোনটাই ব্যবহার করা হল না। এবার আমরা চলে যাচ্ছি মিঃ ফরসাইথের লেখা দিনলিপিতে যেখানে তিনি মিঃ মংক ম্যাসন ও মিঃ আইন্সওয়ার্থের যুগ্ম পাণ্ডুলিপিকে হুবহু ভাষান্তরিত করেছেন। দিনলিপিটি মিঃ ম্যাসনের নিজের হাতের লেখা; মিঃ আইন্সওয়ার্থ তাতে প্রতিদিনই একটি "পুনশ্চ" সংযোজিত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি এই সমুদ্রযাত্রার একটি চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় বিস্তারিত বিবরণও প্রস্তুত করছেন। অচিরেই আমরা সেই বিবরণ জনসাধারণকে উপহার দিতে পারব।

দিনলিপি

শনিবার, ৬ই এপ্রিল—রাতারাতি প্রস্তুতি-পর্ব শেষ করে আজ ভোরে আমরা বেলুনটাকে ফোলাবার কাজ শুরু করলাম; কিন্তু ঘন কুয়াসার জন্য রেশমের

ভাঁজগুলি ঠিকমত না খোলায় সে কাজ শেষ করতে প্রায় এগারোটা বেজে গেল। তারপর বাঁধন কেটে দিতেই সেটা ধীরে ধীরে উপরে উঠে আমাদের বৃটিশ চ্যানেলের দিকে নিয়ে চলল। উপরে ওঠার শক্তিটা আমাদের প্রত্যাশার চাইতেও বেশী হতে লাগল; উঠতে উঠতে যত পাহাড়ের চূড়াগুলো ছাড়িয়ে বেশী করে রোদের মধ্যে পড়লাম, ততই আমাদের ঊর্ধ্বগতি দ্রুততর হতে লাগল। দশ মিনিটের মধ্যেই ব্যারোমিটারে ১৫,০০০ ফুট উচ্চতা ধরা পড়ল। আবহাওয়া ছিল অতি চমৎকার; ফলে নীচের ভূ-স্তরকে দেখাচ্ছিল পরম রমণীয়। আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি দক্ষিণাঞ্চলের পর্বতশ্রেণীর দিকে; কিন্তু তখন আমরা এতটাই উচ্চতা রেখে চলেছি যে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনামাত্রও ছিল না। সাড়ে এগারোটার সময় প্রথম চোখে পড়ল বৃটিশ চ্যানেল; আরও পনেরো মিনিট পরে উপকূলের ঢেউয়ের রেখাটি যেন ঠিক আমাদের নীচেই দেখা দিল; আমরা তখন সমুদ্রের উপর পেঁৗছে গেছি। এবার আমরা স্থির করলাম যে বেশ কিছুটা গ্যাস ছেড়ে দেব। সেটা করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা একটু একটু করে নামতে লাগলাম। প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের প্রথম বয়াটি জল স্পর্শ করল, এবং তার পরেই দ্বিতীয়টি জলস্পর্শ করামাত্রই আমাদের গতি মোটামুটি স্থির হয়ে গেল। এবার বেলুনের হাল ও স্ক্রুর কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য দুটোকেই সক্রিয় করে দেওয়া হল। আমাদের তখন লক্ষ্য হল বেলুনটিকে পূর্বদিকে ঘুরিয়ে প্যারিসের দিকে নিয়ে যাওয়া। সে কাজটা সফল হওয়ায় আমরা ন' বার আনন্দ-ধ্বনি করে আমাদের আবিষ্কারের মূলনীতির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ একখণ্ড কাগজে লিখে একটা বোতলের মধ্যে ভরে সেটাকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম। কিন্তু আনন্দ-কোলাহল শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা অদৃষ্টপূর্ব দুর্ঘটনা ঘটল যাতে আমাদের উৎসাহে অনেকটা ভাটা পড়ল। যে ইস্পাতের দণ্ডটি বেলুনের স্প্রিংটাকে প্রপেলারের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছিল সেটা হঠাৎ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে ঝুলতে লাগল। আমরা যখন সেটাকে আবার ঠিক জায়গায় বসানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম সেই ফাঁকে পূর্ব দিক থেকে একটা প্রচণ্ড বাতাসের ঝাপটা এসে আমাদের অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে দ্রুতগতিতে ঠেলে নিয়ে চলল। ফলে অচিরেই বুঝলাম যে ঘণ্টায় পঞ্চাশ/ষাট মাইল বেগে আমরা সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছি। কোন মতে ইস্পাতের দণ্ডটাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে তবে আমরা প্রকৃত অবস্থা নিয়ে ভাবতে বসলাম। আর তখনই মিঃ আইন্সওয়ার্থ একটা অসাধারণ প্রস্তাব করলেন এবং মিঃ হল্যাণ্ডও সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমর্থন করলেন। প্রস্তাবটা হলঃ পুনরায় প্যারিসের দিকে ফিরে না গিয়ে এই প্রবল বাতাসের সুযোগ নিয়ে উত্তর আমেরিকার উপকূলে পেঁৗছবার চেষ্টা করাই আমাদের উচিত। কিছুটা চিন্তা করে আমিও এই সাহসী প্রস্তাবে সম্মতি জানালাম; কিন্তু—কী আশ্চর্য—কেবলমাত্র নাবিক দুজনই তাতে আপত্তি জানাল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে আমাদের প্রস্তাবই গ্রাহ্য হল। আমরা সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চললাম। বেলুনের গতিবেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। নতুন করে ঝড়ো হাওয়া ধেয়ে এল। আমরা উড়ে চললাম অভাবনীয় দ্রুত বেগে। বলাই বাহুল্য, অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের চোখ থেকে উপকুল-রেখা মুছে

গেল। নানা ধরনের অসংখ্য জাহাজ আমরা পার হয়ে গেলাম; তাদের মধ্যে কয়েকটি গতির প্রতিযোগিতায় আমাদের হারিয়ে দেবার চেষ্টাও করল, কিন্তু বেশীর ভাগই সে চেষ্টায় ক্ষান্ত দিল। আমাদের উড়তে দেখে সব জাহাজেই প্রচণ্ড উত্তেজনা দেখা দিল। তা দেখে আমাদেরও খুব মজা লাগল; আমাদের দুই নাবিক তো জেনেভার গ্লাসে চুমুক দেবার ফলে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠল। অনেক জাহাজ থেকেই বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হতে লাগল। সকলেই প্রবল চীৎকার করে, টুপি ও রুমাল উড়িয়ে আমাদের অভিবাদন জানাল। এইভাবে সারাদিন কেটে গেল। বিশেষ কোন ঘটনা ঘটল না। ক্রমে রাত নামল। আমরাও কতটা দূরত্ব পার হয়েছি তার একটা মোটামুটি হিসাব কষে ফেললাম। সেটা পাঁচশ মাইলের কম তো হবেই না, হয়তো তার কিছু বেশীও হতে পারে। প্রপেলারটাকে সব সময়ই কাজে লাগানো হল, আর তাতে আমাদের অগ্রগতিও ঠিকভাবেই চলতে লাগল। সূর্য ডুবে গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝাটা নতুন করে হারিকেনের রূপ নিল। ফস্‌ফরাসের আলোর ঝিকিমিকির জন্য নীচের সমুদ্রটাও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। সারা রাত পূবের হাওয়া বইতে লাগল; তাতে আমাদের যাত্রার সাফল্যই সূচিত হল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ভেজা আবহাওয়া খুবই কষ্টকর মনে হতে লাগল। তবে বেলুনে প্রচুর জায়গা থাকায় আমরা জোব্বা ও কম্বল জড়িয়ে বেশ আরামেই শুয়ে পড়লাম।

পুনশ্চ (মিঃ আইন্সওয়ার্থের লেখা)। বিগত নয়টি ঘন্টা আমার জীবনের সব চাইতে উত্তেজনাপূর্ণ সময়। এই অজানা বিপদ ও অ্যাডভেঞ্চারের নতুনত্ব আমার কাছে দেখা দিল এক ধারণাতীত মহত্ব নিয়ে। ঈশ্বর করুন আমাদের যাত্রা যেন সফল হয়। আমার মত একজন তুচ্ছ মানুষের নিরাপত্তার জন্য আমি এ সাফল্যের প্রার্থনা করছি না, প্রার্থনা করছি মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার ও এই জয়ের বিরাটত্বের জন্য। অথচ কাজটা ততই সহজসাধ্য যে মানুষ কেন এতদিন এ কাজটি করতে এগিয়ে যায় নি সেটাই এক বিস্ময়। যে ঝড়টি এখন আমাদের সহায় হয়েছে—এ রকম আর একটি ঝড়ের টানে একটা বেলুন চার পাঁচদিন ধরে (এ ধরনের ঝড় প্রায়ই আরও বেশীদিন ধরে চলে) ছুটে চলুক, আর সেই সময়ের মধ্যেই যাত্রীরা পেঁীছে যাক সমুদ্রের এক উপকূল থেকে আর এক উপকূলে। এ রকম একটা ঝড়ের দোলতে সুদূরপ্রসারী অতলান্তিক মহাসাগর হয়ে পড়ে একটা হ্রদ মাত্র। সমুদ্রের উথাল-পাথাল ঢেউ সত্ত্বেও এই মুহূর্তে আমাকে সবচাইতে বিস্মিত করছে তার অপার নৈঃশব্দ্য। জলের বুক থেকে কোন স্বর উঠে যাচ্ছে না স্বর্গের দিকে। সুদূরপ্রসারী জ্বলন্ত সমুদ্রের দেহ যন্ত্রণায় মুচড়ে মুচড়ে উঠলেও সে যেন বিনা অভিযোগে তা সহ্য করছে। পর্বতপ্রমাণ ঢেউগুলি দেখে মনে হচ্ছে, অসংখ্য বিরাটকায় মূক শয়তান বুঝি প্রতিকারহীন যন্ত্রণায় আছড়ে পড়ছে। এই রকম একটা রাতেই তো মানুষ বাঁচার মত বাঁচে—এই জীবন একটা শতাব্দীব্যাপী সাধারণ জীবনের সমতুল্য—আজকের রাতের এই উচ্ছ্বসিত আনন্দের বিনিময়ে আমি একশ বছরও বেঁচে থাকতে চাই না।

রবিবার, সাতই। [মিঃ ম্যাসনের পাণ্ডুলিপি।] আজ সকাল ১০টা নাগাদ ঝড়ের বেগ অনেক কমে এসেছিল। তখন হয়তো আমরা ঘন্টায় তিরিশ মাইল বা

তার চাইতে একটু বেশী গতিতে এগিয়ে চলেছিলাম উত্তরের দিকে। কিন্তু এখন সূর্যাস্তের সময় প্রধানত স্ক্রু ও হালের কল্যাণে আমরা চলেছি পশ্চিম মুখে। আমি তো মনে করি আমাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়েছে, এখন আর যে কোন দিকে আকাশপথে সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া কোন সমস্যাই নয়। গতকালের প্রবল বাতাসের বিরুদ্ধে হয়তো আমরা ইচ্ছামত চলতে পারতাম না, কিন্তু প্রয়োজন হলে কিছুটা উপরে উঠে গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই সেই বাতাসকে এড়িয়ে যেতে পারতাম। আমার স্থির বিশ্বাস, একটা প্রপেলারের সাহায্যে যেকোন মোটামুটি জোরদার বাতাসের বিরুদ্ধে ইচ্ছামত পথে চলা যায়। আজ দুপুরে মালের ভার কমিয়ে নিয়ে আমরা প্রায় ২৫,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম। এ যাত্রা যদি আরও তিন সপ্তাহ ধরেও চলে তাহলেও এই ছোট পুকুরটাকে পাড়ি দেবার মত প্রচুর গ্যাস আমাদের আছে। অকারণে ভুল বুঝে এই যাত্রার অসুবিধাগুলিকে বড় বেশী করে দেখা হয়েছে। আমি ইচ্ছামত স্রোত বেছে নিতে পারি, আর সবগুলি স্রোতধারাই যদি আমার বিরুদ্ধে যায় তাহলেও প্রপেলারের সাহায্যে আমি বেশ ভালভাবেই এগিয়ে যেতে পারি। উল্লেখ করার মত কিছুই ঘটে নি। রাতটাও ভাল কাটবে বলেই মনে হচ্ছে।

পুনশ্চ। [মিঃ আইন্সওয়ার্থের লেখা।] উল্লেখ করার মত বিশেষ কিছু নেই, তবে একটা ঘটনা আমার কাছে খুব বিস্ময়কর মনে হয়েছে—কোটোপাক্সির সমান উচ্চতায় উঠেও আমার খুব ঠাণ্ডা লাগে নি, মাথা ধরে নি, শ্বাসকষ্ট হয় নি। শুধু আমারই নয়, মিঃ ম্যাসন, বা মিঃ হল্যান্ড, বা স্যার এভারার্ড কারও হয় নি। মিঃ অস্‌বোর্ণ বুকের সংকোচনের কথা বলেছিলেন বটে, তবে সেটা অচিরেই কেটে গিয়েছিল। সারাটা দিন জোর গতিতে উড়েছি, কাজেই অতলান্তিক পাড়ি দেবার অর্ধেকের বেশী পথ অবশ্যই পার হয়েছি। নানা ধরনের প্রায় বিশ-ত্রিশটা জাহাজের উপর দিয়ে এসেছি; সকলেই বেশ চমৎকৃত হয়েছে বলে মনে হল। মোট কথা, বেলুনে চড়ে মহাসাগর পাড়ি দেওয়া খুব একটা শক্ত কাজ নয়। "যা কিছু অজানা তাকেই অনেক বড় কিছু বলে মনে হয়।" ২৫,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে আকাশটাকে মনে হয় প্রায় কালো; তারাগুলো খুব পরিষ্কার দেখা যায়; আর সমুদ্রকে কাছিম-পিঠের বদলে মনে হয় সম্পূর্ণ অবতল।

সোমবার, ৮ই। [মিঃ ম্যাসনের পাণ্ডুলিপি।] আজ সকালে প্রপেলারের দণ্ডটা নিয়ে কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে; ওটাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়তে হবে। সারাদিন উত্তর-পূর্ব দিক থেকে একটানা জোর বাতাস বয়েছে; তাই এখন পর্যন্ত বাতাসকে আমাদের অনুকূলেই মনে হচ্ছে। দিনের আলো ফোটার ঠিক আগে বেলুনের একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনে আমরা সকলেই কিছুটা ভয় পেয়েছিলাম। আবহাওয়ার তাপবৃদ্ধির ফলে গ্যাসের আয়তন বেড়ে যাওয়াতেই এটা ঘটেছিল। বেলুন থেকে কয়েকটা বোতল ছুঁড়ে দিলাম নীচের জাহাজগুলোকে লক্ষ্য করে। দেখলাম, একটা বড় জাহাজ—মনে হল নিউ ইয়র্ক লাইনের কোন জাহাজ—তার মধ্যে একটা বোতল তুলে নিল। জাহাজটার নাম দেখতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঠিক পড়তে পারা গেল না। মিঃ অস্‌বোর্ণের দূরবীণে সেটাকে "আটালাণ্টা" বলে মনে

হল। এখন রাত ১২টা ; আমরা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছি প্রায় পশ্চিম দিকে। সমুদ্রে অদ্ভুত রকমের ফসফরাসের ঝিলিমিলি।

পুনশ্চ। [মিঃ আইন্সওয়ার্থের লেখা।] এখন রাত ২টা। মনে হচ্ছে চারদিক শান্ত—কিন্তু এ ব্যাপারটা সঠিক বলা শক্ত, কারণ আমরা চলেছি পুরোপুরি বাতাসের অনুকূলে। হুইল-ডোর ছাড়বার পর থেকে আমি ঘুমাই নি, কিন্তু আর পারছি না, একটু ঘুমিয়ে নিতেই হবে। আমেরিকার উপকূল আর বেশী দূরে হবে না।

মঙ্গলবার, ৯ই। [মিঃ আইন্সওয়ার্থের পাণ্ডুলিপি।] রাত ১টা। দক্ষিণ ক্যারোলিনার নীচু উপকুল-রেখা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা বড় সমস্যা মিটে গেল। আমরা অতলান্তিক পাড়ি দিয়েছি—বেশ ভালভাবে সহজে পাড়ি দিয়েছি অতলান্তিক! ঈশ্বরের জয় হোক! এর পরে কে বলবে কোন কাজ অসম্ভব?

দিনলিপি এখানেই শেষ। অবশ্য বেলুন থেকে নামার কিছু বিবরণ মিঃ আইন্সওয়ার্থ শুনিয়েছিলেন মিঃ ফরসাইথকে। অভিযাত্রীরা যখন প্রথম উপকূল দেখতে পেয়েছিলেন তখন চারদিক ছিল মৃত্যু-স্তব্ধ। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দুই নাবিক ও মিঃ অসবোর্ণ উপকূলটা চিনতে পেরেছিলেন। শেষোক্ত ভদ্রলোকের ফোর্ট মুলট্রিতে পরিচিত লোক থাকায় সঙ্গে সঙ্গে স্থির করা হয়েছিল তার কাছাকাছিই নামতে হবে। বেলুনটাকে সমুদ্র-সৈকতের উপরে আনা হল (ভাঁটা শেষ হওয়ায় বালি ছিল শক্ত ও মসৃণ এবং বেলুন অবতরণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী) এবং ছোট নোঙরটা ফেলে দিতেই সেটা শক্ত হয়ে মাটিতে বসে গেল। দ্বীপের অধিবাসীরা এবং দুর্গের অধিবাসীরা এসে বেলুন দেখতে ভিড় করে দাঁড়াল ; কিন্তু অতলান্তিক পাড়ি দেবার মত এত বড় একটা বাস্তব অভিযানের ব্যাপারটা তাদের বোঝাতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হল। নোঙরটা মাটি ছুঁয়েছিল ঠিক ২টায় ; অতএব পুরো অভিযানটা শেষ করতে লেগেছিল পঁচাত্তর ঘণ্টা, বা তার কিছু কম সময়। কোন গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে নি। কোন সময়ে কোন সত্যিকারের বিপদের আশংকাও কেউ করে নি। বেলুনটা নির্বিঘ্নেই নেমেছিল। যে পাণ্ডুলিপি থেকে এই বিবরণ সংকলিত হয়েছে সেটাকে যখন চার্লস্টন থেকে পাঠানো হয়েছিল তখনও দলটা ফোর্ট মুলট্রিতেই ছিল। তাদের আর কি বাসনা ছিল সেটা জানা যায় নি ; কিন্তু পাঠকদের আমরা স্বচ্ছন্দেই কথা দিতে পারি যে, হয় সোমবার, অথবা বড় জোর তার পরের দিনের মধ্যেই আরও কিছু খবর তাদের জানাতে পারব।

আজ পর্যন্ত মানুষ যত অভিযান সম্পূর্ণ করেছে, অথবা করার চেষ্টা করেছে এই অভিযানটি যে তাদের মধ্যে সব চাইতে বিরাট, সব চাইতে আকর্ষক, এবং সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই নেই। এর ফলে আরও কি অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে পারে এখনই তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা একান্তই অর্থহীন।

ভন্ কেম্পেলেন ও তার আবিষ্কার

Von Kempelen and his Discovery

আরাগো-লিখিত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত প্রবন্ধের পরে, "সিলিম্যান্'স জার্নাল"-এ প্রকাশিত সংক্ষিপ্তসারের কথা না হয় নাই বললাম, এবং লেফ্টেন্যান্ট মাউরির সদ্য প্রকাশিত বিবরণের পরে ভন কেম্পেলেনের আবিষ্কার প্রসঙ্গে যদি দু'একটি দ্রুত মন্তব্য করি তাহলে নিশ্চয়ই কেউ মনে করবেন না যে বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কোন পরিকল্পনা আমার আছে। আমার উদ্দেশ্য খুবই সরল, প্রথমত, স্বয়ং ভন কেম্পেলেন সম্পর্কে কিছু বলা (কয়েক বছর আগে তার সঙ্গে কিছুটা ব্যক্তিগত পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল), কারণ এই মুহূর্তে তার সম্পর্কিত সব কিছুই আকর্ষণীয় হতে বাধ্য ; আর দ্বিতীয়ত, সেই আবিষ্কারের ফলগুলিকে সাধারণভাবে এবং দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখা।

"ডায়রি অব স্যার হাম্ফ্রি ডেভি"-র (কট্ল্ অ্যাণ্ড মুন্রো, লণ্ডন, পৃঃ ১৫০) সঙ্গে মেলালেই ৫৩ এবং ৮২ পৃষ্ঠায় দেখা যাবে এই বিখ্যাত রসায়নবিদের যে বিশ্লেষণটিকে নিয়ে ভন্ কেম্পেলেনের জয়-জয়কার পড়ে গেছে শুধু যে তার ধারণাটাই প্রথম তার মাথায় এসেছিল ঐ "ডায়রি" থেকে তাই নয়, ইতিমধ্যেই তাকিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক্ষেত্রেও তিনি অনেকদূর অগ্রসর হয়েছেন। যদিও তিনি এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নি, তথাপি এটা নিঃসন্দেহ (আমি বিনা দ্বিধায় এ-কথা বলছি এবং দরকার হলে তা প্রমাণও করতে পারি) যে অন্তত নিজ প্রচেষ্টার যে প্রথম ইঙ্গিতটি তিনি দিয়েছেন তার জন্য তিনি "ডায়রি"র কাছে ঋণী। কিছুটা পারিভাষিক হলেও স্যার হাম্ফ্রির একটি সমীকরণসহ "ডায়রি"র দুটি অংশ সংযোজন না করে পারছি না। [যেহেতু প্রয়োজনীয় বীজগণিতিক চিহ্নগুলি আমাদের কাছে নেই। এবং যেহেতু এথেনিয়াম লাইব্রেরিতেই "ডায়রি"খানা পাওয়া যাবে, তাই মিঃ পো-র পাণ্ডুলিপির একটি ছোট অংশ আমরা এখানে বাদ দিলাম।—সম্পাদক।]

"কুরিয়ার অ্যান্ড এন্কয়ারার"-এর যে অনুচ্ছেদটি এখন সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় ঘুরছে এবং যাতে এই আবিষ্কারটিকে মেইনের অন্তর্গত ব্রান্সউইক নিবাসী জনৈক মিঃ কিসাম-এর আবিষ্কার বলে দাবী করা হচ্ছে, বেশ কয়েকটা কারণে সেই অনুচ্ছেদটিকে আমি নকল বলে মনে করি ; অবশ্য সেই বিবরণে অসম্ভব বা অসঙ্গত কিছু নেই। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের মধ্যে যেতে চাই না। সেই অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে আমার এই অভিমত প্রধানত তার প্রকাশ-ভঙ্গীর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেটাকে সত্য বলে মনে হয় না। যারা ঘটনার বিবরণমাত্র দেয় তারা কখনই দিন, তারিখ ও সঠিক ঘটনাস্থলের ব্যাপারে মিঃ কিসাম-এর মত সঠিক হবার চেষ্টা করেন না। তাছাড়া, মিঃ কিসাম-এর কথা অনুসারে তিনি যদি সত্যি সত্যি

প্রায় আট বছর আগেকার একটা নির্দিষ্ট সময়ে আবিষ্কারটির খোঁজ পেয়ে থাকেন, তাহলে এটা কি করে ঘটল যে এত বড় একটা আবিষ্কারের ফল হিসাবে প্রচুর মুনাফা লোটার উপযোগী পথে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পা বাড়ালেন না? অথচ যে কোন অতি সাধারণ ভাঁড়ও তো বুঝতে পারে যে তখন তখনই সেই পথে হাঁটলে তিনি একক ভাবেই এই আবিষ্কারের কৃতিত্ব ভোগ করতে পারতেন। এটা আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে হয় যে মিঃ কিসাম যে আবিষ্কারটি করেছেন বলে বলছেন সেটা যে কোন সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোকই করতে পারে, অথচ পরবর্তীকালে তিনিই ব্যবহার করেছেন একটি শিশুর মত—একটি প্যাঁচার মত। কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলি কে এই মিঃ কিসাম? আর "কুরিয়ার অ্যান্ড এনকয়ারার"-এর গোটা অনুচ্ছেদটিই হৈ-চৈ ফেলার জন্য একটা বানানো গুলমাত্র নয় তো? একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে সমস্ত ব্যাপারটাকেই কেমন যেন পাগলের গুলবাজী বলে মনে হয়। আমার মতে, এটার উপর কোন রকম ভরসা করাই চলে না।

কিন্তু স্যার হামফ্রি ডেভির "ডায়রি"-র কথায়ই আবার ফিরে যাই। পুস্তিকাটি জনসাধারণের চোখে পড়ার জন্য লিখিত হয় নি, এমন কি লেখকের মৃত্যুর পরেও না; লেখার শৈলীর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্র দৃষ্টি দিলেই যে কোন লোক বুঝতে পারবে লেখাটা কার, কারণ লেখার মধ্যে বাক্যের গঠনগত অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। আসল কথা হল, স্যার হামফ্রি ডেভি কখনই বিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে লেখার মানুষ ছিলেন না। আমি আরও বিশ্বাস করি, জীবিত অবস্থায় যদি তিনি বুঝতে পারতেন যে এই "ডায়রি" পুড়িয়ে ফেলার যে ইচ্ছা তার মনে ছিল তা কেউ পূর্ণ করবে না, তাহলে তার শেষের দিনগুলি খুবই অসহনীয় হয়ে উঠত। "ডায়রি"-টা আগুনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্যবশত সেটা এখনও জানা যায় নি। তবে ভন কেমপেলেন ও তার সাক্ষাৎ বন্ধুরা যে এর থেকে মোটা দাঁও মারবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ পোষণ করা বোকামিরই লক্ষণ। যথাসময়েই তারা যে বড় বড় বাড়ি ও জমি এবং অন্যান্য সম্পত্তি কিনে আখের গুছিয়ে নেবেন না এতটা দুর্বলচিত্ত মানুষ তারা নন।

"দি লিটারেরি ওয়ার্ল্ড" তাকে বলেছে প্রেসবুর্গের অধিবাসী, কিন্তু আমি বেশ স্পষ্ট করেই বলতে পারি (কারণ কথাটা আমি তার নিজের মুখ থেকেই শুনেছি) যে তার জন্ম হয়েছিল নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উটিকাতে, যদিও আমার বিশ্বাস তার বাবা-মা দুজনই প্রেসবুর্গ পরিবারের সন্তান। শ্রুতিধর দাবারু যন্ত্রের আবিষ্কারক মায়েল জেলের সঙ্গে ঐ পরিবার কোন না কোন ভাবে যুক্ত। [আমাদের যদি ভুল না হয়ে থাকে তাহলে ঐ দাবারু যন্ত্রের আবিষ্কারকের নাম হয় কেমপেলেন, না হয় ভন কেমপেলেন, বা ঐ রকম একটা কিছু—সম্পাদক।] লোকটি দেখতে বেঁটে ও বলিষ্ঠ, বড় বড় ফোলা ফোলা নীল চোখ, বালি রংয়ের চুল ও গালপাট্টা, চওড়া হাসি-হাসি মুখ, সুন্দর দাঁত এবং রোমক নাক। একটা পায়ে খুঁত আছে। সব মিলিয়ে চেহারায়, কথায় ও কাজে তাকে মোটেই 'মানবদ্বেষী" বলে মনে হয় না। প্রায় ছয়

বছর আগে আমরা রোড দ্বীপের প্রভিডেন্সের আর্লস হোটেলে এক সপ্তাহকাল সহযাত্রী ছিলাম। মনে পড়ে, বিভিন্ন সময়ে মোট তিন-চার ঘন্টা কথাও বলেছি। তিনি প্রধানতঃ সমসাময়িক বিষয় নিয়েই কথা বলতেন। তার কোন কথাতেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কোন আভাষ কখনও পাই নি। আমার আগেই তিনি হোটেল ছেড়ে চলে যান; তার উদ্দেশ্য ছিল প্রথমে নিউ ইয়র্ক, এবং সেখান থেকে ব্রেমেন যাবেন; ঐ শেষোক্ত শহরেই তার মহান আবিষ্কারের কথা প্রথম জনসাধারণ জানতে পারে; অথবা বলা যায় যে সেখানেই প্রথম সন্দেহ করা হয় যে, তিনিই ঐ আবিষ্কারটি করেছেন। বর্তমানে অমর ভন কেম্‌পেলেন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি এইটুকুই জানি।

এ ব্যাপারটা নিয়ে যে সব বিস্ময়কর গুজব ছড়িয়েছে সেগুলি যে নেহাৎই মন-গড়া সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না; অতএব আলাদিনের প্রদীপের কাহিনী যতটা কৃতিত্ব প্রাপ্য হতে পারে এগুলির ব্যাপারেও তাই প্রাপ্য। তথাপি একটা কথা খুব পরিষ্কার যে এসব ব্যাপারে প্রকৃত সত্যটা উপন্যাসের চাইতেও বিস্ময়কর হতে পারে। অন্তত নিম্নোক্ত কাহিনীটি এতই প্রামাণিক যে এটাকে আমরা সহজেই মেনে নিতে পারি।

ব্রেমেনে থাকাকালে ভন কেম্‌পেলেনের আর্থিক অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না; একথা সকলেরই জানা যে প্রায়শই যৎসামান্য কিছু উপার্জনের জন্যও তাকে চরম ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিতে হত। গুট্‌স্‌মুথ অ্যান্ড কোং-এর জালিয়াতি নিয়ে যখন প্রচণ্ড হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল তখন ভন কেম্‌পেলেনের উপরেই সন্দেহটা পড়েছিল। কারণ সেই সময় তিনি গ্যাস্‌পেরিক লেনে অনেক সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং তা কেনার টাকাটা কোথায় পেয়েছিলেন তার কোন জবাবই দিতে পারেন নি। অবশেষে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য পুলিশ তার গতিবিধির উপর কড়া নজর রেখে দেখতে পেল যে সে প্রায়ই একই পথ ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এবং "ভণ্ডারগাট" নামক চোরাগলির সংকীর্ণ গোলকধাঁধায় ঢুকে নজরদারদের ফাঁকি দিয়ে কেটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে "ফ্লাটপ্ল্যাজ" নামক গলির একটা আটতলা বাড়ির চিলে কোঠায় তাকে হাতেনাতে বমাল ধরে ফেলে জালিয়াতির যন্ত্রপাতি সমেত। হাতে হাত-কড়া পরিয়ে তার ঘরে, বরং বলা চলে যে সবগুলি ঘরেই তল্লাসি চালায়। কারণ সবগুলি ঘরই সে দখল করে ছিল।

যে চিলে কোঠা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তার পাশেই ১০ ফুট × ৮ ফুট একটা ছোট ঘর ছিল। ঘরটাতে কিছু রাসায়নিক যন্ত্রপাতি সাজানো ছিল। ঘরটার এক কোণে জ্বলন্ত উনুনের উপর বসানো ছিল একটা নল দিয়ে জুড়ে দেওয়া দুটো মুচি। একটাতে ছিল ফুটন্ত সীসে, আর একটাতে ছিল ধূমায়মান অন্য কোন তরল পদার্থ। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তার হবার আশংকা করেই লোকটি মুহূর্ত মধ্যে মুচি দুটিকে দুই হাতে ধরে তার ভিতরকার পদার্থগুলি টালির মেঝের উপর ছড়িয়ে ফেলে দেয়। পরমুহূর্তেই পুলিশ তার হাতে কড়া পরিয়ে দিয়ে তার দেহটা পরীক্ষা করে কোটের পকেটে একটা কাগজের পার্শ্বেল ছাড়া বিশেষ কিছু পায় না।

পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে পকেটে পাওয়া গিয়েছিল রসাঞ্জনে ও একটি অজ্ঞাত বস্তুর মিশ্রণ। অজ্ঞাত বস্তুটিকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করে আজও তার স্বরূপ জানা যায় নি; তবে শেষ পর্যন্ত যে জানা যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বন্দীকে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে পুলিশ অফিসাররা এক সময় রসায়নবিদের শোবার ঘরে ঢোকে। সবগুলি দেরাজ ও বাক্স উল্টে-পাল্টে কিছু রুপো ও সোনার মুদ্রা ছাড়া বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত বিছানার নীচে একটা মস্ত বড় ডালা-খোলা, তালাবিহীন ট্রাংক দেখতে পেয়ে সেটাকে অনেক টানাটানি করেও বের করে আনতে পারে না। তাতে বিস্মিত হয়ে একজন হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার নীচে ঢুকে ট্রাংকের ভিতর তাকিয়ে বলে উঠল ঃ

"আমরা যে এটাকে নড়াতে পারি নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই ঃ আরে, এটা তো পুরনো পিতলের টুকরো দিয়ে আগাগোড়া ঠাসা!"

নিজের পা দুটি দেওয়ালে ঠেকিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সে ট্রাংকটাকে ঠেলতে লাগল, আর তার সঙ্গীরা সকলে মিলে সেটাকে টানতে লাগল। এই যৌথ প্রচেষ্টার ফলে অনেক কষ্টে ট্রাঙ্কটাকে বিছানার নীচ থেকে টেনে বের করা হল এবং ভিতরে যা ছিল তা পরীক্ষা করে দেখা হল। ভিতরে ছিল ছোট ছোট মসৃণ সব ধাতুর টুকরো—একটা মটরদানা থেকে ডলার পর্যন্ত নানা মাপের। অফিসারদের একজনেরও মুহূর্তের জন্য মনে হল না যে এই ধাতুর টুকরোগুলো পিতল ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে। এগুলো যে সোনাও হতে পারে সেটা তাদের মাথায়ই ঢুকল না। কিন্তু পরদিন সারা ব্রেমেন শহর জানল যে পুলিশ অফিসাররা যে সব পিতলের টুকরো গাড়ি বোঝাই করে পুলিশ অফিসে নিয়ে গিয়েছিল, অথচ তা থেকে একটা ছোট টুকরোও কেউ পকেটে ভরে নি সেগুলো সবই ছিল সোনা—আসল সোনা—যে সোনা দিয়ে মুদ্রা তৈরী হয় তার চাইতে অনেক ভাল সোনা—বস্তুত সম্পূর্ণ খাঁটি, নিখাদ সোনা।

ভন কেম্‌পেলেনের স্বীকৃতি ও মুক্তির বিস্তারিত বিবরণ আমি দেব না, কারণ সে-সব কথা সকলেরই জানা। সে যে সত্যি সত্যি "দার্শনিকের পরশ পাথরের" সন্ধান পেয়েছিল, কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই তাকে সন্দেহ করবে না। তবে সরল সত্য কথাটা এই যে আজ পর্যন্ত সব বিশ্লেষণই ব্যর্থ হয়েছে; যতদিন ভন কেম্‌পেলেন নিজেই তার এই রহস্যের সমাধান আমাদের জানাবে, ততদিন এ ব্যাপারটা ঝুলেই থাকবে। তবে এই সব দেখেশুনে এটুকু বেশ ভালভাবেই জানা গেল যে, কতকগুলি অজানা পদার্থের অজানা হারে মিশ্রণের দ্বারা ইচ্ছামত এবং হাতে হাতে নিখাদ সোনা তৈরী করা যায়।

এই আবিষ্কারের তাৎক্ষণিক ও চরম ফলাফল সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নানা ভাবনা চিন্তা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ইয়োরোপে যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখা গেছে সেটা হচ্ছে—সীসের দাম শতকরা দু'শ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর রুপোর দাম বেড়েছে শতকরা পাঁচশ হারে।

বোতলবন্দী পাণ্ডুলিপি

MS. Found in a Bottle

আমার দেশ ও পরিবার সম্পর্কে বলার কিছু নেই। কুখ্যাতি ও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান আমাকে একটি থেকে বিতাড়িত করেছে এবং অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। বংশানুক্রমিক বিত্ত আমাকে যে শিক্ষা দিয়েছে সেটা নেহাৎই সাধারণ নয়, আর প্রথম জীবনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে লেখাপড়া করে যে বিদ্যা আমি সঞ্চয় করেছিলাম তাকে সঠিক পথে চালিত করেছে আমার চিন্তাশীল মানসিকতা। সে সব কিছুকে ছাড়িয়ে জার্মান নীতিবাদীদের গ্রন্থাবলী আমাকে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক জুগিয়েছে। অবশ্য তার কারণ তাদের সোচ্চার উন্মত্ততার প্রতি অকারণ আকর্ষণ যতটা নয় তার চাইতে বেশী তাদের চিন্তাধারার অসহায়তাকে ধরতে পারার মত আমার কঠোর চিন্তাশক্তির সহজাত অভ্যাস। অনেক সময়ই প্রতিভার রসহীনতার জন্য আমি নিন্দিত হয়েছি ; আমার চরিত্রের কল্পনার স্বল্পতাকে অপরাধরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে ; আমার নানান মতামতে নাস্তিকতার প্রকাশই আমাকে কুখ্যাত করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে, আমি মনে করি পদার্থবিষয়ক দর্শনশাস্ত্রের প্রতি আমার অতিরিক্ত আকর্ষণই আমার মনকে এ যুগের এক সাধারণ ভ্রান্তিতে জড়িত করেছে—সেটা হচ্ছে অতি সাধারণ ঘটনাকেও তৎসংক্রান্ত বিজ্ঞানের মৌলিক নীতির আলোকে পর্যালোচনার অভ্যাস। মোট কথা, কুসংস্কারের তাড়নায় সত্যের কঠিন অঙ্গন থেকে বিচ্যুত হবার অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে যতটা প্রযোজ্য ততটা বোধ হয় আর কারও বিরুদ্ধে নয়। এত কথা বললাম কারণ অন্যথায় যে অবিশ্বাস্য কাহিনীটি আমি বলতে যাচ্ছি সেটাকে অবাস্তব কল্পনার উচ্ছ্বাস বলে মনে হতে পারে।

বিদেশ ভ্রমণে অনেক বছর কাটিয়ে ১৮—সালে সুন্দা দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্য সমৃদ্ধ ও জনবহুল জাভা দ্বীপের বাটাভিয়া বন্দর থেকে জাহাজে চাপলাম। স্নায়বিক উত্তেজনা তখন আমাকে পিশাচের মত তাড়া করে ফিরছে। সেই তাড়নাই আমাকে বসিয়েছিল সেই জাহাজের যাত্রী।

প্রায় চারশ' টনের একটা সুন্দর জাহাজ ; তামা দিয়ে মোড়া, মালাবার সেগুন কাঠ দিয়ে বোম্বাইতে তৈরী। লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জ থেকে আহরিত তুলো আর তেল বোঝাই করা হয়েছে। তাছাড়াও ছিল দড়ি, তালগুড়, ঘি, নারকেল ও কিছু অফিসের পেটি। মালপত্রগুলি খুব বাজেভাবে সাজানো হবার ফলে জাহাজটা টলমল করছিল।

বাতাসের টানেই ভেসে চললাম। জাভার পূর্ব-উপকূল পথেই অনেক দিন কেটে গেল। সুন্দা দ্বীপপুঞ্জ থেকে আগত কিছু ছোট জাহাজের সঙ্গে মাঝে মধ্যে দেখা হওয়া ছাড়া যাত্রাপথের একঘেয়েমি কাটাবার মত আর কোন ঘটনাই ঘটল না।

একদিন সন্ধ্যায় জাহাজের পিছন দিকের রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম আকাশে একটা অদ্ভুত টুকরো মেঘ চোখে পড়ল। বাটাভিয়া থেকে যাত্রার পরে এই প্রথম মেঘ দেখতে পেলাম। তাছাড়া মেঘের রংটাও বিচিত্র। সূর্যাস্ত পর্যন্ত একদৃষ্টিতে সেইদিকেই তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মেঘটা পূব-পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ল। একফালি কুয়াসায় দিকচক্র এমনভাবে ঢেকে গেল যে সেটা দেখতে হল নীচু উপকূলের একটা দীর্ঘ রেখার মত। অচিরেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল চাঁদের গোধূলি রাঙা চেহারা এবং সমুদ্রের একটা অদ্ভুত চরিত্রের দিকে। সমুদ্রের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে; জলরাশি ক্রমেই অতিমাত্রায় স্বচ্ছ হয়ে উঠছে। বাতাস অসহ্য গরম; গরম লোহা থেকে বিচ্ছুরিত তাপের মত হল্কা এসে গায়ে লাগছে। ক্রমে রাত হল। বাতাস একেবারেই পড়ে গেল। চারদিক এতবেশী থমথমে ভাবাও যায় না। বাতি-দানে মোমবাতি জ্বলছে; তার শিখা একটুও কাঁপছে না। বুড়ো আঙুল ও অন্য একটা আঙুলে একটুকরো লম্বা চুল ঝুলিয়ে ধরলেও এতটুকু কাঁপা চোখে পড়ছে না। যাইহোক, কাপ্তেন যখন জানাল যে বিপদের কোন লক্ষণ নেই, তখন আমরাও যখন উপকূলের কাছ বরাবরই চলেছি, তখন সেই হুকুম দিল, নোঙর তুলে পাল উড়িয়ে দেওয়া হোক। যাত্রীরা—তাদের অধিকাংশই মালয়বাসী—ডেকের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল। শংকিতচিত্তে আমি নীচে নেমে গেলাম। বস্তুত, একটা আসন্ন ঝড়ের আশংকা সব কিছুতেই যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। আমার ভয়ের কথা কাপ্তেনকে বললাম, কিন্তু সে কানই দিল না; এমন কি একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। মানসিক অস্বস্তিতে আমার কিন্তু ঘুম এল না। মাঝরাতে ডেকে উঠে গেলাম। সিঁড়ির উপরের ধাপে পা দিতেই একটা জোরালো গুঞ্জন ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। কোন মিলের চাকা দ্রুত বেগে ঘুরলেই এ ধরনের শব্দ হয়ে থাকে। তার অর্থ বুঝবার আগেই গোটা জাহাজটা কাঁপতে লাগল। পরমুহূর্তেই একটা প্রবল ফেনায়িত জলোচ্ছ্বাস আমাদের যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং আমাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়ে সমস্ত ডেকটাকেই আগাগোড়া ভাসিয়ে দিল।

অবশ্য ঝড়ের এই দাপটই জাহাজটাকে অনেকখানি বাঁচিয়ে দিল। সম্পূর্ণ জলে ডুবে যাওয়া সত্ত্বেও মিনিট খানেক পরেই সমুদ্রের ভিতর থেকে মাথা তুলল, এবং ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় টাল-মাটাল হতে হতে এক সময় সোজা হয়ে দাঁড়াল।

কোন্ অলৌকিক কারণে আমি সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলাম বলা অসম্ভব। জলের ধাক্কার ধকল কাটিয়ে উঠেই বুঝলাম যে জাহাজের পিছনের মাস্তুল ও হালের মাঝখানে আমি আটকে পড়েছি। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম। ঝাপসা চোখে চারদিকে তাকিয়ে প্রথমেই মনে হল আমরা ঢেউয়ের মধ্যে রয়েছি। পর্বত প্রমাণ ফেনায়িত ঢেউয়ের যে আবর্তের মধ্যে আমরা আটকা পড়েছি তার ভয়াবহতা কল্পনার অতীত। অল্পক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধ সুইডেনবাসীর গলা শুনতে পেলাম। বন্দর ছাড়বার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিল। সমস্ত শক্তি এক করে তাকে ডাকলাম; সেও কাঁপতে কাঁপতে এসে হাজির হল। অচিরেই বুঝতে

পারলাম, এই দুর্ঘটনার হাত থেকে কেবল আমরা দুজনই বেঁচে গেছি। একমাত্র আমরা দু'জন ছাড়া ডেকের অন্য সকলেই ভেসে গেছে। কাপ্তেন ও মেটরা ঘুমন্ত অবস্থায়ই মারা গেছে, কারণ তাদের কেবিনগুলো জলে ভাসছে। কোনরকম সাহায্য ছাড়া জাহাজের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমাদের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রথম দিকে জলে ডুবে যাওয়ার আশংকায় আমাদের সব কর্মক্ষমতা যেন লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের প্রচণ্ড দোলায় আমরা অনবরত দুলতে লাগলাম। ঢেউ এসে বার বার আমাদের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। পিছনের গলুই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল; আমরাও নানাভাবে আহত হলাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভাল যে পাম্পগুলোর মুখ আটকে যায় নি, আর জাহাজে বোঝাই ইট-পাথরগুলো বেশী এদিক-ওদিক করে নি। ঝড়ের দাপট ইতিমধ্যেই অনেক কমে গেছে; হাওয়ার বেগটা এখনও জোর থাকলেও তাতে ভয়ের আশংকা অনেক কম। কতক্ষণে বাতাস একেবারে শান্ত হবে তারই জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু সে আশা শীঘ্র ফলবতী হল না। পাঁচ দিন পাঁচ রাত কেটে গেল। আমাদের একমাত্র খাদ্য অনেক কষ্টে বাঁচানো কিছু তাল-গুড়। ভাঙা জাহাজটা দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। বাতাসের বেগ আগের থেকে কমলেও এখনও তার যা দাপট সেরকম ঝড়ের মুখে আমি আগে কখনও পড়ি নি। অবশ্য প্রথম চারদিন আমরা এলোমেলোভাবে চলছিলাম কখনও দক্ষিণ-পূবে, কখনও দক্ষিণে। কাজেই ততদিনে আমাদের নতুন হল্যাণ্ডের উপকূল বরাবর চলবার কথা। পঞ্চম দিন ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়ল। বিবর্ণ হলুদ আলো ছড়িয়ে সূর্য উঠল দিগন্ত-রেখার কয়েক ডিগ্রি উপরে। আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বাতাস ক্রমেই বাড়তে লাগল, বাতাস কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। দুপুর নাগাদ আবার সূর্য দেখা দিল। কিন্তু সে রকম আলো ছড়াল না, কেমন যেন একটা আবছা, বিষণ্ণ দীপ্তি। নিঃশব্দ সমুদ্রের বুকে ডুবে যাবার আগে সূর্যের আলোটা হঠাৎ নিভে গেল—কোন অদৃশ্য শক্তি যেন দ্রুত হাতে সেটাকে নিভিয়ে দিল। অতল সমুদ্র-গর্ভে তীব্র গতিতে ছুটে যাবার আগে দেখা গেল শুধু একটা অস্পষ্ট রুপোর মত বলয়।

ষষ্ঠ দিনের আবির্ভাবের প্রত্যাশায় বৃথা প্রতীক্ষা—আমার কাছে সেদিনটি এল না,—সুইডেনবাসীর কাছে এল না আর কোন দিন। সেই থেকে আমাদের দিন কাটতে লাগল নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের আবরণে; জাহাজ থেকে দশ পা দূরের জিনিসও চোখে পড়ে না। অন্তহীন রাত আমাদের ঘিরে রইল; গ্রীষ্ম-মণ্ডলের সমুদ্রে ফস্‌ফরাস-ঘটিত যে ঔজ্জ্বল্যে আমরা অভ্যস্ত তারও চিহ্নমাত্র নেই। আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। ঝড়ের তীব্রতা একইভাবে চলেছে, সাগরের বুকে বা তীরভূমিতে ফেনার দেখা নেই। চারদিকে শুধু আতংক, গভীর বিষণ্ণতা, আর আবলুস কাঠের সব কালো দগ্ধ মরুভূমি। সুইডেনবাসী বৃদ্ধের মনে একটু একটু করে জাগতে লাগল কুসংস্কার-জাত আতংক; আমার নিজের মনেও ছড়াতে লাগল নীরব বিস্ময়। জাহাজের যন্ত্র নবার দিকে আমাদের এতটুকু মন রইল না; পিছনদিককার মাস্তুলের গোড়ায় অপেক্ষা-কৃত নিরাপদে বসে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম সমুদ্রের দিকে। সময় বুঝবার

কোন উপায় নেই ; কোথায় আছি সেটাও বুঝতে পারছি না। তবে একটা কথা ভালই বুঝতে পারছি, সুদূর দক্ষিণের যে অঞ্চল দিয়ে চলেছি সেখানে আগে কখনও কোন নাবিক আসে নি। অথচ কী আশ্চর্য, সেখানকার বরফের কোনরকম স্বাভাবিক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন এখনও আমাদের হতে হয় নি। ইতিমধ্যে প্রতিটি মুহূর্তকেই মনে হচ্ছে আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত—প্রতিটি পর্বত প্রমাণ ঢেউই আছড়ে পড়ছে চরম আতংকের মত। ঢেউয়ের প্রতিটি অভিঘাত এত প্রচণ্ড যা আমার কল্পনারও অতীত ছিল এতকাল। ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের সলিল-সমাধি হচ্ছে না সেটাই অলৌকিক ব্যাপার। সঙ্গীটি আশ্বাস দিয়ে বলছিল যে আমাদের জাহাজটা হাল্কা, তার মাল-মশলা ও গঠন-পদ্ধতিও খুব ভাল ; কিন্তু আমার আশা-হীন নৈরাশ্য তাতে দূর হল না ; নিজেকে আসন্ন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে লাগলাম, কারণ আমার ধারণা সে-মৃত্যু আসতে আর ঘণ্টাখানেকের বেশী বিলম্ব হবে না ; জাহাজের এগিয়ে চলার প্রতিটি "নট"-এর সঙ্গে সমুদ্রের প্রচন্ড কালো কালো ঢেউগুলি আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। কখনও ঢেউয়ে মাথায় উড়ন্ত অ্যালবাট্রস পাখিদেরও ছাড়িয়ে আমরা এত উপরে উঠছি যে দম বন্ধ হয়ে আসছে ; আবার কখনও তীব্র বেগে সমুদ্রের নরক-গর্তে এত নীচে নেমে যাচ্ছি যে মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে।

একবার সেইভাবে সমুদ্রের গর্ভে নেমে যেতেই আমার সঙ্গীর একটি ভয়ার্ত কণ্ঠ-স্বর রাতের বুকে ছড়িয়ে পড়ল। সে আমার কানের কাছে আর্তনাদ করে উঠল, "দেখ! দেখ! ঈশ্বর সর্বশক্তিমান! দেখ! দেখ!" সে যখন কথাগুলি বলছিল তখনই আমি দেখতে পেলাম আমরা যেখানে রয়েছি সেখানে সমুদ্র যেন দুই ভাগ হয়ে গেছে, আর লাল আলোর একটা আবছা বিষণ্ণ রেখা সেই ফাঁক দিয়ে চলে গিয়ে আমাদের জাহাজের ডেকের উপর পড়েছে। উপরের দিকে চোখ মেলে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে আমার রক্তের স্রোত জমাট বেঁধে গেল। আমাদের সোজা উপরে অনেক উঁচুতে আনুমানিক চার হাজার টনের একটা বড় জাহাজ ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমুদ্র-বক্ষ থেকে একশ' গুণেরও অধিক উঁচু একটা ঢেউয়ের মাথায় অবস্থিত হলেও সে জাহাজের আকার সেই পথে চলাচলকারী বা তৎকালে প্রচলিত "ইস্ট ইণ্ডিয়াম্যান"-এর যে কোন জাহাজের চাইতে বড়। তার প্রকাণ্ড দেহটায় গাঢ় কালো রং লাগানো ; সাধারণ জাহাজের মত তাতে কোনরকম কারুকার্য করা নেই। খোলা ছিদ্র পথে মুখ বের করে আছে এক সার কামানের ধাতু-মুখ, অসংখ্য মশাল জাহাজের দড়াদড়ি থেকে ঝুলছে আর তার আলো ঠিকরে পড়ছে জাহাজের ঝকঝকে গা থেকে। কিন্তু যা আমাদের অভিভূত করে ফেলল আতংকে ও বিস্ময়ে সেটা হল—এই অস্বাভাবিক সমুদ্র ও নিয়ন্ত্রণাতীত ঝড়ের মুখেও কেবলমাত্র পালের উপর ভর করে জাহাজটা অক্ষত অবস্থায় চলছে। প্রথম যখন সেটি দৃষ্টিগোচর হল তখন সেই ভয়ংকর ফাঁক থেকে ধীরে ধীরে জেগে-ওঠা তার গলুইটা মাত্র নজরে পড়ল। ঢেউয়ের মাথায় সশংকভাবে মুহূর্তমাত্র কাটিয়েই জাহাজটা কাঁপতে কাঁপতে ভেঙে পড়ল, আর—তারপরেই নীচে নেমে এল।

সেই মুহূর্তে কী যে আত্ম-সংযম জেগে উঠল আমার মনে তা আমিই জানি না।

যতদূর সম্ভব সরে দাঁড়িয়ে আসন্ন ধ্বংসের প্রতীক্ষায় নির্ভয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমাদের জাহাজের সব চেষ্টার অবসান হল; একেবারে অধোমুখ হয়ে সেটা সমুদ্রে ডুবে যেতে লাগল। স্বভাবতই নেমে-আসা অপর জাহাজটার ধাক্কা এসে লাগল আমাদের জাহাজের সেই অংশের উপর যেটা ইতিমধ্যেই জলের তলে চলে গিয়েছিল; আর তার অনিবার্য পরিণতিতে দুরন্ত বেগে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম নবাগত জাহাজের দড়াদড়ির উপর।

আমি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজটা নড়েচড়ে আবার চলতে শুরু করল; আর সেই হট্টগোলের ফাঁকে আমি জাহাজের মাঝিমাল্লাদের চোখ এড়িয়ে সরে পড়লাম। অতি সহজেই সকলের অলক্ষ্যে আধ-খোলা দরজা দিয়ে নীচে নেমে জাহাজের খোলের মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। কেন যে এ কাজ করলাম তা বলা শক্ত। প্রথম দর্শনেই নাবিকদের দেখে ভয় পেয়েছিলাম—হয়তো সেটাই আমার আত্মগোপনের কারণ। প্রথম দৃষ্টিতেই অজানা নতুনত্ব, সন্দেহ ও ভয়ের যে সব লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখেছিলাম তাতেই হয়তো তাদের উপর ভরসা রাখতে পারছিলাম না। তাই একটা লুকিয়ে থাকার মত ভাল জায়গা খুঁজে নেওয়াই সঙ্গত মনে করেছিলাম। বোর্ডের একটা ছোট টুকরো সরিয়ে জাহাজের বড় বড় কাঠের মাঝখানে এমন একটা লুকোবার জায়গা পেয়ে গেলাম আশ্রয় হিসাবে যেটা খুবই সুবিধাজনক।

কাজটা সবে শেষ করেছি এমন সময় পায়ের শব্দ কানে আসতেই বোর্ডের টুকরোটা আবার যথাস্থানে বসিয়ে দিলাম। অস্থির দুর্বল পা ফেলে একটি লোক আমার পাশ দিয়েই চলে গেল। আমি তার মুখটা দেখতে পেলাম না, কিন্তু তার চেহারাটা আমার দৃষ্টি এড়াল না। সে চেহারায় বার্ধক্য ও জরার লক্ষণ স্পষ্ট। বয়সের ভারে তার হাঁটু দুটো টলমল করছে, সমস্ত শরীরটাই কাঁপছে। অস্পষ্ট ভাঙা গলায় নিজের মনে এমন একটা ভাষায় কি যেন বলছে তার কিছুই বুঝতে পারলাম না। এক কোণে অদ্ভুত দর্শন সব যন্ত্রপাতি ও জাহাজ-চালানোর জীর্ণ মানচিত্রের স্তূপের মধ্যে সে কি যেন খুঁজতে লাগল। তার আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেল দ্বিতীয় শৈশবের খিটখিটে মেজাজ ও দেবতার গম্ভীর মর্যাদাবোধের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। শেষটায় সে ডেকের উপর চলে গেল। আর তাকে দেখলাম না।

* * *

একটা নাম-না-জানা অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল—সে অনুভূতি বিশ্লেষণের অতীত, অতীতের শিক্ষা-দীক্ষা সেখানে কোন কাজেই লাগে না, মনে হয় অনাগত ভবিষ্যৎও সে রহস্য-উন্মোচনের কোন চাবি আমার হাতে তুলে দেবে না। আমার মানসিকতা যেভাবে গড়ে উঠেছে তাতে শেষ সম্ভাবনার কথাটা ভাবাও পাপ। আমার মনোভাব সম্পর্কে আমি কোন দিনই সন্তুষ্ট হব না—আমি জানি কোন দিনই হব না। অথচ এই ধারণাগুলি যে সুনির্দিষ্ট নয় তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ যেখানে তাদের উৎস নিহিত সেগুলিও সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব। আমার আত্মার সঙ্গে যেন একটা

নতুন ইন্দ্রিয়—একটা নতুন সত্তা যুক্ত হয়েছে।

* * *

এই ভয়ংকর জাহাজের ডেকে যখন প্রথম পা ফেলেছিলাম সে অনেক দিন আগের কথা। আমার ভাগ্যের রশ্মিরেখা ক্রমেই একটা বিন্দুতে এসে মিলেছে। দুর্বোধ্য সব মানুষ! কী যেন এক অজানা চিন্তায় বিভোর হয়ে তারা আমার পাশ দিয়ে চলে যায়, অথচ আমাকে দেখতে পায় না। লুকিয়ে থাকাটাই আমার পক্ষে বোকামি, কারণ এরা কখনও চোখ মেলে দেখবেই না। এইমাত্র আমি গেটের একেবারে চোখের সামনে দিয়েই তো এলাম; বেশীক্ষণ আগের কথা নয়, সাহসে ভর করে আমি কাপ্তেনের নিজস্ব কেবিনে ঢুকেছিলাম এবং সেখান থেকেই লেখার সরঞ্জাম এনেছি ও লিখেছি। মাঝে মাঝেই এই দিন-পঞ্জী লেখা চালিয়ে যাব। একথা ঠিক যে এই লেখা বাইরের জগতের কাছে পাঠাবার সুযোগ আমি পাব না; তবু সে চেষ্টা থেকে আমি বিরত হব না। শেষ মুহূর্তে এই পাণ্ডুলিপিকে একটা বোতলে ভরে সমুদ্রের বুকে ফেলে দেব।

* * *

একটা নতুন ঘটনা ঘটায় নতুন চিন্তা দেখা দিল আমার মনে। এ সবই কি অনিয়ন্ত্রিত আকস্মিকতার পরিণতি? সাহসে ভর করে ডেকে উঠে গেলাম এবং সকলের অগোচরে ডিঙির তলায় স্তূপীকৃত পুরনো পাল ও মইয়ের দড়িদড়ার মধ্যে নেমে গেলাম। নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবেই পাশেই একটা পিপের উপর রাখা ছোট পালটার গায়ে আলকাতরার বুরুসটা টানছিলাম। পালটা এখন জাহাজের উপর কাত হয়ে আছে আর উদ্দেশ্যহীনভাবে চালানো বুরুশের মুখে ফুটে উঠেছে একটি শব্দ "আবিষ্কার"।

জাহাজের গড়নটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলাম। অস্ত্রশস্ত্র ভালভাবে সজ্জিত হলেও মনে হল এটা যুদ্ধ জাহাজ নয়। তার রশারশি, গড়ন ও সাধারণ সাজসজ্জা—সব কিছুই যুদ্ধ-জাহাজের ধারণার বিপরীত। এটা যে কি নয় তা সহজেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু আসলে এটা কি তা বলা অসম্ভব। এটা কি তা আমি জানি না, কিন্তু অদ্ভুত মডেল, মাস্তুলের বিচিত্র গড়ন, অত্যন্ত সাধারণ গলুই ও সেকেলে পশ্চাদভাগ—সব কিছু ভাল করে পরীক্ষা করতেই মাঝে মাঝে চকিতে আমার মনের কোণে ঝলসে উঠত পূর্ব পরিচয়ের একটা অনুভূতি; আর সেই অস্পষ্ট স্মৃতির সঙ্গে সব সময়ই মিশে থাকত বিদেশের প্রাচীন ইতিহাস ও অনেক অনেক দীর্ঘকাল আগেকার ব্যাখ্যাহীন স্মৃতি······

জাহাজের কাঠের দিকেই তাকিয়েছিলাম। যে কাঠ দিয়ে এটা তৈরী তা আমার সম্পূর্ণ অচেনা। সে কাঠের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যা দেখে আমার মনে হল, যে-কাজে জাহাজটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে এটা তার অনুপযুক্ত। এই সব সমুদ্রে চলাচলের ফলে কীটদষ্ট হওয়া এবং বয়সের ভারে জীর্ণ হওয়া ছাড়াও কাঠটা অত্যন্ত ছিদ্রবহুল হওয়ার কথাটাই আমি বলতে চাইছি। আমার দেখার মধ্যে হয়তো অতি-

কৌতূহলের ছাপ আছে, কিন্তু এই কাঠের মধ্যে স্পেনীয় ওক কাঠের সবরকম বৈশিষ্ট্যই আছে, অবশ্য স্পেনীয় ওককে যদি কোন অস্বাভাবিক পন্থায় প্রসারিত করা যায়।

এই পংক্তিটি পড়তে গিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপটা-খাওয়া জনৈক বৃদ্ধ ওলন্দাজ নাবিকের একটি বিচিত্র উক্তি আমার মনে পড়ে গেল। তার কথার সত্যতা নিয়ে কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করলেই সে বলে উঠত, "সমুদ্রে চলতে চলতে কোন জীবন্ত নাবিকের শরীরটা যেমন ক্রমাগত বাড়তে থাকে ঠিক তেমনিভাবে বাড়তে থাকে জাহাজটারও দেহ, তেমন একটা সমুদ্রও যে সত্যি আছে এ কথা যেমন নিশ্চিত, আমার কথাটাও তেমনি নিশ্চিত।"

ঘণ্টাখানেক আগে সাহসে ভর করে একদল নাবিকের সঙ্গে মিশে গেলাম। তারা যেন আমাকে দেখেও দেখল না; তাদের একেবারে মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকেও মনে হল, আমার উপস্থিতি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অচেতন। জাহাজের খোলের মধ্যে যে নাবিকটিকে প্রথম দেখেছিলাম তার মতই তাদের সকলের দেহেই অতি-বার্ধক্যের সুস্পষ্ট লক্ষণ। বার্ধক্যের ভারে সকলেরই হাঁটু কাঁপছে; জরাজীর্ণ কাঁধ দুটি সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়েছে; শুকনো চামড়া বাতাসে ঠুক্-ঠুক্ করছে; কণ্ঠস্বর নীচু, কাঁপা ও ভগ্ন; বার্ধক্যজনিত পিঁচুটিতে চোখ দুটি চক্চক্ করছে; ঝড়ের বেগে পাকা চুলে ঢেউ বইছে। তাদের চারদিকে ডেকের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে গণিতশাস্ত্রের বিচিত্র ও অপ্রচলিত গড়নের নানান যন্ত্রপাতি…

কিছুক্ষণ আগে একটা ছোট পালের বেঁকে থাকার কথা উল্লেখ করেছি। সেই থেকে বাতাসে বিকল হয়ে যাওয়া জাহাজটা তীব্র গতিতে দক্ষিণ দিকেই এগিয়ে চলেছে। পা ঠিক রাখা অসম্ভব হওয়ায় এইমাত্র ডেক ছেড়ে এসেছি, যদিও সেখানকার নাবিকদের কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে বলে মনে হয় নি। আমরা এতগুলি লোক যে তৎক্ষণাৎই চিরদিনের মত সমুদ্রের গর্ভে তলিয়ে যাই নি সেটাই চূড়ান্ত অলৌকিক। অথচ আমরা তো নিশ্চিতরূপেই জানি যে, অতল সমুদ্রে চূড়ান্তভাবে ডুবে না গিয়ে অনন্তকাল ধরে অবিরাম ঘুরে বেড়ানোই আমাদের বিধিলিপি। জীবনে যত ঢেউ দেখেছি তার চাইতে হাজার-গুণ বেশী প্রচণ্ড ঢেউয়ের দোলায় আমরা ভেসে চলেছি তীরগতি সমুদ্র-পক্ষীর মত স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে। বিরাটকায় ঢেউগুলি আমাদের ছাড়িয়ে মাথা তুলছে পাতালপুরীর অসুরদের মত; তারা আমাদের ভয় দেখাতে পারে, কিন্তু ধ্বংস করতে পারে না। আমরা যে বার বার এই ভাবে প্রাণে বেঁচে থাকছি তার একটিমাত্র প্রাকৃতিক কারণই আমার মনে আসছে। আমার ধারণা, জাহাজটা হয় কোন প্রবল স্রোতের টানে পড়েছে, নয় তো কোন প্রচণ্ড চোরা-বানের…

কাপ্তেনকে তার নিজের কেবিনে মুখোমুখি দেখেছি—কিন্তু যা ভেবেছিলাম তাই, সে আমার দিকে তাকালই না। যদিও তাকে দেখলে মানুষ ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না, তবু তাকে দেখেই মনের মধ্যে জেগে উঠল বিস্ময়মিশ্রিত একটা অপ্রতিরোধ্য শ্রদ্ধা ও ভয়ের অনুভূতি। উচ্চতায় প্রায় আমারই মত; পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

শরীর সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ, বলিষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। কিন্তু তার মুখে এমন একটা বিশিষ্ট ভাব খেলা করছে—বার্ধক্যের এমন একটা তীব্র, আশ্চর্য ও রোমহর্ষক প্রকাশ সেখানে ফুটে উঠেছে যা দেখে আমার মনে জাগল একটা অবর্ণনীয় অনুভূতি। তার ঈষৎ কুঞ্চিত ললাটে যেন মুদ্রিত রয়েছে অনন্তকালের ছাপ। তার পাকা চুলে অতীতের ইতিহাস; তার ধূসরতর চোখে ভবিষ্যতের অকথিত বাণী। কেবিনের মেঝেতে ছড়িয়ে ছিল লোহা দিয়ে আটকানো বিচিত্র কাগজপত্র, বিজ্ঞানের ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতি, দীর্ঘবিস্মৃত অপ্রচলিত সব চার্ট! দুই হাতের উপর মাথাটা রেখে জ্বলন্ত, চঞ্চল চোখে সে তাকিয়ে আছে একটা কাগজের দিকে। মনে হল কাগজখানা একটি নিয়োগপত্র, তাতে রাজার স্বাক্ষর রয়েছে। খোলের মধ্যে দেখা প্রথম নাবিকটির মতই এই বৃদ্ধটিও অস্পষ্ট খিটখিটে স্বরে বিদেশী ভাষায় আপন মনেই কি যেন বকে চলেছে। লোকটি আমার পাশেই রয়েছে, অথচ মনে হল তার কণ্ঠস্বর এক মাইল দূর থেকে আমার কানে এসে পৌঁছচ্ছে...

জাহাজটা এবং তার ভিতরকার সব কিছুই যেন প্রাচীনত্বে আচ্ছন্ন। নাবিকরা ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে অতীতের বহু শতাব্দীর প্রেতাত্মার মত; তাদের চোখে ফুটে উঠছে সাগ্রহ ও অস্বস্তিকর বাণী; যুদ্ধ-মশালের তীব্র আলোয় তারা যখন আমার পথের সামনে আড়াআড়িভাবে দাঁড়ায় তখন আমার মনে যে ভাব জাগে তেমনটি আগে কখনও জাগে নি, অথচ সারাটা জীবন আমি প্রত্ন-বস্তু নিয়েই কেনা-বেচা করেছি; আমার আত্মা যতদিন না ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে ততদিন পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছি বলবেক, টার্ডমোর ও পার্সিপোলিসের ধ্বংসস্তূপের ছায়ায় ছায়ায়...

নিজের চারদিকে তাকালে সেদিনের সেই সব ভয়ের জন্য লজ্জাবোধ করি। সেদিনের ঝড়ের ঝাপ্টায় যদি কেঁপে উঠে থাকি তাহলে বাতাস ও সমুদ্রের যে সংঘাতকে "টর্নেডো এবং সাইমুন" বললেও অতি সামান্যই বলা হয় তাকে প্রত্যক্ষ করে কি আমি আতংকে বিহ্বল হয়ে পড়ব না? জাহাজের চারপাশ ঘিরে আছে শুধু অনন্ত রাত্রির কালো অন্ধকার এবং ফেনাবিহীন জলোচ্ছ্বাস; কিন্তু আমাদের দুই দিকে প্রায় একলীগ পর্যন্ত অস্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে বরফের প্রচণ্ড দুর্গ-প্রাকার নির্জন আকাশের দিকে উঠে গেছে—তাকে দেখে মনে হচ্ছে বিশ্ব-পৃথিবীর প্রাচীর বলে।

যেমনটি ভেবেছিলাম, জাহাজটা সত্যি স্রোতের টানে পড়েছে—অবশ্য জোয়ারের যে স্রোতটা সাদা বরফের বুকে সগর্জনে আছড়ে পড়ে প্রচণ্ড জলপ্রপাতের মত তীব্রগতিতে ছুটে চলেছে দক্ষিণ অভিমুখে তাকে যদি ঐ নামে অভিহিত করা সঙ্গত হয়।

আমি তো মনে করি, আমার সে আতংকের অনুভূতিকে বুঝতে পারা একেবারে অসম্ভব; তথাপি এই সব ভয়ংকর অঞ্চলের রহস্যকে ভেদ করার একটা কৌতূহলের কাছে পরাভূত হল আমার সব নৈরাশ্য; আমি এগিয়ে গেলাম মৃত্যুর সেই ভীষণ মূর্তির মুখোমুখি হতে। এ কথা সত্য যে আমরা দ্রুত এগিয়ে চলেছি কোন

উত্তেজনাপূর্ণ জ্ঞানের দিকে—এমন কোন অপার রহস্যের দিকে যাকে পাওয়া মানেই ধ্বংস। হয়তো এই জলস্রোত আমাদের নিয়ে চলেছে খাস দক্ষিণ মেরুতে। কে জানে।

অশান্ত কম্পিত পায়ে নাবিকরা ডেকের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে; কিন্তু তাদের মুখের ভাবে ফুটে উঠেছে হতাশার বিরক্তির চাইতে আশার ব্যগ্রতা অনেক বেশী।

ইতিমধ্যে বাতাস জাহাজের পিছন দিকে আমাদের উপর দিয়েই বইছে। যখনই আমরা একগাদা পালকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি তখনই মাঝে মাঝে জাহাজটা যেন সশরীরে সমুদ্র থেকে ভেসে উঠছে! হায়, আতংকের উপর আতংক!—হঠাৎ আমাদের ডাইনে সমুদ্র দু'ভাগ হয়ে গেল; বাঁয়েও। আর একটা প্রকাণ্ড বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চকে ঘিরে আমরাও ঘুরতে লাগলাম বাঁই-বাঁই করে। সে রঙ্গমঞ্চের প্রাচীরের মাথাগুলো হারিয়ে গেছে দূরের অন্ধকারে। আমার পরিণতি কি হবে সে কথাটা ভাববার মত সময়ও আমার হাতে নেই! বৃত্তগুলি ক্রমেই ছোট হচ্ছে, আমরা দ্রুত তলিয়ে যাচ্ছি ঘূর্ণাবর্তের জঠরে। অবিরাম গর্জন ও গোঁ-গোঁ চীৎকার এবং সমুদ্র ও ঝড়ের বজ্রহুংকারের মধ্যে জাহাজটা টল্‌মল্‌ করছে—হা ঈশ্বর! আর—ডুবে যাচ্ছে!

বিঃ দ্রঃ—"বোতলবন্দী পাণ্ডুলিপি" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১-এ; অনেক কাল পরে মার্কেটর-এর যে মানচিত্রগুলি হাতে এল তাতে দেখানো হয়েছে চার মাস ধরে চলতে চলতে সমুদ্র মেরু উপসাগর-এ (উত্তর) পড়ে ধরিত্রীর গর্ভে মিলিয়ে গেছে; আর মেরুকে দেখানো হয়েছে যেন একটা কালো পাহাড় বিস্ময়কর উচ্চতায় উঠে গেছে।

শবের সঙ্গে সংলাপ

Some Words with a Mummy

আগের সন্ধ্যার আলোচনা-চক্রটির বোঝা আমার স্নায়ুর পক্ষে একটু বেশী ভারিই হয়েছিল। বেশ মাথা ধরেছিল; অসম্ভব ঘুম পাচ্ছিল। তাই সন্ধ্যাটা কাটাতে বাইরে না গিয়ে রাতের মত সামান্য কিছু মুখে দিয়ে সকাল-সকাল ঘুমিয়ে পড়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে হল।

খাওয়াটা সামান্যই হল বটে। ওয়েল্‌সের খরগোসের মাংস আমার অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। অবশ্য একবারে এক পাউণ্ডের বেশী খাওয়াটা সব সময় সমীচীন নয়। তবু দুই পাউণ্ডে আপত্তি করার কোন সত্যিকারের কারণ থাকতে পারে না। আর সত্যি কথা বলতে কি, দুই আর তিনের মধ্যে ফারাক তো মাত্র একের। আমি হয়তো চার পাউণ্ডের কথাই বলেছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রস্তাব হল—পাঁচ; কিন্তু সে হয়

তো দুটো ব্যাপারকে গুলিয়ে ফেলেছিল। আমি বিজোড় সংখ্যাটা মেনে নিতে রাজী ছিলাম; কিন্তু ঐ সংখ্যাটার সঙ্গে "ব্রাউন স্টাউট"-এর বোতলের একটা সম্পর্ক আছে; আর চাট হিসাবে ঐ বোতলকে বাদ দিলে তো খরগোসের মাংসকেই বাতিল করতে হয়।

এইভাবে যৎসামান্য আহার শেষ করে রাত-টুপিটা মাথায় পরে বালিশে মাথা রাখলাম, এবং পরদিন দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘুমের আশা নিয়ে খোলা মনে অচিরেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম।

কিন্তু মানুষের আশা কবে পূর্ণ হয়ে থাকে? মাত্র তিনবার নাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সদর দরজার ঘন্টাটা সজোরে বেজে উঠল। তারপরেই অধৈর্য হয়ে কড়া নাড়ার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল। এক মিনিট পরেই আমার স্ত্রী এসে মুখের উপর একটা চিরকুট ছুঁড়ে দিল। পুরনো বন্ধু ডাক্তার পন্নোনারের চিঠি। তাতে লেখা ঃ

"প্রিয় বন্ধু, এই চিঠি পাওয়া মাত্রই অতি অবশ্য চলে এস। এসে আমাদের আনন্দ বর্ধন কর। দীর্ঘদিনের সুকৌশল প্রচেষ্টার ফলে অবশেষে সিটি মিউজিয়ামের ডিরেক্টরবর্গ মমিটাকে পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন। কোন্ মমিটার কথা বলছি তা তো তুমি জানই। মমির আবরণ কেটে ফেলে দরকার হলে সেটাকে সম্পূর্ণ খুলে ফেলার অনুমতি আমি পেয়েছি। মাত্র অল্প কয়েকজন বন্ধুই উপস্থিত থাকবে—অবশ্য তুমিও তাদের অন্যতম। মমিটি এখন আমার বাড়িতেই আছে; আজ রাত এগারোটায় আবরণ উন্মোচন করতে শুরু করব।

—তোমার চিরদিনের পন্নোনার।"

পন্নোনারের বাড়িতে পৌঁছবার পথেই আমার মনে হল, আমি বেশ ভাল রকমই জেগেছিলাম। উৎসাহের আতিশয্যে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে পোশাক পরিবর্তন করে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ডাক্তারের বাড়ির দিকে ছুটেছিলাম।

সেখানে পৌঁছে দেখলাম, সকলে সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। ডাইনিং-টেবিলের উপর মমিটা শোয়ানো রয়েছে। আমি ঘরে ঢোকামাত্রই পরীক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেল।

বেশ কয়েক বছর আগে পন্নোনারের সম্পর্কিত ভাই ক্যাপ্টেন আর্থার সাব্রেটাশ নীলনদের তীরবর্তী থিবিস শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে লিবিয়া পর্বতমালার এলিথিয়াসের নিকটবর্তী একটি কবর থেকে একজোড়া মমি নিয়ে এসেছিল। এটি সেই জোড়ারই একটি। সেখানকার গুহাগুলির জাঁকজমক থিবিসের সমাধিগুলি অপেক্ষা কম হলেও মিশরীয়দের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার অসংখ্য চিত্রে শোভিত হওয়ায় সেগুলির গুরুত্ব ও আকর্ষণ অনেক বেশী। যে গুহা-কক্ষ থেকে মমি দুটি আনা হয়েছিল সেটা এই ধরনের অনেক চিত্রে সুশোভিত ছিল—দেওয়াল জুড়ে ছিল ফ্রেস্কো চিত্রাবলী, ছিল পাথরে খোদাই-করা মূর্তি, নানা রকমের আবক্ষ মূর্তি, ধাতু-পাত্র, ও

মোজাইকের কাজ। সে সব দেখলেই বোঝা যায় মৃত ব্যক্তিরা ছিল প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক।

ক্যাপ্টেন সারেটাশ যে অবস্থায় এই মূল্যবান সম্পদটি নিয়ে এসেছিল ঠিক সেই ভাবেই সেটি মিউজিয়ামে রাখা হয়েছিল ঃ—অর্থাৎ শবাধারটির কোন পরিবর্তনই করা হয় নি। আট বছর ধরে সেটা একই অবস্থায় ছিল ; দর্শকরা কেবল বাইরে থেকেই সেটাকে দেখতে পেত। এখন মমিটা সম্পূর্ণভাবে আমাদের হেপাজতে এসেছে। সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় কোন পুরাবস্তুকে আমাদের দেশে নিয়ে আসাটা যে কতখানি বিরল ঘটনা সেটা যারা জানে তারা নিশ্চয়ই আমাদের এই সৌভাগ্যকে অভিনন্দন জানাবে।

টেবিলের দিকে এগিয়ে তার উপরে একটা বাক্স বা আধার দেখতে পেলাম ; বাক্সটি প্রায় সাত ফুট লম্বা, তিন ফুট মত চওড়া, ও আড়াই ফুট গভীর। সেটা আয়তাকার, ঠিক শবাধারাকৃতি নয়। প্রথমে মনে হয়েছিল বাক্সটা মিশরীয় ডুমুর কাঠের তৈরী, কিন্তু কাটতে গিয়ে বুঝলাম, সেটা প্যাপিরাস গাছের ছাল দিয়ে তৈরী পেস্টবোর্ড। তার উপর শবযাত্রা ও অনুরূপ শোকাবহ দৃশ্যের অলংকরণ—মাঝে মাঝেই নানাভাবে আঁকা মিশরীয় চিত্রলিপির সারি ; সেগুলি যে মৃত ব্যক্তিদের নাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যবশত মিঃ গ্লিডন ছিলেন আমাদের দলে। চিত্রলিপির অনুবাদ করতে তার কোন অসুবিধাই হল না। সেগুলি স্বরপ্রধান—শব্দটি "আল্লা-মিস্টাকিও।"

অক্ষত অবস্থায় বাক্সের ডালা খুলতে বেশ কষ্ট করতে হল। কিন্তু খুলে দেখলাম তার মধ্যে আর একটা বাক্স রয়েছে। সেটা শবাধারাকৃতি, এবং অন্য সব দিক থেকে বড়টার মত দেখতে হলেও আকারে অনেক ছোট। দুটো বাক্সের ভিতরকার ফাঁকটা রজন দিয়ে ভর্তি করায় ভিতরকার বাক্সের রং কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সহজেই দ্বিতীয় বাক্সের ডালা খুলতে তিন নম্বর বাক্সটা পেলাম। এটাও শবাধারাকৃতি এবং অন্য কোন রকম তফাৎ না থাকলেও সেটা দেবদারু কাঠের তৈরী ; এখনও কাঠের সুগন্ধ নাকে লাগছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সের মাঝখানে কোন ফাঁক নেই ; একটা আরেকটার গায়ে সেঁটে ছিল।

তৃতীয় বাক্সটা খুলে শবদেহটা বের করলাম। যথারীতি আশা করেছিলাম, শবদেহটা কাপড়ের পটি দিয়ে জড়ানো থাকবে ; তার পরিবর্তে দেখতে পেলাম প্যাপিরাসের একটা আবরণ, আর তার উপরে প্লাস্টারের একটা চিত্র-বিচিত্র ঘন প্রলেপ। ছবিগুলিতে দেখানো হয়েছে আত্মার নানাবিধ কর্তব্য এবং দেবতাদের প্রতি তার বিভিন্ন উপঢৌকন ; আর আছে নানা মানুষের মূর্তি—সম্ভবত প্রলেপিত ব্যক্তিদের প্রতিকৃতি। মমির মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বভাবে একসারি চিত্রলিপি আঁকা—সেগুলি মৃতের নাম ও উপাধি, এবং তার আত্মীয়জনের নাম ও উপাধি।

খোলা গলার চারদিকে জড়ানো রয়েছে নানা বর্ণের বেলনাকৃতি স্ফটিকের মালা ; সেগুলি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে গড়ে উঠেছে নানা দেবদেবীর মূর্তি, ঝিঁঝি

পোকার মূর্তি, ইত্যাদি। কোমরে রয়েছে অনুরূপ মালা জড়ানো।

প্যাপিরাসের আবরণ খুলে ফেলে দেখা গেল, মৃতদেহের মাংস চমৎকার সুরক্ষিত অবস্থায় আছে; কোন রকম গন্ধই পাওয়া যাচ্ছে না। রংটা ঈষৎ লালচে। চামড়া শক্ত, মসৃণ, ও চকচকে। দাঁত ও চুলও বেশ ভাল অবস্থায় আছে। মনে হল, চোখ দুটি তুলে নেওয়া হয়েছে; তার জায়গায় বসানো হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর, জীবন্ত প্রায় কাঁচের চোখ; একটু কটাক্ষ বুঝিবা ফুটে উঠেছে সে-চোখে। আঙুলে ও নখে চমৎকার সোনালী ছোপ লাগানো হয়েছে।

চামড়ার লালচে রং দেখে মিঃ গ্লিডন জানালেন, অবলেপনের কাজটা পুরোপুরি আলকাতরা দিয়েই করা হয়েছে; কিন্তু ধারালো ইস্পাতের যন্ত্র দিয়ে উপরটা চেঁচে নিয়ে সেই গুঁড়োটা আগুনে ফেলতেই কর্পূর ও অন্য রকমের কিছু মিষ্টি গন্ধ নাকে এল।

সাধারণত যেখান দিয়ে নাড়িভুড়িটা বের করে ফেলা হয় অনেক খুঁজেও সেটার সন্ধান না মেলায় আমরা খুবই বিস্মিত হলাম। আমাদের দলের তখনকার কেউই জানত না যে অনেক সময় অক্ষতদেহ মমির সন্ধানও মেলে। তখনকার প্রচলিত ব্যবস্থাই ছিল মস্তিষ্কটাকে বের করা হত নাক দিয়ে; অন্ত্রগুলিকে বের করা হত এক-পাশ কেটে; তারপর পুরো দেহটাকে কামিয়ে ভাল করে ধুয়ে নুন মাখানো হত; তারপর কয়েক সপ্তাহ সেই অবস্থায় রেখে অবলেপনের কাজ শুরু হত।

কাটা-ছেঁড়ার কোনরকম চিহ্ন না পেয়ে ডাক্তার পন্নোনার মৃতদেহে অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ করতেই আমি লক্ষ্য করলাম বেলা দুটো বেজে গেছে। কাজেই সকলে একমত হলেন যে অস্ত্রোপচারের কাজটা পরের দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত স্থগিত রাখা হোক। একজন প্রস্তাব করলেন ভলটা-আবিষ্কৃত দু'একটা বৈদ্যুতিক পরীক্ষা চালিয়ে দেখা যেতে পারে।

অন্তত তিন-চার হাজার বছরের প্রাচীন একটি মমির উপর বৈদ্যুতিক পরীক্ষা খুব বিবেচনাসঙ্গত না হলেও তাতে যথেষ্ট মৌলিকতা থাকায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে তাতে সম্মত হলাম। কিছুটা আগ্রহে, কিছুটা বা কৌতূহলে ডাক্তারের পড়ার ঘরে একটা ব্যাটারির ব্যবস্থা করা হল, এবং মিশরীয় মমিটাকে সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল।

অনেক অসুবিধা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত কপালের পার্শ্বস্থ অপেক্ষাকৃত নরম মাংসপেশী কিছুটা কেটে ফাঁক করে ফেলা হল, কিন্তু তার সঙ্গে তার জুড়ে দেওয়ার পরে কোন রকম প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলাম না। এরকমটা যে হবে সেটা আমরাও অনুমান করেছিলাম। আমাদের প্রথম পরীক্ষার ফল দেখে নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় আমরা সকলেই প্রাণ খুলে হেসে উঠলাম। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিতে যাব এমন সময় আমার চোখ দুটি মমিটার চোখের উপর পড়তেই আমি বিস্ময়ে হাঁ করে সেদিকেই তাকিয়ে রইলাম। একটুক্ষণ তাকাতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, যে চোখের মণিকে আমরা কাঁচের বলে মনে করেছিলাম এবং যাতে একটা অর্থহীন ভ্রূকুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেই মণি দুটো এখন চোখের পাতায় প্রায় ঢাকা পড়েছে।

আমি বলছি না যে এ-দৃশ্য দেখে আমি ভয় পেয়েছিলাম; আমার পক্ষে এ ক্ষেত্রে

“ভয়” কথাটা ঠিক খাটে না। হয়তো “ব্রাউন স্টাউট” পেটে না পড়লে আমি কিছুটা স্নায়বিক অস্বস্তি বোধ করতাম। কিন্তু দলের অন্য কেউই ভয় পাবার ব্যাপারটাকে চাপা দেবার কোনরকম চেষ্টা করলেন না। ডাক্তার পন্নোনারকে দেখে তো করুণাই হল। একটা অদ্ভুত উপায়ে মিঃ গ্লিডন সকলের চোখের আড়ালেই চলে গেলেন। আর মিঃ সিল্ক বাকিংহাম যে চার জনের উপর দিয়ে টেবিলের নীচে ঢুকে পড়লেন সে কথা অস্বীকার করবার মত সাহস তার ছিল না।

যাই হোক, বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পরে সকলেই স্থির করলাম, পরীক্ষাটা নতুন করে চালানো হবে। এবার পরীক্ষা শুরু হল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটিকে নিয়ে। আঙুলের বাইরের দিকে ছুরি চালিয়ে একটা মাংসপেশীর গোড়া পাওয়া গেল। ব্যাটারিটাকে ঠিকঠাক করে কাটা স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে সংযোগ ঘটাতেই জীবন্ত মানুষের মত তীব্র গতিতে মমিটা প্রথমে ডান হাঁটুটাকে এমনভাবে ভাঁজ করল যে সেটা তলপেটকে প্রায় ছুঁয়ে গেল, আর তারপরেই অকল্পনীয় জোরের সঙ্গে সেটাকে এমনভাবে সোজা করল যে ডাক্তার পন্নোনার একটা মোক্ষম লাথি খেয়ে গুলতি থেকে নিক্ষিপ্ত তীরের মত জানালা দিয়ে ছিটকে গিয়ে নীচের পথের উপর পড়লেন।

ভদ্রলোকের তালগোল-পাকানো দেহটাকে তুলে আনতে আমরা সবাই নীচে ছুটে গেলাম। কিন্তু বড়ই সুখের বিষয় যে সিঁড়িতেই তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে তিনি উপরে উঠে আসছিলেন। নতুন উদ্যমে নতুন করে পরীক্ষা চালাতে তিনি তখন দৃঢ়সংকল্প।

তারই পরামর্শক্রমে মমির জিভের ডগায় একটা গভীর ক্ষত সৃষ্টি করা হতেই ডাক্তার নিজে জিভটাকে টেনে বের করে এনে তারের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিলেন।

নৈতিক বা দৈহিক—আলংকারিক বা আক্ষরিক—যে অর্থেই ধরা হোক না কেন, এবার ফল হল বৈদ্যুতিক। প্রথমত, মৃতদেহটা দুই চোখ খুলে কয়েক মিনিট ধরে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে পিট্‌পিট্ করে তাকাতে লাগল ঃ মিঃ বার্নেস তার মূকাভিনয়ে ঠিক যেরকমটা করে থাকেন ; দ্বিতীয়ত, সে হাঁচি দিতে লাগল ; তৃতীয়ত, সে উঠে বসল ; চতুর্থত, ডাক্তার পন্নোনারের মুখে একটা ঘুষি মারল ; পঞ্চমত, মঁসিয় গ্লিডন ও বাকিংহামের দিকে ঘুরে চোস্ত মিশরীয় ভাষায় তাদের উদ্দেশ্য করে বলে উঠল ঃ

“ভদ্রমহোদয়রা, একথা আমি অবশ্য বলব যে আপনাদের আচরণে আমি যতটা বিস্মিত হয়েছি ঠিক ততটাই মর্মাহত হয়েছি। ডাক্তার পন্নোনারের কাছ থেকে এর চাইতে ভাল কিছু আমি আশা করি নি। সেই বেঁটে, মোটা, বোকা লোকটা এর চাইতে বেশী কিছু জানেও না। করুণা করে তাকে আমি ক্ষমা করেছি। কিন্তু আপনি মিঃ গ্লিডন—আর আপনি সিল্ক—আপনারা তো মিশরে গেছেন, সেখানে থেকেছেন—আর এত বেশী দিন আমাদের মধ্যে কাটিয়েছেন যে নিজেদের মাতৃভাষা যে রকম লিখতে পারেন ঠিক সেইরকম ভালভাবেই মিশরীয় ভাষায়ও কথা বলতে পারেন—আপনাদের তো আমি মমিদের অকৃত্রিম বন্ধু বলেই চিরদিন জেনে এসেছি—তাই আপনাদের কাছে আরও ভদ্র ব্যবহার আমি আশা করেছিলাম। আপনারা যে আমার

পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন, অসুন্দর দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছেন; তাতে আমি কি ভাবব ? এই ভয়ংকর ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় আপনারা যে রাম-শ্যাম-যদুকে অনুমতি দিয়েছেন শবাধার খুলে আমার শরীর থেকে সব আবরণ খুলে ফেলতে, তা নিয়েই বা আমি কি মনে করব ? আসল কথা হল, ঐ বেঁটে শয়তান ডাক্তার পন্নোনারকে আমার নাক ধরে টানাটানি করার কাজে আপনাদের সাহায্য ও সমর্থনকেই বা আমি কি চোখে দেখব ?"

এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের বক্তৃতা শুনে আমরা সকলেই হয় দরজা দিয়ে ছুটে পালাব, না হয় মৃগীরোগীর মত ভীষণভাবে গোঁ-গোঁ করে ধরাশায়ী হব। অথবা মূর্ছা যাব—এটা অবশ্য ধরেই নেওয়া যায়। এর যে কোন একটাই প্রত্যাশিত ছিল। বস্তুত আমরা যদি এই তিন পন্থার যে কোন একটি এবং তিনটিকেই অনুসরণ করতাম তাহলেও কিছু বলার থাকত না। বিশ্বাস করুন, আমরা যে কেমন করে অথবা কেন এর কোন একটি পথও অনুসরণ করি নি সেটাও আমার বুদ্ধির অগোচর। কিন্তু হয় তো এর সত্যিকারের কারণ খুঁজে প্যাওয়া যাবে তৎকালীন যুগ-ধর্মের মধ্যে ; এ যুগটাই চলে বৈপরিত্যের নিয়মে—স্ববিরোধিতা এবং অসম্ভবতার পথেই যে সব কিছুর সমাধান করা যায় এটাই আজ সাধারণভাবে স্বীকৃত। অথবা, হয় তো মমির অত্যধিক স্বাভাবিক ও বাস্তব হাবভাবই তার কথাগুলিকে ভয়ংকর হতে দেয় নি। কিন্তু সে যাই হোক, ঘটনাটা খুবই সহজবোধ্য : আমাদের দলের কারও আচরণেই কোনরকম বিশেষ শংকা প্রকাশ পায় নি, অথবা খুবই অভাবিত কিছু ঘটেছে বলেও কারও মনে হয় নি।

আমার নিজের তো মনে হয়েছিল যে যা ঘটেছে ঠিকই ঘটেছে ; আমি শুধুমাত্র মিশরীয়টির ঘুষির আওতার বাইরে একটু সরে গিয়েছিলাম। ডাক্তার পন্নোনার ব্রীচেসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মমিটার দিকে কটমট করে তাকাতে লাগলেন ; তার মুখখানা অসম্ভব লাল হয়ে উঠল। মিঃ গ্লিডন গোঁফে তা দিতে দিতে শার্টের কলারটা তুলে দিলেন। মিঃ বাকিংহাম মাথা নীচু করে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে মুখের বাঁ দিকের কষের উপর রাখলেন।

কঠিন মুখে তার দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে অবশেষে মিশরীয়টি মুখ সিঁটকে বলে উঠল :

"আপনি কিছু বলছেন না কেন মিঃ বাকিংহাম ? আমি যা বললাম সেটা শুনতে পেলেন, না পান নি ? মুখ থেকে বুড়ো আঙুলটা বের করুন !"

মিঃ বাকিংহাম ঈষৎ চমকে উঠে মুখের বাঁ কোণ থেকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা সরিয়ে নিল বটে, কিন্তু পাল্টা জবাব হিসাবে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটাকে মুখের ডান কোণে রাখল।

মিঃ বি-র কাছ থেকে কোন উত্তর বের করতে না পেরে মূর্তিটা এবার দুষ্টুমি করে মিঃ গ্লিডনের দিকে ফিরে আদেশের সুরে জানতে চাইল, আমাদের এ সব কাজের অর্থ কি।

মিঃ গ্লিডন ধ্বনাত্মক শব্দের সাহায্যে দীর্ঘ উত্তর শুনিয়ে দিলেন। প্রাচীন মিশরীয় ভাষার চিত্রলিপির অনুরূপ অক্ষর আমেরিকান মুদ্রাযন্ত্রে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলে মূল ভাষায় সম্পূর্ণ সংলাপটিকে লিপিবদ্ধ করে আমি প্রচুর আনন্দ পেতে পারতাম।

এই অবসরে আমি আরও বলে নিতে চাই যে মমির সঙ্গে পরবর্তী কথোপকথনে প্রাচীন মিশরীয় ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছিল, আর সেটা সম্ভব হয়েছিল দো-ভাষী হিসাবে মঁসিয় গ্লিডন ও বাকিংহামের মাধ্যমে। এই দুই ভদ্রলোক মমির মাতৃভাষাকে অননুকরণীয় দ্রুততায় প্রাঞ্জলভাবে বলে যেতে পারেন।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, মমির দেহের আবরণ খুলে ফেলে তার নাড়িভুঁড়ি-গুলো বের করতে পারার ফলে বিজ্ঞানের যে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে মিঃ গ্লিডনের আলোচনা প্রধানত তাকে কেন্দ্র করেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল ; সঙ্গে সঙ্গে এ কাজ করতে গিয়ে তার, বিশেষ করে আল্লামিস্টাকিও নামধারী এই মমিটির যে সব অসুবিধা সৃষ্টি করা হয়েছে সেজন্য তিনি ক্ষমাও চেয়ে নিলেন। উপসংহারে তিনি আরও জানালেন যে সমস্ত ব্যাপারটা যখন যথাযথভাবে বোঝানো হয়ে গেল, তখন এবার বাঞ্ছিত পরীক্ষার কাজে পুনরায় হাত দেওয়া যেতে পারে।

এ বিষয়ে আল্লামিস্টাকিওর মনে কিছুটা খুঁৎখুঁতি থাকলেও ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার ফলে সে সন্তুষ্ট চিত্তেই টেবিল থেকে নেমে চারদিক ঘুরে সকলের সঙ্গে কর-মর্দন করল।

কর-মর্দনের অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্রই ধারালো ছুরির টানে মমির দেহের যে সব ক্ষতি হয়েছিল সেগুলি মেরামতের কাজে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কপালের ক্ষতটা সেলাই করা হল। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হল, এবং নাকের ডগায় এক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ কালো প্লাস্টার লাগিয়ে দেওয়া হল।

এতক্ষণে আমাদের নজর পড়ল যে কাউণ্ট (এটাই আল্লামিস্টাকিওর উপাধি) একটু একটু কাঁপছে—সেটা যে শীতের ফল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাকের ঘরে চলে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল জেমিংসের তৈরী একটা সেরা কাঠের কালো ড্রেস-কোট, আকাশ-নীল রংয়ের একজোড়া ডোরা-কাটা পাৎলুন ; গোলাপি রংয়ের চেক-কাটা কামিজ, ব্রোকেডের ভেস্ট, সাদা মোটা ওভার কোট, আংটা-লাগানো বেতের ছড়ি, কাণাবিহীন টুপি, পেটেণ্ট-লেদারের বুট, খড়-রংয়ের চামড়ার দস্তানা, চোখ-ঢাকা চশমা, একজোড়া গালপাট্টা, ঢেউ-তোলা গলাবন্ধ। কাউণ্ট ও ডাক্তারের বপুর মাপের সামঞ্জস্যহীনতার (মাপের হার ২ ঃ ১) জন্য মিশরীয়কে এই সব পোশাক পরাতে বেশ কিছুটা অসুবিধাই হল। কিন্তু সব কিছু ঠিকঠাক হবার পরে তাকে মোটামুটি সুসজ্জিত বলার মতই দেখা গেল। অতএব মিঃ গ্লিডন হাত বাড়িয়ে তাকে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশে একটা আরামদায়ক চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ডাক্তার ঘণ্টা বাজিয়ে চুরুট ও মদ আনবার হুকুম দিলেন।

অচিরেই কথাবার্তা বেশ জমে উঠল। আল্লামিস্টাকিও এতদিন পরেও জীবিত

থাকার ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য সকলেই খুব কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

মিঃ বাকিংহাম বললেন, "আমি তো ভেবেছিলাম আপনি অনেক আগেই মারা গেছেন।"

কাউন্ট সবিস্ময়ে জবাব দিলেন, "সে কী! আমার বয়স তো সাতশ' বছরের সামান্য কিছু বেশী! আমার বাবা বেঁচে ছিলেন হাজার বছর, আর মরবার সময় তিনি মোটেই জরাগ্রস্ত ছিলেন না।"

এই সময় শুরু হয়ে গেল নানান প্রশ্ন ও চুল-চেরা হিসাব; তার ফলে পরিষ্কার বোঝা গেল যে এই মমির বয়স সম্পর্কে ধারণাটা খুবই ভুল হয়েছিল। তাকে এলিথিয়াসের ভূগর্ভস্থ সমাধিতে রাখার পরে এক হাজার পঞ্চাশ বছর কয়েক মাস পার হয়ে গেছে।

মিঃ বাকিংহাম বলে উঠলেন, "কিন্তু আমার কথার মধ্যে তো সমাধিস্থ হবার সময়ে আপনার বয়সের উল্লেখ ছিল না; আমি বক্তব্যে শুধু উল্লেখ করেছি আপনার আলকাতরায় আবৃত হয়ে থাকার সময়ের দীর্ঘ বিস্তৃতির কথা।"

"কিসে আবৃত হয়ে থাকার কথা?" কাউন্ট প্রশ্ন করল।

"আলকাতরায়," মিঃ বি. আবার বললেন।

"ওঃ, হ্যাঁ; আপনার বক্তব্য কিছুটা যেন বুঝতে পারছি। একটা জবাবও দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু আমাদের কালে বাইক্লোরাইড অফ্ মার্কারি ছাড়া অন্য কিছু আমরা ব্যবহার করতাম না।"

ডাক্তার পন্নোনার বললেন, "কিন্তু আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না যে পাঁচ হাজার বছর আগে আপনার মৃত্যু হয়, মিশরে আপনাকে কবরস্থ করা হয়, তবু কেমন করে আপনি আজও জীবিত আছেন? আপনাকে এত আনন্দিত ও সুস্থই বা দেখাচ্ছে কেমন করে?"

কাউন্ট উত্তর দিলেন, "আপনার কথামত আমি যদি মারা গিয়েই থাকি তাহলে আমার পক্ষে এখনও মৃত অবস্থায় থাকাই সম্ভব। বুঝতে পারছি, আপনারা এখনও রাসায়নিক তড়িৎ চিকিৎসার একেবারে শৈশব অবস্থায়ই আছেন। প্রাচীনকালে আমাদের কাছে যা ছিল খুবই সাধারণ ব্যাপার আপনারা আজও সেখানে পৌঁছতেই পারেন নি। আসল ঘটনা হল, আমি অপস্মার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলাম; আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ধরে নিয়েছিল যে আমি হয় মারা গিয়েছি, নয়তো অচিরেই মারা যাব; তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে একটা লেপন দিয়ে আমাকে ঢেকে দিয়েছিল—আশা করি অবলেপন পদ্ধতির মূল নীতিটি আপনারা জানেন?"

"না তো, মোটেই জানি না।"

"ওঃ, বুঝেছি; এক শোচনীয় অজ্ঞতার অবস্থা! দেখুন, বিশদ বিবরণের মধ্যে তো এখন যেতে পারব না; কিন্তু একটা কথা বোঝানো দরকার যে মিশরে ঠিক মত অবলেপনের কাজই ছিল সর্বপ্রকার জৈবিক ক্রিয়াকলাপকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য রুদ্ধ করে দেওয়া। 'জৈবিক' কথাটাকে আমি ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করছি; নৈতিক ও

প্রাণময় সত্ত্বার সঙ্গে দৈহিক সত্ত্বাকেও তার অন্তর্ভুক্ত করেছি। আবার বলছি, আমাদের কাছে অবলেপনের মূল নীতিই ছিল ঐ পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব রকম জৈবিক ক্রিয়া-কলাপকে সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ করে দিয়ে তাকে চিরদিনের মত সেই অবস্থায় রেখে দেওয়া। এক কথায় বলতে গেলে, অবলেপনের সময় কোন ব্যক্তিবিশেষ যে অবস্থায় ছিল তাকে ঠিক সেই অবস্থায় রেখে দেওয়া হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমার ধমনীতে স্কারাবিউসের রক্ত প্রবাহিত বলে আমাকে জীবিত অবস্থায় অবলেপিত করা হয়েছিল, আর আপনারা আজ আমাকে সেই অবস্থায়ই দেখতে পাচ্ছেন।

"স্কারাবিউসের রক্ত!" ডাক্তার পন্নোনার চীৎকার করে উঠলেন।

"হ্যাঁ। স্কারাবিউস একটি বিশিষ্ট ও অতীব বিরল সম্ভ্রান্ত পরিবারের প্রতীক-চিহ্ন। স্কারাবিউসের রক্তের ধারক হওয়া মানেই এমন একটি পরিবারের একজন হওয়া যার প্রতীক-চিহ্ন স্কারাবিউস। আমি প্রতীকী ভাষায় কথা বলছি।"

"কিন্তু তার সঙ্গে আপনার জীবিত থাকার কি সম্পর্ক?"

"আরে, অবলেপনের আগে যেকোন মৃতদেহ থেকে অন্ত্রসমূহ ও মস্তিষ্ককে বের করে নেওয়াই মিশরের সাধারণ রীতি; একমাত্র স্কারাবিউ জাতির বেলায়ই এ রীতি প্রযুক্ত হত না। কাজেই আমি যদি একজন স্কারাবিউস না হতাম তাহলে আমাকেও অন্ত্রসমূহ ও মস্তিষ্ক বিহীন হতে হত; আর এদের যে কোন একটিকে বাদ দিয়ে বাঁচা শক্ত।

মিঃ বাকিংহাম বললেন, "বুঝতে পেরেছি; তাহলে ধরেই নিচ্ছি, যেসব মমি আমাদের হাতে এসেছে তার সবগুলিই স্কারাবিউই জাতির।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই।"

মিঃ গ্লিডন নরম গলায় বললেন, "আমার ধারণা ছিল স্কারাবিউস মিশরীয়দের অন্যতম দেবতা।"

উঠে দাঁড়িয়ে মমি চীৎকার করে বলল, "মিশরীয়দের অন্যতম কি বললেন?"

"দেবতা!" আগন্তুক আবার বলল।

চেয়ারে বসে পড়ে কাউন্ট বললেন, "মিঃ গ্লিডন, আপনার মুখে এ ধরনের কথা শুনে আমি সত্যি বিস্মিত হচ্ছি। পৃথিবীর কোন জাতি কোনদিন একের অধিক দেবতাকে স্বীকার করে নি। স্কারাবিউস, আইবিস, প্রভৃতি হচ্ছে প্রতীক বা মাধ্যম মাত্র। যেহেতু পরম সৃষ্টিকর্তাকে সরাসরি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না তাই এই সব প্রতীক বা মাধ্যমের সাহায্যে তাকে পূজা করা হয়ে থাকে।"

সকলেই চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার পন্নোনারই নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত করলেন।

"তাহলে তো আপনার ব্যাখ্যা অনুসারে নীল নদের নিকটবর্তী ভূগর্ভস্থ সমাধিগুলিতে স্কারাবিউস জাতির অনেক মমি এখনও জীবিত অবস্থায় থাকতে পারে।"

"সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না," কাউন্ট জবাব দিলেন; যে সব

www.boierboi.blogspot.com

স্কারাবিউইকে ঘটনাক্রমে জীবিত অবস্থায় অবলেপিত করা হয়েছিল তারা অবশ্যই জীবিত আছে। এমন কি উদ্দেশ্যমূলকভাবে যাদের এভাবে অবলেপিত করা হয়েছিল তাদের কেউ কেউ এখনও সমাধির মধ্যেই রয়েছে।”

“‘উদ্দেশ্যমূলকভাবে অবলেপিত হয়েছে” বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন দয়া করে সেটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?” আমি বললাম।

এই প্রথমবার আমি তাকে সরাসরি প্রশ্ন করায় চশমার ভিতর দিয়ে আমাকে ভালভাবে দেখে নিয়ে মমি জবাব দিল, “আনন্দের সঙ্গেই বলব। আমার কালে মানুষের স্বাভাবিক আয়ু ছিল প্রায় আটশ’ বছর। অসাধারণ কোন দুর্ঘটনা না ঘটলে ছয়শ’ বছরের আগে কেউ মারা যেত না ; আবার খুব কম লোকেই হাজার বছরের বেশী বাঁচত ; আটশোকেই অস্বাভাবিক আয়ু মনে করা হত। অবলেপন রীতি আবিষ্কৃত হবার পরে আমাদের দার্শনিকদের মনে হল যে এই স্বাভাবিক আয়ুষ্কালকে যদি কিস্তিতে কিস্তিতে বাঁচার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে একটা প্রশংসনীয় কৌতূহলকে মেটানো যায়, আবার বিজ্ঞানের প্রচুর উন্নতি ঘটানো যায়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে তো এ ধরনের অভিজ্ঞতা প্রায় অপরিহার্য বলেই প্রমাণিত হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন ইতিহাসকার হয়তো পাঁচশ’ বছর বয়সে অনেক পরিশ্রম করে একখানা বই লিখে নিজেকে যত্নসহকারে অবলেপিত করালেন ঃ তার সাময়িক হত্যাকারীদের নির্দেশ দিলেন— একটা বিশেষ সময়, ধরুন পাঁচ বা ছয় শ’ বছর পরে তাকে যেন পুনরুজ্জীবিত করা হয়। যথাকালে পুনর্জীবিত হয়ে তিনি অতি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে তার সেই মহৎ গ্রন্থখানি ততদিনে হজবরল-তে পরিপূর্ণ একটি পুঁথিতে পরিণত হয়েছে— সেটাকে কেন্দ্র করে পরস্পরবিরোধী অনুমান, ধাঁধা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষের এক সাহিত্যিক রণ-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। ভাষ্য ও সংশোধনের নামে এই সব অনুমানাদি মূলগ্রন্থখানিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন, বিকৃত, ও প্রভাবিত করে ফেলেছে যে গ্রন্থকারকে তখন লণ্ঠন হাতে নিয়ে নিজের বইখানার খোঁজে বের হতে হবে। আর সেটা যখন পাওয়া যাবে তখন দেখা যাবে যে খোঁজাটাই পণ্ডশ্রম হয়েছে। তারপর বইখানাকে নতুন করে আগাগোড়া লিখে ফেলার পরে সেই গ্রন্থকারের অবশ্য কর্তব্যই হবে নতুন করে কাজ শুরু করা, ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেরই অতীত জীবনের সমসাময়িক কালের ঐতিহ্যকে সংশোধন করা। এইভাবে বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন সময়ে নিজের বইকে নতুন করে লেখা ও সংশোধন করার পথ অনুসরণ করার ফলে আমাদের ইতিহাস পুরোপুরি উপকথা হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে”।

এই সময় মিশরীয়টির বাহুতে আলতো করে হাত রেখে ডাক্তার পন্নোনার বললেন “মাফ করবেন মহাশয়, এক মুহূর্তের জন্য একটা কথা বলতে পারি কি ?”

“নিশ্চয় পারেন,” কাউণ্ট বললেন।

ডাক্তার বললেন, “আমি কেবল একটা প্রশ্ন করতে চাই। ইতিহাসকার কর্তৃক নিজের যুগের ঐতিহ্যকে সংশোধন করার কথা আপনি বললেন। আচ্ছা মহাশয়, গড়পরতা এই সব কাব্বালা-র কত ভাগ সাধারণত সত্য প্রমাণিত হয়েছে ?”

“কাব্বালা কথাটা আপনি সঠিক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। দেখা গেছে যে ঐ সব কাব্বালা অলিখিত ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সমান তালেই চলেছে।—অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই এই দুটির কোনটাই তিলমাত্র ভুল হয়েছে বলে জানা যায় নি।”

ডাক্তার আবার বললেন, “কিন্তু যেহেতু এটা খুবই পরিষ্কার যে আপনার সমাধিস্থ হবার পরে অন্তত পাঁচ হাজার বছর কেটে গেছে, তখন আমি নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে আপনাদের তৎকালীন ঐতিহ্য না হলেও তৎকালীন ইতিহাস অন্তত একটি সার্বজনীন কৌতূহলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছে ঃ সেটা হচ্ছে মাত্র দশ শতাব্দী পূর্বে সংঘটিত সৃষ্টিকর্ম।”

“মহাশয়!” কাউন্ট আল্লামিস্টাকিও বললেন।

ডাক্তার তার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করলেন। সেই সঙ্গে অনেক মন্তব্য করার পরে তবেই বিদেশীর কাছে সেটা বোধগম্য হল। তবু তিনি ইতস্তত করে বললেন ঃ

“আমি স্বীকার করছি যে আপনার মন্তব্যগুলি আমার কাছে সম্পূর্ণ অভিনব। আমার সমকালে এমন একজনকেও আমি জানতাম না যার মনে কল্পনাতেও এ রকম একটা ধারণা স্থান পেয়েছিল যে এই বিশ্ব-জগতের কোন আদি কোন কালে ছিল। আজ আমার মনে পড়ছে একবার, মাত্র একবারই শুনেছিলাম, বহু ধ্যান-ধারণার অধিকারী একটি মানুষ মানবজাতির আবির্ভাব সম্পর্কে এই রকম একটা ইঙ্গিত করেছিলেন; আর সেই মানুষটি আপনার ব্যবহৃত আদম (বা লাল পৃথিবী) কথাটা ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য তিনি কথাটা ব্যবহার করেছিলেন প্রজন্ম প্রসঙ্গে—বর্দ্ধিষ্ণু মাটি থেকে স্বতস্ফূর্ত জীব-জন্ম প্রসঙ্গে—ভূমণ্ডলের পাঁচটি সুনির্দিষ্ট এবং প্রায় সমভাবে বিভক্ত অংশে পাঁচটি বিরাট মানবদলের স্বতস্ফূর্ত আবির্ভাবের কথাটাই আমি বলছি।”

এখানে উপস্থিত সকলেই কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন; দু একজন তো অর্থপূর্ণভাবেই কপালে হাত ছোঁয়ালেন। মিঃ সিল্ক বাকিংহাম প্রথমে আল্লামিস্টাকিওর করোটির দিকে ও পরে সম্মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন ঃ

“আপনার কালে মানব জীবনের দীর্ঘ বিস্তার এবং তাকে কিস্তিতে ভাগ করে ভোগ করার ফলে জ্ঞানে সাধারণ উন্নতি এবং একধরনের ঝোঁক নিশ্চয় খুব বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং আমি মনে করি আধুনিক মানুষদের তুলনায়, বিশেষ করে ইয়াংকিদের সঙ্গে তুলনায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রাচীন মিশরীয়দের সুস্পষ্ট অনগ্রসরতার মূলে রয়েছে মিশরীয়দের করোটির অত্যধিক নিরেটতা।”

যথেষ্ট ভদ্রভাবে কাউণ্ট বললেন, “আবার স্বীকার করছি যে আপনার কথাগুলি আমি বুঝতে পারছি না। আমাকে বলুন, বিজ্ঞানের কোন্ বিষয়ের কথা আপনি বলছেন।”

এখানে আমাদের দলের সকলেই সমস্বরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে লাগল

মস্তিষ্কতত্ত্বের মৌলিক সত্য এবং জৈব চৌম্বকশাস্ত্রের বিস্ময়কর তত্ত্বগুলি।

আমাদের সব কথা মন দিয়ে শুনে কাউণ্ট তাদের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার কথা বললেন। তারপর দুই পক্ষের মধ্যে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। দু'পক্ষের মুখেই বহ্বাড়ম্বরের খৈ ফুটতে লাগল। আমরা বললাম, আধুনিক আমেরিকার নানারকম বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কথা; বললাম নিউ ইয়র্কের বোলিং-গ্রীন ফোয়ারা ও ওয়াশিংটন ডি. সি.-র সরকারী ভবনের কথা। কাউণ্টও শুনিয়ে দিল মিশরের মন্দির-স্থাপত্য ও পিরামিডের কাহিনী। আমরা বললাম, গণ-ভোটে নির্বাচিত এমন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা যেখানে রাজা বলে কেউ নেই। কাউণ্টও শুনিয়ে দিলেন এক আজব কাহিনী। কোন এক সময়ে তেরোটি মিশরীয় রাষ্ট্র স্বাধীন হয়ে মানব জাতির সামনে একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই তেরোটি রাষ্ট্র আরও পনেরো বা বিশটি রাষ্ট্রের সঙ্গে একত্রে মিশে গিয়ে এমন এক জঘন্য ও সমর্থনের অতীত নিরংকুশ শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যার কথা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনও শোনা যায় নি।

আলোচনাটা ক্রমাগতই অধিকতর হাস্যকর রূপ নিতে থাকল। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার পন্নোনার গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, মিশরীয়দের দেশে কখনও কোন কালে পন্নোনারের লজেঞ্চুস অথবা ব্রাণ্ড্রেথ-এর বড়ি তৈরী হয়েছে কি না।

গভীর উদ্বেগের সঙ্গে একটা উত্তরের জন্য আমরা হাঁ করে রইলাম; কিন্তু সব বৃথা। কোন উত্তর এল না। মিশরীয় ভদ্রলোক লজ্জায় অধোবদন হলেন। এতবড় জয় বুঝি আর কখনও কারও হয় নি; এতবড় পরাজয়ও কখনও কাউকে বরণ করতে হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি, মমিটির এই অসহায় মর্মবেদনা আমি যেন সইতে পারছিলাম না। টুপিটা তুলে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গীতে তাকে অভিবাদন জানিয়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

বাড়ি পৌঁছে দেখি চারটে বেজে গেছে; তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। এখন সকাল দশটা বাজে। সাতটায় জেগে উঠে আমার পরিবারের লোকজন ও মানবজাতির কল্যাণার্থে এই স্মৃতি-কথা লিখতে বসেছি। পরিবারের লোকদের সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হবে না। আমার স্ত্রী একটি মহা-খাণ্ডারণী। আসল কথা, এই জীবন ও ঊনবিংশ শতাব্দীটাই আমার কাছে দুঃসহ হয়ে উঠেছে। আমার দৃঢ় ধারণা, সব কিছুই বেচালে চলছে। তাছাড়া, ২০৪৫-এ কে প্রেসিডেণ্ট হবে তা জানতেও আমি উৎকণ্ঠিত। সুতরাং দাড়ি কামিয়ে এক কাপ কফি গিলেই আমি চলে যাব পন্নোনারের বাড়ি এবং শ' দুই বছরের জন্য অনুলেপনের সাহায্যে নিজেই মমিতে পরিণত হব।

লাল মৃত্যুর সৌখিন অভিনয়

The Masque of the Red Death

"লাল মৃত্যু" অনেক কাল আগেই দেশকে ছাড়খারে দিয়েছিল। অন্য কোন মহামারীই কোন দিন এত বেশী মারাত্মক বা বীভৎস হয়ে দেখা দেয় নি। রক্ত—রক্তের লাল রং ও আতংকই—তার অবতার ও মোহর। প্রথমে তীব্র যন্ত্রণা ও আকস্মিক ঝিমুনি; তারপরেই লোমকুপ থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ ও মৃত্যু। আক্রান্ত রোগীর সারা দেহে, বিশেষত মুখে চাকা চাকা লাল দাগই মহামারীর অভিশাপের মত তাকে বঞ্চিত করে রাখে সাহায্য ও সহচরদের সহানুভূতি থেকে। রোগের আক্রমণ, প্রসার ও বিরাম—সব কিছুই মাত্র আধা ঘণ্টার ব্যাপার।

কিন্তু যুবরাজ প্রস্পেরো সুখী, অকুতোভয় ও চতুর। রাজ্যের অর্ধেক জন-সংখ্যা নিঃশেষ হবার পরে দরবারের পারিষদবর্গ ও সুন্দরীদের ভিতর থেকে এক হাজার হাসি-খুশি ও লঘুচিত্ত বন্ধুদের ডেকে এনে তাদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল প্রাকারবেষ্টিত দুর্গসদৃশ একটি নির্জন মঠে। মঠটি যেমন বিস্তীর্ণ তেমনই চমৎকার তার গঠন-শৈলী,—যুবরাজের খেয়ালি অথচ মহান রুচির এক অনবদ্য সৃষ্টি। একটি দৃঢ় ও সুউচ্চ প্রাচীর তাকে বেষ্টন করে রেখেছে। তাতে লোহার ফটক বসানো। পারিষদরা মঠে ঢুকেই উনুন ও ভারী ভারী হাতুড়ি আনিয়ে হুড়কোগুলোকে পিটিয়ে জুড়ে দিল। মনের আকস্মিক হতাশা বা পাগলামির ধাক্কায় কেউ যাতে সেখানে ঢুকতে বা বের হতে না পারে তার সবরকম ব্যবস্থা করতে তারা দৃঢ়সংকল্প। মঠের মধ্যে প্রচুর খাদ্যসামগ্রী মজুদ করা হল। বাইরে থেকে রোগ-সংক্রমণকে বন্ধ করার ব্যবস্থাও এতে হয়ে গেল। যে জগৎটা বাইরে থাকল তার ব্যবস্থা সে নিজেই করতে পারবে। আপাতত তা নিয়ে দুঃখ করা বা চিন্তা-ভাবনা করা বৃথা। আমোদ-প্রমোদের সব রকম ব্যবস্থা 'প্রিন্সই' করেছে। তাদের সঙ্গে ভাঁড় আছে, ব্যালে-নাচিয়ে আছে, গাইয়ে-বাজিয়ে আছে, সুন্দরীর দল আছে, মদও আছে। এ সব কিছুরই সঙ্গে নিরাপত্তাও আছে প্রাকারের ভিতরে। তার বাইরে আছে "লাল মৃত্যু।"

এই নির্জন বাসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ মাসের শেষের দিকের কথা। বাইরে তখন মহামারী প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে। সেই সময় হাজার পারিষদের মনোরঞ্জনের জন্য যুবরাজ প্রস্পেরো অসাধারণ জাঁকজমকপূর্ণ একটা মুখোসধারী বল-নাচের আয়োজন করল।

সেই মুখোসধারী সমবেত নৃত্যের আসর হৈ চৈতে ভরা এক বিলাসবহুল দৃশ্য। কিন্তু যে সব ঘরে সে আসর বসেছিল প্রথমে তার কথাই বলি। ঘর ছিল সাতটি—প্রত্যেকটি রাজকীয় কেতায় সুসজ্জিত। অনেক রাজপ্রাসাদেই এ ধরনের ঘরগুলি থাকে পর পর দীর্ঘ সারিতে সাজানো; ভাঁজ করা দরজাগুলো খুলে দিলেই দু

দিকের দেওয়ালের গায়ে প্রায় মিশে যায়; ফলে তাদের পুরো দৃশ্যটা কোনরকম বাধা পায় না। এখানে কিন্তু ব্যবস্থাটা অন্যরকম; অদ্ভুত কোন কিছুর প্রতি ডিউকের অনুরাগ থেকে সেটাই তো প্রত্যাশিত। ঘরগুলি এমন অনিয়মিতভাবে সাজানো যে একসঙ্গে তাদের একটার বেশী দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রতি বিশ বা ত্রিশ গজ দূরে দূরেই একটা করে খাড়া বাঁক তৈরী করা হয়েছে; তার ফলে প্রতিটি বাঁকেই ফল হয়েছে অদ্ভুত। বামে ও ডাইনে প্রতিটি দেওয়ালের মাঝখানে গথিক ধরনের একটা করে লম্বা, সরু জানালা এমনভাবে বসানো হয়েছে যে তার পিছনে একটা বন্ধ বারান্দা এঁকে বেঁকে চলে গেছে ঘরগুলোর সঙ্গে তাল রেখে। জানালাগুলোতে রঙিন কাঁচ লাগানো; যে ঘরের যে রং জানালার কাঁচের রংও তার সঙ্গে মিলিয়ে করা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একেবারে পূর্ব প্রান্তের ঘরটার রং নীল,—কাজেই তার জানালাও সম্পূর্ণ নীল। দ্বিতীয় ঘরটির সাজগোজ ও পর্দার রং রক্তিম; তাই সেখানে জানালার কাঁচও রক্তিম বর্ণ। তৃতীয় ঘরটা সবুজে ঢাকা, আর জানালাও তাই। চতুর্থ ঘরের সব কিছু কমলা রংয়ের—পঞ্চম ঘরে সাদা—ষষ্ঠ ঘরে বেগুনি। সপ্তম ঘরটিতে কালো ভেলভেটের পর্দা সিলিং থেকে দেওয়াল বরাবর নেমে এসে ভাঁজ হয়ে পড়েছে একই রং ও কাপড়ের কার্পেটের উপর। কিন্তু কেবলমাত্র এই ঘরের অন্য সাজসজ্জার রংয়ের সঙ্গে জানালার রংয়ের মিল নেই। কাঁচগুলো রক্তিম—টকটকে গাঢ় রক্তবর্ণ। এই সাতটা ঘরের কোনটাতেই কোন বাতি বা মোমবাতি-দান নেই, যদিও মেঝেয় ছড়িয়ে আছে অথবা ছাদ থেকে ঝুলছে প্রচুর সোনালী রং মাখানো জিনিসপত্র। কোন ঘরের ভিতরেই বাতি বা মোমবাতি থেকে কণামাত্র আলো ঠিকরে পড়ছে না। কিন্তু প্রতি জানালার পিছনের বারান্দায় রাখা হয়েছে একটি করে ভারী ত্রিপদী; তার উপরে স্থাপিত অগ্নিপাত্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে ঢুকে ঘরকে উজ্জ্বল আভায় আলোকিত করে তুলেছে। এইভাবে সমস্ত বাড়িটাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা অত্যদ্ভুত আলোক বৈচিত্র্য। কিন্তু পশ্চিম দিকের অথবা কালো ঘরটিতে অগ্নিপাত্র থেকে বিচ্ছুরিত আলোকপাতের ফল হয়েছে একেবারে অন্যরকম। রক্ত-রংয়ের কাঁচের ভিতর দিয়ে অগ্নিপাত্রের আলো এসে কালো কালো ঝুলন্ত আসবাবপত্রের উপর পড়ে একটা ভৌতিক রং-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে, আর যারাই ঘরে ঢুকছে তাদের মুখের উপর সেই আলো পড়ে এমন একটা অমানুষিক দৃশ্য রচনা করছে যে তা দেখে অন্য কেউ সে ঘরে পা ফেলতে সাহস করছে না।

আবার সেই ঘরের পশ্চিম দিকের দেওয়ালের গায়েই দাঁড়িয়ে আছে আবলুস কাঠের একটা প্রকাণ্ড ঘড়ি। তার পেন্ডুলামটা এদিক-ওদিক দুলছে একটা একঘেয়ে ভারী টক্-টক্ আওয়াজ করে। যখন মিনিটের কাঁটাটা ঘুরে যাচ্ছে, যখন এক ঘন্টার পরে ঘড়িটা বাজছে, তখনই ঘড়িটার ধাতব ফুসফুস থেকে বেরিয়ে আসছে একটা স্পষ্ট ও জোরালো অথচ গম্ভীর এবং অত্যন্ত সুরেলা ধ্বনি। কিন্তু সে ধ্বনির তাল ও জোর এমনই যে প্রতি একটি ঘন্টা পার হতেই অর্কেস্ট্রার বাজিয়েরা সে শব্দ শুনবার জন্য কিছুক্ষণের জন্য তাদের বাজনা বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। সেই সঙ্গে যারা ওয়াল্‌জ নাচে তারাও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলে ফূর্তিবাজ পুরো দলটাই

কিছুক্ষণের জন্য বেসামাল হয়ে যায়। ঘড়িটা কিন্তু তখনও বাজতেই থাকে, আর তখনই দেখা যায় যারা ছিল চঞ্চল তারা বিবর্ণ হয়ে গেছে, এবং এক অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও অবসরপ্রাপ্তরা ভুরুতে হাত বুলোচ্ছে, যেন কোন দিবাস্বপ্নে বা ধ্যানে ডুবে গেছে। কিন্তু যেই তার প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ থেমে যাচ্ছে অমনি একটা হাল্কা হাসিতে ঘরটা ভরে ওঠে; নিজেদের স্নায়বিক দুর্বলতা ও বোকামির জন্য বাজিয়েরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে আর ফিস্‌ফিস্‌ করে একে অন্যের কাছে প্রতিজ্ঞা করে আবার যখন ঘড়িটা বাজবে তখন তারা এরকম বেহাল হয়ে পড়ে না। কিন্তু ষাটটি মিনিট (যেটা উড়ে-যাওয়া কালের তিন হাজার ছ' শ' সেকেণ্ডের সমান) পার হতেই আবার যখন ঘড়িটা বেজে ওঠে তখনই দেখা দেয় আগের মত সেই একই বেহাল, কম্পমান ও ধ্যানের পরিস্থিতি।

কিন্তু এত সব সত্ত্বেও সে হৈ-হল্লার আসরটা ছিল যেমন আনন্দমুখর তেমনি সূক্ষ্ম। শুধুমাত্র ফ্যাসান মাফিক সে চলে না। তার পরিকল্পনা দুঃসাহসিক ও অগ্নিময়; তার ধ্যান-ধারণায় বর্বরতার উজ্জ্বল দীপ্তি। হয় তো কেউ কেউ তাকে পাগল মনে করত। কিন্তু তার অনুচররা তা ভাবত না। সে যে পাগল নয় সেটা নিশ্চিতরূপে বুঝতে হলে তার কথা শোনা দরকার, তাকে দেখা দরকার, তাকে স্পর্শ করা দরকার।

এই বিরাট উৎসব উপলক্ষ্যে তার নির্দেশক্রমেই এই সাতটি ঘরের অস্থাবর সাজ-সজ্জাগুলিকে সরান-নরান করা হয়েছে। তার রুচিসম্পন্ন পরিচালনাগুণেই মুখোস-ধারীদের চরিত্রে নতুন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। সত্যি, তারা সবাই ছিল কিম্ভুতকিমাকার। তাদের মধ্যে ছিল দীপ্তি, চাকচিক্য, তীব্রতা ও ভৌতিকতা—"হেরনানি"-তে যা কিছু দেখা গিয়েছিল তার অনেক কিছুই ছিল। অদ্ভুত সব আরবি অলংকরণও ছিল। এমন সব মাথাপাগলা কল্পনার খেলা ছিল যা কেবল পাগলদেরই মানায়। সেখানে ছিল অনেক কিছু সুন্দর, অনেক কিছু কামপরায়ণ, অনেক কিছু কিম্ভুতকিমাকার, কিছুটা ভয়ংকর, আবার বিরক্তিকর যা ছিল তাও সামান্য নয়। সাতটি ঘরময় যেন সগর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অসংখ্য স্বপ্ন। আর এরা এই সব স্বপ্নরা—এঁকে বেঁকে ঘুরছিল এ-ঘর থেকে ও ঘরে, নানান ঘরের রং মেখে মেখে; মনে হচ্ছিল অর্কেস্ট্রার উন্মত্ত সুরগুলি বুঝিবা তাদেরই পদশব্দের প্রতিধ্বনি। আরে! ঐ তো ভেলভেটে ঢাকা হলঘরের আবলুস কাঠের ঘড়িটা বাজছে। তারপরই মুহূর্তের জন্য সবই স্তব্ধ, সবই নিশ্চুপ, একমাত্র ঘড়ির শব্দ ছাড়া। স্বপ্নগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে—যেন জমাট বরফে তৈরী। কিন্তু ঘড়িটার শব্দের প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল এক মুহূর্ত পরেই; আর একটা হাল্কা, চাপা হাসি যেন সেই প্রতিধ্বনির পিছনে ভেসে চলে গেল। আবার বাজনা বেজে উঠল, স্বপ্নরা বেঁচে উঠল, ত্রিপদীর আলোর বিচিত্র স্রোত গায়ে মেখে এঁকে বেঁকে আনন্দিত পদক্ষেপে চলতে লাগল এ ঘর থেকে ও-ঘরে। কিন্তু পশ্চিম দিকের সাতটা ঘরের একেবারে শেষের ঘরটাতে কোন মুখোসধারীই সাহস করে ঢুকল না। কারণ রাত শেষ হয়ে আসছে; রক্ত-রাঙা কাঁচের ভিতর দিয়ে

আসছে অধিকতর লাল আলোর রেখা ; কালো পর্দাগুলি ভয়াবহ দেখাচ্ছে ; কাছাকাছি থাকা আবলুস কাঠের ঘড়িটা থেকে যে শব্দ শোনা যাচ্ছে সেটা দূরের অন্যান্য ঘর অপেক্ষা এই ঘরটাতে যে ঢুকছে তার কানে বাজছে অনেক বেশী গম্ভীর আওয়াজে।

কিন্তু অন্য সব ঘর ভিড়ে ঠাসাঠাসি ; সেখানে জীবনের স্পন্দন বাজছে তীব্রতর সুরে। হৈ-হুল্লোড় একতালেই চলতে চলতে একসময় ঘড়িতে বেজে উঠল মধ্যরাতের ঘণ্টা। তখনই থেমে গেল বাজনা ; শান্ত হল ওয়াল্‌জ-নাচিয়েদের পায়ের তাল ; সব কিছুই অস্বস্তিকরভাবে থেমে গেল। এবার শুরু হল ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দ ; আর হুল্লোড়কারীদের মধ্যে যারা একটু বেশী চিন্তাশীল তাদের মাথায় ঢুকল আরও বেশী চিন্তা। এইভাবে ঘড়ির শেষ শব্দের প্রতিধ্বনিটা সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগেই ভিড়ের ভিতরকার কিছু লোকের নজর পড়ল এমন একটি মুখোসধারী মূর্তির উপর যাকে এর আগে কেউই চোখে দেখে নি। ক্রমে এই নতুন উপস্থিতির কথা কানে কানে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই মুখে মুখে উঠল একটা গুঞ্জন, অথবা বলা যায় আপত্তি ও বিস্ময়ের একটা অস্পষ্ট সোরগোল—আর শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়ে উঠল ভয়, আতংক ও বিরক্তির উচ্ছ্বাস।

যে ধরনের ভৌতিক সমাবেশের ছবি আমি এঁকেছি তাতে সহজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে কোন সাধারণ উপস্থিতি তাদের মধ্যে এত বেশী উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারত না। আসলে সে রাতের মুখোসধারী নৃত্যের আসরে যোগদানের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল ঢালাওভাবে ; কিন্তু আলোচ্য মূর্তিটি সকলের উপর টেক্কা দিয়ে স্বয়ং যুবরাজের আরোপিত বিধি-নিষেধকেও ভঙ্গ করছিল। উপস্থিত গোটা দলই অনুভব করল, কি পোশাকে, কি আচরণে নবাগত লোকটি বুদ্ধি বা শালীনতার কোন স্বাক্ষর রাখতে পারে নি। মূর্তিটি দীর্ঘদেহ ও ক্ষীণকায় ; তার আপাদমস্তক কবরের পোশাকে ঢাকা। যে মুখোসটা সে পরেছে সেটা দেখতে এত বেশী একটা শক্ত মৃতদেহের মুখের মত যে খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেও ফাঁকিটা ধরা বেশ শক্ত। তবু আনন্দে অধীর হল্লাকারীরা এ সবকিছুই হয়তো সহ্য করত। কিন্তু ততক্ষণে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে যে এই মূর্তিটিই "লাল মৃত্যু"। তার পোশাক রক্তে চুবানো,—চওড়া ভুরুসহ চোখ, নাক মুখ সর্বত্রই ছিটানো হয়েছে রক্তিম আতংক।

যুবরাজ প্রস্পেরোর চোখ পড়ল ভৌতিক মূর্তিটার উপর (যেন নিজের ভূমিকাটিকে পুরোপুরি বজায় রাখতেই সে তখন ধীর গম্ভীরভাবে ঘুরছে ওয়াল্‌জ নাচিয়েদের সঙ্গে) ; প্রথমেই সে বিচলিত হয়ে উঠল ; ভয়ে হোক বিরক্তিতে হোক তার সমস্ত শরীর থর্‌ থর্‌ করে কেঁপে উঠল ; কিন্তু পরমুহূর্তেই তার ভুরু ক্রোধে রাঙা হয়ে উঠল।

কর্কশ গলায় পাশে দাঁড়ানো পারিষদদের বলে উঠল, "কার এত সাহস ? এমন অপবিত্র পরিহাসের দ্বারা আমাদের অপমান করার সাহস হল কার ? তাকে পাকড়াও

কর ; তার মুখোস খুলে নাও—তার মুখ আমাদের দেখতে দাও যাকে কাল সূর্যোদয়ের কালে ফাঁসিতে ঝোলাতে হবে।”

পূর্বদিকের বা নীল ঘরে দাঁড়িয়ে যুবরাজ প্রস্পেরো কথাগুলি বলল। তার সুস্পষ্ট জোরালো প্রতিধ্বনি শোনা গেল সাতটি ঘরেই—কারণ যুবরাজ সাহসী ও শক্ত সমর্থ, আর তার হাতের দোলায় সব বাজনা গেছে বন্ধ হয়ে।

নীল ঘরে যুবরাজের পাশে তখন ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল একদল পারিষদ। যুবরাজের হুকুম শুনেই কিছু লোক নবাগতের দিকে এগিয়ে গেল। সেও কাছেই ছিল। এবার বড় বড় পা ফেলে যুবরাজের আরও কাছে এল। কিন্তু ইতিমধ্যেই যে গুজবটি সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল তার অজানা ভয়েই দলের কোন লোক তার গায়ে হাত লাগাতে সাহস করল না। ফলে বিনা বাধায় সে যুবরাজের এক গজের মধ্যে পেঁছে গেল। সমবেত পারিষদবর্গ তখন একসঙ্গে ঘরের মাঝখান থেকে দেওয়ালের দিকে সরে গেল, আর নবাগত লোকটি বিনা বাধায় সেই একই গুরুগম্ভীর মাপা পদক্ষেপে নীল ঘর থেকে লাল ঘরে, লাল থেকে সবুজ, সবুজ থেকে কমলা—সেখান থেকে সাদা, এমন কি বেগুনি ঘর হয়ে এগিয়ে চলতে লাগল। কেউ তাকে বন্দী করতে এগিয়ে গেল না। যাই হোক, তখনই যুবরাজ প্রস্পেরো নিজের সাময়িক ভীরুতায় ক্রোধে ও লজ্জায় অভিভূত হয়ে ছ'টা ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল। কিন্তু আতংকবিহ্বল পারিষদবর্গের কেউ তাকে অনুসরণ করল না। উদ্যত ছুরি হাতে নিয়ে ছুটতে ছুটতে যুবরাজ পেঁছে গেল চলমান নবাগতের তিন-চার ফুটের মধ্যে। আর সে লোকটিও ভেলভেট ঘরের শেষ প্রান্তে পেঁছে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল। ধ্বনিত হল একটা তীক্ষ্ণ ক্রন্দন—ছুরিটা কালো কার্পেটের উপর পড়ে চকচক করতে লাগল ; আর পরমুহূর্তেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল যুবরাজ প্রস্পেরোর দেহ। তখন হল্লাকারীদের দলটা হতাশাপ্রণোদিত উন্মাদ সাহসে ভর করে কালো ঘরটাতে ঢুকে পড়ে মুখোসধারীকে চেপে ধরল। দীর্ঘ মূর্তি'টা কিন্তু আবলুস কাঠের ঘড়িটার ছায়ায় সোজা হয়ে নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আর আক্রমণকারীরা যখন বুঝতে পারল কবরের পোশাকে ঢাকা ; মৃতের মুখোশ-আঁটা যে মূর্তিটাকে তারা এমন নির্দয়ভাবে চেপে ধরেছে তার ভিতরে কোন সত্যিকারের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহ নেই, তখন অনুচ্চারিত আতংকে তারা হতবাক হয়ে গেল।

এতক্ষণে তারা বুঝতে পারল এই মূর্তিই “লাল মৃত্যু”। সে এসেছে রাতের অন্ধকারে চোরের মত। অমনি একের পর এক হুল্লোড়কারীরা ঢলে পড়তে লাগল রক্ত-ছড়ানো মেঝের উপর। যে যে ভাবে পড়ল সেই ভাবেই মরল। সর্বশেষ পারিষদটির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আবলুস কাঠের ঘড়িটার জীবন-বায়ুও বেরিয়ে গেল। নিভে গেল ত্রিপদীর অগ্নিশিখা। সকলের উপর প্রসারিত হল অন্ধকার, ধ্বংস ও লাল মৃত্যুর সীমাহীন শাসন-দণ্ড।

এমণ্টিলাডোর সুরাপাত্র

The Cask of Amontillado

ফর্চুনাটোর হাজার অস্ত্রাঘাত আমি সাধ্যমত সহ্য করেছি ; কিন্তু সে যখন আমায় অপমান করে বসল তখনই প্রতিজ্ঞা করলাম—প্রতিশোধ চাই। তোমরা যারা আমার স্বভাব ভাল করেই জান তারা কখনই মনে করবে না যে সে প্রতিজ্ঞাকে আমি শুধু মুখেই বলেছিলাম। শেষ পর্যন্ত প্রতিশোধ আমি নেবই—সে কথা একেবারে পাকা, কিন্তু সে কথা ঘোষণা করার ঝুঁকি তো নেওয়া যায় না। শাস্তি আমি দেবই, কিন্তু সে কাজটি করব নিজেকে মুক্ত রেখে। দোষী ব্যক্তি যদি পাল্টা প্রতিশোধ বাসনায় উজ্জীবিত হয় তাহলে সে দোষের প্রতিকার হয় না।

কাজেই বুঝতে হবে যে কথায় বা কাজে ফর্চুনাটোকে আমি এমন কোন সুযোগই দেই নি যাতে সে আমার সদিচ্ছাকে সন্দেহ করতে পারে। আমার যেমন স্বভাব, তাকে দেখলেই আমি আগের মত হাসি ; সে বুঝতেও পারে না যে এখন আমি হাসি তার বলি হবার কথা ভেবে।

অন্য সব ব্যাপারে শ্রদ্ধেয়, এমন কি ভয়ের কারণ হলেও এই ফর্চুনাটোর একটা দুর্বলতা ছিল। সুরার ভাল-মন্দ বিচারের নৈপুণ্য নিয়ে সে খুব গর্ব করত। ইতালীয়দের মধ্যে সত্যিকারের কলাবিদ সংখ্যায় অল্প। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগ মত কাজ করতেই তারা উৎসাহী—কিংবা বৃটিশ ও অস্ট্রীয় কোটিপতিদের ঠকানোর কাজে। চিত্রকলা বা মণিকার-বৃত্তিতে ফর্চুনাটো তার স্বদেশবাসীদের মতই একজন হাতুড়ে মাত্র—কিন্তু পুরনো মদের ব্যাপারে সে ঐকান্তিক। এ ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার বিশেষ মতবিরোধ নেই ; ইতালীয় সুরার ব্যাপারে আমিও একজন বিশেষজ্ঞ ; সুযোগ পেলেই সে জিনিসটা যথেষ্ট পরিমাণে কিনে ফেলি।

কার্নিভালের মরশুম তখন পুরোদমে চলছে। একদিন সন্ধ্যার আগে বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তরল পদার্থ অনেকটাই পেটে পড়েছিল ; তাই তার অভ্যর্থনায় উত্তাপ একটু বেশীই ছিল। পরণে ভাঁড়ের পোশাক। গায়ে বহুবর্ণের ডোরা-কাটা আঁটো জামা ; মাথা জুড়ে কোণ-উঁচু টুপি ও ঘন্টা। তাকে দেখে এত খুশি লাগল যে আমার মনে হল যে তার হাতটা মুচড়ে দেবার কথাটা ভাবাই উচিত হয় নি।

তাকে বললাম—"প্রিয় ফর্চুনাটো, ভাগ্যক্রমেই তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আজ তোমাকে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ! কিন্তু আমি একটা পাইপ পেয়েছি ; ওরা বলছে সেটা নাকি এমন্টিলাডো-র জিনিস। সে বিষয়ে আমার অবশ্য সন্দেহ আছে।"

সে বলল, "সে কি ? এমন্টিলাডো ? পাইপ ? অসম্ভব ! তাও কার্ণিভালের মাঝখানে।"

জবাব দিলাম, "আমিও সন্দেহ করেছি। কিন্তু কি জান, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই এমন্টিলাডোর পুরো দামটাই চুকিয়ে দিয়েছি। তোমারও দেখা পাচ্ছিলাম না, আবার ভাল জিনিসটা হাতছাড়া করতেও ভয় পেয়েছিলাম।"

“এমন্টিলাডো !”

“আমার সন্দেহ আছে।”

“এমন্টিলাডো !”

“তাদের তো খুশি করতেই হবে।”

“এমন্টিলাডো !”

“তুমি তো ব্যস্ত আছ, আর আমিও যাচ্ছি লুচেসি-র কাছে। ভাল-মন্দ বিচার করতে যদি কেউ পারে তো সেই সে লোক। তাকে বলে তো দেখি—”

“শেরী থেকে এমন্টিলাডো-র তফাৎ কি সে কথাই তো লুচেসি বলতে পারে না।

“অথচ বোকারা বলে বেড়ায় যে তার রুচি নাকি তোমারই সমগোত্রীয়।”

“এস ; চলা যাক।”

“কোথায় ?”

“তোমার সুরা-কক্ষে।”

“না হে বন্ধু ; তোমার ভালমানুষেমির সুযোগ আমি নেব না। তোমার তো একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা আছে। লুচেসি—”

“কারও সঙ্গে দেখা করার কথা আমার নেই।—চল।”

“না বন্ধু, না। দেখা করার কথা হচ্ছে না। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছি তোমার খুব সর্দি লেগেছে। ভূগর্ভ-কুঠুরি অত্যন্ত স্যাঁতসেতে হয়। সোরার পর্দা পড়ে যায় দেওয়ালের গায়।”

“তথাপি চল। সর্দি তো তুচ্ছ ব্যাপার। এমন্টিলাডো ! তোমাকে ঠকিয়েছে। আর লুচেসি,—সে তো শেরী আর এমন্টিলাডোর তফাৎই বোঝে না।”

বলতে বলতেই ফর্চুনাটো আমার হাতটা চেপে ধরল। কালো রেশমের মুখোস পরে, একটা খাটো আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে তাকে নিয়ে আমার পালাজ্জোতে হাজির হলাম।

বাড়িতে চাকরবাকর কেউ ছিল না ; তারা সুযোগ বুঝে ফূর্তি করতে বেরিয়েছে। তাদের বলে গিয়েছিলাম, আমি সকালের আগে ফিরব না ; পরিষ্কার হুকুম দিয়ে গিয়েছিলাম তারা যেন বাড়ি থেকে না বের হয়। জানতাম, আমি বেরিয়ে যাবার পরে এই হুকুমই তাদেরও হাওয়া হয়ে যাবার পক্ষে যথেষ্ট।

তাদের শামাদান থেকে দুটো জ্বলন্ত মশাল তুলে নিয়ে একটা ফর্চুনাটোকে দিলাম। তারপর তাকে নিয়ে কয়েকটা ঘর পার হয়ে ভূগর্ভ-কুঠুরির খিলানের নীচে ঢুকলাম। তাকে সতর্ক করে দিয়ে একটা লম্বা ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম ; সেও পিছন পিছন এল। শেষ পর্যন্ত একেবারে নীচে নেমে দুজনে দাঁড়ালাম মন্ট্রেসরদের সমাধিক্ষেত্রে।

বন্ধুর পা টলছে। সেই সঙ্গে টুপির ঘণ্টাগুলিও বাজছে। “পাইপটা,” সে বলল।

বললাম, “আরও আগে। কিন্তু দেওয়ালের মাকড়শার সাদা জালগুলো কেমন চক্‌চক্‌ করছে দেখ।”

আমার দিকে ঘুরে নেশায় বুঁদ হওয়া চোখে সে আমার চোখে চোখ রাখল।

শেষ পর্যন্ত শুধাল, "সোরা কি ?"

"হ্যাঁ সোরা," আমি জবাব দিলাম। "তোমার কাশিটা কবে থেকে হয়েছে ?"

"খুক ! খুক্ !—খুক্ ! খুক্ ! খুক্ ! খুক্ !—খুক ! খুক্ ! খুক্—খুক্ ! খুক্ ! খুক্ !……

বেশ কয়েক মিনিট বেচারি বন্ধুটি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। শেষে বলল, "ও কিছু না।"

আমি জোর দিয়ে বললাম, "চল ফিরে যাই ; তোমার স্বাস্থ্যের দাম অনেক বেশী। তুমি ধনী, শ্রদ্ধেয়, প্রশংসিত, প্রিয়পাত্র ; তুমি সুখী, যেমন একদা আমি ছিলাম। তোমাকে হারাতে পারি না। আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি ফিরে যাবে ; অসুস্থ হয়ে পড়বে ; সেজন্য আমি দায়ী হতে পারি না। তাছাড়া, লুচেসি রয়েছে—"

সে বলে উঠল, "খুব হয়েছে। এ কাশি অতি তুচ্ছ। এতে আমি মরব না। একটু কাশলেই আমার মরণ হবে না।"

জবাবে বললাম, "ঠিক কথা—ঠিক ; সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে অকারণে ভয় দেখাবার ইচ্ছা আমার ছিল না —কিন্তু সবরকম সতর্কতা তোমার নেওয়া দরকার। এই মেডক-সুরা এক চুমুক খেলেই আমরা ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাব।"

এই সময় ঢিবির উপরকার লম্বা এক সারি বোতলের ভিতর থেকে একটা বোতল টেনে বের করে আমি তার গলাটা ভেঙে ফেললাম।

মদটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, "খাও।"

মুখটা বেঁকিয়ে সে বোতলটাকে ঠোঁটে ছোঁয়াল। একটু থেমে অন্তরঙ্গভাবে সে আমার দিকে মাথাটা দুলিয়ে দিল। ঘণ্টাগুলি টুং-টাং করে বেজে উঠল।

সে বলল, "আমি পান করছি তাদের উদ্দেশে যারা আমাদের চারপাশে কবরে শুয়ে বিশ্রাম করছে।"

"আর আমি পান করছি তোমার দীর্ঘ জীবন কামনা করে।"

সে আবার আমার হাত ধরল। দুজন এগিয়ে চললাম।

সে বলল, "এই ভূগর্ভ-কুঠুরিগুলি বড় বেশী বিস্তৃত।"

আমি বললাম, "মন্ত্রেসরাও ছিল খুব বড়, আর পরিবারও ছিল অগুণতি।"

"তোমার হাত ধরতে ভুলে গেছি।"

"নীল মাঠে একটা মস্ত বড় মানুষের পা ; সে পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে গেল একটা সাপ ; তার ফণাটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল তার গোড়ালির নীচে।"

"নীতি-বাক্যটা কি ?"

"যে আমার ক্ষতি না করে আমাকে উত্তেজিত করে।"

"ভাল !" সে বলল।

তার দুই চোখে মদের ঝিলিক। ঘণ্টা বাজছে। মেডকের নেশায় আমার কল্পনাও উথলে উঠছে। স্তূপীকৃত হাড়ের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে ঠাসাঠাসি করে রাখা সুরাপাত্র ও পিপে পার হয়ে আমরা সমাধিক্ষেত্রের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। আবার থামলাম। এবার সাহসে ভর করে ফর্চুনাটোর হাতটা চেপে ধরলাম বগলের উপর দিয়ে।

বলল, "সোরা! দেখতে পাচ্ছ ক্রমেই বাড়ছে। প্রাচীরের গায়ে শ্যাওলার মত ঝুলে আছে। এখন আমরা আছি নদী-খাতের নীচে। উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে হাড়ের উপর। সময় থাকতে ফিরে যাই চল। তোমার কাশিটা—"

সে বলল, "ও কিছু না। এগিয়ে চল। কিন্তু তার আগে আর এক চুমুক মেডক।"

ডি গ্রাভ-এর একটা সরু মুখ বোতল ভেঙ্গে তার হাতে দিলাম। এক নিঃশ্বাসে বোতলটাকে সে খালি করে ফেলল। তীব্র আলোয় তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। হেসে উঠে বোতলটাকে এমন অঙ্গভঙ্গী করে উপরে ছুঁড়ে দিল যে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম। সেই একই অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করে সে শুধাল, "বুঝতে পারলে না?"

"না," আমি জবাব দিলাম।

"তাহলে তুমি দলের লোক নও।"

"কি রকম?"

"তুমি রাজমিস্ত্রি পরিবারের লোক নও।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," আমি বললাম।

"তুমি? অসম্ভব! রাজমিস্ত্রি?"

"আমি রাজমিস্ত্রি।"

"কোন নিদর্শন আছে?"

আলখাল্লার ভাঁজের ভিতর থেকে একটা কর্ণিক বের করে বললাম, "এটা আছে।"

কয়েক পা সরে গিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "তুমি ঠাট্টা করছ। কিন্তু এবার এমণ্টিলাডোর কাছে যাওয়া যাক।"

কর্ণিকটা আলখাল্লার ভিতরে রেখে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "তাই হোক।" সে আমার উপর খুব বেশী করে ভর দিল। এগিয়ে চললাম এমণ্টিলাডোর সন্ধানে। অনেকগুলো নীচু খিলান পার হয়ে নীচে নামলাম; আরও এগিয়ে আবার নীচে নামলাম; একটা গভীর গুহার মধ্যে ঢুকলাম; সেখানকার বাতাসে একটা দুর্গন্ধ। তাতে মশালের আলোর জোর কমে গেল।

গুহার একেবারে শেষ প্রান্তে আর একটা ছোট গুহা। তার দেওয়ালবরাবর নর-কংকাল স্তূপীকৃত হয়ে ছাদ পর্যন্ত উঠে গেছে; ঠিক যে রকমটি আছে প্যারিসের বড় সমাধিক্ষেত্রে। গুহার তিন দিক একই ভাবে সাজানো; চতুর্থ দেওয়ালের কংকালগুলি নীচে নামিয়ে রাখা হয়েছে; ফলে সেখানে একটা ছোটখাট ঢিবি গড়ে উঠেছে। কংকালগুলি সরিয়ে ফেলার ফলে সেখানকার দেওয়ালটা ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় আরও একটা ছোট গুহা চোখে

পড়ল ; সেটা চার ফুট গভীর, তিন ফুট চওড়া, ও ছ' সাত ফুট উঁচু। গুহাটা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল বলে মনে হয় না।

হাতের স্বল্প আলোয় মশালটা তুলে ধরে ফর্চুনাটো বৃথাই তার ভিতরটা ভাল করে দেখতে চেষ্টা করল। ম্লান আলো গুহার শেষ পর্যন্ত পেঁছল না।

আমি বললাম, "এগিয়ে চল। এখানেই এমণ্টিলাডো আছে। আর লুচেসি—"

স্খলিত পা ফেলে সামনে এগোতে এগোতে বন্ধু বলল, "সে তো একটি মহামুখখু।" আমিও তার পিছনে পা ফেললাম। মুহূর্তের মধ্যেই সে কুঠুরিটার শেষ প্রান্তে পেঁছি গেল, কিন্তু পাথরে পথ আটকে যাওয়ায় বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এক মুহূর্তের মধ্যেই তাকে শিকল দিয়ে সেই গ্রানিট পাথরের সঙ্গে বন্দী করে ফেললাম। দেওয়ালের গায়ে ফুট দুই দূরে পাশাপাশি দুটো আংটা লাগানো ছিল। তার একটা থেকে ঝুলে ছিল একটা ছোট শিকল, অন্যটা থেকে একটা তালা। শিকলটা তার কোমড়ে জড়িয়ে দিয়ে তালাবন্ধ করাটা তো মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের কাজ। অতি-বিস্ময়ে কোনরকম বাধা দেবার চিন্তাই তার মাথায় আসে নি। চাবিটা খুলে নিয়ে আমি পিছিয়ে এলাম।

বললাম, "দেওয়ালের গায়ে হাতটা বুলাও ; তাহলেই সোরার উপস্থিতি টের পাবে। দেওয়ালটা সত্যি খুব স্যাঁতসেতে। আবার তোমাকে মিনতি করছি, ফিরে চল। না? তাহলে তোমাকে রেখেই আমি চলে যাব। কিন্তু তার আগে সাধ্যমত তোমার দিকে মনোযোগ দেব।"

বন্ধুর বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি ; চীৎকার করে বলল, "এমণ্টিলাডো!"

আমি বললাম, "ঠিক ; এমণ্টিলাডো।"

বলতে বলতে আমি হাড়ের স্তূপ সরাবার কাজে লেগে গেলাম। কিছুটা সরাতেই পেয়ে গেলাম কিছু পরিমাণ বাড়ি তৈরীর পাথর ও চুন-সুরকি। সেই মালমশলা ও আমার কর্ণিকের সাহায্যে তাড়াতাড়ি একটা দেওয়াল গাঁথতে শুরু করলাম।

প্রথম স্তরটা গাঁথা শেষ হতেই লক্ষ্য করলাম, ফর্চুনাটোর নেশা অনেকটা কেটে গেছে। তার প্রথম নিদর্শন পেলাম কুঠুরির ভিতর থেকে একটা নীচু আর্ত ক্রন্দন কানে আসায় ; এ তো কোন মাতালের কান্না নয়। তারপরই দীর্ঘস্থায়ী একটানা নিস্তব্ধতা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরও গেঁথে ফেললাম ; তারপরই শুনতে পেলাম শিকলের প্রচণ্ড শব্দ। কয়েক মিনিট ধরে চলল সেই শব্দ। ভাল করে শুনবার জন্য কাজ বন্ধ করে হাড়ের উপর বসে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত শিকলের ঝনঝনানি বন্ধ হতেই আবার কর্ণিক হাতে নিলাম ; বিনা বাধায় পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম স্তরও গেঁথে ফেললাম। দেওয়ালটা প্রায় বুক পর্যন্ত উঠেছে। আবার থেমে গাঁথুনির উপর মশালটা তুলে ধরে ভিতরের মূর্তিটার উপর সামান্য আলো ফেললাম।

শৃংখলাবদ্ধ মূর্তিটির গলা থেকে বেরিয়ে-আসা অবিশ্রাম তীব্র আর্ত-চীৎকার যেন আমাকে সজোরে পিছনে ঠেলে দিল। অল্পক্ষণের জন্য আমি ইতস্তত করলাম, কাঁপতে লাগলাম। তরবারি কোষমুক্ত করে কুঠুরিটার ভিতর হাতড়াতে লাগলাম ; মুহূর্তের

চিন্তা আমাকে নিশ্চিত করে দিল। সমাধিগুলোর উপর হাত বুলিয়ে সন্তুষ্ট বোধ করলাম। দেওয়ালের দিকে এগিয়ে গেলাম। যে আর্তনাদ ভেসে আসছিল তার জবাব দিতে শুরু করলাম। তার কথার প্রতিধ্বনি করলাম—নতুন কথা বললাম—গলার স্বরকে আরও উঁচুতে তুললাম, জোরদার করলাম, তার গলাকে ছাপিয়ে গেলাম। ফলে এক সময় তার কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

মাঝরাত হল। আমার কাজ শেষ হয়ে এল। অষ্টম, নবম ও দশম স্তর গাঁথা শেষ হল। একাদশ ও শেষ স্তরেরও কিছুটা গাঁথা হয়ে গেল ; আর মাত্র একটা পাথর বসিয়ে পলস্তরা লাগানো বাকি। পাথরটা খুব ভারী ; অনেক চেষ্টায় সেটাকে আংশিকভাবে জায়গামত বসিয়ে দিলাম। এবার কুলুঙ্গির ভিতর থেকে ভেসে এল একটা চাপা হাসি ; আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তারপরেই শুনলাম একটা বিষণ্ণ স্বর ; বুঝতে বেশ কষ্ট হল যে সেটা মহান ফর্চুনাটোর কণ্ঠস্বর। সে স্বর বলতে লাগল—

"হা! হা! হা!—সে! সে!—খুব ভাল রসিকতাই বটে—চমৎকার রসিকতা। পালাজ্জোতে এ নিয়ে অনেক হাসাহাসি করা যাবে—সে! সে! সে!—মদের পাত্র সামনে নিয়ে—সে! সে! সে!"

"এমণ্টিলাডো!" আমি বললাম।

"সে! সে! সে!—সে! সে! সে!—হ্যাঁ, এমণ্টিলাডো কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে না? লেডি ফর্চুনাটো এবং অন্য সকলে কি পালাজ্জোতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে না? আমাদের যাওয়া দরকার।"

বললাম, "হ্যাঁ, যাওয়া তো দরকারই।"

"দেবতা মন্ত্রেসরের প্রীতির খাতিরে।"

বললাম, "হ্যাঁ, দেবতার প্রীতির খাতিরে!"

কিন্তু একটা উত্তর শোনার জন্য বৃথাই কান পেতে রইলাম। অধৈর্য হয়ে উঠলাম। চীৎকার করে ডাকলাম—

"ফর্চুনাটো!"

কোন উত্তর নেই। আবার ডাকলাম—

"ফর্চুনাটো!"

তবু উত্তর এল না। অসম্পূর্ণ দেওয়ালের ফোকর দিয়ে মশালটা ঢুকিয়ে নীচে ফেলে দিলাম। প্রত্যুত্তরে এল কেবল ঘণ্টার টুং-টাং শব্দ। আমার হৃৎপিণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ল—সমাধিক্ষেত্রটা বড় বেশী ঠাণ্ডা। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইলাম। শেষ পাথরটাকে ঠিক জায়গায় ঠেলে বসিয়ে দিলাম ; তার উপর পলস্তারা চাপালাম। নতুন গাঁথা দেওয়ালের গায়ে নতুন করে সাজিয়ে দিলাম হাড়ের পুরনো প্রাচীরটা। অর্ধশতাব্দী কাল ধরে সে সব হাড়ে কোন মানুষের হাত পড়ে নি। তারা শান্তিতে শুয়ে থাক!

মুখর হৃৎপিণ্ড

The Tell-Tale Heart

সত্যি !—বিচলিত—খুব খুব ভীষণ রকমের বিচলিত আমি হয়েছিলাম এবং এখনও আছি ; কিন্তু তোমরা কেন বলবে যে আমি পাগল ? রোগটা আমার ইন্দ্রিয়কে তীক্ষ্ণ করেছে—নষ্ট করে নি—ভোঁতা করে নি। সব চাইতে বড় কথা, আমার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়েছিল তীক্ষ্ণ ; স্বর্গ মর্তের সব কথা আমি শুনতে পেতাম। নরকের কথাও অনেক শুনতাম। তাহলে আমি পাগল হলাম কি করে ? কান পেতে শোন ! লক্ষ্য কর কত সুস্থভাবে—কত শান্তভাবে সমগ্র কাহিনীটা তোমাদের বলতে পারছি।

ধারণাটা প্রথম আমার মাথায় কেমন করে এসেছিল তা বলা শক্ত ; কিন্তু একবার মাথায় ঢুকতেই আমাকে দিনরাত তাড়া করতে লাগল। কোন বস্তু ছিল না। কোন আবেগ ছিল না। বুড়ো লোকটিকে আমি ভালবাসতাম। সে কখনও আমার কোন অন্যায় করে নি। আমাকে অপমান করে নি। তার সোনার প্রতি আমার নজর ছিল না। মনে হয়, আসল জিনিসটা তার চোখ ! হ্যাঁ, ঠিক তাই ! তার একটা চোখ ছিল শকুনের চোখের মত—একটা বিবর্ণ নীল চোখ, স্বচ্ছ আবরণে ঢাকা। সে চোখ আমার উপর পড়লেই আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেত ; তাই তো একটু একটু করে খুব ধীরে ধীরে সংকল্প করলাম বুড়ো লোকটাকে প্রাণে মারব, আর তাতেই সেই চোখের দৃষ্টি থেকে নিজেকে চিরতরে মুক্ত করতে পারব।

এটাই মূল কথা। তোমরা ধরে নিয়েছ যে আমি পাগল। পাগলরা তো কিছুই জানে না। কিন্তু তোমরা তো আমাকে দেখেছ। আর তাহলে তো নিশ্চয় দেখেছ কত বিজ্ঞের মত আমি অগ্রসর হয়েছি— কত সতর্কতার সঙ্গে—কত দূরদৃষ্টির সঙ্গে—কতখানি কপটতার সঙ্গে কাজে হাত দিয়েছি। বুড়ো মানুষটিকে মেরে ফেলবার আগের পুরো সপ্তাহটা তার প্রতি যতটা সদয় ব্যবহার করেছি সে রকমটি তো আগে কখনও করিনি। আর প্রতিটি রাতে, প্রায় মাঝ রাতে, তার দরজার সিটকিনিটা ঘুরিয়ে সেটা খুলেছি—আহা, কত আস্তে ! আর তারপরে যখন মাথাটা গলাবার মত একটা ফাঁক তৈরী করতে পারলাম তখনি সম্পূর্ণ ঢাকা একটা অন্ধকার লণ্ঠন ঢুকিয়ে দিলাম যাতে কোনরকম আলো বাইরে বের হতে না পারে, আর তারপরেই ঢুকিয়ে দিলাম আমার মাথাটা। আহা, কত বুদ্ধি খাটিয়ে যে সেটাকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম তা দেখলে তোমাদেরও হাসি পেত। মাথাটাকে ধীরে এগিয়ে দিলাম—খুব ধীরে ধীরে যাতে বুড়ো মানুষটির ঘুম ভেঙে না যায়। পুরো মাথাটাকে সেই ফোকরের মধ্যে ঢোকাতে আমার এক ঘণ্টা সময় লেগেছিল। তবে বিছানায় শোয়া অবস্থায় তাকে ঠিক মত দেখতে পাচ্ছিলাম। আহা ! —কোন পাগল কি এতটা বুদ্ধিমান হতে পারে ? আর তারপর আমার মাথাটা যখন ঘরের মধ্যে যথেষ্ট ঢুকেছে তখন খুব সতর্কভাবে লণ্ঠনটা খুলে দিলাম—আহা, কত সতর্কভাবে—সতর্ক হয়েছিলাম (কারণ কব্জাগুলি ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করেছিল)—লণ্ঠনটা ঠিক ততটা ফাঁক করেছিলাম যাতে একটিমাত্র সূক্ষ্ম আলোর রেখা শকুণ-চক্ষুটার উপর পড়ে।

দীর্ঘ সাতটি রাত ধরে এ কাজ আমি করেছিলাম—প্রতি রাতে ঠিক মাঝরাতে—কিন্তু চোখটা সব সময়ই বোজা দেখতে পেতাম। ফলে কাজটা করা অসম্ভব হল; কারণ বুড়ো লোকটি তো আমার বিরক্তির কারণ নয়, কারণ তো তার পাপ চক্ষুটা। আর প্রতিদিন সকালে দিনের আলো ফুটলে সাহসের সঙ্গে তার ঘরে ঢুকতাম, আদর করে নাম ধরে ডেকে তার সঙ্গে কথা বলতাম, জিজ্ঞাসা করতাম রাতটা সে কি ভাবে কাটিয়েছে। তাহলেই বুঝতে পারছ যে বুড়ো লোকটি প্রগাঢ় বুদ্ধির অধিকারী, কারণ সে সন্দেহ করেছিল যে প্রতি রাতে ঠিক বারোটার সময় ঘুমন্ত অবস্থায় আমি তার উপর নজর রাখতাম।

অষ্টম রাতে দরজা খোলার ব্যাপারে আমি আরও সতর্ক হলাম। ঘড়ির মিনিটের কাঁটাও আমার চাইতে দ্রুততর চলে। সে রাতের আগে আমার নিজের শক্তির—আমার বিচক্ষণতার বহর আমি নিজেই জানতাম না। জয়ের উচ্ছ্বাসকে আমি আর চেপে রাখতে পারছিলাম না। ব্যাপারটা চিন্তা কর—আমি একটু একটু করে দরজাটা খুলছি অথচ আমার গোপন কাজ বা চিন্তার কথা সে স্বপ্নেও মনে করছে না। সে কথা ভাবতেই আমি বোধ হয় একটু হেসেছিলাম; হয় তো সেটা সে শুনতে পেয়েছিল; কারণ হঠাৎ চমকে উঠে সে বিছানায় নড়ে উঠেছিল। এ অবস্থায় তোমরা ভাবতে পার যে আমি সরে এসেছিলাম—কিন্তু না। ডাকাতের ভয়ে খড়খড়ি বন্ধ করে রাখায় তার ঘর ছিল ঘন আঁধারে ঢাকা; কাজেই আমি জানতাম যে দরজা খোলার ব্যাপারটা সে দেখতে পাবে না; তাই আমি একটু একটু করে দরজাটা ঠেলতেই লাগলাম।

মাথাটা ভিতরে গলিয়ে লণ্ঠনটা খুলতে যাব এমন সময় আমার বুড়ো আঙুলে সেটার গায়ে ধাক্কা লাগল, আর বুড়ো লোকটি বিছানায় লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলে উঠল—"কে ওখানে?"

আমি তবু চুপ করে থাকলাম; কোন কথা বললাম না। একঘণ্টা ধরে একটা মাংসপেশীও নড়ালাম না; সে সময়ের মধ্যে তার শুয়ে পড়ার শব্দও কানে এল না। সে তখনও বিছানায় বসে কান পেতে ছিল; ঠিক আমি যেমন আছি রাতের পর রাত দেওয়ালের মৃত্যু-ঘড়ির দিকে কান পেতে।

তখনি সামান্য কাতরানির শব্দ শুনতে পেলাম; কোন মারাত্মক ভয়ের কাতরানি। কোন ব্যথা বা শোকের কাতরানি নয়—মোটেই না! তীব্র ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বেরিয়ে আসে যে চাপা আওয়াজ ঠিক সেই রকম। এ আওয়াজ আমার খুব চেনা। রাতের পর রাত, ঠিক মাঝরাতে সারা জগৎ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন এই আওয়াজ আমার বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে; তার ভয়ংকরতা আমার নিজের ভয়কে গভীরতর করে তোলে। তাই তো বলছি, এ আওয়াজ আমি ভালই চিনি। বুড়ো মানুষটির সেই অনুভূতিকে বুঝতে পেরে মনে মনে খুশি হলেও তার জন্য আমার করুণা হত। আমি জানি, প্রথম সামান্য শব্দটি শুনে পাশ ফিরে শোবার পর থেকেই সে জেগে থাকে। তার সেই ত্রাস দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। সে সব ত্রাসকে সে অকারণ বলেই ভাবতে চেষ্টা করত, কিন্তু পারত না। নিজেই নিজেকে

বলত—"ওটা চিমনির ভিতরকার বাতাস বই আর কিছু নয়—একটা ইঁদুর হয়তো মেঝেটা পার হচ্ছে, 'অথবা' একটা ঝিঁঝিঁ পোকা প্রথম ঝিঁ-ঝিঁ করে ডেকে উঠেছে।" হ্যাঁ, এই সব অনুমানের দ্বারা সে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করে ঃ কিন্তু বৃথাই সে চেষ্টা। সব বৃথা ; কারণ স্বয়ং যম কাছে আসতে আসতে তার কালো ছায়া ফেলেছে বৃদ্ধের সামনে, ঢেকে দিয়েছে নিজের শিকারকে। অপ্রত্যক্ষ ছায়ার সেই শোকাবহ প্রভাবের ফলেই নিজের চোখে না দেখে বা কানে না শুনেও সে যেন ঘরের মধ্যে আমার মাথাটার উপস্থিতি বুঝতে পারত।

এই ভাবে ধৈর্য ধরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও যখন তার শুয়ে পড়ার আওয়াজ শুনতে পেলাম না তখন স্থির করলাম, লণ্ঠনের ছোট ফাঁকটাকে আরও সামান্য একটু খুলে দেব। তাই করলাম—কত চুপি চুপি যে কাজটা করলাম তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত মাকড়শার জালের মত একটা সূক্ষ্ম আবছা আলোর রেখা সেই ফাঁক দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে শকুণ-চক্ষুটার উপর গিয়ে পড়ল।

চোখটা খোলা—বেশ বড় বড় করে খোলা—সে দিকে তাকিয়ে আমি ভীষণ রেগে গেলাম। পরিপূর্ণ স্পষ্টতায় দেখতে পেলাম—একঘেয়ে নীলের উপর একটা বীভৎস আবরণ ; আমার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত জমে বরফ হয়ে এল ; কিন্তু বুড়ো লোকটির মুখ বা শরীরের আর কিছুই দেখতে পেলাম না ; কারণ হয় তো বা প্রবৃত্তিবশেই আমি আলোর রশ্মিটাকে ফেলেছিলাম ঠিক সেই অভিশপ্ত স্থানটার উপরে।

আর তোমাদের বলেছি না যাকে তোমরা পাগলামি বলে ভুল করছ সেটা আমার ইন্দ্রিয়সমূহের অতি-তীক্ষ্ণতা ছাড়া আর কিছুই না ?—এখন আমি বলছি, ঠিক তখনই আমার কানে এল একটা নীচু, একঘেয়ে, দ্রুত শব্দ, ঠিক যে রকম শব্দ বের হয় তুলোয় ঢাকা কোন ঘড়ি থেকে। সে শব্দও আমার খুব চেনা। সেটা বুড়ো লোকটির হৃৎপিণ্ডের শব্দ। আমার রাগ আরও চড়ে গেল, ঠিক যে রকম চড়ে যায় সৈনিকের সাহস ঢাকের বাদ্য শুনে।

কিন্তু তবু আমি চুপ করে থাকলাম। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছি না ঃ হাতের লণ্ঠনটা নিষ্কম্প। আলোর রেখাটাকে চোখের উপর স্থির রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করলাম। ইতিমধ্যে হৃৎপিণ্ডের সেই নারকীয় ধুকপুকানি বেড়েই চলল। প্রতিমুহূর্তে সেটা দ্রুততর হচ্ছে, উচ্চতর হচ্ছে। বুড়ো লোকটির আতংক নিশ্চয় চরমে উঠেছে! আমি বলছি, সেটা উচ্চে, আরও উচ্চে উঠেছে প্রতিটি মুহূর্তে!—আমাকে ভাল করে লক্ষ্য করছ তো ? বলেছি তো, আমার স্নায়ু দুর্বল ঃ সত্যি তাই। আর এখন রাত্রির সেই শেষ লগ্নে, পুরনো বাড়িটার ভয়ংকর নিস্তব্ধতার মধ্যে, এ রকম একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আমার ভয় মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তবু, আরও কয়েক মিনিট আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম। হৃৎপিণ্ডের শব্দ তবু বেড়েই চলল। মনে হল, হৃৎপিণ্ডটা বুঝি ফেটেই যাবে। এবার একটা নতুন উদ্বেগ আমাকে পেয়ে বসল—এ শব্দ তো কোন প্রতিবেশীও শুনতে পারে! বুড়ো লোকটির সময় তো হয়ে এসেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করে লণ্ঠনটা খুলে ফেললাম ; লাফ দিয়ে পড়লাম ঘরের মধ্যে। সে একটিবার চীৎকার

করে উঠল—মাত্র একবার। মুহূর্তের মধ্যে তাকে মেঝেতে টেনে নামিয়ে ভারী বিছানাটা চাপা দিলাম তার উপরে। কাজটা এতখানি করে খুশিতে হেসে ফেললাম। কিন্তু আরও অনেক মিনিট ধরে হৃৎপিণ্ডের চাপা শব্দটা চলতে লাগল। অবশ্য তাতে আমি বিরক্ত হলাম না। শব্দটা দেওয়ালের ওপারে যেতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত সেটা থামল। বুড়ো লোকটি মারা গেল। বিছানাটা সরিয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করলাম। হ্যাঁ, সে পাথর হয়ে গেছে— মৃত্যু-কঠিন। তার বুকের উপর হাতটা রাখলাম—অনেক মিনিট ধরে রাখলাম। কোনরকম উঠা-নামা নেই। সে মরে পাথর হয়ে গেছে। তার চোখ আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না।

তোমরা যদি এখনও আমাকে পাগল মনে কর তাহলেও মৃতদেহটাকে লুকিয়ে ফেলার জন্য বুদ্ধিমানের মত আমি যে সব সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছিলাম তার বিবরণ দেবার পরে তোমরা আর তা মনে করবে না। রাত শেষ হয়ে এল। আমিও নিঃশব্দে দুত কাজ করতে লাগলাম। প্রথমে লাশটাকে খণ্ড খণ্ড করলাম। মাথা, হাত, ও পা কেটে ফেললাম।

ঘরের মেঝে থেকে তিনটে তক্তা খুলে ফেলে সব কিছু তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর তক্তাগুলিকে এত নিপুণভাবে আবার বসিয়ে দিলাম যে কোন মানুষের চোখে—এমন কি তার চোখেও—সেটা ধরা পড়বে না। ধুয়ে পরিষ্কার করার মত কিছুই ছিল না—কোন রকম দাগ নয়—রক্তের চিহ্নটুকুও নয়। খুব সতর্ক ছিলাম। একটা বালতি আনলেই সব ধরা পরে যেত—হা! হা!

সব কাজ যখন শেষ করলাম তখন চারটে বাজে—তখনও মাঝরাতের মত অন্ধকার ঘন্টা বাজতেই রাস্তার দিককার দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ হল। হাল্কা মনে নীচে নেমে গেলাম দরজা খুলতে—এখন আর আমার ভয়টা কিসের? ঘরে ঢুকল তিনজন; নিজেদের পরিচয় দিল পুলিশ অফিসার বলে। রাতের বেলায় জনৈক প্রতিবেশী একটা আর্তনাদ শুনেছে; সকলের মনে একটা অসৎ কাজের সন্দেহ জেগেছে; পুলিশ-আপিসে খবর দেওয়া হয়েছে; তাই তাদের পাঠানো হয়েছে বাড়িগুলোতে তল্লাসী করতে।

আমি হাসলাম—কিসের ভয় আমার? ভদ্রলোকদের স্বাগত জানালাম। বললাম স্বপ্নের মধ্যে আমিই আর্তনাদ করেছিলাম। বুড়ো লোকটি অনেকদিন এদেশে নেই। অফিসারদের সারা বাড়ি ঘুরিয়ে দেখালাম। তাদের খুঁজে দেখতে বললাম বেশ ভাল করে। অবশেষে তাদের নিয়ে গেলাম "তার" ঘরে। দেখালাম, তার টাকা-পয়সা নিরাপদেই আছে, কেউ হাত দেয় নি। আত্ম-বিশ্বাসের অতি উৎসাহে ঘরের মধ্যে চেয়ার নিয়ে এলাম, তাদের অনুরোধ করলাম এখানে বসেই বিশ্রাম করতে, আর পরিপূর্ণ বিজয়ের উন্মাদ হটকারিতায় নিজের চেয়ারটাকে পাতলাম ঠিক সেই জায়গাটাতে যার ঠিক নীচেই শায়িত রয়েছে আমারই শিকারের মৃতদেহ।

অফিসাররা দেখেশুনে খুশি। আমার চাল-চলনে তারা সন্তুষ্ট। আমি অসম্ভব রকমের অনায়াস-ভঙ্গী। তারা বসল, আমি খুশি মনে জবাব দিলাম, তারা নানা বিষয়ে

আলাপ করতে লাগল। কিন্তু অচিরেই আমি কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে গেলাম, মনে হল তারা এখনি চলে যাক। আমার মাথা ধরল ; কানের মধ্যে বোঁ বোঁ করতে লাগল ; তারা কিন্তু বসেই থাকল ; কথার আর শেষ নেই। কানের ভিতরকার শব্দটা স্পষ্টতর হতে লাগল ; চলতেই থাকল ; আরও স্পষ্ট হল। সে ভাবটা কাটাবার জন্য আমি আরও সহজভাবে কথা বলতে লাগলাম ; কিন্তু শব্দটা চলতেই থাকল ; স্পষ্টতাও বাড়তে লাগল—শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলাম যে শব্দটা আমার কানের মধ্যে হচ্ছে না।

কোন সন্দেহ নেই, এতক্ষণে আমি বিবর্ণ হতে শুরু করেছি ;—কিন্তু আমি একটানা কথা বলে যেতে লাগলাম আরও উঁচু গলায়। তবু শব্দটা বেড়েই চলল—আমি আর কি করতে পারতাম ? শব্দটা নীচু ও দ্রুতগতি, একটা ঘড়িকে তুলো দিয়ে ঢেকে দিলে যে রকম শব্দ হয় ঠিক তেমন। আমি হাঁপাতে লাগলাম—তবু অফিসাররা তা শুনতে পেল না। কথা বলতে লাগলাম আরও দ্রুত—আরও জোরে ; শব্দটা কিন্তু বেড়েই চলল। উঠে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ কথা নিয়ে তর্ক করলাম ; উঁচু পর্দায় গলা তুলে প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলাম ; কিন্তু শব্দটা তবু বেড়েই চলল। কেন থামছে না ? ভারী পা ফেলে মেঝেময় হাঁটতে লাগলাম—কিন্তু শব্দটা একইভাবে বাড়তে লাগল। হা ঈশ্বর ! আমি কী করি ? মুখ দিয়ে ফেনা ছুটল—পাগলের মত বকতে লাগলাম—দিব্যি গাললাম ! যে চেয়ারে বসেছিলাম সেটাকে তুলে তক্তার উপরে সশব্দে বসালাম, কিন্তু সে সব কিছুকে ছাপিয়ে শব্দটা ক্রমাগতই বাড়তে লাগল। জোরে-আরও জোরে আরও। তারা কিন্তু তখনও মনের আনন্দে কথা বলছে, হাসছে। এও কি সম্ভব যে তারা শব্দটা শুনতে পায় নি ? সর্বশক্তিমান ঈশ্বর !—না, না। তারা শুনেছে !—তারা সন্দেহ করেছে !—তারা জেনেছে !—আমার ভয় নিয়ে তারা তামাসা করছে !—আমি তাই ভেবেছিলাম ; এখনও ভাবি। কিন্তু এ যন্ত্রণার চাইতে তো অন্য সবকিছুই ভাল ছিল ! এই বিদ্রূপের চাইতে অন্য যা কিছু সবই সহনীয় ! ঐ কপট হাসি আর সইতে পারলাম না ! মনে হল, হয় চীৎকার করব ; নয়তো মরে যাব !—ঐ—আবার ! শোন ! আরও জোরে ! আরও জোরে ! আরও জোরে ! আরও জোরে !

চীৎকার করে বললাম, "শয়তানের দল ! এ কপটতার অবসান কর ! স্বীকার করছি, আমি এ কাজ করেছি ! তক্তাগুলো খুলে নাও !—এখানে, এখানে !—এই তো তার বিকট হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন !"

রু মর্গের হত্যাকাণ্ড

The Murders in the Rue Morgue

যে সব মানসিক পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণাত্মক বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে আসলে সেগুলি মোটেই বিশ্লেষণের আয়তনের মধ্যে পড়ে না। তাদের ফলাফল দেখেই আমরা তাদের বুঝতে পারি। সাধারণভাবে সেই সব মানসিক অবস্থার অধিকারীদের কাছে সেগুলি প্রচুর আনন্দের উৎস হয়েই দেখা দেয়। একজন শক্তিমান মানুষ যেমন শক্তির খেলা দেখাতে পারলেই খুশি হয়, একজন বিশ্লেষণধর্মী মানুষও তেমনি জটিলতাদূরকারী নৈতিক কাজকর্ম নিয়ে গর্ব বোধ করে। নিজের প্রতিভাকে কাজে লাগানোর সামান্য সুযোগ পেলেও সে খুশিতে ডগমগ হয়ে ওঠে। বাঁধা, হেঁয়ালি ও সাংকেতিক লিপি তার খুব প্রিয় ; সেসবের সমাধানে যতটা বুদ্ধির দরকার সাধারণ মানুষের কাছে সেটা সত্যি অসাধারণ বলেই মনে হয়। যে ভাবে সেই সব সমস্যার সমাধান সে করে তার মধ্যে সত্যি সত্যি বোধির প্রকাশটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

সমস্যা-সমাধানের এই ক্ষমতা সম্ভবত গণিতশাস্ত্রের অনুশীলনের দ্বারা যথেষ্ট বাড়ানো যায়, বিশেষ করে গণিতের সেই সর্বোচ্চ শাখা যাকে বলা হয় বিশ্লেষণ। অথচ গণনামাত্রই তো বিশ্লেষণ নয়। যেমন, একজন দাবারু অনেক হিসাব করে চলে, কিন্তু বিশ্লেষণের ধার ধারে না। তার থেকে এটাই মনে হয় যে দাবা খেলা মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে সেটাকে বড় বেশী ভুল বোঝা হয়ে থাকে। আমি কোন প্রবন্ধ লিখতে বসি নি, অনিয়মিতভাবে দেখা একটি কাহিনীর ভূমিকা রচনা করছি মাত্র; সুতরাং এই সুযোগে এ-কথাই বলব যে দাবাখেলার ব্যাপক অর্বাচীনতা অপেক্ষা অনাড়ম্বর ড্র্যাকট খেলাতেই চিন্তাশীল বুদ্ধি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। দাবা খেলায় বিভিন্ন ঘুঁটির চাল ভিন্ন রকমের হওয়ায় এবং তাদের শক্তিও নানা রকমের হওয়ায় তার জটিলতাকেই পাণ্ডিত্য বলে ভুল করা হয়। এ খেলায় মনোযোগটাই সব চাইতে বেশী দরকারি। মুহূর্তের জন্যও মনোযোগ শিথিল হলে একটা চাল হয় তো দৃষ্টি এড়িয়ে গেল, যার ফলে ঘটল সমূহ ক্ষতি বা পরাজয়। সম্ভাবিত চালগুলি শুধু যে একাধিক তাই নয়, বেশ জটিলও বটে, আর তাই বেখেয়াল হওয়ার সম্ভাবনাটাও বেশী ; ফলে দশের মধ্যে ন'টি ক্ষেত্রেই সেই দাবারুই জিতে যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অপেক্ষা যার মনোযোগশক্তি বেশী। অপর দিকে, ড্র্যাকট খেলায় প্রতিটি চাল এত বেশী দ্বিতীয়রহিত ও একক যে বেখেয়াল হবার সম্ভাবনাই সেখানে অল্প, আর মনোযোগের বদলে শ্রেষ্ঠতর ক্রীড়া-নৈপুণ্যই সেখানে জয়ের নির্ধারক হয়ে থাকে। সোজা কথায়—এমন একটা ড্র্যাকট খেলার কথা ধরা যাক যেখানে রাজার সংখ্যা চারে কমানো হল, সেখানে তো নজর এড়িয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। সেখানে তো জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে কেবলমাত্র বুদ্ধির তারতম্য দিয়ে।

দীর্ঘকাল ধরে বিচার-শক্তির উপর হুইস্ট খেলার প্রভাবের খ্যাতি প্রচলিত আছে; তীক্ষ্ণতম ধীশক্তির অধিকারী মানুষরা সে খেলায় অকারণ আনন্দ উপভোগ করে থাকে, আর দাবাকে বলে তুচ্ছ বাচাল খেলা। নিঃসন্দেহে হুইস্ট খেলার মত অন্য কোন খেলায় বিশ্লেষণ ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না। সারা খৃস্টীয় অঞ্চলের একজন শ্রেষ্ঠ দাবারু তার বেশী কিছু হয়ে উঠতে পারে না; কিন্তু হুইস্ট খেলায় যে সুদক্ষ জীবনের অন্য যে সব ক্ষেত্রে মনের সঙ্গে মনের লড়াই চলে সেখানেও জয়লাভের ক্ষমতা সে রাখে। সুদক্ষ বলতে আমি বুঝি খেলায় সেই পূর্ণতা ন্যায়-সঙ্গত সুবিধা লাভের সবগুলি উৎস যেখানে করায়ত্ত। সে উৎস শুধু সংখ্যায় অনেক নয়, নানা ধরনেরও বটে; সাধারণত মনের যে গভীর মণিকোঠায় সেগুলি সঞ্চিত থাকে সাধারণ বুদ্ধি সেখানে পৌঁছতেই পারে না।

বিশ্লেষণাত্মক শক্তিকে সরল বুদ্ধির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়; কারণ যে বিশ্লেষক সে বুদ্ধিমানও বটে। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান মানুষ প্রায়ই বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে একান্তই অক্ষম হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষক ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা উৎকল্পনা ও কল্পনার পার্থক্যের চাইতে অনেক বেশী, যদিও উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্যও যথেষ্ট। বস্তুত দেখা যায় যে, বুদ্ধিমান লোকরাই উৎকাল্পনিক হয়। আর সত্যিকারের কল্পনাশক্তি সম্পন্ন মানুষ কখনও বিশ্লেষক ভিন্ন অন্য কিছু হয় না।

যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি সেটি পাঠকের কাছে এই বক্তব্যের ভাষ্যরূপেই প্রতিভাত হবে।

১৮— সালের বসন্তকাল ও গ্রীষ্মের কতকাংশ প্যারিসে বাস করার সময় মঁসিয় সি. অগাস্ত দুপাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই যুবক ভদ্রলোকটি ছিল একটি ভাল—বস্তুত একটি বিখ্যাত পরিবারের ছেলে, কিন্তু নানা প্রতিকূল ঘটনায় সে তখন এতদূর দারিদ্র্যের মধ্যে পড়েছিল যে তার নীচেই চাপা পড়ে গিয়েছিল তার চারিত্রিক শক্তি; বাইরের জগতে চলাফেরা অথবা সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করাই সে ছেড়ে দিয়েছিল। অবশ্য উত্তমর্ণদের সৌজন্যে পৈত্রিক সম্পত্তির যৎসামান্য তখনও তার হাতে ছিল; আর তার থেকে যা আয় হত তা থেকেই যথেষ্ট টানাটানি করে জীবন-যাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি সংগ্রহ করত; আজেবাজে জিনিস নিয়ে মাথা ঘামাত না। পুঁথিপত্রই তার একমাত্র বিলাস-সামগ্রী, আর সে বস্তু প্যারিসে সহজলভ্যও বটে।

রু মঁৎমার্তারের একটা অখ্যাত গ্রন্থাগারে আমাদের প্রথম দেখা হয়েছিল। ঘটনাচক্রে দু'জন একই দুষ্প্রাপ্য ও অত্যন্ত নামকরা বইয়ের খোঁজ করায় আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও জন্মেছিল। বারে বারেই আমাদের দেখা হতে লাগল। নিজের বিষয়ে কথা বলার সময় ফরাসীরা যে রকম অতিমাত্রায় উৎসাহ বোধ করে তেমনিভাবেই নিজের ছোট পারিবারিক ইতিহাস সে আমাকে শুনিয়েছিল, আর আমিও আগ্রহভরে শুনেছিলাম। তার পড়াশুনার ব্যাপক ক্ষেত্র আমাকে বিস্মিত করেছিল। বিশেষ করে তার কল্পনার অতি-উচ্ছ্বাস ও নবীনতায় আমার অন্তরলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। আমার মনে ছিল, সেই সময় আমি প্যারিসে যে সব জিনিস খুঁজে বেড়া-

www.allbanglaboi.blogspot.com

ছিলাম সেদিক থেকে এ ধরনের একটি লোকের সাহচর্য আমার পক্ষে একটি অমূল্য সম্পদ বিশেষ ; সে কথা তাকে খোলাখুলি বলেও ফেললাম। শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল, আমি যতদিন সে শহরে কাটাব ততদিন দু'জন একসঙ্গেই বাস করব। যেহেতু আমার সাংসারিক অবস্থা তার তুলনায় কিছুটা অল্প বিপন্ন ছিল তাই বাড়ি ভাড়া করা এবং আমাদের অদ্ভুত মেজাজ অনুযায়ী তার আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করার অনুমতিটা আমিই পেয়ে গেলাম। ভাড়া করা হল একটি কাল জীর্ণ অদ্ভুতদর্শন অট্টালিকা ; কুসংস্কারবশত বাড়িটা যে দীর্ঘকাল যাবৎ পরিত্যক্ত সে খোঁজও আমরা নিলাম না ; তাছাড়া প্রায় ভেঙে পড়ার অবস্থায় উপনীত বাড়িটা ছিল কবুর্গ স্যাঁৎ জার্মেনের একটি নির্জন অঞ্চলে।

সেখানে আমাদের বাঁধাধরা দৈনিক জীবনযাত্রার বিবরণ যদি এ জগতের মানুষ জানতে পারত তাহলে আমাদের নিশ্চয় পাগল মনে করত—অবশ্য এমন পাগল যারা কারও কোন ক্ষতি করে না। আমাদের নির্জন বাস একেবারে নিখুঁত। কোন অতিথি আসত না আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আসলে আমাদের এই গোপন আস্তানার কথাটা পূর্ব পরিচিত জনদের কাছে সযত্নে গোপন রাখা হয়েছিল ; তাছাড়া অনেক কাল ধরেই দুপঁ প্যারিসের কোন খবর রাখে না, আবার প্যারিসের লোকরাও তার খোঁজ-খবর করা ছেড়ে দিয়েছে। আমরা নিজেদের নিয়েই দিন কাটাতে লাগলাম।

আমার বন্ধুটি তো নিজের খামখেয়ালের বশে (তাছাড়া একে আর কি বলতে পারি ?) এখানকার রাত নিয়ে একেবারে মেতে উঠল ; আর তার অন্য সব খেয়ালের মতই আমিও সুরসুর করে তার এই গাড্ডায় পড়ে গেলাম ; তার অদ্ভুত সব খেয়ালের পায়ে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করলাম। এই স্বর্গীয় অন্ধকার অবশ্য সব সময় আমাদের ঘিরে থাকত না, কিন্তু আমরা তার নকল উপস্থিতি তৈরী করে নিতাম। প্রথম দিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরনো বাড়ির সবগুলো ভারী জানালা আমরা বন্ধ করে দিলাম ; তীব্র গন্ধযুক্ত দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম ; তা থেকে বের হতে লাগল কেবলমাত্র ভৌতিক ও ক্ষীণ আলোর রেখা। সেই আলোর সাহায্যেই আমরা যেন স্বপ্নের মধ্যে পড়াশুনা, লেখা ও কথাবার্তা চালিয়ে যেতে লাগলাম। এই ভাবেই চলত যতক্ষণ না ঘড়িটা আমাদের জানিয়ে দিত প্রকৃত অন্ধকারের আগমন-বার্তা। তখন আমরা হাতে হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়তাম, দিনের আলোচনারই জের চালিয়ে যেতাম, এবং সেই জনাকীর্ণ শহরের উজ্জ্বল আলো ও ছায়ার ভিতর দিয়ে দূর-দূরান্তে ঘুরে ঘুরে মানসিক উত্তেজনার সেই অসীমতার সন্ধান করতাম যা মেলে একমাত্র শান্ত পর্যবেক্ষণের পথে।

সেই সব সময়ে দুপঁর মধ্যে বিশ্লেষণ-ক্ষমতার একটা বিশেষ গুণ আমার চোখে পড়ত ; তার প্রশংসা না করে পারতাম না। আরও মনে হত, সে ক্ষমতা লোককে দেখানোর জন্য না হোক অন্তত তার অনুশীলনে তার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট ; তাতে সে যে আনন্দ লাভ করে সে কথা জানাতেও সে সংকোচ বোধ করত না।

একটু মুচকি হেসে সগর্বে বলত যে অধিকাংশ মানুষই তার সম্পর্কে বুকের মধ্যে একটা জানালা পুষে রাখে এবং আমার সম্পর্কে তারা যে অনেক কিছুই জানে সেটাকে, সোজাসুজি বোঝাতেই তারা অভ্যস্ত। সেই সব মুহূর্তে তার চালচলন হয়ে উঠত নির্জীব ও বিমূর্ত; তার চোখ দুটি হয়ে উঠত শূন্য দৃষ্টি; তার কণ্ঠস্বর উঠত তিনগুণ উচ্চগ্রামে। তার সেই সময়কার অবস্থা দেখে আমার প্রায়ই মনে পড়ে যেত দ্বৈত সত্তার দার্শনিক তত্ত্বের কথা; আমি কল্পনা করতাম দুপঁর মধ্যেও বাস করে দুটো মন—একটি সৃষ্টিধর্মী, অপরটি বিশ্লেষণধর্মী।

এই সব কথা থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে আমি কোন রহস্য বা রোমাঞ্চের কথা লিখতে বসেছি। ফরাসী ভদ্রলোকটির যে বিবরণ আমি দিয়েছি সেটা কোন উত্তেজিত, হয়ত বা রোগগ্রস্ত ধীশক্তিরই ফলশ্রুতি মাত্র। কিন্তু সেই সময়ে তার কথাবার্তার স্বরূপ সব চাইতে ভাল বোঝা যাবে তার একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে।

একদিন রাতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম প্যালেস রয়েল-এর কাছাকাছি একটা লম্বা নোংরা রাস্তা ধরে। দুজনেই নিজ নিজ চিন্তায় ডুবে থাকায় অন্তত পনেরো মিনিট কেউ একটি কথাও বলি নি। হঠাৎ দুপঁ বলে উঠল:

“অত্যন্ত ছোটখাটো এই লোকটি ‘থিয়েতর দ্য ভ্যারায়েতেস’-এ গেলে যে অনেক ভাল করতে পারত সে কথা খুবই সত্যি।”

কোন কিছু চিন্তা না করেই আমি বললাম, “সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।” এক মুহূর্ত পরেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গভীর বিস্ময়ে বললাম, “দেখ দুপঁ, এটা একেবারেই আমার বুদ্ধির অতীত; অসংকোচেই বলছি যে আমি অবাক হয়ে গেছি, আমার ইন্দ্রিয়গুলিও বোধ হয় অকেজো হয়ে পড়েছে। আমি কি ভাবছিলাম সেটা জানা তোমার পক্ষে কি করে সম্ভব হল—?” কথার মাঝখানেই আমি থেমে গেলাম।

সে বলল, “চাঁতিলির কথা বলছ তো? তা থামলে কেন? তুমি তো নিজের মনকেই বলছিলে যে বেঁটে চেহারার জন্যই বিয়োগান্ত নাটকে তাকে মানায় না।

আমি ঠিক এই বিষয়টি নিয়েই চিন্তা করছিলাম। চাঁতিলি রু স্যাঁৎ ডেমিস-এর একজন প্রাক্তন মুচি; রঙ্গমঞ্চের ভূত মাথায় ঢোকায় ক্রিবিলিয়ঁ-র “জারাকেসস” নামক নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করতে নেমে যথেষ্ট গালাগালি খেয়েছে।

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, “ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বল কোন্ পন্থায়—অবশ্য যদি কোন নির্দিষ্ট পন্থা থেকে থাকে—তুমি এ ব্যাপারে আমার মনের কথাটা জানতে পারলে?”

বন্ধু উত্তর দিল, “আর সেই ফলওয়ালাই তো তোমাকে বুঝিয়েছে যে লম্বা-চওড়া চেহারার জারাকেসস-এর চরিত্রে অভিনয় করার মত দৈহিক উচ্চতা সেই মুচির-পোর মোটেই নেই।”

“ফলওয়ালা!—তুমি তো আমাকে অবাক করে দিলে—কোন ফলওয়ালাকেই আমি চিনি না।”

"এই তো পনেরো মিনিট আগে আমরা এই পথে ঢুকবার মুখেই তো একটি লোক, ছুটে এসে তোমার গায়ে পড়েছিল।"

মনে পড়ল, আমরা যখন রু সি—থেকে এই বড় রাস্তাটায় পড়ি তখনই জনৈক ফলওয়ালা একটা আপেল ভর্তি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে আমাকে ধাক্কা দিয়ে প্রায় ফেলে দিয়েছিল; কিন্তু তার সঙ্গে চাঁতিলির কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারলাম না।

দুপাঁ কখনও বাজে কথা বলে না। সে বলল, "বুঝিয়ে বলছি; আর সমস্ত ব্যাপারটা যাতে তুমি ভালভাবে বুঝতে পার সেজন্য আমাদের দুজনের কথাবার্তার শুরু থেকে ফলওয়ালার সঙ্গে তোমার ধাক্কা লাগা পর্যন্ত তোমার চিন্তার পুরো ধারাটাই আমি গোড়া থেকে পর পর বলে যাচ্ছি। এই চিন্তা-সূত্রের বড় বড় গ্রন্থিগুলো হচ্ছে—চাঁতিলি, ওরিয়ন, ড. নিকল্‌স্‌, এপিকিউরাস, স্টিরিও টমি, রাস্তার পাথর, ফলওয়ালা।"

তার কথাগুলো শুনে আমি স্বীকার করলাম যে সে ঠিক কথাই বলেছে। তখন সে আবার বলতে শুরু করল ঃ

"যতদূর মনে পড়ে, রু সি—ছেড়ে আসার ঠিক আগে আমরা ঘোড়ার বিষয়ে কথা বলছিলাম। সেটাই ছিল আমাদের আলোচনার শেষ বিষয়। পার হয়ে এই রাস্তায় পড়ার মুখে একটি ফলওয়ালা মস্ত একটা ঝুড়ি নিয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এক জায়গায় স্তূপ-করা পাথর-কুচির উপরে। একটা পাথরের টুকরোয় পা হড়কে পড়ে গিয়ে তোমার পায়ের কব্জিটা ঈষৎ মচকে গেল, তুমি বিরক্ত হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললে, পাথরের স্তূপটার দিকে তাকালে, তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলে। তখন আমি যে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে দেখেছিলাম তা কিন্তু নয়; সম্প্রতি কোন কিছুকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করাটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।

"তোমার চোখ তখনও মাটির দিকে—বিরক্ত মুখে রাস্তাটার খানা-খন্দের দিকে তাকিয়েছিলে। অবশেষে আমরা লামার্টিন নামক ছোট গলিটায় পৌঁছলাম। সে গলিটা সুন্দরভাবে বাঁধানো। তোমার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল; তোমার ঠোঁট নড়া দেখে সন্দেহমাত্র রইল না যে তুমি অস্ফুটভাবে 'স্টিরিওটমি' কথাটাই উচ্চারণ করছিলে; এ ধরনের রাস্তা বাঁধানোকে ঐ নামেই অভিহিত করা হয়। আমি জানতাম পরমাণুর কথা এবং এপিকিউরাসের মতবাদের কথা মনে না এলে তুমি স্টিরিওটমি কথাটা উচ্চারণ করতে না। তারপর খুব বেশীদিন আগের কথা নয় এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি তোমাকে বলেছিলাম এই মহান গ্রীক পণ্ডিতের অস্পষ্ট অনুমানটি কী আশ্চর্যভাবে সাম্প্রতিক নীহারিকা-তত্ত্বের দ্বারা বিশেষভাবে সমর্থিত হয়েছে। ফলে সেই মুহূর্তে তুমি যে ওরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের নীহারিকার দিকে চোখ তুলে তাকাবে সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তাই তুমি করেছিলে; আর তখনই আমি নিশ্চিত হয়েছিলাম যে তোমার চিন্তার ধাপগুলিকে আমি ঠিক ঠিক অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু গতকালের 'মিউজি'

পত্রিকায় চাঁতিলির তিক্ত সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধকার মুচি মহোদয় অভিনেতা সাজতে গিয়ে নিজের নামের যে পরিবর্তন ঘটিয়েছিল কিছুটা অপমানজনকভাবে তার উল্লেখ করতে গিয়ে একটি লাতিন পংক্তি উদ্ধৃত করেছিল। পংক্তিটি এই রকম।

Perdidit antiquum litera prima sonum. তখনই তোমাকে বলেছি যে এর মধ্যে ওঁরিয়া-এর কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং এটা তো খুবই স্পষ্ট যে ওরিয়ন ও চাঁতিলি এই দুটো শব্দকে তুমি একসঙ্গে মনে না করে পারবে না। তোমার ঠোঁটের হাসির চেহারা দেখেই আমি বলতে পারলাম যে কথা দুটিকে তুমি একসঙ্গেই স্মরণ করেছ। বেচারি মুচিটির আত্মবলিদানের কথাই তুমি ভাবছিলে। এতক্ষণ পর্যন্ত তুমি একটু উবু হয়েই হাঁটছিলে; কিন্তু এবার দেখলাম তুমি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছ। ঠিক বুঝলাম যে চাঁতিলির বেঁটে মূর্তিটার কথাই তুমি ভাবছ। আর ঠিক তখনই তোমার চিন্তায় বাধা দিয়ে বলে উঠেছিলাম যেহেতু এই লোকটি—এই চাঁতিলি—খুবই ছোটখাট দেখতে তাই 'থিয়েতর দ্য ভারায়েতেস'-এ সে আরও ভাল করতে পারত।

এর কিছুক্ষণ পরেই "গেজেৎ দ্য ত্রাইবুনো"-র একখানি সান্ধ্য সংস্করণের উপর চোখ বুলোতে বুলোতে নীচের অনুচ্ছেদটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"অসাধারণ হত্যাকাণ্ড।—আজ সকাল প্রায় তিনটের সময় পর পর ভয়ংকর আর্তনাদ শুনে কোয়ার্তিয়ের স্যাৎ রোচ-এর অধিবাসীদের ঘুম ভেঙে যায়। যতদূর মনে হয় আর্তনাদটা এসেছিল রু মর্গের একটা বাড়ির চারতলা থেকে। সেখানে বাস করত শুধু মাদাম ল' এস্পালয়ে ও তার মেয়ে মাদ্‌ময়জেল ক্যামিল ল' এস্পালয়ে। স্বাভাবিক পথে সেখানে ঢোকার বৃথা চেষ্টার পরে কিছুটা বিলম্বে শাবল দিয়ে ফটকটা ভেঙে ফেলা হয় এবং দুজন সশস্ত্র পুলিশসহ আটজন প্রতিবেশী সেখানে ঢোকে। ততক্ষণে চীৎকার থেমে গেছে; কিন্তু তারা সিঁড়ির প্রথম ধাপগুলি বেয়ে উঠবার সময়ই দুই বা ততোধিক মোটা গলার ক্রুদ্ধ বকাবকি তাদের কানে আসে; সে শব্দটা বাড়ির উপর দিক থেকেই আসছে বলে তাদের মনে হয়। সিঁড়ির দ্বিতীয় চাতালে পোঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সে সব শব্দও থেমে যায়; তারপর সব কিন্তু সম্পূর্ণ চুপচাপ। প্রবেশকারী দলটা ছড়িয়ে পড়ে এ-ঘরে ও-ঘরে ছুটতে থাকে। চারতলার একটা বড় পিছনের ঘরে পৌঁছে (দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় জোর করে ভেঙে ফেলা হয়) যে দৃশ্য তারা দেখতে পেল তাতে উপস্থিত সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়ে।

"এপার্টমেন্টটা একেবারে ছত্রখান হয়ে ছিল—ভাঙা আসবাবপত্র চারিদিকে ছড়ানো। একটিমাত্র খাট থেকে বিছানাপত্র ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে মেঝের মাঝখানে। একখানা চেয়ারের উপর পড়ে আছে রক্তমাখা ক্ষুর। অগ্নিকুণ্ডের উপরে পড়ে আছে দু' তিনটি লম্বা, ঘন, রক্তাক্ত পাকা চুলের বেণী; দেখে মনে হয় গোড়া-শুদ্ধ উপড়ে ফেলা হয়েছে। মেঝেতে পাওয়া গেছে চারটি নেপোলিয়ন (ফরাসী স্বর্ণমুদ্রা), একটি পোখরাজের দুল, তিনটে বড় রুপোর চামচ, তিনটে ছোট ধাতুর চামচ, দুটো বড় থলে ভর্তি প্রায় চার হাজার সোনার ফ্রাঁ। ঘরের এককোণে দাঁড়

করানো বুকের টানাগুলো খোলা ; দেখে মনে হয় লুট করা হয়েছে, যদিও অনেক কিছু তখনও তার মধ্যে ছিল। বিছানাপত্রের নীচে (খাটের নীচে নয়) একটা ছোট লোহার সিন্দুক পাওয়া গেছে। সেটাকে খোলা হয়েছিল, চাবিটা তখনও ঝুলছিল। কিছু পুরনো চিঠি ও বাজে কাগজ ছাড়া তার মধ্যে আর কিছুই পাওয়া যায় নি।

“মাদাম ল' এস্পালয়ের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে নি ; কিন্তু অগ্নিকুণ্ডে অস্বাভাবিক রকমের বেশী ঝুল দেখে চিমনির ভিতরটা খোঁজ করা হয়, আর (কী ভয়ংকর কথা !) মেয়ের মৃতদেহটি নীচের দিকে মাথা রাখা অবস্থায় তার ভিতর থেকে টেনে নামানো হয় ; বেশ বোঝা যায় সরু চিমনির ভিতর দিয়ে সেটাকে অনেকটা উপরে ঠেলে তুলে দেওয়া হয়েছিল। মৃতদেহটা তখনও বেশ গরম ছিল। সেটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল অনেক জায়গায় ছাল-চামড়া উঠে গেছে ; যে রকম জোর করে সেটাকে উপরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এবং নামানো হয়েছে এগুলি যে তারই ফল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুখময় অনেক গভীর কাটা দাগ, কালসিটে পড়া গলায় আঙুলের নখের গভীর ক্ষত ; মনে হয় মৃত মেয়েটিকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে।

“বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আর কিছু না পেয়ে দলটা চলে যায় বাড়ির পিছনকার একটি ছোট বাঁধানো উঠোনে, আর সেখানেই পাওয়া যায় বৃদ্ধ মহিলার মৃতদেহ ; গলাটা সম্পূর্ণ কাটা ; সেটাকে ধরে তুলবার চেষ্টা করতেই মাথাটা নীচে পড়ে গেল। মাথাসহ দেহটাকে ভীষণভাবে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে—দেহটার বিকৃতি এত বেশী ঘটানো হয়েছে যে সেটাকে মানুষের দেহ বলেই চেনা যাচ্ছে না।

“আমাদের বিশ্বাস, এই ভয়ংকর রহস্যের কোন সূত্রই এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।”

পর দিনের কাগজে এই সব অতিরিক্ত বিবরণ পাওয়া গেল।

“ রু মর্গের শোকাবহ ঘটনা। এই অতি-অসাধারণ ও ভয়ংকর ব্যাপার নিয়ে আরও অনেক লোককে পরীক্ষা করা হয়েছে, কিন্তু এই ঘটনার উপর আলোকপাত করার মত কিছুই পাওয়া যায় নি। যে সব সাক্ষ্য প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে নীচে আমরা সেগুলি তুলে ধরলাম।

“ধোবিখানার মালিক পলিন দুবুর্গ সাক্ষাতে বলেছেন মৃত দুজনকেই সে তিন বছর ধরে চেনে ; এই সময়টা সে তাদের সব পোশাকপত্তর ধুয়েছে। বৃদ্ধা মহিলা ও তার মেয়ের মধ্যে বেশ সদ্ভাবই ছিল—একে অপরকে খুব ভালবাসত। টাকা-পয়সার ব্যাপারেও তারা চমৎকার। তাদের জীবনযাত্রা বা আয়-উপার্জনের ব্যাপারে সে কিছু বলতে পারে না। তাদের অনেক টাকা আছে বলে শুনেছে। কাপড়-চোপড় আনতে বা ফেরত দিতে সে বাড়িতে গিয়ে কখনও কোন অপর লোককে দেখে নি। তাদের যে কোন চাকর ছিল না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। চারতলা ছাড়া বাড়ির অন্য কোথাও কোন আসবাব ছিল বলে সে মনে করে না।

“তামাক-বিক্রেতা পিয়ের মরো তার সাক্ষীতে বলেছে, প্রায় চার বছর ধরে সে মাদাম ল' এস্পালায়াকে অল্প পরিমাণে তামাক ও নস্যি বিক্রি করেছে। কাছাকাছিতেই সে জন্মেছে আর সেখানেই আগাগোড়া বাস করছে। যে বাড়িতে মৃতদেহ দুটি পাওয়া

গেছে মৃতা ও তার মেয়ে দু বছরের বেশী সে বাড়িতে বাস করছে। আগে ও বাড়িতে একজন স্বর্ণকার থাকত ; সে নানা জনকে উপরের ঘরগুলো ভাড়া দিত। বাড়িটা মাদাম ল-র সম্পত্তি। তাই তার বাড়ি নিয়ে ভাড়াটের এই অপব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে সে নিজেই বাড়িতে উঠে এল ; আর ভাড়া দিতে রাজী হল না। বৃদ্ধা মহিলাটি একটু ছেলেমানুষ ছিল। গত দু' বছরে সাক্ষী মেয়েটিকে দেখেছে মাত্র পাঁচ-ছ' বার। দু'জনই অতিমাত্রায় অবসর জীবন যাপন করত—তাদের যথেষ্ট অর্থ ছিল বলে শোনা যায়। সাক্ষী প্রতিবেশীদের মুখে শুনেছে যে মাদাম ল' সম্পদের কথা ফলাও করে বলত—কিন্তু সে তা বিশ্বাস করে না। বৃদ্ধা মহিলা ও তার মেয়ে ছাড়া আর কোন মানুষকে সে ও বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকতে দেখে নি ; একদিন বা দুদিন কুলিকে ঢুকতে দেখেছে ; আর একজন চিকিৎসককে দেখেছে আট দশ দিন।

"আরও অনেক প্রতিবেশী ঐ একই সাক্ষী দিয়েছে। কেউই সে বাড়িতে যাতায়াত করার কথা বলে নি। মাদাম ল' ও তার মেয়ের মধ্যে কোনরকম ঘনিষ্ঠতা ছিল কি না তাও কেউ জানে না। সামনের দিককার জানালার খড়খড়ি কদাচিৎ খোলা হত। চারতলার পিছন দিককার বড় ঘরটা ছাড়া অন্য সব পিছনের জানালাও সব সময় বন্ধ থাকত। বাড়িটা ভালই ছিল—খুব পুরনো নয়।

"সশস্ত্র পুলিশ ইসিদোর মুসেৎ তার সাক্ষ্যে বলেছে, সকাল তিনটের সময় তাকে ও-বাড়িতে ডাকা হয় ; ফটকে বিশ-ত্রিশটি লোককে দেখতে পায় বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। শেষ পর্যন্ত বেয়নেট দিয়ে ফটক খোলা হয়—শাবল দিয়ে নয়। ফটক খুলতে বেশী কষ্ট হয় নি, কারণ ফটকটা ছিল দোভাঁজ করা, আর নীচে বা উপরে কোন খিল ছিল না। ফটক না খোলা পর্যন্ত আর্তনাদ চলছিল—তার পরই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। যন্ত্রণাকাতর কোন মানুষের বা অনেকের আর্তনাদ বলেই মনে হচ্ছিল—বেশ জোরালো ও একটানা আর্তনাদ, সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত নয়। সাক্ষীই সকলের আগে আগে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যায়। প্রথম চাতাল থেকেই দুটো গলার জোরালো ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ শুনতে পায়—একটি গলা কর্কশ, অপরটি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ—একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। প্রথম কণ্ঠ জনৈক ফরাসীর ; তার কয়েকটা শব্দ সে ধরতে পেরেছিল। সে কণ্ঠ যে কোন স্ত্রীলোকের নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। Sacre ও Diable শব্দ দুটি ধরতে পেরেছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী কোন বিদেশী। সেটা পুরুষের কি নারীর কণ্ঠস্বর তা নিশ্চয় করে বলতে পারে না। তার বক্তব্যও সে বুঝতে পারে নি, 'তবে তার বিশ্বাস ভাষাটা স্প্যানিশ। ঘর ও মৃতদেহ দুটোর যে বর্ণনা সাক্ষী দিয়েছে সেটা আমাদের গতকালের বর্ণনার অনুরূপ।

"প্রতিবেশী আঁরি দুভাল পেশায় একজন রৌপ্যকার ; সে সাক্ষ্যে বলেছে, যে দলটি প্রথম বাড়িতে ঢুকেছিল সে তাদের অন্যতম। মোটামুটিভাবে মুসেৎ-এর বক্তব্যকেই সে সমর্থন করেছে। ভিতরে ঢুকেই তারা দরজাটা আবার বন্ধ করে দিয়েছিল যাতে শেষ রাত সত্ত্বেও দ্রুত সমবেত ভিড়ে ভিতরে ঢুকতে না পারে। এ সাক্ষীর মতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের অধিকারী একজন ইতালীয়। ফরাসী যে নয় সে

বিষয়ে সে নিশ্চিত। সেটা যে পুরুষের কণ্ঠ সে বিষয়েও সে নিশ্চিত নয়। নারীকণ্ঠও হতে পারে। ইতালীয় ভাষার সঙ্গে তার পরিচয় নেই। কথাগুলি ধরতে পারে নি, তবে কথা বলার ভঙ্গী থেকে তার স্থির বিশ্বাস যে বক্তা একজন ইতালীয়। মাদাম ল' ও তার মেয়েকে সে চিনত। প্রায়শই তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর যে মৃত দুজনের কারও নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত।

"—রেস্তোরাঁর মালিক ওদেন হাইমার। এই সাক্ষী স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দিতে এসেছিল। ফরাসী বলতে পারে না বলে একজন দো-ভাষীর মাধ্যমে তার সাক্ষ্য নেওয়া হয়। আমস্টারডামের অধিবাসী। আর্তনাদের সময় বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আর্তনাদ বেশ কয়েক মিনিট ধরে চলছিল—হয় তো দশ মিনিট। আর্তনাদ ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও জোরালো—খুব ভয়াবহ ও দুঃখদায়ক। যারা বাড়ির ভিতর ঢুকেছিল সে তাদেরই একজন। একটি ছাড়া অন্য সব বিষয়ে পূর্বেকার সাক্ষ্য সে সমর্থন করে। তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বর যে একজন পুরুষের—একজন ফরাসীর সে বিষয়ে নিশ্চিত। উচ্চারিত কথাগুলি ধরতে পারে নি। কথাগুলি ছিল জোরালো ও দ্রুত—অসমান—বলা হয়েছিল ভয়ে ও রাগে। কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ—যত না তীক্ষ্ন তার চাইতে বেশী কর্কশ। তীক্ষ্ন স্বরও বলে নি। কর্কশ কণ্ঠস্বর বার বার উচ্চারণ করেছে 'Sacre' 'diable আর একবার mon Dieu.

"রু দেলোরাঁ-র মিগনো এৎ ফিলস্ ফার্মের ব্যাংকার জুলে মিগনো। সেই বড় মিগনো। মাদাম ল' এস্পানায়ের কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল। —সালের বসন্তকালে (আট বছর আগে) তার ব্যাংকে একটা হিসাব খুলেছিল। মাঝে মাঝে অল্প কিছু টাকা জমা দিত। মৃত্যুর তিন দিন আগে স্বয়ং এসে ৪,000 ফ্রাঁ তুলে নিয়েছিল। টাকাটা দেওয়া হয়েছিল সোনায়, আর তা নিয়ে একজন কেরানিকে বাড়িতে পাঠানো হয়েছিল।

"মিগনো এৎ ফিলস্-এর কেরানি এদলফ্ লে বোঁ তার সাক্ষ্যে বলেছে, সেদিন দুপুরে দুটো থলেতে ৪,000 ফ্রাঁ নিয়ে মাদাম ল' এস্পানায়ের সঙ্গে সে তার বাসভবনে গিয়েছিল। দরজা খোলা হলে মাদাম জেল ল' নিজে বেরিয়ে এসে তার হাত থেকে একটা থলে নেয় এবং অপর থলেটি নেয় বৃদ্ধা মহিলাটি। তারপর সে অভিবাদন করে চলে আসে। সে সময় রাস্তায় কোন লোক দেখে নি। সেটা একটা উপ-পথ—খুব নির্জন।

"দর্জি উইলিয়াম বার্ড তার সাক্ষ্যে বলেছে, যারা প্রথম বাড়িটাতে ঢুকেছিল সে তাদের অন্যতম। একজন ইংরেজ। দু'বছর হল প্যারিসে আছে। প্রথম যারা সিঁড়ি দিয়ে উঠেছিল সে তাদেরও অন্যতম। বাদানুবাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিল। কর্কশ কণ্ঠস্বর জনৈক ফরাসীর। কথাগুলি বুঝতে পেরেছিল, এখন স্মরণ করতে পারছে না। পরিষ্কার শুনেছে 'Sacre' ও 'Mon Dieu' সেই মুহূর্তে এমন একটা আওয়াজ হয়েছিল যেন কয়েকজন ধ্বস্তাধস্তি করছে—ঘষাঘষি ও হুড়োহুড়ির শব্দ। তীক্ষ্ন কণ্ঠস্বরটি ছিল খুবই জোরালো—কর্কশ কণ্ঠস্বর অপেক্ষা জোরালো।

সেটা যে কোন ইংরেজের গলা নয় সে বিষয়ে নিশ্চিত। জার্মান বলে মনে হয়েছিল। নিশ্চয় কোন স্ত্রীলোকের গলা। সে জার্মান জানে না।

"উপরে উল্লেখিত সাক্ষীদের মধ্যে চারজনকে আবার ডাকা হলে তারা বলে যে, মাদ্‌ময়জেল এল,-এর মৃতদেহ যে ঘরে পাওয়া যায় সে ঘরে পোঁছে তারা দেখতে পায় ঘরের দরজা ভিতর থেকে তালাবন্ধ। সব কিছু সম্পূর্ণ চুপচাপ—কোন আর্তনাদ বা আওয়াজ শোনা যায় নি। দরজা ভেঙে কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পিছনের ও সামনের ঘরের সব জানালা নামানো ছিল এবং ভিতর থেকে শক্ত করে আটকানো ছিল। দুটি ঘরের মাঝখানের দরজাটা বন্ধ ছিল, কিন্তু তালা দেওয়া ছিল না। সামনের ঘর থেকে বারান্দায় যাবার দরজাটা তালা দেওয়া ছিল, আর চাবিটা ছিল ভিতরে। চারতলার বাড়ির সামনের দিকে বারান্দার মাথায় ছোট ঘরটা খোলা ছিল, দরজাও ছিল সপাটে খোলা। ঘরটাতে ডাঁই করা ছিল পুরনো বিছানা, বাক্স প্রভৃতি। সেগুলি ভাল করে সরিয়ে তল্লাস করা হয়েছিল। বাড়ির এক ইঞ্চি জায়গাও কড়া তল্লাসীর হাত থেকে রেহাই পায় নি। চিমনিগুলোর উপর-নীচে ঝাড়ু চালানো হয়েছিল। বাড়িটা চারতলা, তার উপরে একটা চিলে কোঠা। ছাদের চাপ-দরজাটাকে ধীরেসুস্থে পেরেক চালিয়ে নামানো হয়েছিল—বেশ কিছু বছর সেটা যে খোলা হয় নি তা বোঝা গিয়েছিল। তর্কাতর্কির শব্দ কানে আসা এবং ঘরের দরজা ভাঙার মধ্যে সময়ের ব্যবধান কতটা ছিল সে সম্পর্কে সাক্ষীরা নানারকম কথা বলে। কেউ বলল তিন মিনিট,—কেউ বা পাঁচ মিনিট। দরজাটা খুলতে বেশ কষ্ট করতে হয়েছিল।

"মুর্দাফরাস আল্‌ফন্‌জো গার্চিও তার সাক্ষ্যে বলে, সে রু মর্গেই থাকে। স্পেনের অধিবাসী। যারা বাড়িতে ঢুকেছিল তাদের একজন। সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠে নি। স্নায়ু দুর্বল, তাই উত্তেজনার ফল নিয়ে ভয় ছিল মনে। বিতর্কের আওয়াজ শুনেছিল। কর্কশ শব্দটা কোন ফরাসীর। কথাগুলি বুঝতে পারে নি। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর একজন ইংরেজের—সে বিষয়ে নিশ্চিত। ইংরেজি ভাষা জানে না, কিন্তু উচ্চারণ থেকে ধরতে পারে।

"রুটিওয়ালা আল্‌বের্তো মঁতানি বলেছে, প্রথম যারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠেছিল সে তাদের একজন। আলোচ্য কণ্ঠস্বরগুলি সে শুনেছে। কর্কশ গলাটি একজন ফরাসীর। কয়েকটি কথা ধরতে পেরেছিল। বক্তা কোন কিছুর প্রতিবাদ করছে বলে মনে হয়েছিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের কথাগুলি বুঝতে পারে নি। খুব দ্রুত আর অসমান ভাবে কথা বলছিল। একজন রুশের গলা বলে মনে হয়। প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই সমর্থন করে। নিজে ইতালীয়। কোন রুশের সঙ্গে কখনও কথা বলে নি।

"দ্বিতীয়বার সাক্ষ্য দিতে গিয়ে কয়েকজন সাক্ষী জানায় চারতলার সবগুলো ঘরের চিমনিই এত সরু যে তার ভিতর দিয়ে কোন মানুষ গলে যেতে পারে না। চিমনি পরিষ্কার করার ঝাড়ন দিয়ে বাড়ির প্রতিটি চিমনি আগাগোড়া খুঁচিয়ে দেখা হয়েছে। বাইরের লোক যখন সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে সেই সুযোগে কেউ অন্য পথে পালিয়ে যেতে পারে এমন কোন গুপ্ত পথও বাড়িতে নেই। মাদ্‌ময়জেল ল' এস্পানায়ের

মৃতদেহটা এমনভাবে চিমনির সাথে আটকে গিয়েছিল যে চার-পাঁচজন একসঙ্গে টেনে তবে তাকে নীচে নামিয়েছিল।

'চিকিৎসক পল দুমা তার সাক্ষ্যে বলেছে, মৃতদেহ দেখার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল ভোরবেলা। যে ঘরে মাদ্‌ময়জেল ল'-কে পাওয়া গিয়েছে সেই ঘরের খাটের উপরেই তখন মৃতদেহ দুটি শোয়ানো ছিল। তরুণীর দেহের অনেক ছাল-চামড়া উঠে গিয়েছিল। দেহটাকে যে চিমনির ভিতর দিয়ে জোর করে ঠেলে তুলে দেওয়া হয়েছিল তার ফলেই এটা ঘটেছিল। গলায় অনেক ঘষ্টানির দাগ ছিল। থুতনির ঠিক নীচে কয়েকটা গভীর ক্ষত ছিল ; তাছাড়া বেশ কিছু কালসিটে দেখেই বোঝা যায় সেগুলি আঙুলের দাগ। মুখটা খুবই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আর চোখের মণিও ঠেলে বেরিয়ে পড়েছিল। দাঁত লেগে জিভও কিছুটা কেটে গিয়েছিল। পাকস্থলীর উপর ছড়ে যাওয়ার একটা বড় দাগ দেখে মনে হয় হাঁটু দিয়ে চেপে ধরার ফলেই দাগটা হয়েছে। ম. দুমার মতে, কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ তাকে গলা টিপে মেরেছিল। মায়ের দেহটা ভীষণভাবে বিকৃত করা হয়েছিল। ডান পা ও বাহুর সবগুলি হাড়ই অল্প-বিস্তর গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল। বাঁ পায়ের হাড় এবং বাঁ দিকের সবগুলি পাঁজরই ভেঙে গিয়েছিল। গোটা দেহই ভীষণভাবে কেটে ছড়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। সে সব ক্ষত কি ভাবে হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। কোন অত্যন্ত শক্তিধর পুরুষ কাঠের ভারী মুগুর অথবা চওড়া লোহার দণ্ড—একটা চেয়ার—ইত্যাদি যেকোন ভারী বড় অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেই এ ধরনের ক্ষত হতে পারে। কোন নারী কোন রকম অস্ত্র দিয়েই এত জোরে আঘাত করতে পারে না। সাক্ষী যখন দেখে তখন মৃতের মাথাটা দেহকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল ; খুব থেঁতলে ভেঙেও গিয়েছিল। গলাটা কাটা হয়েছিল অত্যন্ত ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে—হয়তো কোন ক্ষুর দিয়ে।

''সার্জন আলেকজান্দার এতিয়েনকে ডাকা হয়েছিল এম. দুমা-র সঙ্গেই মৃতদেহ দুটি দেখার জন্য। এম. দুমা-র সাক্ষ্য ও মতামতকেই সে সমর্থন করে।

“আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছু জানা যায় নি। সব দিক থেকেই এত বেশী রহস্যপূর্ণ ও জটিল হত্যাকাণ্ড আগে কখনও প্যারিসে সংঘটিত হয় নি, অবশ্য এটা যদি মোটেই হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে। এ ধরনের একটা অস্বাভাবিক ঘটনায় পুলিশ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কোন সূত্রের ছায়া পর্যন্ত চোখে পড়ে নি।”

সংবাদপত্রটির সান্ধ্য সংস্করণে বলা হয়েছে, কায়োর্তিয়ের সাঁৎ রোচ-এ এখনও প্রচণ্ড উত্তেজনা রয়েছে—আলোচ্য বাড়িটিতে পুনরায় বেশ সতর্কতার সঙ্গে তল্লাসী চালানো হয়েছে ; সাক্ষীদেরও নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। অবশ্য পুনশ্চতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ দলফ্ লি বোঁকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়েছে—অবশ্য উল্লিখিত বিবরণ ছাড়া এমন কিছু পাওয়া যায় নি যাতে তাকে এ ব্যাপারে জড়ানো যায়।

এ ব্যাপারে দুপাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে বলে মনে হয়—অন্তত তার হাবভাব দেখে আমার তাই মনে হচ্ছে, কারণ সে কোন মন্তব্যই করছে না। লি বোঁ-র কারারুদ্ধ হবার

কথা ঘোষিত হবার পরেই সে সর্বপ্রথম এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চায়।

এই হত্যাকাণ্ড দুটিকে সমাধানের অতীত রহস্য বলে মনে করার ব্যাপারে সারা প্যারিসের সঙ্গে আমি একমত। এ খুনের সূত্র খোঁজার কোন পথই আমার চোখে পড়ে নি।

দুপঁ বলল, "এই সব তদন্তের খোলস মাত্র দেখে সে পথের বিচার করা ঠিক হবে না। প্যারিসের পুলিশের তীক্ষ্নবুদ্ধি নিয়ে অনেক কথা বলা হয়ে থাকে, তারা চতুর বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাৎক্ষণিক পদ্ধতি ছাড়া তাদের কার্যকলাপের মধ্যে অন্য কোন পদ্ধতিই চোখে পড়ে না। নানা ব্যবস্থার একটা বিরাট প্রদর্শনী তারা খুলে ফেলে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে উদ্দেশ্য সাধনের দিক থেকে সেগুলি সুপ্রযুক্ত নয়। যে সব ফল তার লাভ করে অনেক সময়ই সেগুলি চমকপ্রদ হয়ে থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ফল লাভ ঘটে সহজ পরিশ্রম ও কাজকর্মের দ্বারা। এই গুণগুলি যেখানে থাকে না সেখানেই তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। এই হত্যাকান্ড দুটির ব্যাপারে পুলিশ সম্পর্কে কোন কথা বলার আগে এস আমরা নিজেরাই কিছুটা তদন্ত করে দেখি। তাতে খানিকটা মজা পাওয়া যাবে; তাছাড়া এক সময় লি বোঁ আমার একটা উপকার করেছিল যার জন্য তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। চল না সেখানে গিয়ে নিজেদের চোখেই বাড়িটা দেখে আসি। পুলিশের প্রিফেক্ট জি—আমার পরিচিত; প্রয়োজনীয় অনুমতি পেতে কোন অসুবিধা হবে না।"

অনুমতি পাওয়া গেল, আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে রু মর্গ যাত্রা করলাম। রু রিচল্যু এবং রু স্যাঁং রোচ-এর মাঝখানে যে সব শোচনীয় রাস্তা আছে এটি তাদেরই অন্যতম। সেখানে যখন পৌঁছুলাম তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে; আমাদের বাসস্থান থেকে জায়গাটা অনেক দূরে। বাড়িটা সহজেই পাওয়া গেল, কারণ রাস্তার বিপরীত দিক থেকে অনেক লোকই তখনও উদ্দেশ্যহীন কৌতূহলবশত বাড়িটার বন্ধ খড়খড়ির দিকে তাকিয়ে ছিল। প্যারিসের সাধারণ একটা বাড়ি; একটা ফটক আছে, একপাশে ঘসা-কাঁচের একটা পাহারা—ছবি; তার জানালায় একটা ঠেলা—ঢাকনা। ভিতরে ঢোকার আগে আমরা রাস্তাটা ধরে এগিয়ে একটা গলিতে ঢুকলাম এবং আর একবার মোড় ঘুরে বাড়িটার পিছনে চলে গেলাম—ইতিমধ্যে দুপঁ বাড়িটাসহ গোটা অঞ্চলকে এত বেশী মনোযোগসহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল যেটা আমার কাছে অকারণ বলেই মনে হল।

উল্টো দিকে হেঁটে আমরা আবার বাড়িটার সম্মুখে হাজির ছিলাম, ঘণ্টা বাজালাম, এবং আমাদের পরিচয়-পত্র দেখে ভারপ্রাপ্ত লোকরা আমাদের ভিতরে ঢুকতে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সেই ঘরটাতে ঢুকলাম যেখানে মাদ্‌ময়জেল এল. এস্পানায়ের দেহটা পাওয়া গিয়েছিল, এবং যেখানে দুটো মৃতদেহও তখন পর্যন্ত শোয়ানো ছিল। ঘরের বিশৃংখল অবস্থাটা তখনও যথারীতি বজায় রাখা ছিল। "গেজেৎ দ্য ত্রিবিড নো"-তে যা প্রকাশিত হয়েছিল তার বেশী কিছু আমি দেখতে পেলাম না। দুপঁ সব কিছু খুঁটিয়ে দেখল—মৃতদেহ দুটিও বাদ গেল না। তারপর পেলাম অন্য

সব ঘরে এবং উঠোনে। একজন সশস্ত্র পুলিশ আগাগোড়া আমাদের সঙ্গে থাকল। অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত তদন্ত চালিয়ে আমরা বিদায় নিলাম। বাড়ি ফিরবার পথে আমার সঙ্গীটি এক মুহূর্তের জন্য একটি দৈনিক পত্রিকার কার্যালয়ে ঢুকেছিল।

আগেই বলেছি, আমার বন্ধুর নানারকম 'খামখেয়াল আছে।' এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে পরদিন দুপুরের আগে কোন আলোচনা না করাটাই এখন তার মর্জিতে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, ঘটনার স্থলে বিশেষ কিছু আমি লক্ষ্য করেছি কি না।

"বিশেষ কথাটার উপর সে এত বেশী জোর দিল যে অকারণেই আমি শিউরে উঠলাম।

বললাম, "না, বিশেষ কিছুই তো চোখে পড়ে নি; অন্তত খবরের কাগজে যা পড়েছি তার বেশী কিছু তো নয়ই।"

সে বলল, "ব্যাপারটার অসাধারণ আতংকের দিকটাতে "গেজেৎ' মোটেই যায় নি। কিন্তু ওসব ছাপানো কাগজের অলস কথাবার্তা ছেড়ে দাও। আমার তো মনে হয়, ঠিক যে কারণে এই রহস্যটাকে সহজ সমাধানযোগ্য বলে মনে করা উচিত ঠিক সেই কারণেই এটাকে সমাধানের অতীত বলে ভাবা হচ্ছে। হত্যার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের অতি নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্যের আপাত অভাব দেখেই পুলিশ বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। তাছাড়া, বাদানুবাদ প্রসঙ্গে দ্রুত বিভিন্ন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিহত মাদ্‌মেয়জেল ল' এস্পানায়ে ভিন্ন অপর কাউকে উপরতলায় না দেখতে পাওয়া এবং যারা উপরে উঠেছিল তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ না থাকার ঘটনাগুলিকে মেলাবার আপাত অসম্ভবতাই পুলিশকে আরও বেশী বিচলিত করেছে। ঘরটির অত্যন্ত বিশৃংখল অবস্থা; মৃতদেহটাকে মাথা নীচে রেখে চিমনি দিয়ে উপরে ঠেলে দেওয়া; বৃদ্ধ মহিলার দেহটাকে ভয়ংকরভাবে বিকৃত করা, এবং আরও অনেক কিছু ঘটনা একত্রিত হয়ে সরকারী কর্তাদের ঢক্কানিনাদিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে একেবারেই ধরাশায়ী করে ফেলেছে। অস্বাভাবিককে দুর্বোধ্যতার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলার সাধারণ ভুলের ফাঁদেই তারা পা দিয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ স্তর থেকে সরে যেতে পারলে তবেই বুদ্ধিবৃত্তি সত্যের পথ খুঁজে পায়। বস্তুত, এই রহস্যটি পুলিশের চোখে যতখানি সমাধানের অতীত বলে প্রতিভাত হয়েছে ঠিক ততখানি সাবলীলতার সঙ্গেই আমি তার সমাধানে পৌঁছতে পারব, অথবা পৌঁছে গেছি।"

মূক বিস্ময়ে আমি বক্তার দিকে তাকালাম।

আমাদের এপার্টমেণ্টের দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলেই চলল, "আমি এখন এমন একটি লোকের জন্য অপেক্ষা করছি যে এই সব জঘন্য খুনের নায়ক না হলেও কোন না কোন ভাবে তার সঙ্গে জড়িত। হতে পারে যে এই সব অপরাধের সব চাইতে খারাপ অংশের ব্যাপারে সে নির্দোষ। আমি আশা করছি আমার এই অনুমানটি নির্ভুল, কারণ এর উপর ভিত্তি করেই সম্পূর্ণ গোলকধাঁধাটাকে আমি দেখতে চেষ্টা করছি। এখানে—এই ঘরে যে কোন মুহূর্তে তাকে দেখতে পাব বলে আশা করছি। সে হয় তো নাও আসতে পারে; কিন্তু তার আসার সম্ভাবনাই বেশী। যদি সে এসে

www.boighar.blogspot.com

পড়ে তাহলে তাকে এখানে আটকে রাখাটা দরকার হবে। এই দেখ দুটো পিস্তল; প্রয়োজনের সময় কিভাবে এগুলি ব্যবহার করতে হয় তা আমরা দুজনেই জানি।"

কি করছি না বুঝেই, অথবা যা কানে এল তা বিশ্বাস করেই আমি পিস্তল দুটো তুলে নিলাম। অনেকটা স্বগতোক্তির মতই দুপঁ কথা বলতে লাগল। আগেই বলেছি, এই সব মুহূর্তে সে যেন কেমন নৈর্ব্যক্তিক হয়ে ওঠে। আমাকে উদ্দেশ্য করেই সে কথাগুলি বলল, কিন্তু খুব উঁচু গলায় না হলেও এমনভাবে সে কথা বলতে লাগল যেন অনেক দূরের কাউকে বলছে। তার শূন্য দৃষ্টি দেওয়ালের দিকে নিবদ্ধ।

সে বলতে লাগল, "সিঁড়ির উপর থেকেই আগন্তুক দলটি বাদানুবাদে রত যে সব গলা শুনতে পেয়েছিল তা যে মহিলা দুটির নয় সে কথা গৃহীত সাক্ষ্যের দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। বৃদ্ধ মহিলাটি আগে মেয়েকে মেরে ফেলে পরে আত্মহত্যা করেছে কিনা এ সন্দেহ যদি কারও মনে এসেও থাকে তো এ থেকেই সেটার নিরসন হয়ে যাবে। তদন্ত-পদ্ধতির খাতিরেই আমি এ কথাটার উল্লেখ করছি; কারণ মেয়ের মৃতদেহটা যে অবস্থায় চিমনির ভিতর পাওয়া গিয়েছিল সেভাবে ওটাকে ঠেলে দেবার মত যথেষ্ট শক্তি মাদাম ল' এস্পানায়ের থাকার কথা নয়; আবার তার নিজের দেহে যে ধরনের সব ক্ষত-চিহ্ন দেখা গেছে তাতেও আত্মহত্যার ধারণাটা সম্পূর্ণ বাতিল হয়েই যায়। তাহলে খুনটা হয়েছে কোন তৃতীয় পক্ষের দ্বারা; আর এই তৃতীয় পক্ষের নানা জনের কন্ঠস্বরই শোনা গিয়েছিল বাদানুবাদের সময়ে। এবার আমি ফিরে যাব—এইসব কন্ঠস্বর প্রসঙ্গে সাক্ষীদের কাছ থেকে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে সেদিকে নয়—কিন্তু তার ভিতরকার কোন বিশেষ কিছুর দিকে। এ ব্যাপারে কোন বিশেষ কিছু কি তুমি লক্ষ্য করেছ?"

আমি বললাম, কর্কশ গলাটি একজন ফরাসীর এ বিষয়ে সব সাক্ষী একমত হলেও তীক্ষ্ম গলাটির বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট মতভেদ আছে।

দুপঁ বলল, "ওটা সাক্ষ্যের কথা হল, আমি বলছি সাক্ষ্যের বিশিষ্ট কিছুর কথা। তুমি বিশেষ কিছু লক্ষ্য কর নি। অথচ লক্ষ্য করার মত কিছু ছিল। তুমিই বললে, কর্কশ গলাটি সম্পর্কে সাক্ষীরা সকলে একমত; এখানে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু তীক্ষ্ম গলাটির ব্যাপারে একটা বিশেষত্ব হল—তারা যে এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করে সেটা নয়—ইতালীয় হোক, ইংরেজ হোক, স্পেনীয় হোক, ওলন্দাজ হোক, আর ফরাসী হোক, তার বিবরণ দিতে গিয়ে প্রত্যেকেই বলেছে যে সেটা একজন বিদেশীর গলা। সে কণ্ঠস্বর যে তার দেশের কোন মানুষের নয় সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। প্রত্যেকেই বলেছে সে-কন্ঠস্বর এমন কোন ব্যক্তির নয় যার দেশের ভাষার সঙ্গে সে পরিচিত—বরং তার উল্টো। ফরাসী লোকটি মনে করে সেটা কোন স্পেনীয়র কন্ঠ; 'স্প্যানিশ ভাষা জানা থাকলে তার কিছু কিছু কথা সে বুঝতে পারত।' ওলন্দাজটির মতে সেটা কোন ফরাসীর কন্ঠস্বর; কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সাক্ষ্যে বলা হয়েছে 'ফরাসী জানে না বলে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে একজন দোভাষীর মারফৎ।' ইংরেজটির ধারণা কন্ঠস্বর একজন জার্মানের আর সে 'জার্মান ভাষা বোঝে না।' স্পেনীয় লোকটি 'নিশ্চিত যে সে একজন ইংরেজ, কিন্তু সেটা সে ধরতে

পেরেছে তার বাকভঙ্গী থেকে, 'কারণ ইংরেজি ভাষা সে মোটেই জানে না।' ইতালীয়টির বিশ্বাস যে সেটা একজন রুশের কন্ঠস্বর, কিন্তু 'সে আগে কখনও রুশ দেশের কোন লোকের সঙ্গেই কথা বলে নি।' দ্বিতীয় ফরাসীটি কিন্তু প্রথম জনের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে নিশ্চিতভাবে বলেছে যে কন্ঠস্বরটি একজন ইতালীয়ের। তাহলে সেই কন্ঠস্বরটি কতদূর অদ্ভুত ধরনের অসাধারণ ছিল যাতে এ ধরনের সাক্ষ্য পাওয়া যেতে পারে!—এমনই তার বাচন-ভঙ্গী যে ইউরোপের পাঁচটি বৃহৎ ভূখণ্ডের অধিবাসী তার মধ্যে পরিচিত কিছুই খুঁজে পেল না। তুমি বলবে যে সেটা একজন এশিয়াবাসী বা আফ্রিকাবাসীর কন্ঠস্বর হতে পারে। এশিয়াবাসী বা আফ্রিকাবাসীরা গন্ডায় গন্ডায় প্যারিসে বাস করে না; কিন্তু তোমার সে অনুমানকে অস্বীকার না করেই তিনটি বিষয়ের প্রতি তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছি। একজন সাক্ষী বলেছে, কন্ঠস্বরটি 'যত না তীক্ষ্ন তার চাইতে বেশী কর্কশ।' অপর দু'জন বলেছে 'সেটা দ্রুত ও অসমান।' কোন কথা—অথবা কথার অনুরূপ আওয়াজকেই—কোন সাক্ষী বোধগম্য বলে উল্লেখ করে নি।"

দুপাঁ বলেই চলল, "আমি জানি না এতক্ষণে তোমার বোধশক্তির উপর কতখানি প্রভাব আমি বিস্তার করতে পেরেছি; কিন্তু এ কথা আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, গৃহীত সাক্ষ্যের এই অংশটুকু—কর্কশ ও তীক্ষ্ন কন্ঠস্বর বিষয়ক অংশ—থেকেই যে ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় সেটাই এমন সন্দেহ সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট যার দ্বারা এই রহস্যের বাকি তদন্তের গতি পরিচালিত হতে পারে। 'ন্যায়ানুগ সিদ্ধান্তের" কথা বললাম বটে, কিন্তু আমার বক্তব্যটা তাতে পুরোপুরি প্রকাশিত হয় নি। আমি বলতে চাই যে এটাই একমাত্র সঙ্গত সিদ্ধান্ত, আর সন্দেহটা তার থেকে অনিবার্যভাবেই উদিত হয়। অবশ্য সে সন্দেহটা যে কি তা আমি এখনই বলব না। আমি কেবল চাই যে আমার সঙ্গে তুমিও একথাটা মনে রেখো যে এই সন্দেহই ঐ ঘরে বাকি তদন্তের ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট আকার—একটা সুস্পষ্ট গতি—দেবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

"এবার চল, কল্পনায় আমরা একবার এই ঘরটাতে চলে যাই। এখানে প্রথমে কি খুঁজব? খুনীরা কোন পথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? বলাই বাহুল্য যে আমরা কেউই অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস করি না। মাদাম ও মাদ্‌ময়জেল ল' এস্পানায়ে নিশ্চয় কোন প্রেতাত্মার হাতে খুন হয় নি। এ কাজ যারা করেছে তারা বাস্তব মানুষ আর বাস্তব পথেই পালিয়েছে। কিন্তু কেমন করে? সৌভাগ্যবশত এ বিষয়ে মাত্র একটি যুক্তির পথই খোলা আছে, আর সেই পথ ধরেই আমরা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।—বাড়ি থেকে বের হবার সম্ভাবিত পথগুলি একে একে বিচার করে দেখা যাক। এটা পরিষ্কার যে বহিরাগত দলটি যখন সিঁড়ি বেয়ে ওঠে তখন খুনীরা সেই ঘরেই ছিল যেখানে মাদ্‌ময়জেল ল' এস্পানায়েকে পাওয়া যায় অথবা ছিল তার সংলগ্ন ঘরটিতে। তাহলে কেবলমাত্র এই দুটো ঘর থেকেই পালাবার পথ খুঁজে বের করতে হবে। পুলিশ মেঝে ও সিলিং খুলে ফেলেছে; সব দিককার দেওয়ালের পলস্তরা খসিয়েছে। কোন গুপ্ত পথ তাদের চোখে পড়ে নি। তবু তাদের চোখের উপর ভরসা না করে আমি নিজের চোখে সে সব পরীক্ষা করেছি। তাহলে কোন

গুপ্ত পথ সেখানে নেই। ঘর থেকে বারান্দায় যাবার দুটো দরজাই ভিতর থেকে তালাবন্ধ ছিল। এবার চিমনির দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। সেগুলি অগ্নিকুন্ড থেকে আট-দশ ফুট পর্যন্ত সাধারণ ব্যাসের হলেও গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তার ভিতর দিয়ে একটা বড় বিড়ালের দেহও গলে যেতে পারে না। এসব পথে তাদের বেরিয়ে যাওয়া যখন একেবারেই অসম্ভব, তখন বাকি রইল কেবল জানালাগুলো। রাস্তার ভিড়ে চোখ এড়িয়ে সামনের দিককার জানালা দিয়ে কেউ পালিয়ে যেতে পারে না। তাহলে খুনীরা নিশ্চয় পিছনের ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখন আমরা যখন একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি তখন যুক্তিবাদী হিসাবে আপাত অসম্ভবতার কারণে তাকে আমরা বাতিল করতে পারি না। তাই আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে এই সব আপাত 'অসম্ভবগুলি' বাস্তবে তা নয়।

“ঘরে জানালা আছে দুটো। তার একটি আসবাবপত্রে ঢাকা পড়ে নি, পুরোটাই দেখা যায়। অপরটির নীচের অংশটা খুব কাছাকাছি বসানো বড় খাটটার মাথায় ঢাকা পড়ে দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেছে। প্রথম জানালাটাকে ভিতর থেকে ভালভাবে আটকানো অবস্থায়ই দেখা গেছে। অনেক জোর দিয়ে চেষ্টা করেও সেটা তোলা যায় নি। তার ফ্রেমের বাঁদিকে ভ্রমর দিয়ে একটা বড় ছিদ্র করে একটা বড় শক্ত পেরেক তার মধ্যে সম্পূর্ণ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপর জানালাটাকে পরীক্ষা করেও দেখা গেল তাতেও অনুরূপভাবে একটা পেরেক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে; সেটাকে তুলবার যথেষ্ট চেষ্টা করেও কোন লাভ হয় নি। অতএব পুলিশ সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে সে পথে কেউ বেরিয়ে যায় নি। সুতরাং অপ্রয়োজন মনে করে পেরেক তুলে জানালা দুটি খুলে দেওয়া হয়েছে।

“আমার নিজের পরীক্ষাটা আর একটু বিশেষ ধরনের। তার কারণ আমি জানতাম যে এক্ষেত্রে যা কিছু আপাত অসম্ভব তাকেই বাস্তবে তা নয় বলে প্রমাণ করতে হবে।

“আমি এই ভাবেই চিন্তা শুরু করলাম—অভিজ্ঞতাভিত্তিক ভাবে। খুনীরা যে কোন একটা জানালা দিয়েই পালিয়েছিল। তা হয়ে থাকলে তো তারা ভিতর থেকে পাল্লাটা আবার আটকাতে পারত না; এ কথা ভেবেই পুলিশের তদন্ত এখানেই থেমে গেছে। অথচ সেগুলিকে আটকানো অবস্থায়ই পাওয়া গেছে। তাহলে নিশ্চয় সেগুলি নিজে থেকেই বন্ধ হবার ক্ষমতা রাখে। এ সিদ্ধান্তে না এলে কোন উপায় নেই। আ-ঢাকা জানালাটার কাছে গিয়ে একটু কষ্ট করে পেরেকটা তুলে শার্সিটা তুলতে চেষ্টা করলাম। যেমন ভেবেছিলাম আমার সব চেষ্টাই বিফল হল। আমি জানতাম একটা গুপ্ত স্প্রিং কোথাও নিশ্চয় আছে। একটু যত্ন করে খুঁজতেই গুপ্ত স্প্রিংটাকে পাওয়া গেল। সেটাতে চাপ দিতেই শার্সিটা উঠে গেল।

“তখন পেরেকটাকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলাম। একটা লোক জানালা দিয়ে বেরিয়ে আবার সেটাকে বন্ধ করে দিতে পারে; স্প্রিংটাও ঠিকমত কাজ করবে;—কিন্তু পেরেকটাকে তো আবার জায়গামত বসাতে পারবে না। সিদ্ধান্তটা পরিষ্কার; আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র আরও সংকীর্ণ হয়ে গেল। খুনীরা নিশ্চয় অপর জানালাটা দিয়ে পালিয়েছে। তাহলে যদি ধরে নেওয়া যায় যে দুটো

শার্সির স্প্রিংই একরকম, সেটা হওয়াই স্বাভাবিক, তাহলে পেরেক দুটোর মধ্যে নিশ্চয় কোন পার্থক্য থাকবে; অন্তত তাদের আটকাবার পদ্ধতিতে তো বটেই। খাটের গদির উপর উঠে দ্বিতীয় জানালাটাকে ভাল করে দেখলাম। মাথার দিককার বোর্ডের পিছনে মাথা ঢোকাতেই স্প্রিংটা দেখতে পেয়ে চাপ দিলাম; যেমন ভেবেছিলাম এ স্প্রিংটাও পাশেরটারই অনুরূপ। এবার পেরেকটার দিকে তাকালাম। অপরটার মতই মোটা এবং আপাতদৃষ্টিতে একই ভাবে বসানো—প্রায় মাথা পর্যন্ত ঢোকানো।

“তুমি বলবে, আমি হতভম্ব হয়েছিলাম; কিন্তু তা মনে করে থাকলে তুমি আমার অনুমানের স্বরূপটাকেই ভুল বুঝেছ। আমি কোনরকম ভুল করি নি। মুহূর্তের জন্যও ঘ্রাণটাকে হারিয়ে ফেলি নি। শৃংখলের কোথাও কোন ত্রুটি ছিল না। গোপন কথাটাকে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করেছি,—আর তারই ফলশ্রুতি হল পেরেকটা। আমি বলছি, সেটা দেখতে সব দিক থেকেই অপর জানালার পেরেকটির মত; কিন্তু এখানে এসেই সূত্রটা শেষ হয়েছে এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে এই মিলটাই সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমি বললাম, ‘পেরেকটার ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু ভুল হয়েছে’; পেরেকটার উপর হাত রাখলাম; আর পেরেকটার পৌনে এক ইঞ্চিসহ মাথাটা আমার আঙুলের সঙ্গে উঠে এল। পেরেকের বাকি অংশটা ভেঙে গিয়ে ভ্রমরের ছিদ্রটার মধ্যেই থেকে গেল। ভেঙে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরনো (কারণ ভাঙা জায়গাতে মরচে ধরে গিয়েছিল), আর সেটা ঘটানো হয়েছিল একটা হাতুড়ির আঘাতে; সেই আঘাতের ফলেই পেরেকের মাথাটা শার্সির নীচের দিকে বসে গিয়েছিল। এবার আমি পেরেকের মাথাটাকে আবার ভাঙা জায়গাটার উপর বসিয়ে দিলাম; সেটা দেখতে হল একটা আস্ত পেরেকের মত—ভাঙার দাগটা দেখাই গেল না। স্প্রিংটাতে চাপ দিয়ে শার্সিটাকে কয়েক ইঞ্চি তুলে ধরলাম; পেরেকের মাথাটাও ঠিক মত বসে থেকে শার্সিটার সঙ্গেই উঠে গেল। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম; পুরো পেরেকের চেহারার সঙ্গে মিলটা আবার সম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল।

“এ পর্যন্ত গোলক ধাঁধার সমাধান হয়ে গেল। বিছানার উপরকার জানালা দিয়েই খুনী পালিয়েছিল। সে চলে যাওয়া মাত্রই নিজের থেকেই বন্ধ হয়ে যাক অথবা কেউ ইচ্ছা করেই বন্ধ করে দিক, জানালাটা স্প্রিং-য়ের চাপে আটকে যায়। পুলিশ এই স্প্রিংটাকেই পেরেক বলে ভুল করে, আর তাই তদন্ত কার্যটা আর বেশীদূর চালানোটাকেই অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।

“এবার ঘরের ভিতরে যাওয়া যাক। সেখানকার অবস্থাটা ভাল করে দেখা যাক। বলা হয়েছে যে বুরোর টানাগুলো লুট করা হয়েছিল, যদিও তার ভিতরে তখনও অনেক গয়নাগাটি পড়ে ছিল। এই অনুমানটিই অবাস্তব। এটা নেহাৎই অনুমান—খুব বাজে অনুমান—তার বেশী কিছু নয়। টানার ভিতরে যে সব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে কেবলমাত্র সেইগুলিই সে গোড়া থেকেই সেখানে ছিল না সেটা আমরা জানব কেমন করে? মাদাম ল’ এস্পানায়ে ও তার মেয়ে সম্পূর্ণ নির্জন জীবন যাপন করত—কারও সঙ্গে দেখা করত না—কদাচিৎ বাইরে বের হত—বারে বারে পোশাক-পরিচ্ছদ বদলাবার কোন প্রয়োজনই হত না। যে সব জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলি

বেশ উঁচু দরের এবং এই মহিলাদের উপযোগীও বটে। কোন চোর যদি কিছু চুরিই করবে তাহলে সব চাইতে সেরা জিনিস চুরি করল না কেন—সব কিছুই নিয়ে গেল না কেন? এক কথায়, চার হাজার ফ্রাঁ পরিমাণ সোনা ফেলে রেখে চোর কেবল এক বাণ্ডিল পোশাক চুরি করে নিজেকে বিপন্ন করল কেন? সোনাটা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্যাংকার মঁসিয় মিগনো যে পরিমাণ সোনার কথা উল্লেখ করেছে তার সবটাই থলেভর্তি অবস্থায় মেঝের উপর পাওয়া গেছে। অতএব সাক্ষ্যের যে অংশ বাড়ির দরজায় এসে টাকা দিয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে তার থেকে পুলিশের মস্তিষ্কে খুনের উদ্দেশ্যের যে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়েছে—আমার ইচ্ছা সেটাকে তুমি চিন্তা থেকে বাতিল করে দাও। টাকাটা দিয়ে যাবার তিন দিনের মধ্যে খুন হয়ে যাওয়ার চাইতে দশগুণ বেশী উল্লেখযোগ্য ঘটনার যোগাযোগ আমাদের জীবনে অহরহ ঘটে থাকে, কিন্তু সেদিকে আমরা তিলমাত্র মনোযোগ ফিরাই না। বর্তমান ক্ষেত্রে যদি সোনাটা লুট হয়ে যেত তাহলে তিন দিন আগে সেটা আদায় দেওয়ার ব্যাপারটাকে নেহাৎই যোগাযোগের বেশী কিছু বলেই ধরে নেওয়া যেত। সেটা খুনের উদ্দেশ্যের পরিপূরক বলেই বিবেচিত হত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাস্তব অবস্থা যা দেখা যাচ্ছে তাতে যদি সোনাটাকেই অপরাধের উদ্দেশ্য বলে ধরা হয় তাহলে তো আমাদের এটাও কল্পনা করতে হয় যে খুনী এমনি একটি অস্থিরমতি নির্বোধ যে সে একই সঙ্গে সোনা ও উদ্দেশ্যকে পরিত্যাগ করেছে।

সেই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর, কর্মসমাধানের অসাধারণ ক্ষিপ্রতা, এবং এ ধরনের একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পিছনে কোনরকম উদ্দেশ্যের অভাব—এই সব বিষয়গুলি স্থিরচিত্তে মনে রেখে এবার এই হত্যাকাণ্ডের দিকেই মনোযোগ ফেরানো যাক। এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি নারীকে গলা টিপে হত্যা করে মাথাটা নীচের দিকে রেখে তাকে চিমনি দিয়ে উপরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ খুনীরা এই পদ্ধতিতে খুন করে না। এভাবে মৃতদেহ পাচার করার কথাতো তাদের ক্ষেত্রে ওঠেই না। তুমিও স্বীকার করবে মৃতদেহটাকে যে ভাবে চিমনির ভিতর দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এমন কিছু আছে যেটা অতিমাত্রায় কষ্ট কল্পিত—যাকে মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মের সঙ্গে কিছুতেই মেলানো যায় না তা সে মানুষ যতই নীচ প্রবৃত্তির হোক না কেন। আরও ভেবে দেখ, যে সব চিমনির ভিতর থেকে মৃতদেহটাকে টেনে নামাতে কয়েকটি মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসের দরকার হয়েছে সেটাকে ওখানে ঢুকিয়ে দিতে কতখানি দৈহিক শক্তির দরকার হয়েছিল!

“এবার বিস্ময়কর শক্তি প্রয়োগের অপর নিদর্শকগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাও। অগ্নিকাণ্ডের উপর পাওয়া গেছে মানুষের পাকা চুলের মোটা—খুবই মোটা কয়েকটা বিনুনি। সেগুলোকে মূলশুদ্ধু উপড়ে আনা হয়েছিল। এভাবে কারও মাথা থেকে বিশ বা ত্রিশটা চুল একসঙ্গে ছিঁড়ে নিতে যে কত বেশী শক্তির দরকার হয় সেটা তুমি বোঝ। সে সব বেণী তুমিও দেখেছ, আমিও দেখেছি। তাদের গোড়াগুলিতে (সে দৃশ্য বীভৎস!) টুকরো টুকরো মাংস লেগেছিল—একসঙ্গে প্রায় পাঁচ লক্ষ চুল উপড়ে ফেলতে কী যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয় সেটা তো তারই এক নিশ্চিত

নিদর্শক। বৃদ্ধ মহিলার শুধু যে গলাটি কাটা হয়েছে তাই নয়, তার মাথাটাকে দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ঃ সেজন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র একখানি ক্ষুর। এই সব কাজের পাশবিক হিংস্রতাকে একটু লক্ষ্য কর। মাদাম ল'এস্পানায়ের দেহে যে সব ছড়ে যাওয়ার দাগ ছিল সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। মঁসিয় দুমা ও তার যোগ্য সহকর্মী মঁসিয় ইতিয়েন বলেছে যে সেগুলি করা হয়েছে কোন ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে ; এ পর্যন্ত তারা ঠিকই বলেছে। সেই ভোঁতা অস্ত্রটা স্পষ্টতই নীচের পাথরে-বাঁধানো উঠোন ; বিছানার উপরকার জানালা দিয়ে মহিলাটি তো তার উপরেই পড়েছিল। এ-কথাটা এখন খুব সরল মনে হলেও পুলিশের দৃষ্টিকে এড়িয়ে গেছে।

“এবার এই সব কিছু ছাড়াও ঘরের একান্ত বিশৃংখল অবস্থার কথা তুমি ভালভাবেই চিন্তা করেছ, আর আমরা তার সঙ্গে যোগ করেছি বিস্ময়কর কর্মক্ষমতা, অতিমানবিক দৈহিক শক্তি, পাশবিক হিংস্রতা, উদ্দেশ্যবিহীন খুন, সম্পূর্ণ অমানবিক, এবং এমন একটি কণ্ঠস্বর যা বহুজাতির মানুষের কানেই বিদেশী শুনিয়েছে, যার মধ্যে কোন রকম স্পষ্ট বা অর্থবহ শব্দই ছিল না। তার ফল কি দাঁড়িয়েছে ? তোমার কল্পনার উপর আমি কি ছবি আঁকতে পেরেছি ?”

দুপঁ যখন এই প্রশ্ন আমাকে করল তখন আমার শরীরের মাংস যেন শিউরে উঠল। বলে উঠলাম, “এ কাজ করেছে কোন পাগল—নিকটবর্তী Maison de Sante থেকে পালিয়ে-আসা কোন বদ্ধ পাগল।”

সে জবাবে বলল, “তোমার ধারণা একেবারে অবান্তর নয়। কিন্তু সিঁড়ি থেকে যে অদ্ভুত কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল তীব্রতম আক্ষেপের সময়ও কোন পাগলের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তা মেলে না। পাগলও তো কোন না কোন জাতির মানুষ ; তার ভাষা যত অসংলগ্নই হোক তার মধ্যে প্রচলিত শব্দগুলি তো থাকবেই। তাছাড়া, কোন পাগলের চুলই আমার হাতের এই চুলের মত হয় না। এই ছোট চুলের গুচ্ছটি আমি ছাড়িয়ে এনেছি মাদাম ল' এস্পানায়ের অত্যন্ত শক্ত মুঠিবদ্ধ আঙুলের ভিতর থেকে। এগুলি সম্পর্কে তোমার কি বক্তব্য বল।”

একান্ত বিহ্বলভাবে বললাম, “দুপঁ ! এ চুল তো সাধারণ চুল নয়—মানুষের চুলই নয়।”

সে বলল, “আমি তো বলি নি যে এটা মানুষের চুল ; কিন্তু এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার আগে আমার ইচ্ছা আমার নিজের হাতে আঁকা এই রেখাচিত্রটির উপর তুমি একবার চোখ বুলিয়ে নাও। গৃহীত সাক্ষ্যের এক জায়গায় যাকে একবার বর্ণনা করা হয়েছে মাদ্‌ময়জেল ল' এস্পানয়ের গলার উপরকার থেঁতলে যাওয়ার দরুণ কালো দাগ এবং নখের গভীর আঁচড় বলে, আবার বলা হয়েছে ‘স্পষ্টতই আঙুলের চাপের দরুন অনেকগুলি কালসিটে দাগ, এটা তারই অবিকল নকসামাত্র।”

সামনের টেবিলের উপর কাগজখানাকে মেলে ধরে বন্ধুটি বলতে লাগল, “দেখলেই বুঝতে পারবে যে এই ছবি থেকে একটা দৃঢ় ও অনড় মুঠির ধারণা ফুটে বেরিয়েছে। পিছলে যাবার কোন লক্ষণই নেই। প্রতিটি আঙুল গোড়াতেই যে ভাবে চেপে

বসেছিল একেবারে শেষ পর্যন্ত—সম্ভবত আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত—সেই ভয়ংকর মুষ্টিকে সে অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। এবার প্রতিটি ছাপের উপর তোমার সবগুলি আঙুলকে একসঙ্গে রাখার একটা চেষ্টা করে দেখ।”

চেষ্টাটা করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা।

সে আবার বলল, “আমরা হয় তো সঠিকভাবে কাজটা করছি না। এখানে কাগজটা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে একটা সমতল ভূমির উপরে ; কিন্তু মানুষের গলা তো গোলাকৃতি। এই দেখ একখণ্ড কাঠ যার বেড়টা মানুষের গলার মতই। রেখাচিত্রটাকে এটার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে আবার চেষ্টা করে দেখ।”

তাই করলাম ; কিন্তু আগের থেকেও ব্যাপারটা আরও শক্ত। বললাম, “এটা কোন মানুষের হাতের ছাপই নয়।”

দুপঁ বলল, “কুভিয়ের-এর লেখা এই অংশটা এবার পড়।”

পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বৃহদাকার কটা রংয়ের ওরাং-ওটাং—শারীর-সংস্থানসহ একটা সাধারণ বিবরণ সেটা। এই সব স্তন্যপায়ী জীবের প্রকাণ্ড শরীর, অসাধারণ শক্তি ও কর্মক্ষমতা, বন্য হিংস্রতা ও অনুকরণ-প্রিয়তার কথা সর্বজনবিদিত। সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য হত্যাকাণ্ডের ভয়ংকরতাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

পড়া শেষ করে বললাম, “আঙুলের বিবরণ তো হুবহু এই নকসারই অনুরূপ। আমি তো দেখতেই পাচ্ছি, আঁচড়ের যে সব ছাপ তুমি এঁকেছ সেগুলি ওরাং-ওটাং ছাড়া অপর কোন প্রাণীর দ্বারা সম্ভব হত না। কটা রংয়ের চুলের গুচ্ছও কুভিয়ের বর্ণিত প্রাণীরই অনুরূপ। কিন্তু এই ভয়াবহ হত্যা-রহস্যের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি সঠিক বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, বিতর্করত দুটি কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল, আর তার একটি যে জনৈক ফরাসীর গলার স্বর সেটাও তো সন্দেহাতীত।”

“ঠিক কথা ; এই কণ্ঠস্বরের যে বিবরণ সাথীরা দিয়েছে তার মধ্যে একটি কথা তো সকলেই উল্লেখ করেছে—কথাটা হচ্ছে ‘mon Dieu’ ! একজন সাক্ষী আমার শব্দ দুটিকে অনুযোগ বা আপত্তি প্রকাশের ভাষা বলে উল্লেখ করেছে। সুতরাং এই রহস্যের পূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে আমার সব আশাকে এই দুটি শব্দের উপরেই গড়ে তুলেছি। একজন ফরাসী খুনের কথাটা জেনেছিল। সম্ভবত এই রক্তাক্ত ব্যাপারটার সঙ্গে সে মোটেই জড়িত ছিল না। এমনও হতে পারে যে ওরাং-ওটাংটা তার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল। হয়তো সেটাকে অনুসরণ করেই সে ঘরটাতে ঢুকেছিল। কিন্তু তার পর যে হুলুস্থুলু কাণ্ড ঘটে গেল তখন আর জন্তুটাকে গ্রেপ্তার করা তার পক্ষে সম্ভবই হয় নি। কিন্তু এ নিয়ে আর বেশী কথা আমি বলব না—বলার অধিকারও আমার নেই—কারণ যুক্তিটা আমার কাছেই যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয়। এটাকে বড়জোর একটা নিছক অনুমান বলা যেতে পারে। আলোচ্য ফরাসী লোকটি যদি আমার অনুমানমত সত্যি এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নির্দোষ হয়ে থাকে, তাহলে তো কাল রাতে বাড়ি ফেরার পথে যে বিজ্ঞাপনটি আমি জাহাজ চলাচল সংক্রান্ত সংবাদপত্র ‘লে মোঁদে’-তে প্রকাশের জন্য তার কার্যালয়ে দিয়ে এসেছি সেটা দেখেই সে আমাদের বাসায় এসে হাজির হবে।

সে একটুকরো কাগজ আমার হাতে দিল ; আমি সেটা পড়লাম ঃ

ধরা পড়েছে—বয় দ্য বুলোন-এ এ মাসের—তারিখে খুব সকালে বোর্ণিও শ্রেণীর একটি খুব বড় কটা রংয়ের ওরাং-ওটাং। উপযুক্ত প্রমাণ দেখিয়ে এবং সেটার গ্রেপ্তার ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাবদ যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত করে মালিক (মাল্টাগামী জাহাজের নাবিক বলে জানা গেছে) সেটাকে নিয়ে যেতে পারে। তাকে নং—, রু—, ফবুর্গ স্যাঁৎ জার্মেন এই ঠিকানায় দেখা করতে বলা হচ্ছে।

আমি শুধালাম, "সে লোকটি যে একজন নাবিক এবং মাল্টাগামী জাহাজের যাত্রী সেটা তুমি জানলে কেমন করে ?"

দুপঁ বলল, "মোটেই জানি না। নিশ্চিতও নই। অবশ্য এই যে একটুকরো ফিতে দেখছ এর আকার ও তেলচিটে অবস্থা দেখেই বোঝা যায় যে এটা নির্ঘাৎ ব্যবহৃত হয়েছে কোন নাবিকের লম্বা পরচুলা বাঁধার কাজে। তার উপর এতে যে গিঁটটা রয়েছে সে রকম গিঁট নাবিকরা ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা বাঁধতে পারে না ; আর মাল্টাবাসীদেরই এরা খুব প্রিয়। তদন্ত চালাবার সময় বাড়ি সংলগ্ন একটা বজ্র-বারণ দণ্ডের নীচে এটা কুড়িয়ে পেয়েছি। এটা নিশ্চয়ই মৃত দুজনের কারও নয়। এখন আমার এই অনুমান যদি ভুল হয়েই থাকে তাহলে তো কারও কিছু যায় আসে না। বড় জোর আমার এই ভুল ধরতে পেরে সে লোকটি হয় তো খোঁজ করতে আসবেই না। কিন্তু আমার অনুমান যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে তো মস্ত লাভ হবে। নির্দোষ হলেও খুনের ব্যাপারটা জানে বলে ফরাসীটি বিজ্ঞাপনের ডাকে সাড়া দিতে—ওরাং-ওটাংটিকে দাবী করতে ইতস্তত করবে। তবু সে নিজেকে বোঝাবে ; "আমি নির্দোষ ; আমি গরিব ; আমার ওরাং-ওটাংয়ের অনেক দাম—আমার মত লোকের পক্ষে তো একটা সম্পত্তি বিশেষ—অকারণ বিপদের আশংকায় কেন আমি তাকে হারাব ? সেটা তো আমার হাতের মুঠোয় এসে গেছে। তাকে পাওয়া গেছে বয় দ্য বুলোনে—খুনের জায়গা থেকে বহু দূরে। একটা পশু এ কাজটা করেছে এমন সন্দেহ কারও মনে জাগবেই বা কেন ? ত্রুটি তো পুলিশের—ক্ষীণতম সূত্র খুঁজে পেতেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। যদিও বা তারা জন্তুটার খোঁজ পায়, সেক্ষেত্রেও আমি যে খুনের কথা জানতাম সে কথা প্রমাণ করা অসম্ভব, বা আমি জানতাম বলেই আমাকে সে অপরাধে জড়িয়ে ফেলতেও পারবে না। তাছাড়া আমি তো চেনা লোক। বিজ্ঞাপনদাতা আমাকেই জন্তুটার মালিক বলে উল্লেখ করেছে। এ বিষয়ে তার জ্ঞানের সীমা কতটা তা আমি সঠিক জানি না। এ রকম একটা দামী সম্পত্তি দাবী করা থেকে যদি আমি বিরত থাকি তাহলে আমার দোষে জন্তুটাই সন্দেহভাজন হয়ে পড়বে। আমার প্রতি অথবা জন্তুটার প্রতি সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক সেটা আমার নীতি হতে পারে না। আমি বিজ্ঞাপনে সাড়া দেব, ওরাং-ওটাংকে পেয়ে যাব, এবং যতদিন গোলমালটা মিটে না যায় ততদিন সব কথা গোপন রাখব।"

ঠিক এই সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলাম।

দুপঁ বলল, "পিস্তল নিয়ে তৈরী হও, কিন্তু আমার সংকেত না পাওয়া পর্যন্ত সেটা ব্যবহার করো না, বা দেখিও না।"

বাড়ির সামনের দরজাটা খোলাই ছিল ; আগন্তুক ঘন্টা না বাজিয়েই ঢুকে পড়েছে এবং সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ উঠে এসেছে । অবশ্য মনে হল এবার সে ইতস্তত করছে । তার নেমে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেলাম । দুপাঁ দ্রুত সিঁড়ির দিকে ছুটে যেতেই আবার তার উঠে আসার শব্দ শুনলাম । দ্বিতীয়বার সে ফিরে গেল না ; দৃঢ় সংকল্পে উঠে এসে আমাদের দরজায় ধাক্কা দিল ।

"ভিতরে এস," খুশির সুরে দুপাঁ বলল ।

একটি লোক ঢুকল । বোঝা গেল সে একজন নাবিক—দীর্ঘকায়, সুগঠিত, পেশীবহুল চেহারা । দেখতেও খুব খারাপ নয় ; যদিও মুখে একটা বেপরোয়া ভাব আছে । মুখটা বড় বেশী রোদে পোড়া ; তারও অর্ধেকের বেশী জুলফি ও গোঁফে ঢাকা পড়েছে । হাতে একটা ওক কাঠের বড় লাঠি ; তাছাড়া নিরস্ত্র বলেই মনে হল । অদ্ভুত ভঙ্গীতে অভিবাদন করে ফরাসী উচ্চারণে সে আমাদের 'শুভ সন্ধ্যা' জানাল ; তাতেই বোঝা গেল সে প্যারিসের মানুষ ।

দুপাঁ বলল, "বসো হে বন্ধু । মনে হচ্ছে ওরাং-ওটাংয়ের ব্যাপারেই তুমি এসেছ । বিশ্বাস কর, এমন একটা বস্তুর মালিক হিসাবে আমি তোমাকে ঈর্ষাই করি ; জন্তুটা যেমন চমৎকার তেমনই বড়ই মূল্যবান । সেটার বয়স কত হবে বলে তোমার ধারণা ?"

অসহ্য বোঝার ভার থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষের মত একটা লম্বা শ্বাস টেনে নাবিক বলল, "সঠিক তো বলতে পারব না, চার-পাঁচ বছরের বেশী হবে না । সে কি এখানেই আছে ?"

"আরে না, না ; তাকে এখানে রাখার মত ব্যবস্থা আমাদের নেই ; সে আছে কাছেই রু দুবুর্গের একটা আস্তাবলে । কাল সকালে পেতে পার । অবশ্য তোমার জিনিস সনাক্ত করতে তুমি নিশ্চয় তৈরী আছ ?"

"নিশ্চয় আছি স্যার ।"

"তাকে ছেড়ে দিতে আমার কষ্ট হবে," দুপাঁ বলল ।

লোকটি বলল, "আমি বলছি না যে এত সব ঝামেলা আপনাদের মুফতে পোয়াতে হবে । অতটা আমি আশা করতে পারি না । জন্তুটাকে ফিরে পাবার জন্য একটা পুরস্কার আমি দিতে চাই—মানে ন্যায্য কিছু ।"

বন্ধুটি বলল, "ভাল কথা ; নিশ্চয় খুব সঙ্গত কথা । একটু ভেবে দেখছি—কি পাওয়া উচিত ? আচ্ছা, বলছি । আমার পুরস্কার হবে এই রকম । রু মর্গের হত্যাকাণ্ডের সব খবর তুমি সাধ্যমত আমাকে জানাবে ।"

শেষের কথাগুলি দুপাঁ বলল বেশ নীচু গলায় শান্ত ভাবে । ঠিক ততটা শান্তভাবেই সে উঠে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে পুরল । তারপর বুকের ভিতর থেকে একটা পিস্তল বের করে শান্তভাবে সেটাকে টেবিলের উপর রেখে দিল ।

নাবিকটির মুখ এমনভাবে লাল হয়ে উঠল যেন এখনই তার দম বন্ধ হয়ে যাবে । উঠে দাঁড়িয়ে হাতের লাঠিটা চেপে ধরল, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভীষণভাবে কাঁপতে কাঁপতে মরার মত মুখ করে আবার আসনে বসে পড়ল । একটা কথাও বলল না । তার প্রতি করুণায় আমার বুকটা ভরে উঠল ।

দুপাঁ সদয় গলায় বলল, "দেখ বন্ধু, অকারণেই তুমি ভয় পাচ্ছ—সত্যি বলছি, আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না। একজন ভদ্রলোক হিসাবে, একজন ফরাসী হিসাবে তোমার প্রাপ্য সম্মানের নামে বলছি, তোমাকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। আমি ভালভাবেই জানি, রু মর্গের কাণ্ডকারখানার ব্যাপারে তুমি নির্দোষ। অবশ্য তুমি যে তার সঙ্গে কিছুটা জড়িয়ে পড়েছ সে কথা অস্বীকার করে তো লাভ নেই। এতক্ষণ যে সব কথা বললাম তা থেকেই তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ যে এ ব্যাপারে সব কথা জানাব এমন সব পথ আমার আছে যা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পার না। অবস্থাটা এই রকম দাঁড়িয়েছে। না করে পারতে এমন কোন কাজ তুমি কর নি—এমন কিছু কর নি যাতে তোমাকে দোষী করা যেতে পারে। এমন কি ডাকাতির অপরাধেও তুমি অপরাধী নও, যদিও নির্বিবাদে তুমি সে কাজটা করতে পারতে। লুকোবার মত কিছুই তোমার নেই। লুকোবার কোন কারণও নেই। অপর পক্ষে, নিজের মর্যাদার খাতিরেই যা কিছু জান সব বলতে তুমি বাধ্য। যে অপরাধীকে তুমি ধরিয়ে দিতে পার তার অপরাধের দায়ে একটি নির্দোষ মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে।"

দুপাঁর কথাগুলি শুনে নাবিকের মনের বল অনেকাংশে ফিরে এলেও তার গোড়াকার সাহসিকতা মোটেই ফিরে এল না।

একটু থেমে সে বলল, "ঈশ্বর আমার সহায় হোন। এ ব্যাপারে যা কিছু জানি সবই বলছি ;—কিন্তু আমার কথার অর্ধেকটাও তুমি বিশ্বাস করবে এমন আশা আমি করি না—আমি নিজেই একটা নিরেট বোকা না হলে বিশ্বাস করতাম না। তথাপি আমি নির্দোষ বলেই সব কথা খোলাখুলিই বলব, তাতে যদি আমার মরণ ঘটে তো ঘটুক।"

যা সে বলল সেটা মোটামুটি এই। সম্প্রতি সে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সফর করতে বেরিয়েছিল। তাদের দলটা বোর্নিওতে নেমে একেবারে ভিতরে চলে যায় প্রমোদ ভ্রমণে। একজন সঙ্গীর সহায়তায় সে ওরাং-ওটাংটিকে ধরে। সঙ্গীটি মারা যাওয়ায় জন্তুটি সম্পূর্ণ তার একার দখলে চলে আসে। স্বদেশে ফিরবার পথে বন্দী জন্তুটির একগুঁয়ে হিংস্রতার ফলে অনেক ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা পার হয়ে শেষ পর্যন্ত সেটাকে নিয়ে নিরাপদে প্যারিসের বাড়িতে ফিরে আসে। প্রতিবেশীদের অযথা কৌতূহল এড়াবার জন্য খুব সাবধানে সে তাকে আলাদা করে লুকিয়ে রাখে। জাহাজে থাকাকালে একটা কাঠের টুকরোয় কেটে গিয়ে জন্তুটার পায়ে যে ঘা হয়েছিল সেটা না সারা পর্যন্ত তাকে লুকিয়েই রাখে। ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত সেটাকে বেচে দেবে।

কয়েকজন নাবিকের ফুর্তির আড্ডায় যোগ দিয়ে খুনের দিন রাতে, বরং বলা যায় ভোরে—বাড়িতে ফিরে সে দেখে জন্তুটা তার শোবার ঘরে বসে আছে। পাশের যে ছোট কুঠুরিটায় সেটাকে ভালভাবেই আটকে রাখা হয়েছিল তার দরজা ভেঙেই সে এ ঘরে ঢুকেছিল। আয়নার সামনে বসে হাতে ক্ষুর নিয়ে সে দাড়ি কামাবার চেষ্টা করছিল ; নিশ্চয় কুঠুরির দরজার চাবির ছিদ্র দিয়ে মালিককে ও কাজটা করতে সে কখনও আগে দেখেছে। একটা হিংস্র জানোয়ারের হাতে এ রকম একটা সাংঘাতিক

অস্ত্র দেখে নাবিকটি কয়েক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। অবশ্য জন্তুটা যখনই অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে তখনই একটা চাবুকের সাহায্যে তাকে ঠাণ্ডা করার কাজে নাবিকটি ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এবারও সেই পন্থার আশ্রয়ই সে নিল। তা দেখতে পেয়ে ওরাং-ওটাংটা সঙ্গে সঙ্গে একলাফে দরজা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা খোলা জানালার ভিতর দিয়ে একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ে।

ফরাসী লোকটি হতাশ হয়ে তার পিছু নেয়; জন্তুটি তখনও ক্ষুর হাতে নিয়েই মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে পশ্চাদ্ধাবনকারীর দিকে তাকিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে থাকে; এই ভাবে একবার লোকটি ওরাং-ওটাংটার খুব কাছাকাছিও পৌঁছে যায়। কিন্তু সেটা আবার ছুটতে শুরু করে। এইরকম তাড়া করাটা অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে। তখন সকাল প্রায় তিনটে, পথ-ঘাট খুবই নির্জন ও শান্ত। রু মর্গের পিছন দিককার একটা গলি দিয়ে চলার সময় নিজের বাড়ির চারতলায় মাদাম ল' এস্পানায়েরের ঘরের খোলা জানালা দিয়ে ঠিকরে বের হওয়া আলোর রেখার দিকে পলাতকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ওরাং-ওটাংটা একছুটে বাড়িটার কাছে গিয়ে বজ্র-বারণ লৌহদণ্ডটাকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে সেটা বেয়ে উপরে উঠে যায় এবং জানালার খোলা শার্সিটাকে ধরে একলাফে সোজা পৌঁছে যায় খাটের মাথায়। পুরো ব্যাপারটা ঘটতে এক মিনিটও লাগে না। ঘরের ভিতরে ঢুকবার সময়ই সে লাথি মেরে শার্সিটাকে আবার খুলে দেয়।

তখন নাবিকের অবস্থা যুগপৎ হর্ষ-বিষাদে ভরা। তার মনে খুবই আশা যে এবার সেটাকে ধরতে পারবে। কারণ যে ফাঁদে সে ঢুকে পড়েছে সেখান থেকে আবার পালিয়ে যেতে পারবে না। যদি বজ্রবারণ দণ্ডটা রেখে নেমে আসার চেষ্টা করে তাহলেও সেখানেই তাকে ধরতে পারবে। অপরদিকে, বাড়ির ভিতর ঢুকে সে কি না করে বসে তা নিয়েও উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। সে কথা মনে হতেই লোকটি স্থির করল যে ভাবেই হোক ওটার পিছু নিতে হবে। একটা বজ্র-বারণ দণ্ড বেয়ে ওঠাটা একজন নাবিকের পক্ষে কোন শক্ত কাজ নয়; কিন্তু জানালা পর্যন্ত উঠে সে বুঝতে পারল যে জানালাটা অনেক দূরে অবস্থিত; অতএব সেখানেই সে থেমে গেল। অনেক চেষ্টা করে ঘরের ভিতরে দৃষ্টিটাকে ফেলল। কিন্তু সেদিকে তাকানো মাত্রই তীব্র আতংকে হাত ফসকে সে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। আর তখনই রাতের বুক চিঁরে উঠল সেই বীভৎস আর্তনাদ যা শুনে রু মর্গের অধিবাসীদের ঘুম ভেঙে গেল। মাদাম ল' এস্পানায়ে ও তার মেয়ে নৈশবাস পরা অবস্থাতেই কিছু কাগজপত্র গুছিয়ে রাখার জন্য লোহার সিন্দুকটাকে টেনে নিয়ে এসেছিল ঘরের মাঝখানে। সিন্দুকটা তখন খোলাই ছিল; ভিতরের জিনিসপত্র সব পাশেই মেঝের উপর রাখা ছিল। দুজনেই বসে ছিল জানালার দিকে পিছন ফিরে। কাজেই জন্তুটার ভিতরে প্রবেশ ও আর্তনাদের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে তারা কেউ কিছু বুঝতেই পারে নি। শার্সির শব্দটাকে তারা বাতাসের ফল বলেই মনে করেছিল।

ভিতরে চোখ পড়তেই নাবিক দেখতে পেল, বিরাট জন্তুটা মাদাম ল' এস্পানায়েরের চুলের মুঠি ধরে (সে তখন চুল আঁচড়াচ্ছিল বলে চুলটা খোলাই ছিল) নাপিতের

মত করে ক্ষুরটাকে তার মুখময় চালিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটি নিথর হয়ে সটান পড়ে আছে ; সে মূর্ছা গেছে। বৃদ্ধ মহিলাটির চীৎকার ও বাধা দানের ফলে (ইতিমধ্যে তার মাথা থেকে চুল পর্যন্ত ছেঁড়া হয়ে গেছে) ওরাং-ওটাং-য়ের শান্ত মনোভাবটা তীব্র ক্রোধে ফেটে পড়েছে। পেশীবহুল হাতের এক পোঁচে মহিলার ধড় থেকে মাথাটাকে দু'ভাগ করে ফেলেছে। সে রক্ত দেখে তার ক্রোধ পরিণত হল উন্মত্ততায়। দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে দুই চোখে আগুনের ফুলকি ছুটিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির উপরে, ভয়ংকর নখগুলোকে বসিয়ে দিল তার গলায়, মৃত্যু না ঘটা পর্যন্ত সে মুঠি আলগা করল না। উদ্ভ্রান্তের মত তাকাতে তাকাতে এবার তার চোখ পড়ল বিছানার মাথার উপরের দিকে, আর তার ভিতর দিয়েই দেখতে পেল আতংকে কাঠ হয়ে যাওয়া মালিকের মুখটা ; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল তার ভয়ংকর চাবুকটার কথা। অমনি মুহূর্তের মধ্যে তার সব উচ্ছৃংখল ক্রোধ গলে জল হয়ে পরিণত হল ভয়ে। অবধারিত শাস্তির ভয়ে ভীত হয়ে সে চাইল তার রক্তাক্ত কাণ্ডকে লুকিয়ে ফেলতে, আর তার ফলে অস্থির যন্ত্রণায় ঘরময় দাপাদাপি শুরু করল : আসবাবপত্র ভাঙচুর করল, বিছানা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল খাট থেকে। শেষ পর্যন্ত মেয়ের শবদেহটাকে ধরে চিমনির ভিতর ঢুকিয়ে দিল ; তারপর বৃদ্ধ মহিলার দেহটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

বিকৃত দেহটাকে নিয়ে জন্তুটা যখন জানালার দিকে এগিয়ে যায় তখন লোহার ডাণ্ডা ধরে ঝুলে থাকা নাবিকটি ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে সেটা ধরে হড়্ হড়্ করে নীচে নেমে ছুট দিল বাড়ির পথে—এই হত্যাকাণ্ডের পরিণতির কথা তখন তার মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে ; কাজেই ওরাং-ওটাংটার কি হবে তা নিয়ে সে আর মাথা ঘামাল না। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আগন্তুকরা যে সব কথাবার্তা শুনেছিল সেটা ফরাসী লোকটার আতংকিত চীৎকার আর জন্তুটার আবোল-তাবোল বকুনির একটা জগা-খিচুরি মাত্র।

এরপরে আর নতুন কিছু বলার নেই। ওরাং-ওটাংটা হয়তো দরজা ভেঙে ফেলার আগেই বজ্র-বারণ দণ্ড বেয়ে ঘর থেকে পালিয়েছিল। জানালার ভিতর দিয়ে বের হবার পরে সে হয় তো জানালাটাকে আবার বন্ধ করে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মালিক নিজেই জন্তুটাকে পাকড়াও করে এবং অনেক দামে "জার্দ দ্য প্লাতেঁস-"এ বিক্রি করে দেয়। পুলিশের বড় কর্তার দপ্তরে গিয়ে আমরা সব ঘটনা খুলে বলায় লি বোঁকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া হয়। বন্ধুটির প্রতি যথেষ্ট সদয় থাকা সত্ত্বেও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিটি কিন্তু তাকে এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ জ্ঞান দান করতে কসুর করল না।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে দুপঁ বলল, "ওকে বলতে দাও ; এতে ওর বিবেক কিছুটা শান্ত হবে। তার নিজের দুর্গে তাকে পরাস্ত করতে পেরেই আমি খুশি। তথাপি সে যে এই সমাধান করতে পারে নি তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই ; কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের বন্ধু এই বড় কর্তাটি যতটা চালাক ততটা বুদ্ধিমান নয়। তার জ্ঞানে আসল মালের বড় অভাব। তার শুধু মুণ্ডু আছে, ধড় নেই—দেবী লেভার্নার ছবির মত,—অথবা বড় জোর বলা যায় কড মাছের মত কেবল মাথা আর গর্দানটাই সম্বল। কিন্তু লোকটি ভাল। আমি তাকে পছন্দ করি, বিশেষ করে তার সব মোক্ষম বাণীর জন্য যা তাকে খ্যাতিমান করে তুলছে। কথাটা বলেই সে রুশোর একটা বাণী আউড়ে দিল।

মৈস্মারিক সংলাপ

Mesmeric Revelation

মৈস্নরবিদ্যার (মেস্‌মেরিজম্‌) যুক্তিবত্তাকে ঘিরে এখনও পর্যন্ত যে সন্দেহই জমে থাকুক না কেন, তৎসংক্রান্ত বিস্ময়কর ঘটনাগুলি কিন্তু প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। তবু যারা সন্দেহ করে সন্দেহ করাটাই তাদের কাজ—যত সব অকর্মা ও বিশ্বনিন্দুকের দল। মানুষ কেবল মাত্র ইচ্ছাশক্তির জোরেই অপর একটি মানুষকে এমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং এমন অস্বাভাবিক অবস্থায় তাকে ঠেলে দিতে পারে যেটা প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি একটা অবস্থার মত দেখায়; আর সেই অবস্থায় মানুষটি অনেক চেষ্টা করলেও খুবই দুর্বলভাবে তার বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে কার্যকর করতে পারে, অথচ একান্তভাবে সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষের দ্বারা এবং আমাদের অজ্ঞাত কোন মাধ্যমের দ্বারা এমন সব জিনিসকে প্রত্যক্ষ করতে পারে যেটা দৈহিক ইন্দ্রিয়গুলির আয়ত্তের অতীত; তাছাড়া, তার বুদ্ধিবৃত্তিগুলি বিস্ময়করভাবে উন্নত ও সজীব হয়ে ওঠে; যে মানুষটি তাকে এইভাবে প্রভাবিত করে তার প্রতি সহানুভূতি হয়ে ওঠে গভীরতর; এবং, শেষ কথা হল, এই ধরনের ঘটনার ক্রমিক বৃদ্ধির সঙ্গে লোকটির প্রভাবিত হবার প্রবণতাটাও বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ক্রমেই লোকটির ক্রিয়াকান্ড ব্যাপকতর ও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

আমি বলতে চাই যে মৈস্নরবিদ্যার এই সব বৈশিষ্ট্যকে হাতে-কলমে করে দেখানোটা অপ্রয়োজনীয় প্রচেষ্টামাত্র; তাই সে রকম কোন অপ্রয়োজনীয় কাজ আমি আজ আমার পাঠকদের উপর চাপাতে চাই না। আজ আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাজার প্রতিকূল ধারণা সত্ত্বেও আজ আমি বিনা মন্তব্যে এমন একটি উল্লেখযোগ্য সংলাপের বিস্তারিত বিবরণ দেব যেটা জনৈক স্বপ্নাটন ব্যক্তি (স্বপ্নের মধ্যে ভ্রমণকারী) ও আমার মধ্যে ঘটেছিল।

অনেক দিন যাবৎ আমি আলোচ্য লোকটিকে (মিঃ ভ্যানকার্ক) স্বপ্নাবস্থায় অভিভূত করার কাজটা করে আসছিলাম; ফলে তার অভিভূত হবার প্রবণতা এবং উন্নতিও ক্রমেই তীক্ষ্মতর হচ্ছিল। লোকটি অনেক মাস ধরেই যক্ষ্মারোগে ভুগছিল। আমার কর্মপ্রচেষ্টার ফলে সেই রোগের কষ্টকর লক্ষণগুলি ক্রমেই কমে আসছিল। এ মাসের পনেরোই বুধবার রাতে তার শয্যার পাশে আমার ডাক পড়ল।

পীড়িত লোকটি বুকের তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিল; শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল; তাছাড়া ক্ষয়রোগের অন্য সব সাধারণ লক্ষণগুলি তো ছিলই। এই ধরনের খিঁচুনির সময় স্নায়ুকেন্দ্রগুলিতে সরষের তেল মালিশ করা হলে সে সাধারণত অনেকটা আরাম বোধ করে, কিন্তু আজ রাতে তাতেও কোন ফল হয় নি।

আমি ঘরে ঢুকতেই সে আমাকে স্মিত হাসির সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল ; যথেষ্ট দৈহিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও তাকে মনের দিক থেকে যেন শান্তই মনে হল।

সে বলল, "আমার দেহের কষ্ট দূর করার জন্য আজ রাতে আপনাকে ডাকি নি ; সম্প্রতি কতকগুলি মানসিক ধারণা আমার পক্ষে যথেষ্ট উদ্বেগ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে উঠেছে ; আপনাকে ডেকেছি সেগুলি সম্পর্কে আমার মনকে শান্ত করে দেবেন বলে। আত্মার অমরতা সম্পর্কে আমি যে খুবই সন্দিগ্ধচিত্ত সে কথা আপনাকে বলাই বাহুল্য। এ নিয়ে আমি কোনরকম ভাবনাচিন্তাও করি না। যুক্তি-বিচারের পথে এ-বিষয়ে এগোবার চেষ্টার ফল আমাকে অধিকতর সন্দেহবাদীই করে তুলেছে। আমাকে "কুজিন" পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তার বইপত্র আমি পড়েছি ; তার ইয়োরোপীয় ও মার্কিন অনুরাগীদের গ্রন্থও পড়েছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মিঃ ব্রাউনসনের "চার্ল্‌স এল্‌উড" আমার হাতে এসেছিল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে বই আমি পড়েছি। বইটির উপসংহারে তিনি সংক্ষেপে যা বলতে চেয়েছেন তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে তিনি নিজেকেই নিজে বোঝাতে পারেন নি। এক কথায়, অচিরেই আমি বুঝেছি যে এ ধরনের যুক্তির জাল ফেলে মানুষকে তার অমরত্বে বিশ্বাসের ফাঁদে আটকানো যাবে না। আমাদের ইচ্ছা সেটা মেনে নিতে পারে, কিন্তু মন কখনও মেনে নেবে না—বুদ্ধিও না।

"বিভিন্ন কারণে আমার মনে হয়েছে যে, মৈস্মরিক অবস্থায় যদি কতকগুলি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন আমার কাছে রাখা হয় তাহলে হয় তো এ ব্যাপারে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে।"

এই পরীক্ষা-ব্যবস্থায় আমি সম্মতি দিলাম। প্রথম চেষ্টাতেই মিঃ ভ্যানকার্ক মৈস্মরিক ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার শ্বাস-প্রশ্বাস সহজতর হল ; মনে হল, শারীরিক অস্বস্তিও কেটে গেল। তারপর শুরু হল নিম্নোক্ত সংলাপ ঃ এই সংলাপে "ভি" হচ্ছেন রোগী, আর "পি" হচ্ছি আমি।

পি—আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন ?

ভি—হ্যাঁ—না ; আমি আরও গভীর ঘুম ঘুমতে চাই।

পি—[একটু চুপ করে থেকে] এখন ঘুমিয়েছেন ?

ভি—হ্যাঁ।

পি—আপনার বর্তমান অসুখের পরিণতি কি হবে বলে আপনি মনে করেন ?

ভি—[দীর্ঘক্ষণ ইতস্তত করে বেশ চেষ্টা করে] আমি মারা যাব।

পি—মৃত্যুর চিন্তা কি আপনাকে কষ্ট দেয় ?

ভি—[খুব তাড়াতাড়ি] না—না !

পি—এই সম্ভাবনায় কি আপনি খুশি ?

ভি—জেগে থাকলে আমি মরতেই চাই, কিন্তু এখন সেটা কোন ব্যাপারই নয়। মৈস্মরিক অবস্থাটা মৃত্যুর এত কাছাকাছি যে এতেই আমি খুশি।

পি—মিঃ ভ্যানকার্ক, আমি চাই নিজের কথাটা আরও পরিষ্কার করে বলুন।

ভি—আমি তো সেটাই করতে চাই, কিন্তু তাতে যতটা চেষ্টার দরকার সেটা আমি করতে পারছি না। আপনার প্রশ্ন ঠিকমত হচ্ছে না।

পি—তাহলে আমি কি প্রশ্ন করব?

ভি—শুরু থেকে শুরু করতে হবে।

পি—শুরু থেকে! কিন্তু সেই শুরুটা কোথায়?

ভি—আপনি জানেন, শুরুতেই আছেন ঈশ্বর।

[কথাটা বলা হল নীচু, দ্বিধাযুক্ত স্বরে ; তাতে গভীর শ্রদ্ধার চিহ্ন বিদ্যমান।]

পি—তাহলে ঈশ্বর কি?

ভি—[কয়েক মিনিট ইতস্তত করে] আমি বলতে পারি না।

পি—ঈশ্বর কি আত্মা নন?

ভি—যখন জেগেছিলাম তখন আমি জানতাম "আত্মা" বলতে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন, কিন্তু এখন ওটা একটা শব্দমাত্র—যেমন সত্য, সুন্দর—মানে একটা গুণ।

পি—ঈশ্বর কি অজড় নন?

ভি—অজড় বলে কিছু নেই—ওটা একটা কথার কথা। যেটা বস্তু নয় সেটা কিছুই নয়—অবশ্য গুণগুলি যদি বস্তু না হয়।

পি—তাহলে ঈশ্বর কি বস্তু?

ভি—না। [এই উত্তরটা আমাকে খুব চমকে দিল।]

পি—তাহলে তিনি কি?

ভি—[অনেকক্ষণ থেমে থেকে তো-তো করে] তাও তো বটে—কিন্তু সে কথা বলা বড় শক্ত। [আবার অনেকক্ষণ চুপ] তিনি আত্মা নন, কারণ তাঁর অস্তিত্ব আছে। তিনি বস্তুও নন, অন্তত বস্তু বলতে আপনি যা বোঝেন। বস্তুর নানা স্তর আছে ; সে বিষয়ে মানুষ কিছুই জানে না ; স্থূল সূক্ষ্মকে চালিত করে, আর সূক্ষ্ম স্থূলের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আবহাওয়া বৈদ্যুতিক নীতিকে পরিচালিত করে, আবার বৈদ্যুতিক নীতি আবহাওয়াকে জড়িয়ে থাকে। বস্তুর এই স্তর-ভেদ ক্রমাগত বিরলতা বা সূক্ষ্মতার দিকে এগিয়ে চলতে চলতে এক সময় আমরা কণা-বিহীন বস্তুতে উপনীত হই ; এই কণাবিহীন বস্তু অবিভাজ্য—এক। এই পরম বা কণাবিহীন বস্তু সব কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, সব বস্তুকে চালিত করে—কাজেই সব বস্তুকে নিজের মধ্যে নিয়েই সে এক। এই বস্তুই ঈশ্বর।

পি—কিন্তু এই যে নিছক বস্তুকে ঈশ্বরের সঙ্গে এক করে দেখা—এর মধ্যে কি অশ্রদ্ধার প্রকাশ পাচ্ছে না? [রোগী আমার কথাটা সম্পূর্ণ বুঝবার আগে আমাকে আর একবার প্রশ্নটা করতে হল।]

ভি—আপনি কি বলতে পারেন, বস্তুকে মন অপেক্ষা কম শ্রদ্ধা করা হবে কেন? আত্মাকে যে সব শক্তির অধিকারী মনে করা হয় সে সব শক্তির অধিকারী হয়েও ঈশ্বর তো বস্তুরই পরিপূর্ণ রূপ।

পি—তাহলে আপনি বলতে চান, কণাবিহীন বস্তু চলমান হলেই সেটা চিন্তা হয়ে ওঠে?

ভি—মোটামুটিভাবে, এই চলমানতাই তো সার্বিক মনের সার্বিক চিন্তা। এই চিন্তাই তো সৃষ্টি করে। সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তো ঈশ্বরেরই চিন্তা।

পি—আপনি বললেন "মোটামুটি ভাবে।"

ভি—হ্যাঁ। সার্বিক মনই ঈশ্বর। নতুন ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রয়োজন বস্তুর।

পি—কিন্তু এখন তো আপনি "মন" ও বস্তুর" কথা বলছেন তত্ত্ববিদদের মতই।

ভি—হ্যাঁ—বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য। আমি যখন বলি "মন", আমি কণাবিহীন বা পরম বস্তুকেই বোঝাতে চাই; "বস্তু" বলতে বোঝাতে চাই অন্য সব কিছু।

পি—আপনি বলছিলেন "নতুন ব্যক্তিত্বের জন্য বস্তুর প্রয়োজন।"

ভি—হ্যাঁ; কারণ মন যখন একীভূত না হয়ে অস্তিত্বশীল হয় তখনই তো সে ঈশ্বর। চিন্তাশীল ব্যক্তি-সত্ত্বাকে সৃষ্টি করতে ঐশ্বরিক মনের অংশকে দেহধারী করার প্রয়োজন হয়েছিল।

পি—আপনি বলছেন যে দেহবিমুক্ত মানুষই ঈশ্বর?

ভি—[অনেক ইতস্ততের পরে] এ কথা আমি বলতে পারি না; এটা তো স্ববিরোধীতা।

পি—[আমার লিখিত 'নোট' দেখে] আপনি অবশ্যই বলেছেন যে 'দেহ থেকে মুক্ত হলেই' মানুষ ঈশ্বর হয়ে ওঠে।"

ভি—আর সেটাই তো সত্য। দেহমুক্ত হলেই মানুষ ঈশ্বর হয়ে যায়—ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য-হীন হয়ে যায়। কিন্তু মানুষ কখনও এভাবে দেহবিমুক্ত হতে পারে না—অন্তত কখনও হবে না। মানুষ তো একটি প্রাণী। প্রাণীরাই তো ঈশ্বরের চিন্তা। চিন্তার স্বরূপই হচ্ছে তা অপরিবর্তনীয়।

পি—ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি বলছেন মানুষ কোন দিন দেহকে ছাড়তে পারবে না?

ভি—আমি বলছি সে কোনদিনই দেহহীন হবে না।

পি—বুঝিয়ে বলুন।

ভি—দেহ দুই প্রকার—আদিম ও সম্পূর্ণ; ঠিক কীট ও প্রজাপতির দুটি অবস্থার অনুরূপ। আমরা যাকে "মৃত্যু" বলি সেটা বেদনাদায়ক রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের বর্তমান মূর্তি প্রগতিশীল, প্রস্তুতিমুখীন ও সাময়িক। আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্ণ, পরম, অমর। পরম জীবনই পূর্ণ পরিকল্পনা।

পি—কিন্তু কীটের রূপান্তর সম্পর্কে আমরা তো স্পষ্টতই সচেতন।

ভি—আমরা তো নিশ্চয়ই—কিন্তু কীটটি তো নয়।

পি—আচ্ছা, আপনি বার বার বলছেন মৈস্মরিক অবস্থাটা প্রায় মৃত্যুরই অনুরূপ। সেটা কি?

ভি—আমি যখন বলি সেটা মৃত্যুরই মত, তখন আমি বলতে চাই সেটা পরম জীবনের অনুরূপ।

পি—আপনি আদিম "জীব"-এর কথাও বললেন। মানুষ ছাড়া আর কোন আদিম চিন্তাশীল জীব কি আছে?

ভি—যে বিরল বস্তুটি নেবুলা নয়, গ্রহ নয়, তাকে যে অসংখ্য রকমের পিণ্ডীকরণের ভিতর দিয়ে নেবুলা, গ্রহ, সূর্য ও অন্য মূর্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্যও তো সীমা-সংখ্যাহীন আদিম জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্তহীন বৈশিষ্ট্যের আহার্য যোগানো পরম জীবনের পূর্বগ আদিম জীবনের প্রয়োজন না হলে এই সব দেহই সৃষ্টি হত না।

পি—আপনি বললেন "আদিম জীবনের প্রয়োজন না হলে" কোন তারাই থাকত না। কিন্তু এই প্রয়োজনটা কেন হল?

ভি—অজৈব জীবনে, এবং অজৈব বস্তুর ক্ষেত্রেও ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির মত একটি সরল, অদ্বিতীয় বিধানের কার্যকে বাধা দেবার মত কিছুই নেই। এই বাধার প্রয়োজনেই জৈব জীবন ও বস্তুর উদ্ভাবন ঘটেছিল।

আমার রোগীটি যখন দুর্বল কণ্ঠে এই কথাগুলি বলছিলেন তখন তার চোখে-মুখে একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, এখনই তাকে জাগিয়ে তোলা উচিত। জাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার সারা মুখে একটা উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তিনি বালিশে এলিয়ে পড়লেন। তার মৃত্যু হল। দেখলাম এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যেই তার দেহটা পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল। তার ভ্রুতে বরফের শীতলতা। সাধারণ অবস্থায় এ রকমটা ঘটতে পারত এজরায়েলের হাত তাকে চেপে ধরার দীর্ঘ সময় পরে। তাহলে কি আমার মৈস্মরিক রোগীটি আলোচনার শেষের দিকের কথাগুলি আমাকে বলেছিলেন ছায়ার জগৎ থেকে?

এম. ভল্‌ডিমারের প্রকৃত ঘটনা

The Facts in the Case of M. Valdemar

এম. ভল্‌ডিমারের অসাধারণ ব্যাপার নিয়ে যে আলোচনার ঝড় উঠেছে তাতে বিস্মিত হবার মত কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। বরং অনুরূপ পরিবেশে এটা না হলেই সেটা একটা অলৌকিক ব্যাপার হত। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই ইচ্ছা ছিল অন্তত এখনই, অথবা তদন্তের আরও সুযোগ-সুবিধা না পাওয়া পর্যন্ত, ব্যাপারটা যাতে সাধারণের কানে না যায়—তার জন্য আমরা চেষ্টাও করেছিলাম কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা বিকৃত ও অতিরঞ্জিত বিবরণ সমাজে চাউড় হয়ে গেল; ফলে নানা রকম অপ্রীতিকর ভ্রান্ত ধারণা ছড়াতে লাগল; এবং স্বভাবতই অনেক রকম অবিশ্বাসের জন্ম হল।

তাই প্রকৃত ঘটনা জানানোটা দরকার হয়ে পড়ল; এবং আমার বুদ্ধি মত সেই কাজটাই আমি করছি। সংক্ষেপে সেগুলি এই রকম ঃ

গত তিন বছর যাবৎ বার বার আমার মনোযোগ মৈস্নরবিদ্যার (মেস্‌মেরিজম্‌) প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে; আর প্রায় নয় মাস আগে হঠাৎই আমার মনে হল যে এতদিন পর্যন্ত এ বিষয়ে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাতে একটা উল্লেখযোগ্য ও ব্যাখ্যাতীত ত্রুটি থেকে গেছে ঃ মৃত্যুর ওপার থেকে কথা বলা (articules mortis) কোন মানুষকে আজ পর্যন্ত কৃত্রিম স্বপ্নাবস্থায় অভিভূত করে পরীক্ষা করা হয় নি। প্রথমত, দেখা হয় নি সেই অবস্থায় রোগীর উপর মৈস্নরিক আকর্ষণ কাজ করে কিনা; দ্বিতীয়ত, কাজ করলেও সেই অবস্থার দ্বারা তার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি ঘটে কি না; তৃতীয়ত, সেই পদ্ধতির দ্বারা মৃত্যুর আগমনকে কতদূর পর্যন্ত এবং কত সময় পর্যন্ত রোধ করা যায়। আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, কিন্তু এইগুলো নিয়েই আমার কৌতূহল জেগেছিল—বিশেষ করে তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে, কারণ সেটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।

এই বিষয়গুলি নিয়ে পরীক্ষা চালাবার উপযুক্ত একটি লোক খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ল আমার বন্ধু এম. আর্নেস্ট ভল্‌ডিমারের কথা। লোকটি "বিব্‌লিওথেকা ফোরেন্‌সিকা" গ্রন্থের খ্যাতিমান সংকলক এবং আইজাকার মার্কস ছদ্মনামে "ওয়ালেন্‌স্টিন" ও "গর্গন্টুয়া"-র পোলিশ সংস্করণের লেখক। এম. ভল্‌ডিমার ১৮৩৯ সাল থেকে নিউ ইয়র্কের হার্লেমেই প্রধানত বসবাস করছেন। অতি-কৃশতাই তার শরীরের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য লক্ষণ; তাছাড়া, তার মাথার চুল যত বেশী কালো তার গালপাট্টা ঠিক ততখানিই সাদা; ফলে তার নিজের চুলকে সকলেই পরচুলা বলে ভুল করে। তার স্নায়ুগুলি সহজেই উত্তেজনশীল হওয়ায় মৈস্নরিক পরীক্ষার

পক্ষে সে খুবই উপযোগী। তাকে আমি দু' তিনবার সহজেই ঘুম পাড়িয়েছি, কিন্তু ফলাফল যা পেয়েছি তা নৈরাশ্যজনক। কোন সময়েই তার ইচ্ছাকে আমার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারি নি; আর অতীন্দ্রিয় দর্শনশক্তির ব্যাপারে তাকে নিয়ে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যেই উপনীত হতে পারি নি। তার বিশৃঙ্খল স্বাস্থ্যই আমার এই ব্যর্থতার কারণ বলে আমার মনে হয়েছে। আমার সঙ্গে পরিচয়ের কয়েক মাস আগেই তার চিকিৎসক তাকে যক্ষ্মার রোগী বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এম. ভল্‌ডিমারের মানসিক গঠনের কথা আমি ভাল করেই জানতাম; আমেরিকাতে তার এমন কোন আত্মীয় ছিল না যে তাকে এ কাজে বাধা দিতে পারে। আমিও তাকে সোজাসুজিই আমার উদ্দেশ্যের কথা জানালাম, আর—কী আশ্চর্য! —সঙ্গে সঙ্গে সেও এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী হয়ে উঠল। আলোচনার শেষে আমাদের দুজনের মধ্যে এই ব্যবস্থাই পাকা হল যে, চিকিৎসকরা মৃত্যুর যে সময়টা ঘোষণা করবেন তার চব্বিশ ঘন্টা আগেই তিনি আমাকে ডেকে পাঠাবেন।

আজ থেকে সাত মাসেরও কিছু আগে এম. ভল্‌ডিমারের নিজের হাতে লেখা এই চিঠিটা আমি পেলাম ঃ

"প্রিয় পি—,

এবার আপনার আসার সময় হয়েছে। ডি—এবং এফ—একমত হয়েছেন যে আগামী কাল মধ্যরাতের পরে আমি আর বেঁচে থাকব না; আমি মনে করি, সময়টা তারা ঠিকই ধরতে পেরেছেন।

ভল্‌ডিমার।"

চিঠিটা লেখার আধঘন্টার মধ্যেই আমি সেটা পেলাম, এবং আরও পনেরো মিনিট পরেই মুমূর্ষু লোকটির ঘরে হাজির হলাম। মাত্র দশ দিন আমি তাকে দেখি নি, কিন্তু এই অল্প সময়েই তার যে ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটেছে তা দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। মুখের রং সীসের মত হয়ে গেছে; চোখ দুটি একেবারেই নিষ্প্রভ; শরীর এত বেশী শুকিয়ে গেছে যে চোয়ালের হাড় চামড়া কেটে ঠেলে উঠেছে। কাশিটা অত্যধিক বেড়েছে। নাড়ি এত ক্ষীণ যে বোঝাই যায় না। তথাপি কি মানসিক কি দৈহিক উভয় শক্তিই তখনও যথেষ্ট অক্ষুণ্ণ আছে। কথা বললেন স্পষ্ট গলায়—কারও সাহায্য ছাড়াই বেদনানাশক ওষুধ খেলেন। ঘরে ঢুকেই দেখলাম একটা পকেট বইতে পেন্সিল দিয়ে স্মরণিকা লিখে চলেছেন। বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছেন। কাছেই রয়েছেন দুই ডাক্তার—ডি—ও এফ—।

ভল্‌ডিমারের হাতে একটু চাপ দিয়ে দুই ডাক্তারকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেলাম এবং রোগীর অবস্থার সঠিক বিবরণ জেনে নিলাম। দু'জনেরই অভিমত, কাল (রবিবার) মাঝরাত নাগাদ এম. ভল্‌ডিমার মারা যাবেন। তখন সময় শনিবার সন্ধ্যা সাতটা।

আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য রোগীর বিছানা ছেড়ে আসার সময়ই দুই ডাক্তার ডি—এবং এফ—তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে এসেছিলেন। আবার সে ঘরে ফিরে যাবার ইচ্ছা তাদের ছিল না; কিন্তু আমার অনুরোধে পরের দিন রাত দশটা নাগাদ তারা একবার রোগীকে দেখে যেতে সম্মত হলেন।

তারা চলে গেলে আমি খোলাখুলিভাবেই তার আসন্ন মৃত্যু ও প্রস্তাবিত পরীক্ষার ব্যাপার নিয়ে এম. ভল্‌ডিমারের সঙ্গে কথা বললাম। তখনও তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার পরীক্ষায় আগ্রহ দেখালেন এবং তখনই সে কাজ শুরু করতে বললেন। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা তার দেখাশুনা করছিল। পাছে হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায় এই ভয়ে মাত্র দুজন নার্সের উপর ভরসা করে এ ধরনের একটা কাজে হাত দিতে আমার সাহসে কুলাল না। তাই আমার পূর্ব-পরিচিত জনৈক মেডিক্যাল ছাত্র (মিঃ থিয়োডোর এল—) না আসা পর্যন্ত আমার কাজটা স্থগিত রাখলাম। প্রথমে স্থির করেছিলাম ডাক্তার দু'জন না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব; কিন্তু তার আগেই আমাকে কাজে হাত দিতে হল প্রথমত এম. ভল্‌ডিমারের একান্ত অনুরোধ, আর দ্বিতীয়ত রোগীর অন্তিমক্ষণ দ্রুত ঘনিয়ে আসছে বলে আর একটি মুহূর্তও নষ্ট করা উচিত নয় এই প্রত্যয়ে।

মিঃ এল—আমার ইচ্ছানুসারে সব ঘটনার বিবরণ লিখে রাখতে সম্মত হলেন। তার সেই লেখা থেকেই আমি এই কাহিনী লিখছি।

রোগীর হাতটা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করার অনুমতি চাইলে তিনি দুর্বল কণ্ঠে বেশ স্পষ্ট করেই বললেন, "হ্যাঁ, আমি চাই আমাকে মৈস্মরিক অবস্থায় নেওয়া হোক। আমি আশংকা করছি, আপনি অনেক বেশী দেরী করে এসেছেন।

কাজ শুরু করে দিলাম। তার কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব ব্যবস্থা মত দশটার পরে ডাক্তার ডি.—ও এফ. এসে হাজির হলেন। অল্প কথায় তাদের সব কিছু বুঝিয়ে বলতে তারাও কোনরকম আপত্তি করলেন না। কারণ ততক্ষণে রোগীর মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে। রোগীর ডান চোখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে আমি মৈস্মর-পদ্ধতি মত কাজ করতে লাগলাম।

ক্রমেই তার নাড়ি ক্ষীণতর হতে লাগল; শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নাক ডাকতে লাগল; আধ মিনিট পর পর নাড়ির ওঠা-পড়া চলতে লাগল।

পনেরো মিনিট ধরে অবস্থা প্রায় একই রকম চলল। অবশ্য তারপরে মুমূর্ষু লোকটির বুকের ভিতর থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল এবং নাসিকাধ্বনি সমেত শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল—অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে সেই রকমই মনে হল; নাড়ির ওঠা-নামার বিরতিটুকুও একই থাকল। রোগীর বহিরঙ্গ বরফের মত ঠান্ডা হয়ে গেল।

এগারোটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে মৈস্মরিক অবস্থার স্পষ্ট লক্ষণ আমার চোখে পড়ল। চোখের চনমনে ঘুরন্ত ভঙ্গীর বদলে দেখা দিল এমন একটা অস্বচ্ছন্দ অন্তঃ-

সমীক্ষার প্রকাশ যেটা স্বপ্ন-ভ্রমণ ছাড়া অন্য কোথাও কখনও দেখা যায় না, আর যেটাকে ভুল করাও অসম্ভব। তার চোখের পাতায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলাম। প্রথমে চোখের পাতা কাঁপতে লাগল, তারপর সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলাম। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তাকে সটান বিছানায় শুইয়ে দিলাম; পা দুটোকে সম্পূর্ণ মেলে দিলাম; হাত দুটোকেও টান-টান করে কোমর থেকে কিছুটা দূরে রেখে বিছানার উপর এলিয়ে দিলাম; মাথাটা রইল ঈষৎ তোলা।

এই সব করতে মাঝরাত হয়ে গেল। উপস্থিত ভদ্রলোককে বললাম এম. ভল্‌ডিমারের অবস্থাটা পরীক্ষা করে দেখতে। কিছুটা পরীক্ষা করে তারা স্বীকার করলেন রোগী তখন পুরোপুরি মেস্‌মেরিক ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। দুই ডাক্তারের কৌতূহলই অতিমাত্রায় বেড়ে গেল। ডাঃ ডি—স্থির করলেন, সারারাত রোগীর পাশেই থাকবেন, আর ডাঃ এফ. তখনকার মত বিদায় নিলেও কথা দিয়ে গেলেন, ভোর বেলা আবার আসবেন। মিঃ এল.—ও নার্সরা থেকেই গেল।

সকাল তিনটে পর্যন্ত এম. ভল্‌ডিমারকে সম্পূর্ণ একা রেখে দেওয়া হল। তার পরে ঘরে ঢুকে আমি দেখলাম তিনি ঠিক আগের মত অবস্থাতেই আছেন; একভাবেই শুয়ে আছেন; নাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না; শ্বাস-প্রশ্বাস ক্ষীণ (ঠোঁটের উপর আয়না না ফেললে বোঝাই যায় না); চোখ দুটি স্বাভাবিকভাবেই বোজা; সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শ্বেতপাথরের মত শান্ত ও ঠান্ডা। অথচ, চেহারাটা দেখতে মোটেই মৃত ব্যক্তির মত নয়।

এম. ভল্‌ডিমারের কাছে এগিয়ে গিয়ে আমার ডান হাতটা তার শরীরের উপরে ইতস্তত নাড়তে নাড়তে মনে মনে তার ডান হাতটাকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করলাম যাতে তার ডান হাতটা আমার ডান হাতটাকে অনুসরণ করে। এই রোগীকে নিয়ে এ ধরনের পরীক্ষা আগেও করেছি, কিন্তু কখনও সম্পূর্ণ সফল হই নি; এখনও যে সফল হব তা মোটেই ভাবি নি; কিন্তু কী আশ্চর্য—আমার হাতটা যেদিকে নাড়াতে লাগলাম তার হাতটাও দুর্বলভাবে সেই দিকেই নড়তে থাকল। তখনই স্থির করে ফেললাম, তার সঙ্গে কিছু কথা বলার ঝুঁকি নেব।

বললাম, "এম. ভল্‌ডিমার, আপনি কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?" তিনি জবাব দিলেন না, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম যে তার ঠোঁট দুটো কাঁপছে। তাতেই উৎসাহিত হয়ে আমি বার বার প্রশ্নটা করতে লাগলাম। তৃতীয় বার প্রশ্ন করার পরেই তার সারা দেহ ঈষৎ কাঁপতে শুরু করল; চোখের পাতা এমনভাবে আপনা থেকেই খুলে গেল যে গোলকের সাদা রেখাটাও বেরিয়ে পড়ল; ঠোঁট দুটি ধীরে ধীরে নড়তে লাগল, আর তারই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল মৃদুস্বরে ফিস্‌ ফিস্‌ করে উচ্চারিত কতকগুলি শব্দ।

"হ্যাঁ ;—এখন ঘুমিয়ে পড়েছি। আমাকে জাগাবেন না।—আমাকে এইভাবেই মরতে দিন !"

এ সময় তার হাতে পায়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম, সেগুলি আগের মতই শক্ত। ডান হাতটা আগের মতই আমার হাতকে অনুসরণ করল। আবার তাকে প্রশ্ন করলাম ঃ

"ম. ভলডিমার, এখনও কি আপনি বুকে যন্ত্রণা অনুভব করছেন ?"

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, কিন্তু আগের চাইতেও নিম্ন স্বরে ঃ

"কোন যন্ত্রণা নেই—আমি মরতে চলেছি।"

ঠিক তখনই তাকে আর বিরক্ত করা উচিত হবে না মনে করে ডা. এফ.—না আসা পর্যন্ত আর কিছুই বললাম না। কোন প্রক্রিয়াও করলাম না। তিনি এলেন সূর্যোদয়ের ঠিক আগে, এবং রোগী তখনও বেঁচে আছে দেখে অপরিসীম বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নাড়ি দেখে, ঠোঁটে আয়না ফেলে আমাকে অনুরোধ করলেন, স্বপ্ন-ভ্রমণকারীর সঙ্গে পুনরায়—কথা বলতে। তাই করলাম ; বললাম ঃ

"এম. ভলডিমার, এখনও ঘুমিয়ে আছেন কি ? অনেক কষ্টে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা জবাব বের হতে বেশ কয়েক মিনিট সময় লাগল। চতুর্থবার প্রশ্নটি করার পরে খুবই ক্ষীণ ও অস্পষ্ট স্বরে বললেন ঃ

"হ্যাঁ ; এখনও ঘুমিয়ে আছি—মরছি।"

ঠিক এই সময় ডাক্তাররা জানালেন, মৃত্যু না আসা পর্যন্ত এম. ভলডিমারকে কোন রকম বিরক্ত না করে সেই আপাত শান্ত অবস্থাতেই থাকতে দেওয়া উচিত, আর এবিষয়েও সকলে একমত হলেন যে মৃত্যুটা আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটবে। অবশ্য আমি নিজে স্থির করলাম তার সঙ্গে আর একবার কথা বলব, আর সেই মত আগের প্রশ্নটাই আর একবার করলাম।

আমার কথার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্ন-ভ্রমণকারীর মুখের উপর একটা স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা দিল। চোখ দুটো আপনা থেকেই খুলে গেল ; মণি দুটো উপরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল ; চামড়াটাতে একটা বিশ্রী সাদাটে রং ফুটে উঠল। আর দুই গালের ঠিক মধ্যিখানে যে গোলাকার জ্বর-ঠোসা দুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল সেটা সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। কথাটা বললাম এই কারণে যে ঠোসা দুটো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল এক ফুঁতে একটা মোমবাতিকে নিভিয়ে দেবার একটা দৃশ্য। সেই সঙ্গে উপরের ঠোঁটটা শুকিয়ে গিয়ে দাঁতের পাটিটা বেরিয়ে পড়ল, আর নীচের চোয়ালটা ঠুক করে একটা শব্দ করে এমনভাবে ঝুলে পড়ল যে ফুলে ওঠা কালো জিভটা সম্পূর্ণ দেখা যেতে লাগল। সেই সময় সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন সকলেই মৃত্যু-শয্যার দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত ; কিন্তু এই মুহূর্তে এম. ভলডিমারের মুখটা এতই বীভৎস হয়ে উঠেছিল যে সকলেই আঁতকে উঠে বিছানা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।

বুঝতে পারছি, এই কাহিনীর এমন একটা জায়গায় আমি পেঁচৌছি যেখানে প্রতিটি পাঠকের মনেই অবিশ্বাসের দোলা লাগবে। কিন্তু সব কথা আমাকে তো বলতেই হবে।

এম. ভল্‌ডিমারের দেহে তখন জীবনের ক্ষীণতম লক্ষণটুকুও ছিল না; তাকে মৃত মনে করে আমরা তাকে নার্সদের হেফাজতেই রাখতে যাচ্ছিলাম এমন সময় দেখা গেল জিভটা তীব্রভাবে কাঁপছে। সে কম্পন প্রায় এক মিনিট ধরে চলল। তারপরেই তার ঝুলেপড়া নিশ্চল চোয়ালের ভিতর থেকে একটা স্বর বেরিয়ে এল—সে স্বর বর্ণনা করার চেষ্টা বাতুলতামাত্র। হয়তো এমন মাত্র দু' তিনটি কথাই বলা যেতে পারে যেগুলি আংশিকভাবে সেই স্বর সম্পর্কে প্রযোজ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি বলতে পারি, সে স্বর ছিল কর্কশ, ভগ্ন ও ফাঁকা; কিন্তু সেই বীভৎস স্বর পুরোপুরিভাবে সব বর্ণনার অতীত, কারণ অনুরূপ কোন শব্দ আজ পর্যন্ত কোন মানুষের কর্ন-পটাহকে আঘাত করে নি। তথাপি সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছিল; এবং এখনও আমি মনে করি যে, সেই কন্ঠস্বরের মধ্যে এমন দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা দিয়ে তার অপার্থিব চরিত্র সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যায়। প্রথমত, মনে হয়েছিল যে সেই স্বরটা আমাদের—অন্তত আমার কানে বুঝি এসেছিল অনেক—অনেক দূর থেকে, বা কোন গভীর ভূ-গহ্বর থেকে। দ্বিতীয়ত, আমার মনে হয়েছিল সেই সঙ্গে যেন কোন আঠালো চট্‌চটে বস্তুর মত আমার স্পর্শেন্দ্রিয়কে ঢেকে দিচ্ছিল।

আমি "শব্দ" ও "স্বর" দুটো কথাই ব্যবহার করছি। আমি বলতে চাইছি, সেই শব্দের মধ্যে আশ্চর্য রকমের স্পষ্ট মাত্রা—ভাগ ছিল। অবশ্যই সকলের মনে আছে যে আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম, তিনি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন কিনা। তিনি বললেন:

"হ্যাঁ;—না;—আমি ঘুমাচ্ছিলাম, এবং এখন—আমি—মরতে চলেছি।"

কথাগুলি এতই স্পষ্ট ও বোধগম্য ছিল যে উপস্থিত সকলেই আতংকে কেঁপে উঠেছিলেন। মি. এল.—[ছাত্রটি] তো মূর্ছাই গেল। নার্স দুটি সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুতেই তাদের আর ফিরিয়ে আনা গেল না। আমার নিজের অবস্থাটা পাঠকদের বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টাই আমি করব না। প্রায় একটি ঘন্টা আমরা নীরবে—একটি কথাও না বলে—মিঃ এল-এর জ্ঞান ফিরিয়ে আনতেই ব্যস্ত ছিলাম। সে সুস্থ হয়ে উঠলে আমরা আবার এম. ভল্‌ডিমারের দিকে মনোযোগ দিলাম।

তিনি তখনও সম্পূর্ণ পূর্বাবস্থায়ই ছিলেন। একটিমাত্র ব্যতিক্রম, আয়নাতে আর শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন প্রতিফলন ঘটল না। হাত থেকে রক্ত নেবার চেষ্টাও ব্যর্থ হল। এখানে উল্লেখযোগ্য, সে হাতের উপরও তখন আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তার হাতকে আমার হাতের গতি অনুসারে চালাবার চেষ্টাও বৃথা

www.BDeBooks.blogspot.com

হল। এখন তার উপর মেস্মরিক প্রভাবের একমাত্র লক্ষণ হল। আমি যখনই প্রশ্ন করি তখনই তার জিভটা কাঁপতে থাকে। মনে হয় সে যেন কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। আমি ছাড়া অন্য কেউ কোন প্রশ্ন করলে কিন্তু সেটাও হচ্ছে না। যাই হোক, অনেক চেষ্টা করে অন্য নার্সের ব্যবস্থা করা হল এবং দশটার সময় মি. এল.—ও দুই ডাক্তার সহ আমরা বাড়ি থেকে চলে এলাম।

অপরাহ্নে সকলেই আবার তাকে দেখতে গেলাম। তার অবস্থা ঠিক একই রকম। বেশ বুঝতে পারলাম তাকে জাগিয়ে তুলে কোন লাভ হবে না। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, মেস্মরিক ক্রিয়ার প্রভাবেই মৃত্যুকে আটকে রাখা হয়েছে। এ অবস্থায় তাকে জাগিয়ে তোলা মানেই তার মৃত্যুর মুহূর্তকে ত্বরান্বিত করা।

সেই সময় থেকে গত সপ্তাহের শেষদিন পর্যন্ত—প্রায় সাত মাস—আমরা প্রত্যহ এম. ভল্‌ডিমারের বাড়িতে যাতায়াত করলাম। স্বপ্ন-ভ্রমণকারীর অবস্থা প্রায় একই রকম রইল। নার্সরা যথারীতি তার উপর নজর রেখে চলল।

শেষ পর্যন্ত গত শুক্রবার আমরা স্থির করলাম তাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করব। প্রথম দিকে চেষ্টাটা সফল হল না। প্রথম জাগার লক্ষণ দেখা গেল চোখের মণি কিছুটা নীচে নেমে আসার মধ্যে! লক্ষ্য করলাম, সেই সঙ্গে চোখ থেকে বের হল অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত প্রচুর হলুদ রংয়ের রসানি। ডা. এফ. তখন আমাকে একটা প্রশ্ন করতে বললেন। তাই করলাম।

"এম. ভল্‌ডিমার, এখন আপনার মনের ভাব বা বাসনা আমাদের একটু বুঝিয়ে বলতে পারবেন কি?"

মুহূর্তের মধ্যে তার গালের উপরকার গোলাকার স্বর-ঠোসাগুলি নতুন করে দেখা দিল; জিভটা কাঁপতে লাগল, বা মুখের মধ্যে জোরে ঘুরতে লাগল; আর শেষ পর্যন্ত সেই পূর্ববর্ণিত বীভৎস স্বরটা বেরিয়ে এল:

"ঈশ্বরের দোহাই!—শিগ্‌গির!—শিগগির—আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিন—নইলে, শিগগির!—আমাকে জাগিয়ে তুলুন!—শিগগির!—আমি আপনাদের বলছি যে আমি মরে গেছি!"

আমি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলাম; এক মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। তাকে জাগিয়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, আমার চেষ্টা সফল হবে। ঘরের সকলেই নিশ্চিত বুঝল, রোগী এখনই জেগে উঠবে।

অবশ্য আসলে যা ঘটল তার জন্য কোন মানুষই প্রস্তুত থাকতে পারে না—পারা অসম্ভব।

আমি দ্রুত মেস্মরিক ক্রিয়া চালাতে লাগলাম, আর লোকটির ঠোঁট থেকে নয়, জিভ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল "মৃত! মৃত" ধ্বনি। সঙ্গে

www.boighar.blogspot.com

সঙ্গে মাত্র এক মিনিট বা তারও কম সময়ের মধ্যেই তার গোটা দেহ আমার হাতের নীচেই কুঁকড়ে দুমড়ে একেবারে গুড়োগুড়ো হয়ে গেল। সকলের চোখের সামনেই বিছানার উপর পড়ে রইল একগাদা ঘৃণ্য পচা-গলা পদার্থ।

শেহেরজাদির সহস্র-ও-দ্বিতীয় কাহিনী

The Thousand-and-Second Tale of Scheherzade

সত্য উপন্যাস অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়কর—প্রাচীন প্রবচন।

সম্প্রতি প্রাচ্য দেশ সম্পর্কে কিছু গবেষণা-কার্য চালাতে গিয়ে আমাকে “টেল্-মি-নাউ ইজ-ইট-সো-অর-নট” নামক একখানি বই পড়তে হয়েছিল। সাইমন জোকাইডেন-এর “জোহার”-এর মতই এই বইখানিও ইয়োরোপে মোটেই পরিচিত নয় এবং আমি যতদূর জানি কোন আমেরিকানও তার লেখা থেকে কোন উদ্ধৃতি দেন নি। কিন্তু প্রথমোক্ত বইখানির কয়েকটি পৃষ্ঠা ওল্টাবার পরেই আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, “আরব্য রজনী” তে ওয়াজিরের কন্যা শেহেরজাদির ভাগ্যের কথা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তার ফলে সাহিত্য-জগৎ এতকাল আশ্চর্যজনকভাবে একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসেছিল; আর সে কাহিনীর যে শেষ পরিণতি সেখানে দেখানো হয়েছে সেটা সম্পূর্ণ বেঠিক না হলেও আরও অনেক দূর পর্যন্ত না টানার অপরাধে অপরাধী।

এই আকর্ষণীয় বিস্ময়টি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্যাদির জন্য অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আমি “ইজ-ইট-সো-অর-নট” বইটিই পড়তে বলব; তবে ইতিমধ্যেই আমি যদি সেই বইটিতে যা পেয়েছি তার একটি সংক্ষিপ্ত-সার তুলে ধরি তাহলে সকলেই আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি।

স্মরণ থাকতে পারে যে, এই কাহিনীগুচ্ছের প্রচলিত বিবরণে বলা হয়েছে, জনৈক বাদশা উপযুক্ত কারণেই বেগমের চরিত্রে সন্দিহান হয়ে তাকে মৃত্যুদন্ড দেন, এবং নিজের দাড়ি ও পয়গম্বরের নামে প্রতিজ্ঞা করেন—প্রতি রাতে রাজ্যের সব চাইতে সুন্দরী এক তরুণীকে সাদি করবেন এবং পরদিন সকালেই তাকে তুলে দেবেন ঘাতকের হাতে।

অনেক বছর ধরে অক্ষরে অক্ষরে এই প্রতিজ্ঞাকে পালন করে চলার পরে একদা অপরাহ্নে (সেটা যে নামাজের সময় তাতে কোন সন্দেহ নেই) তার প্রধান ওয়াজির এসে তার সঙ্গে দেখা করল। ওয়াজিরের কন্যার মনে একটা নতুন মতলব জেগেছিল।

তার নাম ছিল শেহেরজাদি, আর তার মতলবটা ছিল—হয় রূপের উপর এই প্রাণনাশকারী মাশুলের হাত থেকে গোটা দেশটা বাঁচাবে, আর না হয় তো সেই প্রচেষ্টায় প্রাণ দেবে।

তদনুসারে সেই কন্যা তার বাবা প্রধান ওয়াজিরকে পাঠাল বাদশার সঙ্গে তার সাদির প্রস্তাব করতে। বাদশা সাগ্রহে সেই পাণিগ্রহণ করলেন—(যে কোন অবস্থাতেই এই ইচ্ছা বাদশার মনে ছিল, শুধু ওয়াজিরের ভয়েই দিনের পর দিন সে ইচ্ছাকে পিছিয়ে দিচ্ছিলেন)—কিন্তু এখন পাণিগ্রহণের সময় তিনি সকলকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন, প্রধান ওয়াজিরই হোক আর যেই হোক স্বীয় প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুলও সরবার ইচ্ছা তার নেই। সুতরাং সুন্দরী শেহেরজাদি যখন বাদশাকে সাদি করতে চাইল এবং বাবার অনুরূপ পরামর্শ সত্ত্বেও সত্যি সত্যি তাকে সাদি করে বসল, তখনও—অন্তত আমি তাই বলব—সে তার সুন্দর কালো চোখ দুটিকে যথাসম্ভব খোলাই রেখেছিল।

অবশ্য দেখেশুনে মনে হয়, এই তীক্ষ্ণধী কন্যাটির (নিঃসন্দেহে সে মেকিয়াভেলি পড়েছিল) মনে একটি সরল ছোট গল্প উঁকি মেরেছিল। সাদির রাতেই কোন ওজুহাতে তা আমি ভুলে গেছি—সে ব্যবস্থা করে ফেলল যাতে তার বোনটি বাদশা—কোমের কৌচের এত সন্নিকটে আর একখানি কৌচ দখল করে বসতে পারে যাতে দুটি শয্যার মধ্যে সহজেই কথাবার্তা চালানো যেতে পারে; আর মোরগ ডাকার কিছু সময় আগেই সে তার স্বামী সেই ভালমানুষ বাদশাকে জাগিয়ে তোলার ব্যবস্থা করল অবশ্যই একটি কাহিনীর গভীর আকর্ষণে (মনে হয় একটা ইঁদুর ও একটা কালো বেড়ালের কিস্‌সা) যেটা সে বলতে লাগল (অবশ্যই চাপা গলায়) তার বোনকে। যখন দিনের আলো ফুটে উঠল তখন দেখা গেল কাহিনীটি সম্পূর্ণ শেষ হয় নি, আর শেহেরজাদিরও বিছানা ছেড়ে উঠে শরীরটাকে টান-টান করার সময় হয়ে গেছে—সে ভঙ্গীটা যে ফাঁসিতে ঝোলার চাইতে অধিক মনোরম তা নয়, তবে কিছুটা বেশী সৌখিন!

অবশ্য ততক্ষণে বাদশার মনে কৌতূহল জেগেছে, আর তার ফলে প্রতিজ্ঞাপূরণের সময়টা পরদিন সকাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া হল, যাতে তিনি পরের রাতে কালো বিড়াল ও ইঁদুরের গল্পের শেষটা শুনতে পারেন।

অবশ্য পরের রাত যখন এল তখন শেহেরজাদি কালো বিড়াল ও ইঁদুরের (ইঁদুরটা ছিল নীল রংয়ের) গল্পটা শেষ করলেও সেটা এমন একটা গল্পের সঙ্গে জড়িয়ে গেল যার কেন্দ্রে আছে একটা গোলাপি ঘোড়া (সবুজ পাখাওয়ালা) নীল চাবিতে দম দিলেই যেটা তীব্র গতিতে চলতে শুরু করে। এই গল্প শুনে বাদশা আগের গল্পের চাইতেও বেশী আকৃষ্ট হলেন এবং গল্প শেষ হবার আগেই ভোর হওয়ায় মৃত্যুর অনুষ্ঠানটি আরও চব্বিশ ঘন্টা পিছিয়ে দিলেন। পরের রাতেও সেই একই দুর্ঘটনা এবং একই পরিণতি দেখা দিল; এবং তার

পরবর্তী রাত—এবং তার পরবর্তী রাত; অতএব শেষ পর্যন্ত এক হাজার ও এক রাত সময়কালের মধ্যেও নিজের প্রতিজ্ঞা পালনের সুযোগ থেকে বাদশা অনিবার্যভাবে বঞ্চিত হলেন, তখন এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হয় তিনি সে প্রতিজ্ঞার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, অথবা স্বাভাবিক পথেই সে প্রতিজ্ঞার দায় থেকে মুক্তি পেলেন? অথবা (সেটাই অধিক সম্ভব) সেটাকে সরাসরিভাবেই ভঙ্গ করলেন। মোটকথা ঈভের বংশোদ্ভূতা হিসাবে শেহেরজাদি হয়তো সেই সাতটি গল্পের ঝুড়িরই অধিকারিণী হয়েছিল যেগুলি ঈভ ঈডেন-উদ্যান থেকে কুড়িয়ে নিয়েছিল; আমি বলতে চাই, শেষ পর্যন্ত শেহেরজাদিরই জয় হল এবং রূপের উপর থেকে প্রস্তাবিত কর তুলে নেওয়া হল।

এখন এই উপসংহারটি নিঃসন্দেহে খুবই সঙ্গত ও মনোহারী—কিন্তু, হায়! অনেক মনোহারী জিনিসের মতই সেটা যতটা মনোহারী ততটা সত্য নয়; এবং এই ভুল সংশোধনের উপায়টির জন্য আমি "ইজ-ইট-সো-অর-নট"-এর কাছেই সম্পূর্ণভাবে ঋণী।

সহস্র-ও-দ্বিতীয় রজনীতে শেহেরজাদি বলল, "প্রিয় বোনটি আমার (এখানে আমি "ইজ-ইট-সো-অর-নট"-এর ভাষাই অবিকল উদ্ধৃত করছি), এখন তো ফাঁসির সম্ভাবনটা সম্পূর্ণ উঠে গেছে, আর এই বাজে কর-ব্যবস্থাটাও রদ হয়েছে, তাই এখন আমার মনে হচ্ছে, বাদশাকে (দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে যে তিনি সারাক্ষণই নাক ডাকিয়ে ঘুমান যেটা কোন ভদ্রলোকই করেন না) এবং তোমাকে সিন্ধবাদ নাবিকের ইতিকথার সম্পূর্ণ উপসংহার থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে আমি অপরাধী। এই লোকটি আরও অসংখ্য চিত্তাকর্ষক অভিযানে গিয়েছিলেন কিন্তু আসল সত্য হল, সেই কাহিনী বলার রাতে আমার ঘুম পেয়েছিল, আর তাই আমি সেটাকে সংক্ষেপে বলেছিলাম; এটা গুরুতর অন্যায় কাজ; আশা করি সেজন্য আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সে অন্যায়ের প্রতিকার করার সময় এখনও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি—আর বাদশার নাকের ঐ ভয়ংকর শব্দটাকে বন্ধ করার জন্য তাকে জাগিয়ে তুলতে দু'একটা চিমটি কেটেই আমি তোমাদের মনোরঞ্জন করব এই বিখ্যাত গল্পের আসল পরিণতিটি শুনিয়ে।"

একথা শুনেও শেহেরজাদির বোন (এটা আমি "ইজ-ইট-সো-অর-নট" থেকেই পেয়েছি) খুব একটা খুশি হল না; কিন্তু যথেষ্ট চিমটি খেয়ে বাদশা নাক ডাকা বন্ধ করে বলে উঠলেন "হুম" ও "হু", আর কেমি সিন্ধবাদ নাবিকের ইতিকথায় প্রবেশ করল।

"অবশেষে আমার বৃদ্ধ বয়সে (এগুলি শেহেরজাদি কথিত স্বয়ং সিন্ধবাদেরই কথা) অনেক বছর শান্তিতে নিজের বাড়িতে বাস করার পরে আবার মনে জাগল দেশভ্রমণের বাসনা; এবং একদিন পরিবারের কাউকে না জানিয়ে খুব মূল্যবান অথচ অল্প জায়গায় ধরে এমন সব ব্যবসার মালপত্র কয়েকটা বান্ডিলে বেঁধে সেগুলিকে বয়ে

নেবার জন্য একটা বাহককে সঙ্গে নিয়ে সাগর-তীরে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে এমন একটা জাহাজের জন্য অপেক্ষা করে রইলাম যেটা আমাকে এ-রাজ্য ছেড়ে অন্য কোন অনাবিষ্কৃত দেশে নিয়ে যেতে পারবে।

“মালের বান্ডিলগুলো বালির উপর রেখে গাছের ছায়ায় বসে আমরা জাহাজের আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যে কোন জাহাজই চোখে পড়ল না। অবশেষে মনে হল যেন একটা অদ্ভুত গুন-গুন বা হুম্-হুম্ শব্দ শুনতে পেলাম ঃ বাহকও একটু কান পেতে থেকে জানাল শব্দটা সেও শুনতে পেয়েছে। ইতিমধ্যে শব্দটা ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগল ; তাতেই বুঝলাম যে শব্দকারী বস্তুটি আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। অবশেষে দিগন্তরেখায় দেখতে পেলাম একটা কালো কিছু ; দেখতে দেখতে আকারে বড় হতে হতে বুঝলাম, একটা বিরাট দৈত্য সারা শরীর দিয়ে সমুদ্রের বুকে সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে। বুকের ধাক্কায় বড় বড় ঢেউ তুলে সেটা অকল্পনীয় দ্রুতগতিতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে ; আর তার আসার পথের পিছনে সমুদ্রের অনেকটা দূর পর্যন্ত আলোয় আলো হয়ে আসছে।

“কাছে এলে সেটাকে আরও স্পষ্ট দেখতে পেলাম। সেটা দৈর্ঘ্যে তিনটে অত্যন্ত উঁচু গাছের সমান। আর প্রস্থে আপনার প্রাসাদের দরবার-কক্ষের মতই বড়। তার দেহটা মাছের মত হলেও পাথরের মত নিরেট, আর দেহের যে অংশটা জলের উপর ভাসছে সেটা পুরোপুরি ঘোর কালো ; শুধু তার চারদিক ঘিরে আছে একটা সরু রক্ত-লাল টান। তার পেটের যতটুকু মাঝে মাঝে জলের উপরে দেখা যাচ্ছে সেটুকু ধাতব আঁশ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢাকা, আর তার রং কুয়াসা-ঢাকা চাঁদের মত। পিঠটা সমতল এবং প্রায় সাদা ; সারা দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেকটা উঁচু ছটা মেরুদণ্ডাস্থি উপরের দিকে বাড়ানো।

“এই ভয়ংকর প্রাণীটির কোন মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না ; কিন্তু সেই ক্ষতি পুষিয়ে দিতে তার সারা শরীর জুড়ে ছিল দুই সারিতে সাজানো আশীটি চোখ ; সবুজ ড্রাগন-পতঙ্গের মত সেগুলি ছিল চক্ষু-গোলক থেকে বের করা ; রক্ত-লাল দাগটা ছিল যেন চোখের উপরকার ভুরু। ভয়ংকর চোখগুলোর মধ্যে দু’তিনটি ছিল অপেক্ষাকৃত বড়, আর দেখতে নিরেট সোনার মত।

“এই জন্তুটি আমাদের দিকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেও সেটা নিশ্চয়ই ছুটছিল যাদুবিদ্যার বলে—কারণ জন্তুটার না ছিল মাছের মত পাখনা, না হাঁসের মত লিপ্তাঙ্গুলি পা, না সামুদ্রিক ঝিনুকের মত পাখা ; আবার বাইন মাছের মত এঁকেবেঁকেও এগোচ্ছিল না। তার মাথা ও লেজ দেখতে ঠিক এই রকম, কেবল লেজের কাছাকাছি দুটো ছোট গর্ত নাকের ফুটোর কাজ করছে ; সেই ফুটোর ভিতর দিয়ে হিস্-হিস্ শব্দে তীব্র বেগে বেরিয়ে আসছে ঘন নিঃশ্বাসের ধারা।

“বীভৎস বস্তুটাকে দেখে আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেটা আরও কাছে এলে অধিকতর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, সেই প্রাণীটার পিঠে রয়েছে

প্রায় মানুষেরই আকার ও আকৃতির অসংখ্য জীব ; তাদের পরণে কোন পোশাক নেই, আছে শুধু অনেকটা কাপড়ের মত দেখতে একটা কুৎসিত অসুবিধাজনক আবরণ (প্রকৃতি-দত্ত) ; আবরণটা এত আঁটো করে চামড়ার সঙ্গে যুক্ত যে হতভাগ্য জীবগুলিকে দেখলে হাসি পায়, আবার তাতে তারা কষ্টও পাচ্ছে খুব। তাদের মাথার উপরে ছিল চৌকো মতন বাক্স ; প্রথমে সেগুলোকে পাগড়ির মত কিছু ভাবলেও অচিরেই দেখলাম সেগুলো অত্যন্ত ভারী ও নিরেট ; আমি তাই অনুমান করলাম জন্তুগুলোর মাথাকে ঘাড়ের উপর স্থির ও নিরাপদে রাখার উদ্দেশ্যেই বাক্সগুলিকে বসানো হয়েছে। প্রাণীগুলোর গলার চারদিকে আটকানো রয়েছে কালো কলার (নিঃসন্দেহে দাসত্বের চিহ্ন), ঠিক যে রকমটা আমরা কুকুরের গলায় বাঁধি ; অবশ্য এই কলারগুলো অনেক বেশী চওড়া ও অত্যন্ত শক্ত—ফলে এই অসহায় জীবগুলির পক্ষে শরীরটাকে না ঘুরিয়ে কেবল মাথাটাকে কোনদিকে ঘোরানো একেবারেই অসম্ভব। কাজেই চিরটা কাল নিজেদের নাকের ধ্যান করাই যেন তাদের নিয়তি।

"আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তার খুব কাছে তীরের দিকে পৌঁছেই দৈত্যটা হঠাৎ একটা চোখকে ঠেলে অনেকটা বের করে দিল, তার থেকে বেরিয়ে এল একটা ভয়ংকর আগুনের ঝলক, সঙ্গে ঘন ধোঁয়ার মেঘ, আর এমন একটা শব্দ যাকে বজ্র ছাড়া অন্য কিছুর সঙ্গেই তুলনা করতে পারি না। ধোঁয়া মিলিয়ে গেলে দেখলাম মানব-জন্তুদের একজন দাঁড়িয়ে আছে বড় জন্তুটার মাথার কাছে ; তার হাতে একটা ভেঁপু ; সেটা মুখে দিয়ে জোরালো কর্কশ স্বরে আমাদের উদ্দেশ্যে সে এমন কিছু বলতে লাগল যেটা পুরোপুরি নাকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে না এলে তাকে আমরা ভাষা বলেই ভুল করতাম।

"কি জবাব দেব কিছুই বুঝতে পারলাম না, কারণ সে কি বলেছিল তাই তো বুঝি নি। বিপদে পড়ে বাহকটির দিকে তাকালাম। তারও তখন ভয়ে মূর্ছা যাবার মত অবস্থা। তার কাছে জানতে চাইলাম, এটা কোন্ ধরনের দৈত্য, কি চায়, ওর পিঠের উপর যারা ভিড় করে আছে তারাই বা কোন্ শ্রেণীর জীব। সে জবাব দিল, এই সামুদ্রিক জন্তুর কথা সে আগেও শুনেছে, এটা খুব নিষ্ঠুর দৈত্য। এর পেট-ভরা গন্ধক, রক্তে আছে আগুন, মানুষকে দুঃখ দেবার জন্যই শয়তান জিন একে সৃষ্টি করেছে ; আর ওর পিঠের উপর যারা আছে তারা হল সব অনিষ্টকর মানুষ-কীট, অনেক সময় কুকুর বিড়ালকেও ধরে।

"এই কথা শুনে আর পিছনে না তাকিয়ে সটান দৌড় লাগালাম পাহাড়ের দিকে, আর আমার বাহক ছুটল বিপরীত দিকে। এই ভাবেই আমার সব মালপত্র নিয়ে সে হাওয়া হয়ে গেল।

"নিজের কথা বলি। মানুষ-কীটগুলি নৌকোতে চেপে তীরে নেমে আমার পিছু নিল এবং অচিরেই আমাকে ধরে ফেলল। আমার হাত-পা বেঁধে দৈত্যের হাতে তুলে দিল ; সঙ্গে সঙ্গে সে আবার সাঁতার কেটে মধ্য সমুদ্রে চলে গেল।

“এবার আমার ভীষণ অনুতাপ হতে লাগল, কেন আরামের বাড়ি-ঘর ছেড়ে মরতে এই অভিযানে বের হয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর অনুতাপ করা বৃথা। এখন একমাত্র চিন্তা—চাঁচা আপন প্রাণ বাঁচা। তখন থেকে আমি সেই ভেঁপুওয়ালা মানুষ-জন্তুটির মন পাবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কারণ আমার মনে হল সেই এই পালের গোদা। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার সে চেষ্টা এতদূর সফল হল যে সে আমাকে তাদের ভাষাটি পর্যন্ত শেখাতে শুরু করল। সহজেই সেই ভাষা বলতে ও বুঝতে শিখে গেলাম।

“একদিন খাবার পরে সে আমাকে বলল, ‘ওয়াশিশ স্কোয়াশিশ স্কুইক, সিন্‌বাদ, হে-ডিড্‌ল্‌ ডিড্‌ল্‌ গ্রান্ট আণ্ট গ্রাম্‌ব্‌ল্‌, হিস্‌, ফিস্‌, হুইস্‌।” কিন্তু আমি হাজার-বার ক্ষমা চাইছি—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে মহামান্য বাদশা “মোরগ-হ্রেষা”-দের (মানব-জন্তুদের এই বলেই ডাকা হয়। কারণ তাদের এই ভাষাই মোরগ ও ঘোড়াদের ভাষার যোগসূত্র) কথ্য ভাষার সঙ্গে পরিচিত নন। অতএব আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কথাগুলি অনুবাদ করে দিচ্ছি ঃ—‘প্রিয় সিন্‌বাদ, আমি জেনে সুখী হলাম যে আপনি খুব ভাল লোক; আমরা এখন পৃথিবী-পরিক্রমায় বেরিয়েছি; যেহেতু আপনিও পৃথিবীটা দেখতে ইচ্ছুক তাই এই জন্তুর পিঠে আপনাকেও বিনা ভাড়ায় একটা আসন দেওয়া হবে।”

“ইজ-ইট-সো-অর-নট”-এ লেখা আছে, কোন শেহেরজাদি এই পর্যন্ত বলার পরে বাদশা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পাশ ফিরে বললেন—

“প্রিয় বেগম, এটা খুবই বিস্ময়কর যে সিন্‌বাদের এই সব অভিযানের কথা তুমি আগে বাদ দিয়েছিলে। তুমি কি জান যে এগুলিকে আমি খুবই মজাদার ও বিস্ময়কর বলে মনে করি?”

বাদশার এই কথা শুনে শেহেরজাদি নিম্নোক্ত কথাগুলি দিয়ে পুনরায় তার ইতি-কথা শুরু করল ঃ—

“সিন্ধবাদ এই ভাবে তার কাহিনী বলেই চলল—মানব-জন্তুটির এই দয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানালাম; অচিরেই বিরাটদেহ জন্তুটির পিঠে চেপে আরামেই চলতে লাগলাম; সেও সমুদ্রের বুকে দুরন্ত গতিতে সাঁতার কাটতে লাগল। ঢেউয়ের উপর চলতে গিয়ে মনে হতে লাগল, কখনও পাহাড়ের মাথায় চড়ছি, আবার কখনও পাহাড়ের নীচে নামছি। এইভাবে চলতে চলতে অবশেষে আমরা বেশ কয়েক শ’ মাইল বড় একটা দ্বীপে উপস্থিত হলাম। শুঁয়ো পোকার মত একরকম ছোট ছোট প্রাণী (প্রবাল-কীট) একত্র হয়ে দ্বীপটাকে গড়ে তুলেছিল।”

বাদশা বলে উঠলেন, “হুম!”

“সিন্ধবাদ বলতে লাগল, সেই দ্বীপটা ছেড়ে আমরা হাজির হলাম আর একটা দ্বীপে। সে দ্বীপের গাছপালা পাথরের মত নিরেট; এত শক্ত যে কাঠে কোপ দিলে অত্যন্ত ভাল কুড়ুলও খান-খান হয়ে ভেঙে যায় (টেকসাসের অন্তর্গত পাসিগুনো নদীর উৎস-মুখে এরকম একটা প্রস্তরীভূত অরণ্য আছে)।

"হুম !" বাদশা আবার বললেন ; কিন্তু তাতে কান না দিয়ে শেহেরজাদি সিন্ধবাদের বাচনিকে বলেই চলল।

"সেই দ্বীপ ছাড়িয়ে আমরা এমন একটা দ্বীপে পেঁছিলাম যেখানে একটা গুহা ধরণীর অভ্যন্তরে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল ঢুকে গেছে ; তার ভিতরে এমন অনেক বড় বড় ও জাঁকজমকে ভরা প্রাসাদ আছে যা সারা দামাস্কাস ও বাগদাদ খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। সেই সব প্রাসাদের ছাদ থেকে ঝুলছে মানুষের চাইতেও বড় মাপের অসংখ্য মণি-মুক্তো-হীরে ; আর দুই ধারের গম্বুজ, পিরামিড ও মসজিদের ভিতরকার রাজপথ বরাবর বয়ে চলেছে—বড় বড় সব নদী ; তার জলের রং আবলুসের মত কালো ; তাতে সাঁতার কাটছে চক্ষুহীন মাছের দল (কেন্টাকি-তে এ রকম একটা বৃহৎ গুহা আছে)।

"হুম !" বাদশা বললেন।

"আমরা তখন সাঁতার কেটে সমুদ্রের এমন একটা অঞ্চলে গেলাম যেখানে আছে উত্তুঙ্গ পর্বত ; তার গা বেয়ে ঝরে পড়ছে এমন সব গলিত লাভার স্রোত যার মধ্যে অনেকগুলিই বারো মাইল চওড়া আর ষাট মাইল লম্বা (১৭৮৩ সালে আইসল্যাণ্ডে এরকমটা ঘটেছিল)। তার শিখরদেশের একটা অতলস্পর্শ গহ্বর থেকে এত বেশী পরিমাণ ছাই বেরিয়ে আসছিল যে আকাশ থেকে সূর্য সম্পূর্ণ ঢেকে গিয়েছিল ; ফলে সেই পাহাড় থেকে দেড়শ মাইল দূরে থেকেও চোখের খুব কাছে ধরেও খুব সাদা বস্তুও দেখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল (১৮১২ সালে সেন্ট ভিন্সেন্ট দ্বীপে একটা আগ্নেয়গিরি থেকে যে পরিমাণ ছাই ও বালি উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল তাতে গোটা বারবাডোজ অঞ্চল এমনভাবে ঢেকে গিয়েছিল যে দুপুর বেলাতেও একখানা সাদা রুমালকে চোখের ছ' ইঞ্চি দূরে ধরেও সেটা দেখাই যাচ্ছিল না)।

"হুম !" বাদশা বললেন।

"সে উপকূল ছেড়ে চলতে চলতে আমরা হাজির হলাম একটা উল্টো রকমের দেশে —কারণ সেখানে একটা প্রকাণ্ড হ্রদের জলের একশ' ফুটেরও নীচে দেখলাম সবুজ পাতায় ঢাকা একটা অরণ্য—সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে পাতায় ঢাকা সব বনস্পতি।"

"হু !" বাদশা বললেন।

"আরও প্রায় একশ' মাইল এগিয়ে এমন একটা আবহাওয়ার মধ্যে পেঁছে গেলাম যেখানে বাতাস এত ঘন যে আমাদের দেশে বাতাসে পালক যেমন ভাসে সেখানে লোহা বা ইস্পাতও সেই রকম ভেসে বেড়ায়।"

"ফিড্‌ল্‌ ডি ডী !" বাদশা বললেন।

"একই দিকে আরও চলতে চলতে পেঁছে গেলাম সারা পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে জমকালো অঞ্চলে। তার ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে কয়েক হাজার মাইল বিস্তৃত একটা বিখ্যাত নদী। তার গভীরতা বর্ণনাতীত, জল স্ফটিকের চাইতেও স্বচ্ছ। নদীটা তিন থেকে ছয় মাইল প্রশস্ত, দুই তীর সরল রেখায় খাড়া উঠে গেছে বারো শ' ফুট ;

সারি সারি চিরসবুজ গাছ ও সব ঋতুতে ফুটন্ত মিষ্টি গন্ধের ফুলের শোভা গোটা অঞ্চলকে করে তুলেছে একটা আশ্চর্য বাগান ; অথচ এমন একটি পত্রপুষ্প শোভিত রাজ্যের নাম আতংকের উদ্যান। আর সেখানে ঢোকা মানেই অনিবার্য মৃত্যু (নাইজার নদীর তীরবর্তী অঞ্চল।)”

“হাম্প!” বাদশা বললেন।

“অতিদ্রুত সে রাজ্য পার হয়ে গেলাম। কয়েক দিন চলার পরে আর একটা দেশ পেলাম যেখানে আছে কাস্তের মত শিংওয়ালা অসংখ্য দৈত্যাকার জন্তু। সেই বীভৎস জন্তুগুলো মাটিতে কোঁদালের মত গর্ত খুঁড়ে পাথর এনে তার চারিদিকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখে যে অন্য কোন জীবজন্তু সেখানে হানা দিলেই সেই পাথরের প্রাচীর হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে, আর জন্তুগুলি রাক্ষুসে গর্তের মধ্যে ছিটকে পড়ে ; সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যরা তাদের সব রক্ত চুষে খেয়ে কংকালটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় “মৃত্যু গহ্বর” থেকে অনেক দূরে (মিরমেলিয়ন নামক এক রকম বাঘা পিঁপড়ে)।

“পুঃ!” বাদশা বললেন।

“আরও এগিয়ে এক জায়গায় দেখলাম প্রচুর গাছ-গাছড়া মাটির বদলে বাতাসেই জন্মেছে ও বেঁচে আছে। সব চাইতে বিস্মিত হলাম একরকম ফুল দেখে যেগুলি জীবন্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস আছে, ইচ্ছামত চলাফেরা করতে পারে। আরও বিস্ময়কর— মানুষের মতই তারাও অন্য প্রাণীকে কৃতদাস করে রাখে, নিজেদের ইচ্ছাপূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বন্দী করে রাখে নির্জন কারাগারে।”

“লা!” বাদশা বললেন।

“সে দ্বীপ ছেড়ে এমন একটা দ্বীপে পৌঁছলাম যেখানে মৌমাছি ও পাখিরা সব এত বড় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান যে প্রতিদিন তারা রাজ্যের সব জ্ঞানী লোকদের জ্যামিতির পাঠ শেখায়। একবার সে দেশের রাজা দুটো খুব কঠিন সমস্যার সমাধানের জন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করলে সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধান করা হয়েছিল—একটা করেছিল মৌমাছিরা, অপরটা পাখিরা। রাজা কিন্তু সমাধান দুটিকে গোপন রাখলেন। তারপর অনেক পরিশ্রমে অনেক গবেষণা হল, সংখ্যাতীত বড় বড় পুঁথি লেখা হল, অনেক বছর কেটে গেল, অবশেষে মানব গণিতিকরা সেই একই সমাধানে উপনীত হল।”

“ওরে আমার!” বাদশা বললেন।

“এ রাজ্যটা দৃষ্টির বাইরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা রাজ্যে গিয়ে পড়লাম। তার তীর থেকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে এল এক ঝাঁক মোরগ-মুরগি ; সে ঝাঁকটা প্রায় এক মাইল চওড়া ও আড়াইশ' মাইল লম্বা ; প্রতি মিনিটে এক মাইল গতিতে উড়েও পুরো ঝাঁকটা আমাদের পার হতে লাগল চার ঘন্টা সময়— ঝাঁকটাতে ছিল লক্ষ লক্ষ পক্ষি।”

“ওঃ ফাই!” বাদশা বললেন।

"এই পাখিদের উৎপাতের হাত এড়াতে না এড়াতেই দেখা দিল নতুন উৎপাত—আর এক ধরনের মোরগের আবির্ভাব ; যে সব রক পাখি পূর্বেকার যাত্রাকালে দেখেছিলাম এরা আকারে তাদের চাইতে অনেক বড়। আপনাদের তুরস্কের খলিফার প্রাসাদের সব চাইতে বড় গম্বুজটার চাইতেও বড়। সেই ভয়ংকর মোরগটার কোন মাথা চোখে পড়ে নি—একটা পেট সর্বস্ব পাখি—মোটা, গোলাকার, চকচকে মসৃণ পদার্থ দিয়ে তৈরী, আর সারা গায়ে নানা রঙের দাগ টানা। পক্ষি-দানবটা তার নখরে আটকে একটা বাড়িকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে উঁচু আকাশে তার পাহাড়ি বাসায়। বাড়ির ছাদটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, ফলে বাড়ির ভিতরকার কতকগুলি ভীত ত্রস্ত অসহায় মানুষকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। পাখিটা ভয় দেখাতে আমরা প্রাণপণে চেঁচাতে লাগলাম, কিন্তু পাখিটা রেগে গিয়ে একবার নাক ডাকিয়ে একটা বালি ভর্তি বস্তা আমাদের মাথার উপর ফেলে দিল।"

"বাজে জিনিস !" বাদশা বললেন।

"তারপরেই দেখা পেলাম বহুদূরবিস্তৃত শক্ত মাটির একটা মহাদেশ ; অথচ সেটাকে সম্পূর্ণভাবে বসানো ছিল ন্যূনপক্ষে চার শ' শিংবিশিষ্ট একটা আকাশ-নীল গরুর পিঠের উপর (পৃথিবীটাকে ধারণ করে আছে চারশ' শিংবিশিষ্ট একটা নীল গাই'—সালের কোরাণ)।"

বাদশা বললেন, "এটা আমি বিশ্বাস করি, কারণ এই রকম একটা কথা আমি আগেও বইতে পড়েছি।"

"আরও কয়েক ঘন্টা চলার পরে একটা আশ্চর্য দেশে পেঁছে গেলাম। মানব-জন্তুটি জানাল এটা তার নিজের দেশ, এখানে তার মত জীবরাই বাস করে। একথা শুনে মানব-জন্তুটির উপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, কারণ আমি বুঝতে পারলাম এরা খুব শক্তিশালী যাদুকরের জাতি ; তাদের মাথায় বুদ্ধির পোকা বাস করে।"

"বাজে কথা !" বাদশা বললেন।

"সেই যাদুকরদের সঙ্গে বাস করত আরও কয়েক শ্রেণীর বিচিত্র প্রাণী ; যেমন সেখানে একটা মস্ত বড় ঘোড়া ছিল যার হাড়গুলো লোহার আর রক্ত হল ফুটন্ত জল। শস্যের বদলে সে খেত কালো পাথর ; অথচ এত শক্ত খাদ্য খেয়েও সে এতই শক্তিশালী ও দ্রুতগতি ছিল যে এই শহরের সব চাইতে বড় মন্দিরটা অপেক্ষা অধিক ভারি একটা বোঝা সে টানতে পারত অধিকাংশ পাখির চাইতে দ্রুততর গতিতে (গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের লণ্ডন থেকে এক্সেটার পর্যন্ত ট্রেনের গতি ওঠে ঘণ্টাপ্রতি ৭১ মাইল। ৯০ টন ওজনের একটা ট্রেন প্যাডিংটন থেকে ডিটকট (৫৩ মাইল) যায় ৫১ মিনিটে) !"

"টোয়াট্‌ল্ !" বাদশা বললেন।

"এই সব লোকের মধ্যে আমি একটা পালকহীন মুরগিও দেখেছি। সেটা উটের চাইতে বড়। হাড়-মাংসের বদলে তার দেহে ছিল লোহা ও ইঁট ; ঘোড়ার মত তার

রক্ত ছিল ফুটন্ত জল; কাঠ বা কালো পাথর ছাড়া আর কিছুই সে খেত না। এই মুরগিটা দিনে একশ'টা বাচ্চা দিত; জন্মের পরে বাচ্চাগুলি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মায়ের পাকস্থলিতেই বাস করত।"

"ফল্ লল্!" বাদশা বললেন।

"এই জাতির এক মহান যাদুকর পিতল, কাঠ ও চামড়া দিয়ে এমন একটা মানুষ তৈরী করেছিল যে দাবা খেলার একমাত্র খলিফা হারুণ অল-রশিদ ছাড়া অন্য সব মানুষকেই হারিয়ে দিতে পারত। অপর এক যাদুকর ঐ একই মাল মশলা দিয়ে এমন একটি জীব তৈরী করেছিল যে তার সৃষ্টিকর্তাকে পর্যন্ত টেক্কা দিতে পারত। তার বুদ্ধির দৌড় এত বেশী ছিল যে এক সেকেণ্ডের মধ্যে সে এত বড় একটা হিসাব কষে দিত যা করতে পঞ্চাশ হাজার রক্ত-মাংসের মানুষের মিলিত পরিশ্রমেও তফাত একটা বছর (ক্যালকুলেটিং মেসিন)। আরও এক আশ্চর্য যাদুকর মানুষও নয় পশুও নয় এমন একটি বস্তু তৈরী করেছিল; তার মস্তিষ্ক ছিল সীসে ও কালো পিঠের সংমিশ্রণে তৈরী; তার আঙুলের ছিল এত গতি ও দক্ষতা যে এক ঘন্টার মধ্যে কোরাণের বিশ হাজার কপি লিখতে তার কোন অসুবিধাই হত না। এই জিনিসটি এত বেশী শক্তিশালী ছিল যে এক নিঃশ্বাসে একটা সাম্রাজ্য সে গড়তেও পারত, আবার ভাঙতেও পারত; কিন্তু তার সে শক্তি ভাল ও মন্দর জন্য সমানভাবে ব্যবহৃত হত!"

"হাস্যকর!" বাদশা বললেন।

"যাদুকর জাতির একজনের শিরায় ছিল গিরগিটির রক্ত। অপর একজন অনায়াসেই কোন ধাতুকে সোনায় পরিবর্তিত করতে পারত। আর একজনের হাতের কাজ এতই সূক্ষ্ম ছিল যে সে একটা অদৃশ্য তারই তৈরী করেছিল।"

"অবাস্তব!" বাদশা বললেন।

"যাদুকরদের আর একজন কেউ কখনও দেখে নি এমন একটা তরল পদার্থের সাহায্যে তার বন্ধুর মৃতদেহকে এমনভাবে চালাতে পারত যে তার ইচ্ছামত তারা হাত ঘুরাত, লাথি মারত, যুদ্ধ করত! এমন কি উঠে দাঁড়িয়ে নাচত। আর একজন অনুশীলনের দ্বারা তার কণ্ঠস্বরকে এতই শক্তিশালী করে তুলেছিল যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তা শোনা যেত (ইলেকট্রো টেলিগ্রাফ)। আর একজনের হাত এত লম্বা ছিল যে দামাস্কাসে বসে সে বাগদাদে বা অন্য যে কোন দূরস্থানে চিঠি লিখতে পারত (ইলেকট্রো টেলিগ্রাফ মুদ্রণ যন্ত্র)। অপর একজনের হুকুমমত আকাশ থেকে বিদ্যুৎ কেন এসে তার হাতে পুতুলের মত খেলা করত। একজন তো গরম উনুনে বরফ বানাত। একজন দুটো আলো থেকে অন্ধকার বানাতো। একজন সূর্যকে হুকুম করল তার প্রতিকৃতি আঁকতে, সূর্য তাই করে দিল।"

"অস্বাভাবিক!" বাদশা বললেন।

স্বামীর বার বার বিঘ্ন সৃষ্টিতে বিচলিত না হয়ে শেহেরজাদি বলতে লাগল, "এই সব অতুলনীয় মহান ও জ্ঞানী যাদুকরদের স্ত্রী-কন্যারা যেন সুরুচি ও সুষ্ঠুতার প্রতীক ; কিন্তু এমন একটা দুঃখময় নিয়তি তাদের উপর নেমে এসেছে যার হাত থেকে তাদের স্বামী ও পিতাদের অলৌকিক শক্তিও তাদের বাঁচাতে পারে নি। সেই নিয়তি এসেছে নানা রূপে, কিন্তু যে নিয়তির কথা আমি বলেছি সেটা এসেছে একটা খেয়ালের বশে।"

"কিসের বশে ?" বাদশা বললেন।

"একটা খেয়াল," শেহেরজাদি বলল। যে বদমাস শয়তানটা সব সময়ই ক্ষতি করতে তৎপর সে এই সব রুচিশীলা মহিলাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে যে পিঠের নিম্নাংশটা যত বেশী স্ফীত হবে ততই তাকে সুন্দরী দেখাবে। সৌন্দর্যের পূর্ণতা কুঁজের বৃদ্ধির সমানুপাতিক। এই খেয়াল দীর্ঘদিন চালু থাকায় এবং সে দেশে তাকিয়া খুব সস্তা হওয়ায় একটি নারী ও কুঁজো উটের মধ্যে পার্থক্য করার দিন অনেক কাল হল চলে গেছে—"

"থাম !" বাদশা বললেন, "আমি আর সহ্য করতে পারছি না, সহ্য করব না। তোমার মিথ্যা শুনতে শুনতে আমার মাথা ধরে গেছে। মনে হচ্ছে যেন ভোরও হয়ে আসছে। কতক্ষণ আগে আমাদের সাদি হয়েছে ? আমার বিবেক গোলমাল শুরু করেছে। তার উপর এই কুঁজ—তুমি কি আমাকে একটা আকাট ঠাউরেছ ? মোট কথা, তুমি উঠে পড় আর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মর।"

"ইজ-ইট-সে-অর-নট" পড়ে জেনেছি, এই কথাগুলি শুনে শেহেরজাদি যুগপৎ দুঃখিত ও বিস্মিত হল। কিন্তু বাদশাকে সে ভাল করেই জানত ; জানত যে তার কথার নড়চড় হবে না ; তাই সে হাসিমুখে স্বীয় নিয়তিকে মেনে নিল। অবশ্য ফাঁসটা এঁটে আসার সময় এই ভেবে সে সান্ত্বনা লাভ করল যে ইতিকথার অনেক কথাই না-বলা থেকে গেল ; আর তার পশু-প্রকৃতির স্বামীর খিটখিটে মেজাজটিই তাকে এনে দিয়েছে একটি উপযুক্ত পুরস্কার—আরও অনেক কল্পনাতীত অভিযানের কথা সোনার সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে।

জলভ্রমিতে অবতরণ

A Descent into the Maelstrom

ততক্ষণে আমরা উঁচু পাহাড়টার একেবারে শীর্ষে পৌঁছে গেছি।

শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন, "আরও কিছু দিন আগে হলে আমি তোমাকে এবং আমার কনিষ্ঠ সন্তানটিকে এই পথটা দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু প্রায় তিন বছর হল এমন একটি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছিল যা আগে কখনও কোন

মানুষের জীবনে ঘটে নি—অন্তত ঘটে যাবার পরে তার কথা বলার জন্য বেঁচে থাকে নি—আর তখন ছয় ঘণ্টা ধরে যে মারাত্মক ত্রাস আমাকে সহ্য করতে হয়েছিল সেটাই আমাকে দেহে-মনে ভেঙ্গে একেবারে খান-খান করে দিয়েছে। তুমি ভাবছ আমি খুব বুড়ো মানুষ—কিন্তু আমি তা নই। একটা পুরো দিনও লাগে নি আমার, আমার মাথার কুচকুচে কালো চুলকে সাদা করতে, আমার হাত-পাকে দুর্বল করতে, স্নায়ুকে শিথিল করে দিতে। আজ আমি একটু পরিশ্রম করলেই কাঁপতে থাকি, একটা ছায়াকে দেখে ভয় পাই। তুমি কি জান যে এই ছোট পাহাড়টার দিকে তাকালেই আমার মাথাটা ঘুরে যায়?”

বিশ্রাম নেবার জন্য যে “ছোট পাহাড়টার” কিনারায় তিনি এমন অসতর্কভাবে নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছিলেন যে তার দেহের ভারী অংশটাই ঝুলে পড়েছিল, আর পাহাড়ের একেবারে পিচ্ছিল শেষ প্রান্তটির উপরে রাখা কনুইয়ের জোরেই তিনি নীচে পড়ে যান কি রকম করে কালো পাথরের সেই ছোট পাহাড়টা নীচের পাহাড়গুলি থেকে একেবারে খাড়া উঠে গেছে প্রায় পনেরো ষোল শ’ ফুট উচ্চতায়। কোন কিছুর লোভেই আমি তো পাহাড়ি প্রান্তের দু’ গজের মধ্যে যেতাম না। সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধুর সেই বিপজ্জনক অবস্থা দেখে আমি এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম যে সটান জমিতে শুয়ে পড়ে চারদিকের ঝোপকেই আঁকড়ে ধরে ছিলাম। চোখ মেলে একবার আকাশের দিকে তাকাতেও সাহস পাই নি। বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পরে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে উঠে বসলাম এবং দূরের দিকে তাকাতে পারলাম।

পথ-প্রদর্শক বললেন, এই সব অসার কল্পনা তোমাকে জয় করতেই হবে। কারণ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি যাতে যে ঘটনাটির কথা তোমাকে বলেছি সেই জায়গাটাকে তুমি খুব ভালভাবে দেখতে পাও—এবং সেই অকুস্থলটিকে তোমার চোখের ঠিক নীচে রেখে সমস্ত কাহিনীটা তোমাকে বলতে পারি।”

নিজস্ব ভঙ্গীতে তিনি বলতে লাগলেন, “এখন আমরা আছি নরওয়ে উপকূলের কাছাকাছি—৬৮ ডিগ্রি লঘিমায়—নর্ডল্যান্ড প্রদেশে—ভয়ংকর লকোডেন জেলায়। যে পাহাড়টির চূড়ায় আমরা বসে আছি সেটা মেঘে ঢাকা হেল্‌সেগেন। এবার নিজেকে একটুখানি তোল—যদি মাথা ঘুরবে বলে মনে হয় তাহলে ঘাসটাকে চেপে ধরে থাক—ঐ ভাবেই—এবার নীচেকার বাষ্প-বলয়ের ও পাড়ে দূর সমুদ্রের দিকে তাকাও।”

মাথা-ঘোরা অবস্থাতেই তাকালাম; দেখতে পেলাম দূর-বিস্তার সমুদ্রের নীল জলরাশি; সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল নিউবীয় ভৌগোলিকের “মারে টেনেব্রারাম”-এর বিবরণ। এর চাইতে অধিক শোচনীয় বিষণ্ণতার একটা পূর্ণ দৃশ্য মানুষের কল্পনার অতীত। যতদূর চোখ যায় ডাইনে ও বাঁয়ে পৃথিবীর প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে ভয়ংকর রকমের কালো ঝুঁকে পড়া পাহাড়ের শ্রেণী; সেই বিষণ্ণতাকে বুঝি বা আরও বেশী স্পষ্ট করে তুলেছে পাহাড়ের সফেদ ভৌতিক চূড়ার উপর সশব্দে আছড়ে পড়া সমুদ্র-তরঙ্গের অবিশ্রাম আর্তনাদ। পাহাড়ের যে প্রান্তভাগের উপর আমরা

ছিলাম ঠিক তার উল্টোদিকে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল দূরে সমুদ্রের বুকে দেখা যায় একটা ছোট নির্জনপ্রায় দ্বীপ। স্থলভাগের দিকে প্রায় দুই মাইল কাছে আরেকটা অপেক্ষাকৃত ছোট দ্বীপ দেখা যায় ; ভীষণ রকমের পর্বতসংকুল ও অনুর্বর ; তাকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলি কালো পাহাড়ের সারি। অধিক দূরবর্তী দ্বীপ এবং উপকূল-রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলের সমুদ্রের চেহারাটি কেমন যেন অস্বাভাবিক। সেই সময়ে একটা প্রচন্ড ঝড় বয়ে চললেও সমুদ্রে সেরকম বড় ঢেউ ছিল না, আর পাহাড়গুলির কাছাকাছি ছাড়া অন্য কোথাও সেরকম ফেনাও ছিল না।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, “দূরের দ্বীপটাকে নরওয়ের লোকরা বলে ভুড়্‌ঘ”। মাঝখানেরটার নাম “মস্‌কো”। মাইলখানেক উত্তরেরটা “আম্‌পরেন”। ঐ যেগুলো দেখা যাচ্ছে তারা হল ইস্‌লেসেন, হট্‌ম্‌, কিল্ডহেম্‌, সুয়ার্‌ভেন ও বাক্‌হম। আরও দূরে—মস্‌কো ও ভুড়্‌ঘ-এর মাঝখানে— আছে ওটারহম, ফ্লিমেন, স্যান্ডফ্লেসেন, ও স্টকহম। এ সবই জায়গাগুলোর আসল নাম—কিন্তু এই নামকরণের প্রয়োজন কেন হয়েছিল সেটা তুমি বা আমি কেউ বুঝতে পারি না। কিছু কি শুনতে পাচ্ছ? জলের কোন পরিবর্তন কি দেখতে পাচ্ছ?”

প্রায় দশ মিনিট হল আমরা হেল্‌সেগেনের মাথায় উঠেছি লফডেনের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে ; কাজেই পাহাড়ের মাথায় ওঠামাত্র সমুদ্রটা হঠাৎই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবার আগে পর্যন্ত আমরা বারেকের জন্যও সমুদ্রকে দেখি নি। বৃদ্ধ কথা বলতে বলতেই আমার কানে এল ক্রমবর্ধমান একটা উচ্চ শব্দ—আমেরিকার বিস্তীর্ণ তৃণভূমিতে একপাল মোষের আর্তনাদের মত। ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম, নাবিকরা যাকে সমুদ্রের “আলোড়ণকারী” চরিত্র বলে থাকে সেটা অতি দ্রুত একটা পূর্বগামী স্রোতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমার চোখের সামনেই সেই স্রোতে প্রচণ্ড গতিবেগ সঞ্চারিত হল। প্রতিটি মুহূর্তে বাড়তে লাগল গতির প্রচণ্ডতা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভুড়্‌ঘ্‌ পর্যন্ত গোটা সমুদ্রটাই যেন চাবুকের আঘাতে বল্গাহীন ক্রোধে ফুঁসতে লাগল ; কিন্তু এই উচ্ছ্বাসটা মস্‌কো এবং উপকূলের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই দেখা গেল। এখানকার বিপুল জলরাশি যেন প্রকান্ড আলোড়নের ফলে হাজার পরস্পরবিরোধী স্রোতধারায় বিভক্ত হয়ে সহসা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে—উদ্বেলিত, ফুটন্ত, হিস্‌-হিস্‌ শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ; সবগুলি স্রোতধারা ফুলে-ফেঁপে যে প্রচণ্ড দ্রুততায় পূর্বদিকে বয়ে চলেছে, একমাত্র জলপ্রপাত ছাড়া জলের সে দ্রুততা কখনও কোথাও দেখা যায় নি।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে দৃশ্যের আমূল পরির্তন দেখা দিল। জলের উপরিভাগ কিছুটা শান্ত হয়ে এল. জলভ্রমিগুলো একে একে অদৃশ্য হল. যেখানে ফেনা মোটেই ছিল না সেখানে দেখা দিল প্রচুর ফেনার রেখা। শেষ পর্যন্ত সেই ফেনাগুলি বহুদূরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল, সবগুলি একত্র হয়ে শান্ত ঘূর্ণ্যাবর্তের ঘূর্ণ্যমান গতির রূপ নিল। মনে হল, সেটা যেন বৃহত্তর ঘূর্ণ্যাবর্তের অংকুর। হঠাৎ—খুবই হঠাৎ—সেটা যেন এক মাইলেরও অধিক ব্যাসার্ধের একটা বৃত্তের আকারে বাস্তবায়িত হয়ে উঠল।

ঘূর্ণ্যাবর্তের চারদিক ঘিরে বিচ্ছুরিত জলকণার একটা চওড়া বেষ্টনী ; কিন্তু তার একটি কণাও সেই ভয়ংকর ফোঁদলের মুখের উপর ছিটকে পড়ছে না। যতদূর চোখে দেখা যায়, ভিতরকার সেই মসৃণ, ঝকঝকে, ঘন কালো রঙের জলের প্রাচীরটা পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণে দিগন্তের দিকে ঈষৎ হেলে ঘুরতে ঘুরতে তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে, আর বাতাসের মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে একটা ভয়ংকর শব্দ ; তাতে মেশানো কিছুটা আর্তনাদ, আর কিছুটা গর্জন—নায়েগারার প্রচণ্ড জলপ্রপাতও কখনও তেমন ভয়ংকর শব্দে তার যন্ত্রণাকে ঈশ্বরের দিকে তুলে ধরে না।

পাহাড়টা যেন তার মূলশুদ্ধ কেঁপে উঠল ; পাথরগুলো দুলতে লাগল। আমি উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম, স্নায়বিক উত্তেজনার আধিক্যে যৎসামান্য ঝোঁপ-লতা যা পেলাম তাকে আঁকড়ে ধরলাম।

শেষ পর্যন্ত আমি বুড়ো মানুষটিকে বললাম, “এটা মালস্ট্রোমের বিরাট ঘূর্ণ্যাবর্ত ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।”

বুড়ো বললেন, “এটাকে অনেক সময় এই নামই দেওয়া হয় বটে। আমরা নরওয়ের লোকরা একে বলি মস্‌কো—স্ট্রোম।”

এই ঘূর্ণ্যাবর্তের যে সব সাধারণ বিবরণ পাওয়া যায় তা জানা থাকলেও এখন যা চোখে দেখলাম তার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। জোনাস র‍্যামাস-এর বিবরণ পড়ে এই ঘটনার যে মহত্ত্ব, বা তার আতংক,—অথবা হতবুদ্ধিকর নতুনত্ব দর্শককে স্তম্ভিত করে ফেলে তার ক্ষীণতম ধারণাও পাওয়া যায় না। আমি সঠিক জানি না কোথা থেকে বা কোন্‌ সময়ে লেখক আলোচ্য ঘটনাটিকে দেখেছিলেন ; কিন্তু সেটা যে হেল্‌সেগেন-এর উপর থেকে নয়, অথবা ঝড়ের সময়ে নয় সেটা নিশ্চিত। তথাপি সেই দৃশ্যের ধারণাটা অত্যন্ত দুর্বলভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকলেও তার বিবরণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

তিনি লিখেছেন, ‘‘লকডেন ও মস্‌কোর মধ্যবর্তী অঞ্চলের জলের গভীরতা ছত্রিশ থেকে চল্লিশ ফ্যাদমের মধ্যে ; কিন্তু অন্য পাশে, ভের (ভুড়্‌ঘ)-এর দিকে জলের গভীরতা এত কম যে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যাবার ঝুঁকি না নিয়ে কোন জাহাজ সহজভাবে সেখান দিয়ে চলতে পারে না ; অত্যন্ত শান্ত আবহাওয়াতেও সে রকম দুর্ঘটনা ঘটে। জোয়ারের সময় লকডেন ও মস্‌কোর ভিতর দিয়ে স্রোত বইতে থাকে উত্তাল গতিতে ; কিন্তু প্রবল ভাটার সময় সেই স্রোত এমনভাবে গর্জন করে সমুদ্রের দিকে বইতে থাকে যে সবচাইতে বেশী গর্জনকারী ও ভয়ংকর জলপ্রপাতের শব্দও তার সমান কখনও হতে পারে না ; সে শব্দ কয়েক লীগ (এক লীগ=প্রায় তিন মাইল) দূর থেকে শোনা যায় ; তার গহ্বর এত বড় ও গভীর যে কোন জাহাজ তার টানের মধ্যে পড়লে অনিবার্যভাবে একেবারে তলদেশে তলিয়ে যায়, এবং সেখানে পাথরে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ; পরে জল শান্ত হলে সেই ভাঙা টুকরোগুলো পুনরায় ছিটকে পড়ে জলের উপরে। কিন্তু সে রকম শান্ত অবস্থা দেখা যায় কেবলমাত্র জোয়ার-ভাটার মুখে, আর শান্ত আবহাওয়ার সময় ; আর সে রকম অবস্থায় থাকে মাত্র

মিনিট পনেরো সময়। জলস্রোত যখন সব চাইতে বেশী শব্দমুখর হয়ে ওঠে এবং ঝড়ের ফলে তার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পায়, তখন তার থেকে এক নরওয়ে—মাইলের মধ্যে আসাও বিপজ্জনক। কত নৌকো, ইয়াট, আর জাহাজ যে সতর্ক হয়ে না চলার দরুন তার টানে তলিয়ে গেছে! কোন তিমি যখন তার কাছাকাছি এসে একবার সেই স্রোতের খপ্পড়ে পড়ে, তখন আত্মরক্ষার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সে বেচারি যে ভাবে আর্তনাদ করতে থাকে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। একদা একটা ভালুক লকডেন থেকে মস্কো সাঁতরে পার হতে গিয়ে স্রোতের টানে তলিয়ে যেতে যেতে যে ভাবে গর্জন করেছিল তা তীর থেকেও শোনা গিয়েছিল। বড় বড় ফার ও পাইন গাছের কাণ্ডগুলি সেই ঘূর্ণাবর্তে তলিয়ে গিয়ে আবার যখন ভগ্ন, ছিন্ন অবস্থায় উপরে উঠে আসে তখন মনে হয় তার গায়ে বুঝি লোমের কুঁচি গজিয়েছে। ১৬৪৫ সালে "সেক্সাগোসিমা" রবিবার খুব সকালে এই ঘূর্ণাবর্ত এত সশব্দ ও উদ্দাম হয়ে উঠেছিল যে উপকূলবর্তী বাড়িগুলির পাথর পর্যন্ত মাটিতে ছিটকে পড়েছিল।"

ভাল মানুষ যোনাস র‍্যামাসের এই বিবরণ আমার কাছে নানা কারণেই গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। আর তিমি ও ভালুকের গল্প তো নিতান্তই হাস্যকর। বড় বড় জাহাজই যেখানে ঝড়ের মুখে পালকের মত তলিয়ে যায়, সেখানে তিমি ও ভালুক তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে মরবে সে আর বেশী কথা কি!

কারচার ও অন্যরা মনে করেন, মালস্ট্রামের জলের নীচে ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা অতলস্পর্শ গহ্বর পৃথিবীর ভিতর দিয়ে ঢুকে অনেক দূরবর্তী কোন অঞ্চলে গিয়ে আবার বাইরে আত্মপ্রকাশ করেছে—কেউ কেউ বোথ্‌নিয়া উপসাগরের নামও করেছেন। বস্তুত অলস কল্পনা হলেও সেই সময়ে আমার মনও এই অভিমতেই সায় দিয়েছিল; কিন্তু পথ-প্রদর্শককে সে-কথা বলতেই তিনি বলে উঠলেন, যদিও নরওয়েবাসীরা প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে এই অভিমতটাকেই স্বীকার করে, তথাপি এটা তার নিজস্ব মত নয়।

তারপরেই তিনি বললেন, "জলভ্রমিটাকে তো বেশ ভাল করেই দেখলে, এখন যদি পাহাড়টাকে পরিক্রমা করে অন্য দিকে যাও যেখানে বাতাসটা সরাসরি যায় না, এবং জলের এই গর্জনকে বন্ধ কর, তাহলে তোমাকে এমন একটি কাহিনী বলব যাতে তোমারও প্রত্যয় হবে যে এই মস্‌কো-স্ট্রাম সম্পর্কে আমার কিছু জানারই কথা।"

তার ইচ্ছামত কাজ করলাম, আর তিনিও বলতে শুরু করলেন।

"আমার ও আমার দুই ভাইয়ের এক সময় প্রায় সত্তর টন মালের একটা স্কুনার-টানা এক মাস্তুলের জাহাজ ছিল। সেটা নিয়ে আমরা প্রায়ই মস্‌কো ছাড়িয়ে ভুড়্‌ঘ্‌-এর কাছাকাছি দ্বীপগুলিতে মাছ ধরতে যেতাম। সমুদ্রের সব ঘূর্ণি-জলেই সুযোগমত যথেষ্ট মাছ ধরা পড়ে, শুধু সেই সাহসটি থাকা চাই। লকডেনের সব নাবিকদের মধ্যে কেবলমাত্র আমরা তিনজনই সেই সব দ্বীপে গিয়ে নিয়মিত ব্যবসা করতাম। সেখানকার পাথরের ফাঁকে ফাঁকে এমন অনেক পছন্দসই জায়গা আছে যেখানে নানা

রকমের মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ; ফলে আমরা একদিনে যত মাছ ধরতাম অন্যরা এক সপ্তাহেও তা ধরতে পারত না।

"এখান থেকে পাঁচ মাইল উজানে একটা খাড়ির মধ্যে আমরা জাহাজটা রেখে দিতাম ; আবহাওয়া ভাল হলেই সেই পনেরো মিনিটের শান্ত সমুদ্রের সুযোগ নিয়ে মসকো-স্ট্রামের প্রধান স্রোতে জাহাজ ভাসিয়ে ওটারহম অথবা স্যাণ্ডফ্লেসেনের কাছাকাছি কোথাও নোঙর ফেলতাম। পুনরায় শান্ত জলের সময় পর্যন্ত সেখানে কাটিয়ে নোঙর তুলে বাড়ির পথে যাত্রা করতাম। আসা-যাওয়ার পথে অনুকূল হাওয়া পাওয়া যাবে সে রকম বুঝলে তবেই আমরা এই অভিযানে বের হতাম—এবং এ ব্যাপার কখনই আমাদের হিসাবে ভুল হত না। ছয় বছরে মাত্র দু'বার বাতাস একেবারে পড়ে যাওয়ার দরুন আমাদের সারা রাত নোঙর ফেলে কাটাতে হয়েছে ; অবশ্য এখানে এ রকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটে। আর একবার আমরা পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই ঝড় ওঠায় সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠেছিল, ফলে আমাদেরও প্রায় একটা সপ্তাহ না খেয়ে কাটাতে হয়েছিল।

"এই ভাবে কতবার কত যে বিপদে পড়েছি তার বিশ ভাগের একভাগও তোমাকে বলতে পারব না। এবার যে ঘটনার কথা তোমাকে বলতে যাচ্ছি সেটা ঘটেছিল তিন বছর আগে। সেটা ছিল ১৮—সালের দশই জুলাই। পৃথিবীর এই অংশের মানুষরা কোনদিন সে তারিখটা ভুলবে না—কারণ সেই দিনই আকাশ থেকে নেমে এসেছিল সব চাইতে ভয়ংকর এক হ্যারিকেন। অথচ সারাটা সকাল থেকে পড়ন্ত বিকেল পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে বইছিল শান্ত মৃদু বাতাস, সূর্য উজ্জ্বল কিরণ দিচ্ছিল ; তাই আমাদের মধ্যে যারা বুড়ো নাবিক ছিল তারাও বুঝতে পারে নি কি ঘটতে চলেছে।

"আমরা তিনজন—দুই ভাই ও আমি নিজে—বেলা দুটো নাগাদ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দ্বীপগুলিতে পৌঁছলাম এবং অচিরেই খুব ভাল ভাল মাছে জাহাজটা বোঝাই করে ফেললাম। সকলেই বললাম, সেদিনকার মত এত বেশী মাছ আমরা আর কোন দিন ধরি নি। আমার ঘড়িতে তখন ঠিক সাতটা। নোঙর তুলে বাড়ির পথে যাত্রা শুরু করলাম যাতে আটটা নাগাদ যখন শান্ত জলের সময় হবে তখনই আমরা স্ট্রামের খারাপ অঞ্চলটা পার হয়ে যেতে পারি।

"নতুন এক ঝলক হাওয়া আসতেই আমরা যাত্রা করলাম। তখনও বিপদের কথাটা স্বপ্নেও ভাবি নি, কারণ সে রকম আশংকার তিলমাত্র কারণও তখন ছিল না। হঠাৎই হেলসেগেন-এর উপর দিয়ে একটা বাতাস উঠে আসায় আমরা হকচকিয়ে গেলাম। এটা খুবই অস্বাভাবিক—আগে কখনও এরকমটা ঘটে নি—আর কেন জানি না আমি যেন কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। জাহাজটা বাতাসের অনুকূলে রাখলাম, কিন্তু ঘূর্ণিগুলোর জন্য এগোতেই পারলাম না। আমি ফিরে যাবার প্রস্তাবই করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পিছনে তাকাতেই সকলে দেখতে পেলাম একটা

অদ্ভুত তামা-রংয়ের মেঘ বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে উঠে এসে সমগ্র দিগ্বলয়টাকে ঢেকে ফেলেছে।

"ইতিমধ্যে যে বাতাসে আমরা এগোচ্ছিলাম সেটা পড়ে গেল, আমরাও থেমে গিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলাম। এখন কি করা যায় সেটা ভাববার সময়ও পেলাম না। এক মিনিটের মধ্যেই ঝড়টা আমাদের উপর এসে পড়ল—দুই মিনিটের মধ্যে গোটা আকাশ ঢেকে ফেলল—আর তার ফলে হঠাৎই চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে গেল যে জাহাজের মধ্যে আমরা কেউ কাউকে দেখতে পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না।

"তারপর যে হারিকেন শুরু হয়ে গেল তাকে বর্ণনা করার চেষ্টা মূর্খামি। নরওয়ের প্রবীণতম নাবিকটিরও এই প্রলয়-ঝড়ের অভিজ্ঞতা ছিল না। ঝড়ের প্রথম ধাক্কাতেই মাস্তুলগুলি এমন ভাবে পড়ে গেল যেন সেগুলিকে করাত দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে—আমার ছোট ভাইটি বড় মাস্তুলটাকে বাঁচাবার জন্য ছুটে গিয়েছিল, কিন্তু তাকে সঙ্গে নিয়েই সেটাও ডুবে গেল।

"আমার বড় ভাই কেমন করে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচেছিল বলতে পারি না, কারণ সেটা জানার কোন সুযোগই আমার ছিল না। অবস্থা বুঝে পালের দড়ি ছেড়ে দিয়ে আমি ডেকের উপর সটান শুয়ে পড়ে সামনের মাস্তুলের কড়াটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছিলাম।

"কয়েক মুহূর্তের জন্য আমরা সম্পূর্ণভাবে জলে ডুবে গিয়েছিলাম; সেই সময়টা আমি দম বন্ধ করে কড়াটা ধরেছিলাম। যখন আর সেভাবে থাকা গেল না তখন উঠে হাঁটু ভেঙে বসলাম দুই হাতে ভড় দিয়ে। এই ভাবে মাথাটাকে বাঁচালাম। এই সময়ে আমাদের ছোট জাহাজটা যেন গা-ঝাড়া দিল, জল থেকে উঠে একটা কুকুর যে রকম করে, এবং সমুদ্রের কবল থেকে নিজেকেও বাঁচাল। এতক্ষণে আমার মনের ঘোরটা কেটে গেল; এখন কি করি তাই ভাবছি এমন সময় কে যেন আমার হাত চেপে ধরল। সে আমার বড় ভাই। আমার বুকটা আনন্দে লাফিয়ে উঠল, কারণ আমি নিশ্চিত ধরে নিয়েছিলাম সে জাহাজ থেকে জলে পড়ে গেছে—কিন্তু পর মুহূর্তেই সে আনন্দ আতংকে পরিণত হল—কারণ আমার কানের কাছে মুখটা এনে সে চীৎকার করে বলল—"মস্‌কো-স্ট্রাম!"

"সেই মুহূর্তে আমার মনের ভাব কেমন হয়েছিল তা কেউ কোন দিন জানবে না। আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত কাঁপতে লাগল, যেন আমার প্রবল জ্বর হয়েছে। ঐ একটি মাত্র শব্দ দ্বারা সে কি বুঝেছিল সেটা আমি ভাল করেই জানতাম—সে আমাকে কি বোঝাতে চেয়েছিল তাও আমি জানতাম। যে বাতাস এখন আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে তাতে স্ট্রাম-এর ঘূর্ণি-পাকে পড়তে আমরা বাধ্য; কোন কিছুই আমাদের বাঁচাতে পারবে না।

"এর মধ্যেই ঝড়ের প্রথম প্রকোপটা কমে এল। আকাশেও দেখা দিল একটা বিচিত্র পরিবর্তন। এতক্ষণ চার দিকটাই ছিল পিচের মত কালো, কিন্তু হঠাৎ আমাদের প্রায় মাথার উপরে দেখা দিল একটুকরো গোলাকার পরিষ্কার আকাশ—এত

www.amarboi.blogspot.com

পরিষ্কার আকাশ আগে কখনও দেখি নি—উজ্জ্বল নীল তার রং—আর তার ভিতর দিয়ে ঝলমল করে বেরিয়ে এল পূর্ণ চাঁদ তার উজ্জ্বল কিরণরাশি নিয়ে। চারদিকের সব কিছু যেন সে আলোয় ফুট্-ফুট্ করতে লাগল—কিন্তু হা ঈশ্বর! সে আলোয় কী দৃশ্যই না দেখলাম!

"এবার আমি দু'একবার দাদার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলাম; কেন জানিনা এই সময় কোলাহলের শব্দ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে তার কানের কাছে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করা সত্ত্বেও সে কিছুই শুনতে পেল না। সে শুধু মাথাটা নাড়ল—তার মুখ মৃত্যুর মত পাণ্ডুর। সে একটা আঙুল তুলল, যেন বলতে চাইল "শোন!"

"প্রথমে কিছুই বুঝতে পারলাম না—কিন্তু তখনই একটা ভয়াবহ চিন্তা আমার মনে ঝিলিক দিয়ে উঠল। পকেট থেকে ঘড়িটা টেনে বের করলাম। ঘড়ি চলছে না। চাঁদের আলোয় ভালো করে দেখেই আমার দুই চোখ জলে ভরে উঠল; ঘড়িটাকে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সাতটা বেজে ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমুদ্র শান্ত থাকার সময়টা পার হয়ে গেছে, স্ট্রামের জলভ্রমি এখন চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে!

"এতক্ষণ ঢেউয়ের মাথায় বেশ দক্ষতার সঙ্গেই চলছিলাম; কিন্তু এবার একটা দৈত্যাকার সমুদ্র যেন আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ঠেলে তুলল উপরে আরও উপরে—আরও—বুঝি আকাশের গায়ে। কোন ঢেউ যে এত উঁচুতে উঠতে পারে তা আমি আগে বিশ্বাসই করতাম না। তারপরই এক ঝটকায় আমরা নীচে নেমে এলাম—ডুব দিলাম—মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল—যেন স্বপ্নের মধ্যে উঁচু পাহাড়-চূড়া থেকে নীচে পড়ে গেলাম। কিন্তু উপরে থাকতে থাকতেই অতি দ্রুত একবার চারদিকে তাকিয়েছিলাম। মুহূর্তের মধ্যেই নিজেদের সঠিক অবস্থানটা বুঝতে পারলাম। সিকি মাইল সামনেই মস্কো-স্ট্রাম জলভ্রমি। আতংকে চোখ দুটো আপনা থেকেই বুজে গেল। প্রচণ্ড আক্ষেপে দুটো পাতা এক হয়ে জুড়ে গেল।

"দুই মিনিট যেতে না যেতেই হঠাৎ মনে হল ঢেউ পড়ে গেছে, ফেনায় একেবারে ঢেকে গেছে। জাহাজটা বাঁ দিকে খাড়া বেঁকে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ছুটতে লাগল। ঠিক সেই মুহূর্তে জলের গর্জনকে ছাপিয়ে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ চীৎকার—মনে হল বুঝি কয়েক হাজার বাষ্পীয় জাহাজের সবগুলি জলের নল থেকে এক সঙ্গে বাষ্প ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তখনও জলভ্রমির চারদিককার ফেনার মধ্যেই আছি; মনে হল, আর এক মুহূর্তে পরেই আমরা তার অতল গহ্বরে ডুবে যাব। জাহাজটা কিন্তু মোটেই জলে ডুবল না, বরং ঢেউয়ের মাথায় বুদ্বুদের মত ভাসছে।

"শুনতে গল্প করার মত শোনালেও—কিন্তু যা সত্য তাই আমি বলছি—আমি তখন ভাবছিলাম এভাবে মরা কী মহান, আর ঈশ্বরের শক্তির এক আশ্চর্য প্রকাশের মুখে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবাটা কী তুচ্ছ। আমার বিশ্বাস, কথাটা মনে হতেই লজ্জায় আমার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরেই ঘূর্ণিটাকে দেখার

একটা প্রচন্ড কৌতূহল আমাকে একেবারে পেয়ে বসল। যেকোন মূল্যে তার গভীরতা মাপার বাসনা মনের উপর চেপে বসল।

"তুমি তো নিজেই দেখলে, ঢেউয়ের পেটটা সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে বেশ কিছুটা নীচু ; তাই সেটা এখন আমাদের চাইতেও উঁচু একটা কালো পাথরের দেওয়ালের মত দাঁড়িয়ে আছে। যদি কখনও প্রবল ঝড়ের সময় সমুদ্রে না গিয়ে থাক তাহলে বাতাস ও উচ্ছ্বসিত জলকণার একত্র মেশামেশি ঘটলে মনের মধ্যে সব কিছু কেমন গুলিয়ে যায় সেটা তুমি বুঝতে পারবে না। তারা তোমার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, তোমাকে বধির করে ফেলে, গলা টিপে ধরে ; কাজ করা ও চিন্তা-ভাবনা করার সব ক্ষমতা হরণ করে।

"সেই ফেনার বেষ্টনিতে কতবার ঘুরপাক খেয়েছি সেটা বলা শক্ত। প্রায় এক ঘণ্টার মত ঘুরছি আর ঘুরছি, ভাসার বদলে উড়ছি, আর ক্রমেই তার ভয়ংকর ভিতরের দিকটার দিকে এগিয়ে চলেছি। সারাক্ষণই আংটাটা আঁকড়ে ধরে ছিলাম। দাদা ছিল পিছনের গলুইতে একটা খালি জলের পিপেকে আঁকড়ে ধড়ে। গহ্বরটার একেবারে কাণায় পেঁছিবার আগেই সে হঠাৎ পিপেটা ছেড়ে দিয়ে আংটাটার দিকে হাত বাড়াল এবং আতংকের ঘোরে আমার হাত দুটোকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল, কারণ আংটাটা দুজনে ধরার মত যথেষ্ট বড় ছিল না। যদিও জানতাম সে তখন ভয়ে পাগল হয়ে গেছে, তবু তাকে এ কাজটা করতে দেখে আমার দুঃখের সীমা রইল না। তাকে আংটাটা ধরতে দিয়ে আমি পিছনের গলুইতে পিপেটার কাছে গেলাম। সেখানে ঠিকঠাক হয়ে বসতে না বসতেই জাহাজের দক্ষিণ দিকে কাত হয়ে পড়েই আমরা সবেগে গহ্বরের মধ্যে ছিটকে পড়লাম। চকিতে একবার ঈশ্বরকে স্মরণ করলাম ; বুঝলাম সব শেষ।

"অবতরণের প্রচণ্ড গতির মধ্যেও পিপেটাকে সবলে আঁকড়ে ধরে চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলেছিলাম। কয়েক সেকেণ্ড পর্যন্ত চোখ মেলার সাহসই হল না—তখন তো যে কোন মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা—কিন্তু সবিস্ময়ে বুঝতে পারলাম যে তখনও জলের সঙ্গে মরণ-যুদ্ধ শুরু হয় নি। মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হয়ে গেল। তখনও বেঁচে আছি। পতনের অনুভূতিটা বন্ধ হয়েছে। জাহাজটা ফেনার বেষ্টনির মধ্যেই আছে, আর তার গতি অনেকটা আগের মতই। সাহসে ভর করে তাকালাম।

"ভয়, আতংক ও বিস্ময়ের সেই অনুভূতির কথা কোনদিন ভুলব না। বিরাট পরিধি ও প্রচণ্ড গভীরতা সমন্বিত একটা ফোঁদলের ভিতরকার দেওয়ালের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জাহাজটা যেন যাদুমন্ত্রে ঝুলে আছে। সেই ফোঁদলের মসৃণ গাটাকে আবলুস বলে ভুল হতে পারত, কিন্তু সেটা যেরকম দ্রুতগতিতে ঘুরছিল, আর মেঘের গোলাকার ফাঁক দিয়ে ভরা চাঁদের কিরণরাশি যেভাবে তার উপর এসে পড়ছিল, তাতে মনে হয়েছিল ফোঁদলের কালো দেওয়াল বরাবর একটা সোনালী জলস্রোত যেন গহ্বরের গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত বয়ে চলেছে।

"প্রথমে এতই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম যে কিছুই ভাল করে লক্ষ্য করতে পারি নি। দুই চোখ মেলে শুধু দেখছিলাম এক ভয়ংকর বিশালতাকে। কিছুটা ধাতস্থ হবার পরে স্বভাবতই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল নীচের দিকে। মনে হল, চাঁদের কিরণ

বুঝি গভীর গহ্বরের একেবারে তলদেশ পর্যন্ত কি যেন খুঁজছে। কিন্তু একটা ঘন কুয়াসায় সব কিছু ঢেকে যাওয়ায় স্পষ্ট করে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। সেই ঘন কুয়াসার উপর ঝুলে ছিল একটা বড় রামধনু—যে সংকীর্ণ ও ভগ্নপ্রায় সেতুটাকে মুসলমানরা বলে মহাকাল ও অনন্তকালের মধ্যে একমাত্র পথ অনেকটা তারই মত।

"ফেনার বেষ্টনি থেকে প্রথম যখন আমরা গহ্বরের মধ্যে পড়েছিলাম তখন একটানে অনেকখানি নীচে নেমে গিয়েছিলাম; কিন্তু তার পর থেকে নেমেছি অপেক্ষাকৃত ধীরগতিতে। অনবরত চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে নেমেছি, কখনও কয়েক শ' গজ মাত্র কখনও বা ঘূর্ণ্যাবর্তের একটা পুরো পাক।

"নামতে নামতেই দেখছিলাম, সেই ঘূর্ণির আলিঙ্গনে শুধুমাত্র আমাদের জাহাজটাই বাঁধা পড়ে নি। আমাদের উপরে নীচে দেখতে পেয়েছিলাম জাহাজের টুকরো টুকরো অংশ, বড় বড় গাছের কাণ্ড; তাছাড়া ছোটখাট অনেক জিনিস, যেমন আসবাবপত্রের টুকরো, ভাঙা বাক্স, পিপে ও লোহার পাত। ভয়ংকর পরিণামের দিকে যত এগোচ্ছি আমার কৌতূহল ততই বাড়ছে। এবার আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে আমাদের সঙ্গে ভেসে-চলা অন্য সব জিনিসকে লক্ষ্য করতে লাগলাম, এবং অনেক কিছু দেখার পরে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। প্রথম, বস্তুটি যত ভারি তার অবতরণ তত দ্রুত; দ্বিতীয়, দুটি সম-বিস্তার বস্তুর মধ্যে একটি যদি গোলাকার হয় এবং অপরটি অন্য যে কোন আকারের হয় তাহলে গোলাকার বস্তুটির অবতরণ দ্রুততর হবে; তৃতীয়, সম আয়তনের দুটি বস্তুর মধ্যে একটি যদি সমগোলাকার হয় এবং অপরটি অন্য যে কোন আকারের হয়, তাহলে সমগোলাকারটি হবে ধীর গতি সম্পন্ন। আরও একটি বিস্ময়কর ঘটনাও এই সিদ্ধান্তগুলিকে সমর্থন করল। প্রতিটি পাক ঘুরবার সময়ই আমরা দেখতে পেলাম একটা পিপে, বা জাহাজের মাস্তুল অথবা তার পাইল দণ্ড, অথচ ঘূর্ণ্যাবর্তের মধ্যে প্রথম চোখে যে সব জিনিস দেখেছিলাম সেগুলি এখন আমাদের অনেক উপরে রয়েছে; মনে হয় তারা গোড়াতে যেখানে ছিল সেখান থেকে বিশেষ সরে যায় নি।

"যা করণীয় তা করতে আর ইতস্তত করলাম না। স্থির করলাম, জলের পিপেটার সঙ্গে নিজেকে ভালভাবে বেঁধে নিয়ে সেটা শুদ্ধ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। ইসারায় দাদার মনোযোগ আকর্ষণ করে ভাসমান পিপেগুলোকে দেখিয়ে আমি কি করতে চলেছি সেটা তাকে সাধ্যমত বোঝাতে চেষ্টা করলাম। হয়তো আমার কথা সে বুঝতেও পারল, তথাপি হতাশভাবে মাথা নেড়ে সে তার জায়গা ছাড়তে অস্বীকার করল। তার কাছে পৌঁছনো তখন অসম্ভব। কাজে কাজেই আর মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত না করে আমি পিপেসমেত সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম।

"যা আশা করেছিলাম ঠিক তাই ঘটল। যখন আমিই তোমাকে সব কথা বলছি তখন তো বুঝতেই পারছ যে আমি পালিয়ে বেঁচেছি। তাই আমি আর যা বলব তাতো বুঝতেই পারছ—অতএব তাড়াতাড়িই গল্পটা শেষ করছি। জাহাজটা ছেড়ে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই সেটা আমার প্রাণের দাদাকে নিয়ে অনেক দূর নেমে গিয়ে

পর পর তিন-চারটে পাক খেয়ে উদ্বেলিত ফেনরাশির মধ্যে চিরদিনের মত উধাও হয়ে গেল। আমার পিপেটা আরও কিছুদূর পর্যন্ত ডোবার পরেই জলভ্রমির চরিত্রটা বদলে যেতে লাগল। বিরাট ফোঁদলটার দেওয়ালের খাড়াইটা একটু একটু করে কমতে লাগল। ঘূর্ণাবর্তের পাক ক্রমেই মন্থরতর হয়ে এল, ক্রমে ফেনার কুণ্ডলী ও রামধনু অদৃশ্য হয়ে গেল, আর গহ্বরটার তলদেশ যেন ধীরে ধীরে উপরে উঠে এল। আকাশ পরিষ্কার, বাতাস পড়ে গেছে, পশ্চিম আকাশে ভরা চাঁদ জ্বলজ্বল করছে, আমি সাগরের উপর ভাসছি, লকডেনের তীর-রেখা সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছি, আর যেখানে ছিল মস্‌কো-স্ট্রামের আবর্ত আমি রয়েছি ঠিক তার উপরে। তখন সমুদ্রের শান্ত থাকার কথা হলেও হারিকেনের ফলস্বরূপ সমুদ্রে রয়েছে পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। ঢেউয়ের টানে আমি ঢুকে পড়লাম স্ট্রামের খালের মধ্যে, আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম জেলেদের আস্তানায়। শ্রান্ত, ক্লান্ত অবস্থায় একটা নৌকো আমাকে তুলে নিল। আতংকের স্মৃতিতে আমি তখন নির্বাক। যারা আমাকে নৌকোতে তুলে নিল তারা সকলেই আমার পুরনো স্যাঙাৎ, প্রতিদিনের সঙ্গী—কিন্তু তারা আমাকে চিনতেও পারল না—মনে হল যেন ভূত দেখছে। একদিন আগেও আমার যে চুল ছিল কাক-কালো সে চুল হয়ে গেছে তুমি যেমন দেখছ তেমনি সাদা। তারা আরও বলে, আমার মুখও আমূল বদলে গেছে। আমার কাহিনী তাদের বলেছি—তারা বিশ্বাস করে নি। এখন তোমাকে বললাম—লকডেনের আমুদে ছেলেদের চাইতে তুমি যে এ কাহিনী বেশী বিশ্বাস করবে সে আশাও আমি করি না।”

মারি রোগেতের রহস্য

The Mystery of Marie Roget

(“রু মর্গ-এ হত্যাকাণ্ড”-এর পরিশিষ্ট)

প্রায় এক বছর আগে “রু মর্গ-এ হত্যাকাণ্ড” শীর্ষক একটা প্রবন্ধে আমি যখন বন্ধুবর শিভালিয়ার সি, অগুস্তে দুপাঁর মানসিক চরিত্রের কয়েকটি খুব উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য চিত্রণের চেষ্টা করেছিলাম, তখন ভাবি নি যে সে বিষয়টাকে আবার তুলতে হবে। এই চরিত্র চিত্রণই ছিল আমার সংকল্প; আর দুপাঁর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে যে সব দৈব ঘটনাকে আনতে হয়েছিল তার ভিতর দিয়েই সেই সংকল্প পেয়েছিল পূর্ণ সার্থকতা। আমি হয়তো অপর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে পারতাম। কিন্তু তাতে কিছুই প্রমাণ হত না। অবশ্য সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর বিস্ময়কর পরিণতি

এমন সব বিশদ বিবরণ দিয়ে আমাকে চমকে দিয়েছে যার মধ্যে আছে জোর করে স্বীকৃতি আদায়ের ভাব। ইদানিং যা আমি শুনেছি তারপরেও যদি যা শুনেছি এবং অনেক কাল আগে যা দেখেছি সে বিষয়ে চুপ করে থাকি তো সেটাই হবে বিস্ময়কর।

মাদাম ল'এস্‌পানায়ে ও তার কন্যার মৃত্যুর ট্রাজেডিকে গুটিয়ে ফেলার পরে শিভালিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ব্যাপারটাকে তার মনোযোগ থেকে বাতিল করে দিয়ে দিবাস্বপ্নের পুরনো অভ্যাসে ফিরে গেলেন। বিমূর্ত চিন্তার দিকেই আমার চিরকালের ঝোঁক, তাই আমিও তার সঙ্গে যোগ দিলাম; এবং ফবুগ স্যাঁত্‌ জার্মাঁ-র চেম্বারটা দখল করে ভবিষ্যৎকে এক ফুঁ-তে উড়িয়ে দিয়ে বর্তমানের কোলে শান্তিতে নিদ্রা দিয়ে দিবাস্বপ্নে বুঁদ হয়ে রইলাম।

কিন্তু সেই স্বপ্নের জাল বোনাও নির্বিঘ্নে চলল না। রু মর্গ নাটকে আমার বন্ধুর ভূমিকা প্যারিসের পুলিশ মহলের উপর প্রভাব বিস্তার করতে যে বিফল হয় নি সেটা সহজেই অনুমেয়। দুপাঁর নাম তো তখন পুলিশের কর্তাদের মুখে মুখে ফিরছে। যে সব সরল সূত্র ধরে সেই রহস্যের সমাধান সে করেছিল কেবল আমাকে ছাড়া আর কাউকেই সেসব কথা সে খুলে বলে নি। কাজেই সমস্ত ব্যাপারটাকেই যে তারা অলৌকিক বলে ধরে নিয়েছে, বা শিভালিয়ারের বিশ্লেষণ শক্তিকে বোধির পর্যায়ে তুলে ধরেছে তাতে অবাক হবার কারণ নেই। ফলে ইদানিং সে পুলিশের চোখের মধ্যমণি হয়ে উঠেছে। অনেক কেসেই তাকে নিয়োগ করার চেষ্টাও পুলিশ মহল থেকে বার বার করা হয়েছে। তার মধ্যে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য কেস হল মারি রোগেত নামের এক যুবতীকে হত্যা।

রু মর্গের নির্মম ঘটনার প্রায় দুই বছর পরে আলোচ্য ঘটনাটি ঘটেছিল। মারি—যার পারিবারিক ক্রিশ্চান নামটা শুনলেই ভাগ্যহীনা "সিগার-গার্ল"-এর নামটাই মনে পড়ে যায়—ছিল বিধবা এস্তেলে রোগেতের একমাত্র মেয়ে। মেয়েটির শৈশবেই তার বাবা মারা যায়। বাবার মৃত্যুর সময় থেকে তার নিজের খুন হবার এগারো মাস আগে পর্যন্ত মা ও মেয়ে রু পাভি স্যাঁত আঁদ্রিতেই একসঙ্গে বাস করত। মাদামের ছিল একটা পেন্সন, আর তাকে সাহায্য করত মারি। মারির বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সেই ব্যবস্থাই চলছিল; তারপরই তার অপরূপ রূপে আকৃষ্ট হল এক গন্ধ-ব্যবসায়ী। প্যালাস রয়েল-এর বেসমেন্টে তার একটা দোকান ছিল। আশপাশের বেপরোয়া মানুষরাই ছিল তার প্রধান খদ্দের। সুন্দরী মারি যদি তার গন্ধদ্রব্যের দোকানে হাজিরা দেয় তাহলে যে ব্যবসার দিক থেকে অনেক সুবিধা হবে মঁসিয় লি ব্লাঁ সেটা বুঝেছিল, আর তার মোটা টাকার প্রস্তাবটাও মেয়েটি সাগ্রহে গ্রহণ করেছিল; অবশ্য মাদাম সেটা মেনে নিয়েছিল অনেক ইতস্তত করার পরে।

দোকানীর প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছিল; মনোহারিণী মেয়েটির টানে তার ঘরটা অচিরেই বিখ্যাত হয়ে উঠল। প্রায় এক বছর দোকানে কাজ করার পরে একদিন মেয়েটির আকস্মিক অন্তর্ধানে তার স্তাবকের দল বিপন্ন বোধ করল। মঁসিয় লি ব্লাঁ তার

অনুপস্থিতির কোন কারণই বুঝতে পারল না ; আর মাদাম রোগেত আতংকে ও উদ্বেগে কাহিল হয়ে পড়ল। সংবাদপত্রগুলি সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে পথে নেমে পড়ল ; পুলিশও ভালরকমের তদন্ত করার উদ্যোগ নিল ; এমন সময় সপ্তাহখানেক পরের এক মধুর সকালে সুস্থ দেহে, অবশ্য কিছুটা বিষণ্ণ ভঙ্গীতে, মারি সেই গন্ধদ্রব্যের দোকানের কাউন্টারে এসে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারি প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য সব রকমের তদন্ত চাপা পড়ে গেল। মঁসিয় লি ব্লাঁ আগের মতই এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করল। সব প্রশ্নের জবাবে ম্যাডাম ও মারি জানাল, গ্রামাঞ্চলের এক আত্মীয়ের বাড়িতে তার গত সপ্তাহটা কেটেছে। এই ভাবেই ব্যাপারটা মিটে গেল ; সকলেই মোটামুটি ভুলেও গেল। আর মেয়েটিও অযথা কৌতূহলের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য অচিরেই গন্ধ-বিক্রেতাকে শেষ বিদায় জানিয়ে রু পাভি স্যাঁত আঁদ্রিতে মায়ের আশ্রয়ে ফিরে গেল।

বাড়িতে ফিরে আসার প্রায় পাঁচ মাস পরে মেয়েটি হঠাৎ দ্বিতীয়বার নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় তার বন্ধুরা খুব ভয় পেয়ে গেল। তিন দিন কেটে গেল, কোন খবর নেই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল তার মৃতদেহ সীন নদীর জলে ভাসছে ; জায়গাটা রু স্যাঁত আঁদ্রির বাড়িগুলির বিপরীত দিকে, আর বারিয়েরে দু রুল-এর নির্জন অঞ্চল থেকে খুব একটা দূরে নয়।

এই খুনের নৃশংসতা, মৃতার যৌবন ও রূপ, এবং তার কুখ্যাতি—সব মিলিয়ে সংবেদনশীল প্যারিসবাসীদের মনে প্রচণ্ড উত্তেজনার ঢেউ তুলল। অন্য কোন অনুরূপ ঘটনার এ-রকম ব্যাপক ও তীব্র পরিণতির কথা আমিও মনে করতে পারছি না। প্রিফেক্ট মশাই অসাধারণ রকমের কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন, আর প্যারিসের গোটা পুলিশ বাহিনীকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো হল।

মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হবার পরে কেউ মনে করে নি যে খুনী পার পেয়ে যাবে, কারণ তদন্তের কাজ সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা সপ্তাহ কেটে যেতেই এ ব্যাপারে পুরস্কার ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ল ; অবশ্য তখন পুরস্কার ছিল এক হাজার ফ্রাঁতে সীমাবদ্ধ। দশ দিন পরে মনে হল টাকার অংকটা দ্বিগুণ করা উচিত ; কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তাহটিও যখন নিষ্ফলা কেটে গেল এবং পুলিশের বিরুদ্ধে বারকয়েক গুরুতর বিক্ষোভ দেখান হল, তখন প্রিফেক্ট নিজে খুনীর শাস্তির জন্য বিশ হাজার ফ্রাঁ দেবার প্রস্তাব রাখলেন। সেই সঙ্গে আরও ঘোষণা করা হল, অপরাধকারী দলের কেউ যদি এগিয়ে এসে তার স্যাঙাতের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় তাহলে তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করা হবে ; আর সেই ঘোষণাপত্রের সঙ্গে নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে আরও দশ হাজার ফ্রাঁ পুরস্কারের কথা জানানো হল। এইভাবে মোট পুরস্কারের পরিমাণ দাঁড়ালো ত্রিশ হাজার ফ্রাঁর কম নয়।

তখন আর কারও মনেই সন্দেহ রইল না যে অবিলম্বেই এই খুনের রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। খুবই বিস্ময়কর মনে হলেও, মৃতদেহ আবিষ্কারের তিন সপ্তাহ পরেও সে ব্যাপারের উপর কোনরকম আলোকপাত হল না। তা সত্ত্বেও জনমনের বিক্ষোভের

একটা গুজব পর্যন্ত দুপাঁ ও আমার কানে এসে পৌঁছে নি। নিজেদের গবেষণা নিয়ে আমরা এত বেশী মেতে ছিলাম যে প্রায় এক মাস হল আমরা ঘর থেকে বের হই নি, কোন অতিথি আমাদের কাছে আসে নি, বা একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রধান রাজনৈতিক প্রবন্ধের উপর চোখ বুলিয়ে যাওয়ার চাইতে বেশী কিছু পড়েও দেখি নি। এই খুনের সংবাদ আমাদের প্রথম এনে দিলেন জি—। ১৮—সালের ১৩ই জুলাইয়ের প্রথম বিকেলেই তিনি আমাদের কাছে এলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত কাটালেন।

খুনীদের খুঁজে বের করার চেষ্টায় বিফল হওয়ায় তিনি খুবই ক্ষুব্ধ ছিলেন। বিশেষ প্যারিসীয় ভঙ্গীতে জানালেন, তার সব সুনাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এমন কি সম্মানটুকুও বুঝি যায়। জনসাধারণ তার দিকেই তাকিয়ে আছে; এই রহস্যের সমাধান করতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তিনি প্রস্তুত। এই প্রসঙ্গে তিনি দুপাঁর অনেক স্তুতি-স্তাবকতা করে সরাসরি তার কাছে একটা প্রস্তাব রাখলেন।

বন্ধুবর যথাসাধ্য স্তুতিগুলোকে খণ্ডন করল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবটা গ্রহণও করল। ব্যাপারটা যখন মিটে গেল তখন প্রিফেক্ট মশায় সাত কাহন করে নিজের মতামতগুলিই বলে যেতে লাগলেন দীর্ঘ সময় ধরে। তার বক্তব্য নিঃসন্দেহে পাণ্ডিত্যপূর্ণই ছিল; তবু রাত অনেক হওয়ায় আমি একবার সে কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিলাম; কিন্তু দুপোঁ তার অভ্যস্ত হাতল-চেয়ারে বসে রইল মূর্তিমান মনোযোগ হয়ে। সমস্ত আলোচনাটার সময় তার চোখে চশমা ছিল; মাত্র একটিবার তার নীল কাঁচের তলা দিয়ে দৃষ্টিপাত করেই আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে তার ঘুমটাও কিছু কম গাঢ় হয় নি, অর্থাৎ প্রিফেক্ট মশায় চলে যাবার আগে পর্যন্ত সাত-আটটি মন্থর ঘণ্টা সে গভীর ঘুমেই কাটিয়েছে।

পরদিন সকালেই আমি সংগৃহীত সাক্ষী-সাবুদের একটা পুরো রিপোর্ট যোগাড় করলাম; প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই করুণ ঘটনাটির সমস্ত বিবরণ যে কয়টি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল তার প্রত্যেকটির একটি করে কপিও সংগ্রহ করলাম। অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে তা থেকে মোটামুটি এই রকম তথ্য পাওয়া গেল ঃ

১৮—সালের ২২শে জুন রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ মারি রোগেত তার মায়ের রু পাভি স্যাঁত আঁদ্রির বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। যাবার সময় সে জনৈক মঁসিয় জাকু স্যাঁত ইউসটারকে—একমাত্র তাকেই জানিয়েছিল, সে রু দে দ্রোমে-তে তার মাসির বাড়িতে দিনটা কাটাবে। রু দে দ্রোমে একটা ছোট ও সংকীর্ণ কিন্তু জনবহুল রাস্তা, নদীর তীর থেকে খুব দূরে নয়, আর মাদাম রোগেতের বোর্ডিং-বাড়ি থেকে মাইল দুইয়েক দূরে। স্যাঁত ইউসটার ছিল মারির স্বীকৃত প্রেমিক; বোর্ডিং-বাড়িতেই সে থাকত ও খেত। কথা ছিল, সন্ধ্যা হলে সে তার বাগদত্তার কাছে যাবে এবং সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দেবে। বিকেল বেলা খুব বৃষ্টি হওয়ায় সে মনে করে যে মেয়েটি রাতটা তার মাসির কাছেই থেকে যাবে, তাই সে কথা রাখাটা দরকার বলে মনে করে নি। রাত হয়ে গেলে মাদাম রোগেত (সত্তর বছরের অক্ষম বৃদ্ধা মহিলা) নাকি ভয়

পেয়ে বলেছিল, "আর হয় তো সে মারিকে দেখতে পাবে না"; কিন্তু সে-কথায় তখন কেউ কান দেয় নি।

সোমবারে জানা গেল, মেয়েটি রু দে দ্রোমে-তে যায় নি; সারা দিনেও তার কোন খবর না পেয়ে একটু ধীরেসুস্থে শহরের কয়েকটা জায়গায় তার খোঁজ করা হয়। কিন্তু নিরুদ্দেশ হবার চতুর্থ দিনের আগে পর্যন্ত তার সম্পর্কে সন্তোষজনক কিছুই জানা যায় না। এই দিন (২৫শে জুন, বুধবার) জনৈক মঁসিয় বুভাই একটি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে সীন নদীর ধারে বারিয়েরে দু রুলে-তে (রু পাভি স্যাঁত আঁদ্রির বিপরীত দিকে) মারির খোঁজ করছিল; সেই সময় তারা খবর পায় সে নদীতে একটি মৃতদেহ ভাসতে দেখে কয়েকটি জেলে সেটাকে তীরে নিয়ে এসেছে। মৃতদেহটি দেখার পরে বুভাই কিছুটা ইতস্তত করার পরে সেটাকে গন্ধ-দোকানের মেয়েটির মৃতদেহ বলে সনাক্ত করে। তার বন্ধু কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সেটা চিনতে পেরেছিল।

মুখটা ছিল কালো রক্তে মাখামাখি; কিছু রক্ত মুখ থেকেও বেরিয়েছে। নিছক জলে ডুবলে যেরকম হয়ে থাকে সে রকম কোন ফেনা হয় নি। শিরার রংয়ের কোনরকম বিকৃতি ঘটে নি। গলায় থেঁতলানোর ও আঙুলের দাগ ছিল। বুকের উপর ভাঁজ-করা হাতদুটো শক্ত। ডান হাতটা মুঠোকরা, বাঁহাত কিছুটা খোলা। বাঁ হাতের কব্জিতে দুটো গোলাকার দাগ, হয় একাধিক দড়ির দাগ, নয়তো একই দড়ির একাধিক পাকের দাগ। ডান হাতের কব্জির একটা অংশে, সারাটা পিঠে, বিশেষ করে ঘাড়ের কাছটাতে ঘসটানোর দাগ। দেহটাকে তীরে টেনে আনতে জেলেরা একট দড়ি ব্যবহার করেছে। কিন্তু এই সব দাগ সে দড়ির নয়। গলার মাংসটা ফোলা। আঘাতের দরুন কেটে যাওয়া বা ছড়ে যাওয়ার কোন চিহ্ন নেই। একটুকরো ফিতে এত শক্ত করে গলায় পেঁচিয়ে বাঁধা ছিল যে চোখেই পড়ে না; সেটা মাংসের মধ্যে কেটে বসে গেছে, আর যে গিঁটটা দিয়ে সেটা বাঁধা সেটা ছিল বাঁ কানের ঠিক নীচে। একটা মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। ডাক্তারি সাক্ষ্যে মৃতার পবিত্র চরিত্রের কথাই জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে; তাকে পাশবিক হিংস্রতার শিকার হতে হয়েছিল; মৃতদেহটি তখন যে অবস্থায় ছিল তাতে বন্ধুদের পক্ষে চিনতে কষ্ট হবার কথা নয়।

পোশাক ছিল ছেঁড়া ও অগোছালো। বহির্বাসের প্রায় এক ফুট চওড়া একটা ফালি নীচের সেলাই থেকে কোমর পর্যন্ত ছেঁড়া, কিন্তু ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া নয়। সেটা কোমরে তিন পাক জড়িয়ে পিঠের দিকে একটা হুক দিয়ে আটকানো ছিল। ফ্রকের ঠিক নীচেকার পোশাকটা ছিল সূক্ষ্ম মসলিনের; সেটা থেকেই আঠারো ইঞ্চি চওড়া একটা ফালি সম্পূর্ণ ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে—তবে ছেঁড়া হয়েছে সমান মাপে খুব যত্ন নিয়ে। সেটা ছিল তার গলায় ঢিলে করে জড়ানো আর একটা শক্ত থোবনা দিয়ে বাঁধা। এই মসলিনের ফালি ও ফিতের ফালির উপরে একটা বনেটের দড়ি আটকে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যে থোবনা দিয়ে বনেটের দড়ি বাঁধা ছিল সেটা কোন মহিলার থোবনা নয়, নাবিকের থোবনা।

সনাক্ত হবার পরে মৃতদেহটিকে রীতিমাফিক মর্গে না পাঠিয়ে তাড়াহুড়া করে

www.boighar.blogspot.com

কাছাকাছি একটা জায়গায় কবর দেওয়া হয়। বুভাইয়ের চেষ্টাতেই ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব চেপে দেওয়া হয়, এবং তারপরে কয়েকটা দিন নিরুপদ্রবেই কেটে যায়। অবশ্য শেষপর্যন্ত একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা ব্যাপারটাকে হাতে নেয়; মৃতদেহটাকে কবর থেকে তুলে নতুন করে পরীক্ষা করা হয়; কিন্তু নতুন কিছুই পাওয়া যায় না। অবশ্য পোশাকপত্রগুলি এবার মৃতার মা ও বন্ধুদের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় মেয়েটি যে সেই পোশাকই পরে ছিল সেটাও পুরোপুরি সনাক্ত করা হয়।

ইতিমধ্যে প্রতি ঘন্টায়ই উত্তেজনা বাড়তে থাকে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশেষ করে স্যাঁত ইউস্টারের উপরেই সন্দেহটা পড়ে। যে রবিবারে মারি বাড়ি ছেড়েছিল সেদিন সে কোথায় কোথায় ছিল তার কোন সঠিক বিবরণই সে প্রথমে দিতে পারে নি। অবশ্য পরে ঐ দিনের একটা সন্তোষজনক বিবরণ সে এফিডেবিটবলে মঁসিয় জি—র কাছে দাখিল করেছিল। যত দিন যেতে লাগল অথচ রহস্যের কোন সমাধানই হল না ততই হাজার রকমের গুজব ছড়াতে লাগল। তার মধ্যে যে গুজবটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হল—মারি রোগেত এখনও বেঁচে আছে, আর সীন নদীতে যে মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেটা অপর কোন হতভাগিনীর। এই নিয়ে "লি' এতোয়েল" পত্রিকায় তো দীর্ঘ এক প্রতিবেদনও প্রকাশিত হল। সেই প্রসঙ্গে সম্পাদক স্বয়ং যুক্তি দেখালেন, মৃতদেহটি জলের মধ্যে মাত্র তিনদিন নয়, ছিল তার পাঁচগুণ বেশী দিন, "কারণ সেটা এতই পচে-গলে গিয়েছিল যে তাকে চিনতে বুভাইয়েরও বেশ কষ্ট হয়েছিল। ঐ পত্রিকার একটি পরবর্তী সংখ্যায় সন্দেহটা বুভাই-এর উপর চাপাবার চেষ্টাও করা হয়। একটি ঘটনার উল্লেখ করে সন্দেহটার উপর কিছুটা রংও চড়ানো হয়। মেয়েটি নিরুদ্দেশ হবার কয়েকদিন আগে এবং মালিকের অনুপস্থিতিতে জনৈক আগন্তুক তার আপিসের দরজার চাবির ফোকরে একটি গোলাপ ফুল এবং কাছেই ঝোলানো একটা স্লেটে "মারি" নামটা দেখতে পায়।

যাই হোক, সংবাদপত্রগুলি থেকে আমরা যতটা বুঝতে পেরেছিলাম তাতে মনে হয় মারি একদল গুন্ডার শিকার হয়েছিল—তারাই তাকে তুলে নদীতে নিয়ে যায়, অত্যাচার করে, এবং পরে খুন করে। অবশ্য প্রভাবশালী পত্রিকা "লি কমার্সিয়েল"-এ সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণার প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয়।

অবশ্য প্রিফেক্ট মশায় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসার দু'এক দিন আগেই এমন কিছু গুরুতর সংবাদ পুলিশের হাতে আসে যাতে "লি কমার্সিয়েল" পত্রিকার যুক্তির প্রধান অংশটাই নস্যাৎ হয়ে যায়। জনৈকা মাদাম দেলুক-এর দুটি ছোট ছেলে বারিয়েরে দু রুলে-র নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একটা ঘন ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তার মধ্যে ছিল তিন-চারটে বড় পাথর দিয়ে তৈরী পিঠ ও পা-দান সমেত একটা আসন। উপরের পাথরটার উপর পড়েছিল একটা সাদা পেটিকোট; দ্বিতীয়টার উপর একটা সিল্কের ছোট চাদর। একটা ছোট ছাতা,

দস্তানা, আর পকেট-রুমালও ছিল। রুমালে "মারি রোগেত" নাম লেখা। চারদিকের কাঁটাঝোপের মধ্যে পোশাকের টুকরোও পাওয়া যায়। মাটিতে পায়ের দাগ, ঝোপঝাড় দুমড়ানো, সর্বত্র সংঘর্ষের চিহ্ন। ঝোপ থেকে নদী পর্যন্ত বেড়াগুলো ভাঙা, মাটির অবস্থা দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় সেখান দিয়ে কোন ভারী বোঝা টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

এটা আবিষ্কারের পরেই কিছু নতুন সাক্ষীও পাওয়া গেল। মাদাম দেলুক তার সাক্ষ্যে বলল, বারিয়েরে দু রুলে-র বিপরীতে নদীর থেকে অদূরেই তার একটা ছোট সরাইখানা আছে। অঞ্চলটা বেশ নির্জন। শহরের বদমাসদের রবিবারের আড্ডাখানা ; তারা নৌকো করে নদী পার হয়ে আসে। আলোচ্য রবিবার বিকেল তিনটে নাগাদ কালো চেহারার একটি যুবককে নিয়ে একটি যুবতী মেয়ে সরাইখানায় আসে। দুজনে কিছু সময় এখানে কাটায়। বেরিয়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা জঙ্গলের পথ ধরে। মেয়েটির পোশাকের উপর মাদাম ডুলেক-এর নজর পড়ে, কারণ তার এক মৃত আত্মীয়ার পোশাকের সঙ্গে ওটার মিল ছিল। বিশেষ করে ছোট চাদরটার উপরেই তার নজর পড়ে। তারা দুজন চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই একদল পাষণ্ড এসে হাজির হয়, হৈ-হল্লা শুরু করে, তারপর পান-ভোজন সেরে পয়সা না দিয়ে যুবক-যুবতীর পথটা ধরেই চলে যায়, সন্ধ্যা নাগাদ সরাইখানায় ফিরে আসে, এবং তাড়াহুড়া করে নদী পার হয়ে চলে যায়।

সেই একই সন্ধ্যায় অন্ধকার হবার অল্পক্ষণ পরেই মাদাম দুলেক ও তার বড় ছেলে সরাইখানার কাছাকাছি নারীকন্ঠের আর্তনাদ শুনতে পায়। আর্তনাদ তীক্ষ্ণ, কিন্তু সংক্ষিপ্ত। মাদাম ডি. শুধু যে ঝোপের মধ্যে পাওয়া চাদরটাকে চিনতে পেরেছিল তাই নয়, মৃতদেহের উপরকার পোশাকটাও চিনেছিল। জনৈক বাস-চালক ভ্যালেন্সও তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, সেই রবিবার সন্ধ্যায়ই কালো চেহারার একটি যুবকের সঙ্গে মারি রোগেতকে ফেরিতে চেপে সীন নদী পার হতে সে দেখেছে। ভ্যালেন্স মারিকে চিনত ; কাজেই তার ভুল হবার কথা নয়। ঝোপের মধ্যে যে সব জিনিস পাওয়া গেছে সেগুলিকে মারির আত্মীয়রা ভালভাবেই সনাক্ত করেছে।

দুপাঁ-র কথামত সংবাদপত্রগুলি থেকে আমি এই যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ ও তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম তার মধ্যে আরও একটি তথ্য ছিল—আর সেটাই ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরে বর্ণিত পোশাকগুলি আবিষ্কৃত হবার অব্যবহিত পরেই মারির বাগদত্ত প্রেমিক স্যাঁত ইউস্টাচের মৃতদেহ, অথবা মৃতপ্রায় দেহ পাওয়া যায় অনুমিত অকুস্থলেরই কাছাকাছি একটা স্থানে। তার কাছাকাছিই পাওয়া যায় "লডেনাম" (আফিমের আরক) লেবেল-আঁটা একটা খালি শিশি। তার নিঃশ্বাসেও ছিল সেই বিষের গন্ধ। কোন কথা বলার আগেই সে মারা যায়। তার শরীরের উপরে একটা চিঠি পাওয়া যায়, তাতে সংক্ষেপে মারির প্রতি ভালবাসা জানিয়ে নিজের আত্ম-হননের পরিকল্পনার কথা লেখা ছিল।

আমার লিখিত বিবরণটি পড়া শেষ করে দুপাঁ বলল, "এটা যে রু মর্গ"-এর চাইতেও বেশী জটিল কেস সেটা বলাই বাহুল্য। নিষ্ঠুর হলেও অপরাধ হিসাবে এটা সাধারণ। এর মধ্যে অসাধারণ কিছু নেই। এই কারণেই এই রহস্যের সমাধানকে সহজ মনে করা হয়েছে, অথচ ঠিক এই কারণেই সমাধানকে খুব শক্ত মনে করা উচিত ছিল। এই তো দেখ, প্রথমেই মনে করা হয়েছিল কোনরকম পুরস্কার ঘোষণা করারই দরকার নেই। যেন জি-র মাইনে-করা চেলা-চামুণ্ডারা প্রথমেই বুঝে নিয়েছিল এইরকম একটা নৃশংস ঘটনা কেমন করে ঘটেছিল এবং কেন ঘটেছিল।

"মাদাম লে' এস্‌পানায়ে ও তার মেয়ের কথাই ধরা যাক। তদন্ত শুরু করার একেবারে গোড়ায় এটা যে একটা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই কারও ছিল না। আত্মহত্যার সম্ভাবনাটা প্রথমেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকে এ কথাও বললেন যে, মৃতদেহ যেটা পাওয়া গেছে সেটা মারি রোগেতের নয়, অথচ তার খুনীকে বা খুনীদের ধরবার জন্যই পুরস্কার ঘোষণা করা হল, আর সে বিষয়ে পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে তখন আমরাও একমত ছিলাম। আমরা দুজনই বড়কর্তা লোকটিকে ভাল করেই চিনি। তাকে খুববেশী বিশ্বাস করা যায় না। এখন—যদি মৃতদেহটি পাবার দিন থেকে তদন্ত শুরু করে খুনীকে খুঁজে বের করার পরে দেখি যে মৃতদেহটি মারির নয়। অন্য কারও; অথবা যদি মারিকে জীবিত বলে ধরে নিয়ে পরে দেখি যে আসলে সেই খুন হয়েছে—উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সব পরিশ্রম জলে যাবে; কারণ আমাদের তো মঁসিয় জি-র সঙ্গেই কাজকর্ম করতে হবে। সুতরাং ন্যায়বিচারের জন্য না হলেও নিজেদের স্বার্থেই সকলের আগে আমাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে—আবিষ্কৃত মৃতদেহটি নিখোঁজ মারি রোগেতের, না অন্য কারও।

"এই প্রসঙ্গে নানারকম তদন্তের ফলে যা জানা গেছে, বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে যা পাওয়া গেছে, এবং লোকের মুখে মুখে যে সব গুজব ছড়িয়েছে—সে সবই উল্টো-পাল্টা, অসংলগ্ন, এবং পরস্পরবিরোধী। অতএব তার উপর নির্ভর করে সত্যের সন্ধ্যানে অগ্রসর হওয়া আর অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানো প্রায় একই কথা।

"তাহলে কোন্ পথ ধরে এগোলে আমরা সত্যের সন্ধান পাব? আমাদের সংগৃহীত তথ্য যত বাড়বে এবং যত সুস্পষ্ট হবে ততই সে পথ উজ্জ্বলতর হয়ে দেখা দেবে। প্রথম গৃহত্যাগের ব্যাপারটা নিয়ে ভাল করে ভাবতে হবে। "অফিসার"-টির আনুপূর্বিক ইতিহাস, বর্তমান ঘটনাবলীর সঙ্গে তার সম্পর্ক, এবং খুনের সময়ে তিনি কোথায় ছিলেন—সব আমাদের জানতে হবে। একটি মস্তান দলকে এই খুনের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার জন্য বিভিন্ন সান্ধ্য দৈনিকপত্রে যে সব সংবাদ পাঠান হয়েছিল, সেগুলিকে যত্নসহকারে মিলিয়ে দেখতে হবে। এসব কাজ হয়ে গেলে, মাদাম দেলুককে ও তার ছেলেদের এবং অমনিবাস-চালক ভ্যালেন্সকে বেশ ভাল করে জেরা করে

“কালো লোকটি”-র চেহারা ও চালচলনের আরও কিছু নির্দিষ্ট বিবরণ জানতে হবে। তারপর ২৩শে জুন সোমবার সকালে ভারপ্রাপ্ত অফিসারের অজ্ঞাতে জনৈক কর্মচারি যে হালবিহীন বজরাখানিকে মৃতদেহটি আবিষ্কৃত হবার সমকালেই অফিস থেকে নিয়ে সরে পড়েছিল সেই বজরাকে খুঁজে বের করতে হবে। যথেষ্ট অধ্যবসায় সহকারে উপযুক্ত সতর্কতা নিয়ে খোঁজ করলে বজরার হদিস অবশ্যই মিলবে; আর সেই সঙ্গে বজরার কর্মচারিটিকেও হালসহ হাতেনাতে ধরা যাবে।

“খুনী একক চেষ্টায় একটা ভারী দেহকে তীরে টেনে তুলেছে এই ভঙ্গির মাধ্যমেই আমি আগেই বলতে চেয়েছি যে একটা নৌকোর সহায়তা সে অবশ্যই পেয়েছিল। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে মারি রোগেতকে নৌকো থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। নদীতীরের অগভীর জলে মৃতদেহকে ফেলে চলে যাওয়া মোটেই নিরাপদ হত না। মৃতার পিঠে ও ঘাড়ে যে দাগ দেখা যায় সেটা নৌকোর এড়ো কাঠের সঙ্গে ঘষ্টানির চিহ্ন ছাড়া আর কিছু হতে পারে। তাছাড়া তীর থেকে মৃতদেহটিকে জলে ভাসিয়ে দিলে তার সঙ্গে একটা ভারী জিনিসকে অবশ্যই বেঁধে দেওয়া হত। যাই হোক, দুষ্কর্মটি শেষ করে খুনী জাহাজঘাটা থেকে পালিয়ে যায়, এবং যাবার আগে নৌকোটির নোঙর জলে ফেলে দেয়। এবার আমাদের কল্পনাকে আরও কিছুটা টানা যাক।—সকাল হলে সেই হতভাগ্য লোকটি যখন দেখতে পেল, সেই নৌকোটাকে কেউ খুঁজে পেয়ে এমন এক জায়গায় আটক করে রেখেছে যেখানে সে হরদম যাতায়াত করে, তখন সে বেচারি কী অকথ্য ভয়ে একেবারে মুষড়ে পড়ল। পরদিন রাতে সে হালটাকে নৌকো থেকে খুলে নেয়। এখন কথা হল, সেই হালবিহীন নৌকোটা গেল কোথায়? সেটা আমাদের সর্বাগ্রে খুঁজে বের করতে হবে। সেটা চোখে পড়ামাত্রই আমাদের সাফল্যের শুভ-সূচনা হবে। নৌকোটিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেই লোকটার কাছে যে সেই ভয়ংকর মাঝরাতে সেটাকে কাজে লাগিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি: আমার এই বিবরণ থেকে সহজেই ধরা পড়বে যে, বেচারি মেরি সিসিলিয়া রোজার্স-এর নিয়তি (“রু মর্গের হত্যাকাণ্ড” দ্রষ্টব্য) এবং মারি রোগেত-এর নিয়তির মধ্যে এত বেশী মিল আছে যা আমাদের একেবারে হতবুদ্ধি করে দেয়। আমি বলছি, এসবই যথাসময়ে প্রকাশ পাবে। কিন্তু মারির জীবনের এই করুণ কাহিনীটি লেখা, এবং তাকে ঘিরে যে রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে তার পরিণতি খোঁজার ব্যাপারে আমার আসল উদ্দেশ্য-দুটি ঘটনার মধ্যেকার মিলকে যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করা, অথবা একটি ইতর মহিলার খুনীকে ধরতে প্যারিস শহরে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, কিংবা অনুরূপ যুক্তির ভিত্তিতে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতেও অনুরূপ ফলই পাওয়া যাবে এরূপ ইঙ্গিত করা—এ কথা যেন মুহূর্তের জন্যও কেউ মনে না করেন।

“আশার বংশ”-এর অবসান

The Fall of the House of Usher

সে বছর হেমন্তকালে মেঘেরা যখন আকাশ থেকে বড় বেশী নীচুতে নেমে ঝুলে ছিল তেমনি এক একঘেয়ে ধূসর, নিঃশব্দ দিন ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমি একাকি কাটিয়েছিলাম গ্রামাঞ্চলের আনন্দহীন পথে। শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যার ছায়া ঘন হয়ে নেমে আসতেই আমার চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল বিষণ্ণ “আশার ভবন”। কেমন করে হয়েছিল জানি না,—তবে বাড়িটাকে দেখার প্রথম মুহূর্তেই একটা দুর্বিষহ বিষণ্ণতা যেন আমার মনটাকে চেপে ধরেছিল। দুর্বিষহ বলছি এই কারণে যে, কোন ভয়ংকরের বা নির্জনতার কঠোরতম মূর্তির মুখোমুখি দাঁড়ালেও যে অর্ধসুখময় কাব্যিক অনুভূতি আমাদের মনকে দোলা দেয় এক্ষেত্রে তাও ছিল অনুপস্থিত। এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম সম্মুখের দৃশ্যাবলীর দিকে—দেখছিলাম বাড়িটা চারদিকের অতি সাধারণ পল্লী-দৃশ্যকে—তার বিষণ্ণ প্রাচীর—নয়নাকৃতি খোলা বাতায়ন—জলজ তৃণভূমি—কিছু মরা গাছের সাদা কান্ড আর দেখতে দেখতে এমন একটা অসহায় বিষণ্ণতা আমার মনের উপর চেপে বসেছিল যার একমাত্র তুলনা হতে পারে কোন অহিফেনসেবীর স্বপ্নভঙ্গের পরবর্তী মানসিক অবস্থার সঙ্গে—স্বপ্ন থেকে দৈনন্দিন জীবনের তিক্ততায় ফিরে যাওয়ার সঙ্গে—জীবনের উপর থেকে অবগুণ্ঠন অপসারিত হওয়ার পরবর্তী বীভৎসতার অনুভূতির সঙ্গে। সারা অন্তরকে ঘিরে ধরল কী এক বরফ-শীতলতা, জলমগ্ন হওয়ার অসহায়তা, রোগাক্রান্তের দুর্বিষহতা—চিন্তার এমন একটা প্রতিকারহীন ভয়াবহতা যাকে দূরতম কল্পনায়ও কোন মহৎ অনুভূতির স্তরে উন্নীত করা যায় না। কিছুক্ষণ নিজের মনেই ভাবলাম—কি সেই শক্তি যা “আশার ভবন”-এর কথা ভাবতে গিয়েই আমাকে এমন অসহায় করে তুলল? এ রহস্য সমাধানের অতীত; আবার সেই ভাবনার ফলে যে সব অস্পষ্ট কল্পনা আমার মাথার মধ্যে ভিড় করল তাকেও আমি ঠিকমত ধরতে পারলাম না। অগত্যা আমাকে এই অসন্তোষজনক সিদ্ধান্তকেই মেনে নিতে হল যে, যদিও অত্যন্ত সরল ও স্বাভাবিক সব ঘটনার সমাহার অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মনকে এরকমভাবে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে তথাপি সেই ক্ষমতার সঠিক বিশ্লেষণ আমাদের শক্তির অতীত। আরও মনে হল, এই দৃশ্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণকে অন্যকোনভাবে সাজাতে পারলে হয়তো আমাদের মনের উপর তার দুঃখজনক প্রভাব বিস্তারের শক্তি অনেকাংশে হ্রাস পেত, অথবা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেত। এই ধারণার বশবর্তী হয়েই আমি ঐ ভবনের পার্শ্ববর্তী ধূসর শান্ত জলের হ্রদটির খাড়া তীরের একেবারে উপরে পৌঁছে ঘোড়ার রাশটা টেনে ধরে নীচে তাকালাম—কিন্তু সেখান থেকে যে দৃশ্যটি চোখে পড়ল তাতে

অধিকতর ভয়ে আমার সারা শরীর ও মন শিউরে কেঁপে উঠল—উপরকার ধূসর তৃণভূমি, ভূতুড়ে বৃক্ষকাণ্ডের সারি, আর নয়নাকৃতি খোলা জানালার সারি—সব কিছুরই একটি ওলটানো বিকৃত ছবি ভাসছে হ্রদের জলে।

তথাপি এ যাত্রায় এই বিষণ্ণ বাড়িটাতেই কয়েকটি সপ্তাহ কাটাব বলে স্থির করলাম। বাড়ির মালিক রোডেরিক আশার আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু; উভয়ের সর্বশেষ দেখা-সাক্ষাতের পরে অনেকগুলি বছর কেটে গেছে। সম্প্রতি দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকার সময় তার একটা চিঠি আমি পেয়েছি। চিঠিতে এমন একটা নাছোড়বান্দা মনের আভাষ ছিল যে তার সে চিঠির উত্তর না দিয়ে আমি পারি নি। হাতের লেখায় স্নায়বিক উত্তেজনার স্পষ্ট প্রকাশ। পত্রলেখক নিজেই জানিয়েছে তার কঠিন শারীরিক অসুস্থতা—মানসিক ভারসাম্যের অভাবের কষ্ট তার সব চাইতে প্রিয় এবং একমাত্র ব্যক্তিগত বন্ধু হিসাবে আমাকে দেখার একান্ত আগ্রহের কথা। সে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায়, আমার সঙ্গসুখের ফলে তার এই কঠিন রোগের কিছুটা নিরাময় ঘটে কি না। যে ভাবে সে এই সব কথা এবং আরও অনেক কিছু সে লিখেছে—সমস্ত অন্তর দিয়েই পাঠিয়েছে তার অনুরোধের বাণী—যে আমার দিক থেকে ইতস্তত করার কোন অবকাশই ছিল না; তাই সঙ্গে সঙ্গেই তার সবিশেষ আহ্বানে আমি সাড়া দিয়েছি।

আমার বালক-বয়সের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী হলেও বন্ধুর সম্পর্কে আমি প্রায় কিছুই জানতাম না। নিজেকে রেখে-ঢেকে চলতেই সে অভ্যস্ত ছিল; আর সে ব্যাপারে তার কিছুটা বাড়াবাড়িও ছিল। অবশ্য আমি এটুকু জানতাম যে স্মরণাতীত কাল থেকেই তার সুপ্রাচীন পরিবারটি ছিল একটি বিশেষ মেজাজের জন্য সুখ্যাত—দীর্ঘ বছর ধরে সে মেজাজের প্রকাশ ঘটেছিল উঁচুদরের শিল্প-কলার অসংখ্য কারুকর্মে, এবং সম্প্রতিকালে নানাবিধ উদার দান-ধ্যানে আর ধ্রুপদী ও সহজবোধ্য সঙ্গীত-সাধনার পরিবর্তে সঙ্গীতের জটিলতর শাখাগুলির প্রতি প্রগাঢ় আগ্রহে ও চর্চায়। আরও একটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তথ্যও আমি জেনেছিলাম: সর্বজন শ্রদ্ধেয় এই আমার বংশের মহামহীরুহের মূল কাণ্ডটি থেকে কোন কালেই কোন স্থায়ী শাখা-প্রশাখা গজায় নি; অন্যভাবে বলা যায়, গোটা পরিবারটি আজও পর্যন্ত মোটামুটিভাবে একটিমাত্র বংশকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশানুক্রমে একটি পারিবারিক ধারাই বয়ে চলেছে এই বিশাল ভবনটিকে কেন্দ্র করে, আর তারই ফলে বাড়িটার মূল নামকরণ যাই হয়ে থাকুক, কালে কালে আশপাশের সাধারণ অধিবাসীদের মুখে মুখে বাড়িটি পরিচিত হয়ে উঠেছে "আশার ভবন" নামে—ঐ একটি নামই পরিবারের এবং তাদের বাসগৃহেরও পরিচয়।

যাই হোক, মুখ তুলে আবার বাড়িটার দিকেই নজর দিলাম। অতি-প্রাচীনতাই বাড়িটার প্রধান বৈশিষ্ট্য। মহাকালের হস্তাবলেপনে পুরো বাড়িটাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। সারা প্রাচীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে ছত্রাকের আবরণ। তাই বলে বাড়িটা কিন্তু মোটেই ধ্বংসের পথে নামে নি। কোথাও খসে পড়ে নি চুন-বালির আস্তরণ।

কেবল মাঝে মাঝে কিছু পাথর খসে পড়ার মুখে। তাছাড়া, বাড়িটার কোথাও কোন ভগ্নদশা চোখে পড়ে না। হয় তো খুব খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়বে একটা সূক্ষ্ম ফাটল সামনের ছাদ থেকে এঁকেবেঁকে নেমে গেছে দেওয়াল বরাবর, এবং এক সময় হ্রদের কালো জলে হারিয়ে গেছে।

এই সব দেখতে দেখতেই ছোট বাঁধানো সড়কটা পার হয়ে বাড়িটার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। অপেক্ষমান চাকরটি এসে ঘোড়ার রাশ হাতে নিল, আর আমিও হল-ঘরের গথিক খিলানের নীচ দিয়ে ভিতরে ঢুকলাম। চুপি চুপি পা ফেলে খানসামা এসে আমাকে নিঃশব্দে নিয়ে চলল অনেক অন্ধকার আঁকাবাঁকা পথ পার হয়ে তার মালিকের স্টুডিয়োতে। যেতে যেতে যা কিছু চোখে পড়ল তাতে আমার আগেকার মানসিকতাই যেন আরও বেড়ে গেল। চারদিকের সব কিছু—ছাদের কারুকর্ম, দেওয়ালের বিষণ্ণ পর্দা, মেঝের আবলুস-কালো রং, অদ্ভুতদর্শন বর্ম-চর্মের বিজয়-স্মারক—সবই তো আমার বাল্যকাল থেকেই চেনা; অথচ এই সব পরিচিত বস্তুই কল্পনায় কী এক অপরিচয়ের রহস্য নিয়ে যে আমার চোখে ধরা দিল তা দেখে আমার যেন বিস্ময়ের সীমা রইল না। একটা সিঁড়িতে পারিবারিক চিকিৎসকের দেখা পেলাম। মনে হল, তার চোখে-মুখে যেন শঠতা ও বিমূঢ়তার একটা মিশ্র অনুভূতির প্রকাশ। সভয়ে আমাকে অভিবাদন জানিয়েই তিনি সরে পড়লেন। এবার খানসামা একটি দরজা খুলে দিয়ে আমাকে হাজির করল তার মালিকের সামনে।

উঁচু ছাদের বেশ বড় ঘর। জানালাগুলি লম্বা, অপ্রশস্ত ও তীক্ষ্ণাগ্র; কালো ওক কাঠের মেঝে থেকে সেগুলি এত বেশী উঁচুতে বসানো যে ভিতর থেকে সেখানে ওঠাই সম্ভব নয়। জাফরি-কাটা কাঁচের ভিতর দিয়ে দিনশেষের রাঙা আলো পড়েছে ঘরের ভিতরে। এবার চারদিকের সবকিছুই বেশ ভালভাবে চোখে পড়ল। তবে অনেক চেষ্টা করেও ঘরের কোণগুলি অথবা খিলান ও কারুকার্যখচিত সিলিং দেখা গেল না। দেওয়ালজুড়ে মোটা পর্দা ঝোলানো। আসবাবপত্র প্রচুর, তবে সবই সেকেলে, ভগ্নপ্রায়, আর অনারামদায়ক। অনেক বই ও বাদ্যযন্ত্র ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। মনে হল, আমি যেন একটা দুঃখের পরিমণ্ডলে শ্বাস নিচ্ছি। একটা কঠিন, গভীর, দুরপনেয় বিষণ্ণতা যেন সর্বত্র প্রসারিত হয়ে আছে।

বন্ধু আশার একটা সোফায় পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই সে সোফা থেকে উঠে এত বেশী সমাদরের সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল যে সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন বাড়াবাড়ি মনে হল। অবশ্য তার মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম তার এই অভ্যর্থনা একান্তভাবেই আন্তরিক। দুজন সোফায় বসলাম। কিছুক্ষণ সে কোন কথাই বলল না; তার দিকে তাকিয়ে অর্ধেক করুণা আর অর্ধেক আতংকের একটা মিশ্র অনুভূতিতে আমার মনটা ভরে উঠল। রডেরিক আশারের আগে আর কোন মানুষ কখনও এত অল্প সময়ে এমন ভয়ংকর পরিবর্তনের শিকার হয় নি! অনেক কষ্ট করে তবে আমার মনকে বোঝাতে পারলাম যে আমার সামনে বসা এই মানুষটি আর আমার সেই ছোটবেলার সঙ্গীটি

একই মানুষ। অথচ তার মুখের গড়ণটা আগাগোড়াই ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখ; একটা চোখ বেশ বড় ও অস্বাভাবিক রকমের উজ্জ্বল; ঠোঁট দুটি সামান্য পাতলা আর বড়ই ফ্যাঁকাসে, কিন্তু ঠোঁটের বাঁকটি অতুলনীয় সুন্দর; সুন্দর হিব্রু গড়ণের নাকে নাসারন্ধ্রটি অস্বাভাবিক রকমের চওড়া; সুগঠিত থুতনি নৈতিক শক্তির অভাব সূচিত করে; মাকড়সার জালের মত নরম, পাতলা চুল; এত সব বৈশিষ্ট্য সমন্বিত মুখখানিকে সহজে ভোলা যায় না। অথচ তার আজকের মুখ দেখে আমার মনেই সন্দেহ জাগল আমি কার সঙ্গে কথা বলছি। অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও তার এখনকার চামড়ার ভৌতিক পাণ্ডুরতা আর চোখের অলৌকিক উজ্জ্বলতা আমাকে হতচকিত, এমন কি ভীত করে তুলল। মাথার রেশমি চুলগুলিও অযত্নে অনেক বেশী বেড়ে মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ার বদলে বড় বেশী বাতাসে উড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও তার মুখের এই আরবসুলভ কারুকার্যকে একটি সরল মানুষের মুখের সঙ্গে কোন মতেই মেলাতে পারলাম না।

বন্ধুর চালচলনে খুব সহজেই একটা অসংলগ্নতা—একটা অসামঞ্জস্য আমার চোখে ধরা পড়ল। অচিরেই বুঝতে পারলাম এ সবই একটি অভ্যাসগত কাঁপুনি—একটি অত্যধিক স্নায়বিক উত্তেজনাকে জয় করবার ব্যর্থ চেষ্টার ফল। অবশ্য তার চিঠি পড়ে এই ধরনের একটা কিছুর জন্য আমি তৈরী হয়েই এসেছিলাম। তার সব কাজকর্মই ছিল কখনও স্ফূর্তিতে উজ্জ্বল। আবার পরক্ষণেই বিষণ্ণতায় পাণ্ডুর। তার কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন ঘটেছে অতি দ্রুত তালে—এই অস্থিরচিত্ততায় কম্পমান, আবার কখনও কণ্ঠবর্ণের আন্দোলিত উচ্চারণের সুসম মূর্ছনা। ঠিক যেমনটি দেখা যায় তীব্র উত্তেজনার মুহূর্তে কোন পাড় মাতাল, বা বেহেড আফিংখোড়ের বেলায়।

সেই একই ভঙ্গীতে সে বলে গেল আমাকে এখানে আমন্ত্রণের উদ্দেশ্য, আমাকে দেখার জন্য তার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং আমার কাছ থেকে সে কতটা সান্ত্বনা প্রত্যাশা করে তার বিবরণ। নিজের রোগের কথাও সবিস্তারে শোনাল। বলল, এটা একটা মজ্জাগত পারিবারিক ব্যাধি, সুতরাং এ ব্যাধি নিরাময়ের কোন আশাই নেই। আবার পরক্ষণেই বলল, এটা একটা স্নায়বিক রোগমাত্র, অচিরেই সেরে যাবে। ইন্দ্রিয়সমূহের অত্যধিক তীক্ষ্ণতায় সে ভুগছে; কেবলমাত্র স্বাদবিহীন খাবারই তার সহ্য হয়; একমাত্র একটি বিশেষ ধরনের বোনা কাপড়ের পোশাকই সে পরতে পারে; সব রকম গন্ধই তার পক্ষে কষ্টদায়ক; অত্যন্ত মৃদু আলোতেও চোখে যন্ত্রণা হয়; কতকগুলি বিশেষ ধরনের শব্দ এবং তার যন্ত্রের বাজনা ছাড়া অন্য যে কোন শব্দ তার মনে ভয়ের সঞ্চার করে।

একটা বিশেষ ধরনের আতংকের একেবারে কৃতদাস বলে তাকে মনে হল। সে বলল, "আমি মরে যাব, এই শোচনীয় বোকামির ফলেই আমার মৃত্যু অনিবার্য। ঠিক এইভাবে, এই ভাবেই, অন্য কোন ভাবে নয়, আমি একদিন হারিয়ে যাব। ভবিষ্যতের ঘটনাকেই আমার ভয়,—ঘটনাগুলিকে নয়, ভয় তাদের ফলাফলকে। মনের এই অসহ্য ক্ষোভের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন যে কোন ঘটনা—এমন কি

তুচ্ছতম ঘটনার কথা ভাবতেই আমি শিউরে উঠি। বিপদকে আমি ঘৃণা করি না, ঘৃণা করি তার ভয়কে। এই সকরুণ স্নায়বিক অবস্থায় আমার মনে হচ্ছে আজ হোক কাল হোক এক নির্মম অপচ্ছায়া যার নাম আতংক তার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতেই একদিন আমাকে একই সঙ্গে বিদায় নিতে হবে জীবন ও যুক্তির কাছ থেকে।”

তাছাড়াও, তার সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে, ভাঙা ভাঙা আকার-ইঙ্গিত থেকে তার মানসিক অবস্থার আরও একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমি ধরতে পেরেছি। যে বাড়িটাতে সে বাস করছে এবং অনেক বছর ধরে সেখান থেকে কখনও বেরিয়ে আসে নি সেই পারিবারিক অট্টালিকাটিই দিনের পর দিন নানা ভাবে, নানা আকারে তার মনের উপরে নিজের অশুভ ছায়াটি ফেলেছে—এ বাড়ির ধূসর দেওয়াল ও গম্বুজের সারি এবং নীচের আলো-আঁধারিতে ঢাকা হ্রদের জলে তাদের প্রতিফলন—এ সবই শেষ পর্যন্ত তার অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

অবশ্য বেশ ইতস্তত করেই এ কথাটাও সে স্বীকার করেছে যে, তার এই অদ্ভুত বিষণ্ণতার মূলে আছে আরও একটি অধিকতর স্বাভাবিক ও বোধগম্য কারণ—সেটি তার বড় আদরের বোন—তার দীর্ঘ দিনের একমাত্র সাক্ষী—এই পৃথিবীতে তার শেষতম ও একমাত্র আত্মীয়ার দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন অসুখ—মৃত্যুই যার আসন্ন পরিণতি। যে তিক্ততার সঙ্গে সে কথাটা বলল তা আমি কোনদিন ভুলব না। সে বলল, “তার মৃত্যু আমাকে (এই অসহায় ভঙ্গুরদেহ আমাকে) রেখে যাবে প্রাচীন আশার বংশের শেষ বংশধর করে।” সে যখন কথাগুলি বলছিল তখন লেডি ম্যাডেলিন (এটাই তার নাম) সেই ঘরের দূরতম অঞ্চলে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার উপস্থিতিকে খেয়াল না করেই অদৃশ্য হয়ে গেল। তাকে দেখেই আমার মনে জাগল ভয়মিশ্রিত চূড়ান্ত বিস্ময়—অথচ তার কোন কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। তার অপসৃয়মান দুটি পায়ের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন একটা ঘোর নেমে এল আমার মনের উপর। শেষ পর্যন্ত ঘরের দরজাটা বন্ধ হতেই আমার চোখ দুটি স্বতঃই গিয়ে পড়ল তার ভাইয়ের মুখের উপর—কিন্তু তখন সে দুই হাতে তার মুখটাই ঢেকে রেখেছে। আমি শুধু দেখলাম, তার অস্বাভাবিক রকমের ক্লান্ত, পাণ্ডুর, শীর্ণ আঙ্গুলগুলির ফাঁক দিয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে অনেক বেদনার অশ্রু।

লেডি ম্যাডেলিনের রোগের তার চিকিৎসকরা দীর্ঘদিন ধরে বৃথাই লড়াই করেছেন। ক্রমেই তার শরীর জীর্ণ হতে জীর্ণতর হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত সে ধীর চিত্তেই এই কঠিন রোগের সব বোঝা বয়ে বেড়িয়েছে, কখনও শয্যা গ্রহণ করে নি। কিন্তু সে বাড়িতে আমার উপস্থিতির দিনই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার পরে সে সংহারকর্তার সর্বশক্তিমান পায়ে নিজেকে নিবেদন করে দিল (সেই রাতেই অবর্ণনীয় দুঃখের সঙ্গে তার ভাইই আমাকে কথাটা জানিয়েছিল)। সেই সঙ্গে আমি আরও জেনেছিলাম, তার যে ক্ষণিকের দেখা আমি সেদিন পেয়েছিলাম সেটাই আমার শেষ দেখা—অন্তত জীবিত অবস্থায় আমি তাকে আর দেখতে পাব না।

তারপর বেশ কয়েকদিন কেটে গেল। আশার বা আমি কেউই তার নামটিও

মুখে আনলাম না। বন্ধুর দুঃখের ভার লাঘব করার আপ্রাণ চেষ্টাতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখলাম। কখনও এক সঙ্গে ছবি আঁকি। কখনও এক সঙ্গে কিছু পড়ি। অথবা তার গিটারের মন-গড়া সব সুরের মূর্ছনাকে যেন স্বপ্নের ঘোরে বসে শুনি। এইভাবে দুজনের ঘনিষ্ঠতা ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল। তার মনের জানালাগুলো একে একে আমার সামনে খুলে যেতে লাগল। আর আমি যেন ততই বেশী করে উপলব্ধি করলাম যে এ মনকে আনন্দঘন করে তোলার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ অন্ধকারের বুকের ভিতর থেকে উৎসাহিত একটি শেষহীন বিষণ্ণতার ধারা তার নৈতিক ও দৈহিক জগৎকে চিরদিনের মত আবৃত করে দিয়েছে।

এই ভাবে "আশার ভবন"-এর মালিকের সঙ্গে একাকী যে গম্ভীর মুহূর্তগুলি আমি কাটিয়েছিলাম তার স্মৃতি আমি চিরদিন বুকের মধ্যে ধরে রাখব। অথচ সে স্মৃতির সঠিক রূপটি আমি কোনদিনই তুলে ধরতে পারব না। একটা উত্তেজনাময় নিরাকার ধারণা যেন সে সব কিছুর উপর ছড়িয়ে দিয়েছে একটা গন্ধকের দীপ্তি। তার দীর্ঘ মন-গড়া বিলাপ-নীতিগুলি চিরকাল আমার কানে বাজবে। অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে একান্ত দুঃখেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছি তার নিজের মত করে গড়া ভন বেবার-এর শেষ দ্বৈত নৃত্যের বিকৃত ও অতিরঞ্জিত মাধুরীকে। ছবি আঁকার ব্যাপারেই তার কল্পনা যেন সব চাইতে বেশী উদ্দাম হয়ে উঠত। তুলির পর তুলির টান পড়তে পড়তে এক সময় তার ছবিটা উত্তীর্ণ হত কোন এক অস্পষ্টতার জগতে। তা দেখে আমিও উত্তেজনায় থর্‌থর্‌ করে কাঁপতাম। তার একান্ত সরলতা, পরিকল্পনার অনাবরণতাই যেন মনোযোগকে আকর্ষণ করত, আতংকিত করে তুলত। কোন মানুষ যদি কোন কালে ভাবনার ছবি এঁকে থাকে তো সে মানুষ রডোরিক আশার।

তার এই বিচিত্র মানসিকতার একটা ছোট উদাহরণ দিই। একখানি ছোট ছবিতে দেখানো হয়েছে একটি দীর্ঘ চতুষ্কোণ ভূগর্ভ-কক্ষ বা সুড়ঙ্গের অভ্যন্তর ভাগ। তার নীচু দেওয়াল মসৃণ, সাদা ও নক্সাবিহীন। আরও কিছু তুলির টানের সাহায্যে ভালভাবেই বোঝানো হয়েছে যে খনন কার্যটি চালানো হয়েছে পৃথিবীর সমতল থেকে অনেক—অনেক গভীরে। কোথাও কোন ফাঁক ফোকর নেই, নেই কোন মশাল বা কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা। অথচ একটা আলোর বন্যা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র ও একটা ভৌতিক ও অনুপযোগী উজ্জ্বলতায় যেন ডুবে গেছে সব কিছু।

তার এই উদ্দাম অসংযত কল্পনা-শক্তির প্রকাশ কাব্য-রচনার ক্ষেত্রেও কিছু কম প্রকটিত নয়। তার তেমনি একটি অসংলগ্ন রচনা আজও আমার মনে আছে। মনে আছে আরও এই কারণে যে ঐ কবিতাটি পড়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তার বুদ্ধিবৃত্তিও যে স্বীয় সিংহাসনের উপরেই মুখ থুবড়ে পড়েছে সে সম্পর্কে আশার-এর পরিপূর্ণ সচেতনতাও সেখানেই প্রথম ধরা পড়েছিল। কবিতাটির শিরোনাম ছিল "ভূতুড়ে প্রাসাদ" আর কবিতাটি ছিল মোটামুটি এই রকম ঃ

১

আমাদের সবুজ উপত্যকায় বাস করত পরীরা।
একদা একটি রাজার প্রাসাদ—উজ্জ্বল প্রাসাদ
মাথা তুলল সেখানে।
চিন্তা-মহারাজার রাজ্যে
সে মাথা তুলল!
এমন সুন্দর দেশের আকাশে
কোন দিন পাখা মেলে নি কোন দেবদূত।

২

হলুদ, উজ্জ্বল, সোনালী নিশানগুলি
ভেসে ভেসে চলত তার ছাদের উপরে ;
(এটা—এসব কিছুই সেই প্রাচীন কালের
অনেক যুগ আগেকার কথা)
সেই সব সুন্দর দিনে
মৃদু বাতাস যখন বয়ে যেত
ধূসর প্রাচীরকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
তখন একটি সুগন্ধ যেন পাখায় ভর দিয়ে
চলে যেত দূর হতে দূরান্তরে।

৩

সেই সুখের উপত্যকায় আসত যত পথিক
দুটি আলোকিত বাতায়ন-পথে তারা দেখত
বাঁশির সুমধুর সুরের তালে তালে
নাচছে যত পরীর দল
একটি সিংহাসনকে ঘিরে। সেখানে বসে আছেন
(পাথরের মূর্তি বুঝি !)
সে রাজ্যের রাজা মশায়
উপযুক্ত সাজসজ্জায় সেজে।

৪

সেই সুন্দর রাজপুরীর দরজায় দরজায়
ঝকমক করত মণি-মুক্তোরাজি।
আর সেই দ্বারপথে ভেসে-ভেসে
আসত যত প্রতিধ্বনি-সেনা ;
গায়ে তাদের ঝল্‌মলানো পোশাক,
তাদের একমাত্র কাজ গান ;

সুমধুর সুরে সুরে তারা গায় আর গায়
দেশের রাজার বুদ্ধি ও জ্ঞানের বাণী।

৫

কিন্তু—দুর্দিন এল দুঃখের সাজে সেজে ;
আক্রমণ করল রাজার রাজ্য ;
(আহা, এস আমরা শোক প্রকাশ করি,
কারণ তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে
কোন দিন আসবে না নতুন প্রভাত !)
আর তার বাড়িটিকে ঘিরে
একদিন যে গৌরবের ফুলগুলি ফুটেছিল
তারা আজ হয়ে গেছে স্মৃতির কথকতা
মহাকালের সমাধিতে সমাহিত।

৬

এই মুহূর্তে যে সব পথিক আছে সেই উপত্যকায়
রঙিন বাতায়ন-পথে তারা দেখছে
বড় বড় সব মূর্তি অদ্ভুতভাবে ঘুরছে
বেসুরো বাজনার তালে তালে ;
আর বীভৎস মানুষের দল কোন এক দ্রুতগামী নদীর মত
বিষণ্ণ দরজার ভিতর দিয়ে
ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে চিরদিনের মত।
তারা হাসছে অট্টহাসি—কিন্তু আর কোনদিন
হাসবে না মৃদু মধুর হাসি।

একদিন সন্ধ্যায় হঠাৎই লেডি ম্যাডেলিনের মৃত্যু-সংবাদটি আমাকে জানিয়ে আশার প্রস্তাব করল, তার মৃতদেহটি একপক্ষ কালের জন্য তাদের অট্টালিকার প্রধান প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ অসংখ্য ভূগর্ভ-কক্ষের একটির মধ্যে সাময়িকভাবে রক্ষিত থাকবে। এই বিশেষ ব্যবস্থার স্বপক্ষে যে পার্থিব যুক্তিটি সে উপস্থিত করল ইচ্ছা করেই আমি তাতে কোন আপত্তি জানাই নি। বরং আশারের অনুরোধে এই সাময়িক সমাধি-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে তাকে সাহায্য করেছি। দেহটিকে শবাধারে রেখে দুজনেই সেটাকে বয়ে নিয়ে গেলাম সমাধিস্থলে। যে ভূগর্ভ-কক্ষে সেটাকে রাখা হল সেটা খুবই ছোট, স্যাঁতসেতে, এবং আলো প্রবেশের ব্যবস্থাবিহীন। অট্টালিকার যে অংশে আমার নিজের শোবার ঘর তার ঠিক নীচে অনেক গভীরে সেই কক্ষটি অবস্থিত। সহজেই অনুমান করা যায়, সুদূর অতীতের সামন্ততন্ত্রের যুগে এটিকে ব্যবহার করা হত আপৎকালীন আশ্রয়-শিবির হিসাবে, এবং পরবর্তী কালে এটিকে ব্যবহার করা হত বারুদ ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ জমিয়ে রাখার ভাণ্ডার হিসাবে। তাই তো ঐ কক্ষের একটি অংশ এবং সম্পূর্ণ সুড়ঙ্গ পথটাই তামার পাত দিয়ে সযত্নে মোড়া। পেটা

লোহার দরজাটাও সেই একইভাবে সুরক্ষিত। দরজাটা এতই ভারী যে সেটাকে হাঁসকলের উপর ঘোরানোর সময় একটা অসাধারণ তীক্ষ্ম ধাতব শব্দ হয়।

আমাদের শোকের ভারটিকে সেই আতংকের রাজ্যে যথাযথভাবে নামিয়ে রেখে শবাধারের ঢাকনাটিকে আংশিকভাবে এক পাশে সরিয়ে মৃতের মুখের দিকে তাকালাম। ভাই ও বোনের মুখের একটা বিশেষ মিল এই সর্বপ্রথম আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল ও হয়তো আমার মনের অবস্থাটা অনুমান করেই আশার এমন কয়েকটি কথা বলল যা থেকে জানতে পারলাম যে মৃত মহিলা ও সে ছিল যমজ ভাই-বোন এবং তাদের দুজনের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য রকমের পারস্পরিক প্রভাব আগাগোড়াই ছিল। আমরা অবশ্য মৃতদেহটির উপর বেশীক্ষণ আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে রাখতে পারলাম না—কারণ একটা অস্পষ্ট ভয়ের অনুভূতি ধীরে ধীরে আমাদের মনে সঞ্চিত হচ্ছিল। যে ব্যাধি পরিপূর্ণ যৌবনকালেই মহিলাটিকে সমাধির গহ্বরে ঠেলে দিয়েছিল তার স্বাভাবিক পরিণতিতেই মৃতের বক্ষে ও মুখে ফুটে উঠেছিল একটা রক্তিমাভা, আর তার ঠোঁটে লেগেছিল এমন একটি রহস্যময় হাসির ছোঁয়া যা মৃতের মুখে বড় ভয়ংকর হয়ে ওঠে। ঢাকনাটিকে শবাধারের উপর বসিয়ে স্ক্রু আটকে দিয়ে লোহার দরজার কপাট বন্ধ করে আমরা বেশ কষ্ট করে বাড়ির উপরতলায় উঠে গেলাম।

তীব্র শোকের ভিতরে দিয়ে কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেবার পরে এবার আমার বন্ধুর মানসিক গোলযোগের কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চোখে পড়তে লাগল। তার সাধারণ চাল-চলন উধাও হয়ে গেল। সব সাধারণ কাজকর্মে প্রকাশ পেতে লাগল অনীহা ও ভ্রান্তি। দ্রুত, অসমান ও উদ্দেশ্যহীন পদক্ষেপে সে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়ায়। মুখের বিবর্ণতার উপর পড়েছে আরও এক পোচ ভৌতিক রংয়ের আভা—কিন্তু চোখের সেই জ্বলন্ত ভাবটা একেবারেই চলে গেছে। কণ্ঠস্বরের সেই ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজও শোনা যায় না—কিন্তু তার সব কথাতেই বাজে একটা ভয়ার্ত কাঁপা স্বর। অনেক সময় আমার নিজেরই মনে হত কোন একটা চাপা রহস্যকে ফাঁস করে দেবার চেষ্টাতেই সে যেন আকুলি-বিকুলি করছে। আবার কখনও মনে হত, এ সবই বোধ হয় উন্মাদের লক্ষণ। অনেক সময়ই দেখতাম ঘণ্টার পর ঘণ্টা গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে উদাস দৃষ্টিতে একই দিকে তাকিয়ে আছে, যেন কোন কাল্পনিক শব্দ শোনার চেষ্টা করছে। ক্রমে তার অবস্থা আমাকেও সন্ত্রস্ত করে তুলল—তার ব্যাধি যেন আমার মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। তার নিজস্ব কাল্পনিক অথচ আকর্ষক কুসংস্কারগুলির প্রভাব যেন ধীর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে আমার মনেও সঞ্চারিত হয়ে চলেছে।

বিশেষ করে লেডি ম্যাডালিনকে সেই আশ্রয় শিবিরে রেখে আমার সপ্তম অথবা অষ্টম দিবসের রাতে বিছানায় শুয়ে পড়ার পরেই সেই অনুভূতির পূর্ণ শক্তির অভিজ্ঞতা আমার হল। ঘুম আমার কাছেই এল না—ঘন্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। যে স্নায়বিক উত্তেজনা আমাকে চেপে ধরেছিল যুক্তির সাহায্যে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে অনেক চেষ্টা করলাম। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম, পুরোপুরি না হলেও

অন্তত অংশত আমার এই অনুভূতির কারণ এই ঘরের বিষণ্ণদর্শন আসবাবপত্রের হতবুদ্ধির প্রভাব—দরজা-জানালার কালো ছেঁড়া পর্দাগুলি বাইরের ঝড়ের ঝাপটায় এদিক-ওদিক দুলছে, বিছানার চারপাশে একটা অস্বস্তিকর খস্-খস্ আওয়াজ হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা দুর্বার কাঁপুনি আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল; এবং শেষ পর্যন্ত একটা অকারণ আতংক আমার বুকের উপর বোঝার মত চেপে বসল। অনেক চেষ্টা করে সে অনুভূতিটাকে ঝেড়ে ফেলে আমি বালিশ থেকে মাথা তুলে উঠে বসলাম; ঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না—হয় তো আমার ভিতর থেকেই কেউ নির্দেশ দিয়েছিল—কান পেতে শুনতে পেলাম ঝড়ো হাওয়ার সাময়িক বিরতির ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে-আসা একটা নিম্ন অস্পষ্ট আওয়াজ। জানি না সে শব্দ কোথা থেকে আসছিল। এক দুর্বোধ্য অথচ অসহ্য আতংকের তীব্র অনুভূতিতে বিপর্যস্ত হয়ে অতি দ্রুত পোশাক পরে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে ঘরময় পায়চারি করতে শুরু করলাম যাতে সেই করুণ অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে তুলতে পারি।

এইভাবে কয়েক পাক ঘোরার পরেই পাশের সিঁড়িতে একটা হাল্কা পায়ের শব্দ কানে এল। বুঝতে পারলাম আশারের পায়ের শব্দ। মুহূর্তকাল পরেই আমার দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে একটা বাতি নিয়ে সে ঘরে ঢুকল। তার মুখখানি যথারীতি অত্যন্ত বিবর্ণ দেখাচ্ছিল—কিন্তু তার দুই চোখে ছিল উন্মাদ মানুষের এক ধরনের অতি-উচ্ছ্বাস—তার সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে ফুটে উঠেছে সংযত হিস্টোরিয়ার লক্ষণ। তাকে দেখে আমি ভয় পেলাম—কিন্তু যে নির্জনতা এতক্ষণ ধরে সহ্য করেছি তার তুলনায় অন্য সব কিছুই বাঞ্ছনীয় মনে হল। এমনকি তার আগমনে আমি যেন বড়ই স্বস্তি বোধ করলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে চারদিকটা দেখে নিয়ে সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তুমি দেখ নি? তাহলে তুমি দেখ নি? অপেক্ষা কর! দেখতে পাবে।"

বলতে বলতেই বাতিটাকে সযত্নে আড়াল করে নিয়ে অতি দ্রুত একটা জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে সেটাকে সপাটে খুলে দিল। বাইরে তখনও ঝড়ের মাতামাতি।

ঝড়ো হাওয়া প্রচণ্ড বেগে ঘরে ঢুকে আমাদের প্রায় উড়িয়ে নেবার যোগাড়। বাইরে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সুন্দর রাত; আতংক ও রূপের অদ্ভুত বন্য সমাহার। মনে হল, কাছাকাছি কোথাও একটা ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রীভূত হয়েছে; কারণ বাতাসের গতি মাঝে-মাঝেই দিক-পরিবর্তন করছে। অত্যন্ত ঘন কালো মেঘের রাশি অনেক নীচে নেমে আসা সত্ত্বেও ঝড়ের সেই জীবন্ত রূপ দেখতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি; অথচ আকাশের চাঁদ বা তারা আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম না—বিদ্যুতের একটি ঝলকানিও চোখে পড়ে নি। অথচ একটা অপ্রাকৃতিক আলোর ম্লান আভা যেন অট্টালিকাটিকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে।

আশারকে জোর করে জানালার কাছ থেকে টেনে এনে একটু সামনে বসিয়ে দিয়ে আমি ভীতকম্পিত গলায় বললাম, "তুমি এসব দেখবে না—কিছুতেই না। যে সব জিনিস দেখে তুমি হতভম্ব হয়ে পড়েছ সেটা একটা বৈদ্যুতিক ঘটনা ছাড়া আর

কিছুই না ; এ রকম তো হামেশাই দেখা যায়—অথবা এ সব কিছুই ঐ হ্রদের দূষিত বাষ্পের কারসাজি। জানালাটা বন্ধ করে দেওয়া যাক ; কনকনে হাওয়া বইছে ; এটা তোমার শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক। এই তোমার একখানা প্রিয় রোমান্সের বই। আমি পড়ছি, তুমি মন দিয়ে শোন। এইভাবে দুজন একসঙ্গে আজকের ভয়ংকর রাতটা কাটিয়ে দেব।"

যে পুরনো বইখানা আমি হাতে নিয়েছিলাম সেটা স্যার ল্যান্সলট ক্যানিং-এর লেখা "উন্মত্ত হাহাকার"। বইখানাকে আশারের প্রিয় বই বলে উল্লেখ করলেও কথাটা সত্যি নয়। বইটা যে সব উদ্ভট আবোল তাবোল কথায় ঠাসা তাতে আমার বন্ধুটির মত একজন আধ্যাত্মিক গঠনের মানুষের সে বই ভাল লাগার কথা নয়। তবে সেই মুহূর্তে ঐ বইটাই হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, আর ভাবলাম যে বন্ধুর এখন যা মনের অবস্থা তাতে এই সব হ-য-ব-র-ল হয় তো তার ভালও লেগে যেতে পারে।

পড়তে পড়তে বইটির সেই জায়গায় পৌঁছে গেলাম যেখানে নায়ক এথেলরেড শান্তিপূর্ণ পথে সন্ন্যাসীর আশ্রমে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেয়ে জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছে। অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে, এখানে বর্ণনাটি এই ভাবেই দেওয়া হয়েছে ঃ

"আর এথেলরেড তো স্বভাবতই বলিষ্ঠ হৃদয়ের মানুষ ; তার উপর কড়া মদ খেয়ে এখন সে আরও শক্তিধর হয়ে উঠেছে। তাই একগুঁয়ে ও বিদ্বেষপরায়ণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথা বলার জন্য সে আর অপেক্ষা করল না। তার উপর কাঁধে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ায় আসন্ন ঝড়ের আশংকা করে সে হাতের গদাটিকে তুলে সজোরে আঘাত করল কাঠের দরজায় এবং অচিরেই লোহার দস্তানা পরা হাত ঢুকিয়ে দেবার মত জায়গা বানিয়ে ফেলল। তারপর কাঠের দরজাকে এত বেশী শব্দ করে দুমড়ে ভেঙে ফেলল যে তার ফলে গোটা বনই ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত ও আতংকিত হয়ে পড়ল।"

পংক্তিটি পড়া শেষ করে আমি এক মুহূর্তের জন্য থামলাম ; কারণ আমার মনে হল অট্টালিকাটির কোন দূরতম কোণ থেকে যে শব্দটি অস্পষ্টভাবে আমার কানে এসে পৌঁছল সেটা যেন স্যার ল্যান্সলটের কাঠের দরজা ভাঙার শব্দের বর্ণনারই অনুরূপ। তবে নিঃসন্দেহে এটা একটা আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। ঘরের জানালার শার্সিগুলোর খট্‌ খট্‌ শব্দ ক্রমবর্ধমান ঝড়ের নানান মিশ্র শব্দের সঙ্গে মিশে যে প্রচণ্ড শব্দব্রহ্মের সৃষ্টি করেছিল তাতে দূরাগত সেই শব্দটি আমার গল্প-পাঠে কোন বিঘ্নই সৃষ্টি করতে পারে নি। আমি আবার পড়তে লাগলাম ঃ

"কিন্তু সৎ যোদ্ধা এথেলরেড দরজার ভিতরে ঢুকে বিদ্বেষপরায়ণ সন্ন্যাসীর চিহ্ন মাত্র দেখতে না পেয়ে যেমন ক্রুদ্ধ হল, তেমনই বিস্মিতও হল ; সন্ন্যাসীর পরিবর্তে সেই ঘরে পাহারায় বসে আছে এক ড্রাগন ; তার বিশাল দেহ আঁশে ঢাকা, জিভে আগুনের হলকা ; রূপোর মেঝে আর সোনার দেওয়ালের প্রাসাদটি সে পাহারা দিচ্ছে। দেওয়ালে টাঙানো ঝকঝকে পিতলের ফলকে লেখা রয়েছে ঃ

এখানে যে করবে প্রবেশ সে এক বিজয়ী ;
ড্রাগনকে যে মারবে সে তো ফলকবিজয়ী ;

এথেলরেড হাতের গদা তুলে ড্রাগনের মাথায় আঘাত করল। ড্রাগন এমন তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে চীৎকার করে উঠল যে এথেলরেড পর্যন্ত দুই হাতে কান চেপে ধরল। এমন চীৎকার আগে কেউ কোনদিন শোনে নি। তারপরই ড্রাগন সটান তার পায়ের নীচে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল।

এখানে আবার আমি হঠাৎই থেমে গেলাম। একান্ত বিস্ময়ে সত্যি সত্যি শুনতে পেলাম একটি দূরাগত, নিম্ন অথচ কর্কশ, দীর্ঘস্থায়ী, অস্বাভাবিক আর্তনাদ বা ধাতব শব্দ—গল্প-লেখক ড্রাগনের অস্বাভাবিক চীৎকারের যে বর্ণনা দিয়েছে সেটা পড়ে যে কণ্ঠস্বরের কল্পনা আমি এইমাত্র করেছি ঠিক তারই অনুরূপ এই শব্দ।

খুবই মুষড়ে পড়লাম। পর পর দুইবার এমন অসাধারণ যোগাযোগ কী করে ঘটল! বিস্ময়ে, আতংকে হতচকিত হলেও এতটা মনোবল তখনও আমার মধ্যে ছিল যার ফলে এমন কোন কথাই আমার মুখ থেকে বের হল না যাতে বন্ধুর অতিস্পর্শকাতর স্নায়ুগুলি আরও উত্তেজিত হতে পারে। শব্দটা যে তার কানেও এসেছে সে বিষয়ে আমিও নিশ্চিত ছিলাম না ; যদিও শেষের কয়েক মিনিট ধরেই লক্ষ্য করেছি যে তার আচরণে একটা বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছে। সে বসেছিল আমার মুখোমুখি ; ধীরে ধীরে চেয়ারটাকে সরিয়ে এখন সে বসে আছে দরজার দিকে মুখ করে ; ফলে এখন তার মুখের কিছুটা অংশমাত্র আমি দেখতে পাচ্ছি ; যদিও এটা দেখতে পাচ্ছি যে তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে—যেন শ্রুতির অগোচরে কিছু বলছে। মাথাটা বুকের উপর ঢলে পড়েছে—যদিও পাশ থেকে দেখা তার দুটি বিস্ফারিত ঋজু খোলা চোখই বলে দিচ্ছে যে সে ঘুমিয়ে পড়ে নি। তার দেহটাও ধীর অথচ পরিমিতভাবে এ-পাশে ও-পাশে দুলছে। এই সব কিছু দেখে নিয়ে আবার স্যার ল্যান্সলটের বর্ণনা পড়তে শুরু করলাম ঃ

তারপর ড্রাগনের ভয়ংকর রোষ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে মহাবীরের মনে পড়ল পিতলের ফলকটির কথা, তার উপর থেকে মন্ত্রের প্রভাব কাটাবার কথা। মৃতদেহটাকে পথের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে সে দুর্গের রুপোর মেঝের উপরে পা ফেলে এগিয়ে গেল দেওয়ালে ঝোলানো ফলকটার দিকে ; কিন্তু সেটার কাছে পৌঁছবার আগেই ফলকটি রুপোর মেঝের উপর তার পায়ের কাছে পড়েই প্রচণ্ড শব্দে ভেঙে গেল।”

আমার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই—ঠিক সেই মুহূর্তে যেন সত্যি সত্যি একটা পিতলের ফলক রুপোর মেঝেতে পড়ে সশব্দে ভেঙে গেল—আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা ফাঁকা, ধাতব, ঝন্ ঝন্ শব্দ। সম্পূর্ণ বিপর্যস্তভাবে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আশারের পরিমিত দুলুনির কোন ব্যাঘাত ঘটল না। তার দুই চোখের দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির নিবদ্ধ। সারাটা মুখে নেমে এসেছে প্রস্তরের কাঠিন্য। কিন্তু তার কাঁধের উপর হাত রাখতেই সে থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। একটা ম্লান হাসিতে বেঁকে গেল দুটি ঠোঁট। দেখলাম, অনুচ্চ দ্রুত কণ্ঠে বিড়বিড়

করে কি যেন বলছে। আমার উপস্থিতির কোন চেতনাই তার নেই। তার দিকে আরও বেশী ঝুঁকে পড়ে তবে তার কথার ভয়াবহ তাৎপর্য বুঝতে পারলাম।

"শুনতে পাচ্ছ না?—হ্যাঁ, আমি শুনতে পাচ্ছি, শুনতে পেয়েছি। দীর্ঘকাল-দীর্ঘকাল-দীর্ঘকাল—অনেক মিনিট, অনেক ঘণ্টা, অনেক দিন এ ডাক আমি শুনেছি—তবু সাহস হয় নি—ওঃ, আমাকে দয়া কর, আমি বড়ই হতভাগ্য! —আমার সাহস হয় নি—কথা বলার সাহস হয় নি। তাকে আমরা জীবন্ত সমাধিস্থ করেছি! তোমাকে বলি নি আমার ইন্দ্রিয়গুলি খুব তীক্ষ্ন হয়েছে? আজ তোমাকে বলছি, ফাঁকা শবাধারের ভিতরে তার নড়াচড়ার ক্ষীণ শব্দ আমি প্রথম শুনতে পাই। অনেক, অনেকদিন আগেই তার কথা আমি শুনেছি—অথচ আমার সাহস হয় নি—কথা বলার সাহস হয় নি। আর এখন—আজ রাতে—এথেলরেড—হা! হা! সন্ন্যাসীর দরজা ভাঙল, ড্রাগনের মৃত্যু-চীৎকার আর ফলকটার ঝন্ ঝন্ শব্দ! বরং বল, তার শবাধার খোলার শব্দ, তার বন্দীশালার লোহার হাঁসকলের ধাতব আওয়াজ, ভূগর্ভ-কক্ষের তামার পাত দিয়ে মোড়া সুড়ঙ্গের ভিতরে তার সংগ্রাম! ওঃ, আমি কোথায় পালাব? সে কি এই মুহূর্তেই এখানে আসবে না? তাড়াতাড়ি করার জন্য সে কি আমাকে ভর্ৎসনা করছে না? সিঁড়িতে তার পায়ের শব্দ কি আমি শুনতে পাই নি? তার বুকের সেই ভারী ভয়ংকর হৃদ্‌স্পন্দন কি আমি ধরতে পারি নি? পাগল!"—এইখানে সে প্রচণ্ড এক লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং যেন প্রাণটাই দিয়ে দিচ্ছে এমনি আর্তকণ্ঠে বলে উঠল,—"পাগল! সে এখন দরজাটার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে!"

তার কথাগুলির অতিমানবিক শক্তির মধ্যে বুঝি লুকিয়ে ছিল মন্ত্রের শক্তি—উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রকাণ্ড প্রাচীন দরজার দিকে সে আঙুল বাড়িয়েছিল সেটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। প্রবল বাতাসের ধাক্কাতেই এটা ঘটেছিল—কিন্তু দরজার বাইরেই যে দাঁড়িয়েছিল আশারের লেডি ম্যাডেলিনের সমুন্নত বস্ত্রাবৃত মূর্তি। তার সাদা পোশাকে ছিল রক্তের দাগ, আর বিশীর্ণ দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল তীব্র সংগ্রামের চিহ্ন। মুহূর্তকালের জন্য সে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েই কাঁপতে কাঁপতে সামনে-পিছনে দুলতে লাগল—তারপরেই একটি নিম্ন আর্ত চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে তার ভাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চরম মৃত্যু-যন্ত্রণার প্রচণ্ড আবেগে তাকে জড়িয়ে ধরেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। প্রত্যাশিত আতংকের শিকার হয়ে ভাইটিও তখন বিগতপ্রাণ।

সেই কক্ষ থেকে সেই অট্টালিকা থেকে আমি সভয়ে পালিয়ে এলাম। পুরনো পথটা যখন পার হই ঝড়ের তাণ্ডব তখনও সমান তালেই চলেছে। সহসা সেই পথের উপর একটা প্রচন্ড আলোর রেখা বিদ্যুতের মত ছুটে এল। এমন অস্বাভাবিক আলো কোথা থেকে এল দেখার জন্য আমি মুখ ফেরালাম, কারণ আমার পিছনে তো তখন ছিল কেবল বড় বাড়িটা আর তার ছায়া। আলোটার উৎস অস্তায়মান রক্ত-লাল পূর্ণচন্দ্র। তারই উজ্জ্বল কিরণ স্পষ্ট হয়ে বিচ্ছুরিত হচ্ছে পূর্বে উল্লেখিত সেই সূক্ষ্ম ফাটলের ভিতর দিয়ে যেটা ঐ অট্টালিকার ছাদ থেকে আঁকাবাঁকা রেখায়

নেমেছিল একেবারে ভিত্তি পর্যন্ত। আমার চোখের সামনেই সেই সূক্ষ্ম ফাটল অতি দ্রুত বাড়তে লাগল—ধেয়ে এল ঘূর্ণিঝড়ের একটা হিংস্র নিঃশ্বাস—উপগ্রহটির পুরো বৃত্তটাই আমার চোখের সামনে মুহূর্তের মধ্যে ফেটে গেল—বাড়িটার বড় বড় দেওয়াল ভেঙে ভেঙে ছিটকে পড়তে লাগল—হাজার জলপ্রপাতের শব্দের মত একটা দীর্ঘায়িত প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা গেল—আর আমার পায়ের নীচেকার গভীর, কালো হ্রদটি এক বিষণ্ন নীরবতা ঢেকে দিল "আশার ভবন"-এর ধ্বংসস্তূপের শেষ টুকরোগুলিকে।

অণ্ডাকৃতি প্রতিকৃতি

The Oval Portrait

একটা রাত যাতে খোলা বাতাসে কাটাতে পারি সেই উদ্দেশ্যে আমার খানসামাটি একরকম জোর করেই আমাকে নিয়ে যে পল্লীভবনটিতে ঢুকেছিল সেটি অনেক দিন থেকেই এ্যাপেলাইন পর্বতমালার ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বিষণ্নতা ও আড়ম্বরের মিশ্রণে গড়ে-ওঠা অনেকগুলি বসতির অন্যতম একটি। দেখেই বোঝা যায় মাত্র কিছুদিন আগেই বাড়িটা সাময়িকভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে। সেই বাড়ির একটি ছোট ও যৎসামান্য আসবাবপত্রে সজ্জিত ঘরে আমরা আস্তানা পাতলাম। ঘরটা বাড়ির এক কোণে একটা বুরুজের নীচে অবস্থিত। ঘরের সাজসজ্জাগুলি বেশ দামী, তবে শতচ্ছিন্ন ও পুরনো। দেওয়ালে পর্দা ঝুলছে, তাতে নানা রকম যুদ্ধজয়ের স্মারক সাজানো, তাছাড়া ছিল অতি আধুনিক অসংখ্য ছবি, দামী সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো। ছবিগুলো যে কেবল মূল দেওয়ালেই ঝোলানো ছিল তা নয়, ঘরের দূরতম কোণে কোণেও শোভা পাচ্ছিল। হয়তো আমার অসুস্থতার প্রাথমিক প্রলাপের অবস্থার দরুনই সেই ছবিগুলির প্রতি আমার আগ্রহটা একটু বেশীই হয়েছিল। তাই আমি পেড্রোকে হুকুম দিলাম, ঘরের ভারী খড়খড়িগুলো টেনে দিক—কারণ ততক্ষণে রাত নেমে এসেছে—বিছানার মাথার কাছে রাখা লম্বা শামাদানের সবগুলো মোমবাতি জ্বেলে দিক,—আর বিছানার উপরকার কুঁচি-দেওয়া কালো ভেলভেটের মশারীটাকে আগাগোড়া খুলে দিক। এই সব কাজগুলি করতে বললাম যাতে ঘুমের হাতে না হলেও অন্তত পক্ষে এই ছবিগুলো নিয়ে ভাবনা-চিন্তা এবং বালিশের উপর রাখা যে ছোট বইটাতে ছবিগুলোর সমালোচনা ও বিবরণ লেখা আছে তার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারি।

অনেক—অনেকক্ষণ ধরে পড়লাম; গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে ছবিগুলোকে বহুক্ষণ এক দৃষ্টিতে দেখলাম। সময়টা বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। নেমে এল

গভীর মধ্যরাত। শামাদানটা যেখানে ছিল তাতে অসুবিধা হওয়ায় ঘুমন্ত খানসামাটিকে বিরক্ত না করে নিজেই অনেক কষ্টে হাতটা বাড়িয়ে সেটাকে এমন জায়গায় টেনে নিলাম যাতে সবটা আলোই বইয়ের উপর এসে পড়ে।

কিন্তু তার ফল যা হল সেটা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। অসংখ্য মোমবাতির আলো গিয়ে পড়ল ঘরের এমন একটি কোণে যেখানটা এতক্ষণ পর্যন্ত বিছানার একটা ছত্রীর ছায়ায় ঢাকা পড়েছিল। ফলে এতক্ষণ নজরে পড়ে নি এমন একটা ছবি এবার সুস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম। উদ্ভিন্নযৌবনা একটি যুবতীর প্রতিকৃতি। ছবিটাকে এক পলক দেখেই চোখ বন্ধ করলাম। কেন করলাম প্রথমে তা নিজেই বুঝলাম না। চোখ দুটি বুজে সেই কারণটাকেই মনে মনে খুঁজতে লাগলাম। যাতে চিন্তা করার কিছুটা সময় পাওয়া যায়—যাতে নিশ্চিত হতে পারি যে চোখ আমাকে প্রতারিত করে নি—যাতে আরও ভালভাবে ছবিটি দেখার জন্য আমার কল্পনাকে শান্ত ও সংযত রাখতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে স্বতঃই চোখ দুটি বুজেছিলাম। কয়েক মুহূর্ত পরেই আবার একদৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকালাম।

এবার যে ঠিক ঠিকভাবেই দেখতে পেলাম তাতে কোন সন্দেহ করতে পারি না, করবও না। সেই ছবির ক্যানভাসের উপর মোমবাতির প্রথম আলো এসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেটে গেল সেই স্বপ্নের জড়তা যা ধীরে ধীরে আমার ইন্দ্রিয়গুলিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল; একটা আকস্মিক ধাক্কা খেয়ে আমি যেন জাগ্রত জীবনে ফিরে গেলাম।

প্রতিকৃতিটা যে এক যুবতীর সে কথা আগেই বলেছি। কেবলমাত্র মাথা ও কাঁধের অংশটা আঁকা হয়েছে—যাকে বলা হয় ফুল-লতা-পাতা শোভিত অংকন-শৈলীতে; অনেকটা সালি-র জনপ্রিয় মস্তক-অংকনের পদ্ধতিতে। দুই বাহু, বক্ষদেশ, উজ্জ্বল কেশরাশির প্রান্ত—সবই বেমালুম মিশে গেছে পশ্চাৎপটের অস্পষ্ট অথচ গাঢ় ছায়াচ্ছন্নতায়। ফ্রেমটা অণ্ডাকৃতি, মুরজাতির অলংকরণ-পদ্ধতিতে বিদরির কাজ-করা। কলাকৃতি হিসাবে ফ্রেমটা ছবির চাইতেও অধিক প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু কি অলংকরণের সফল রূপায়ণ, কি সেই মুখখানির অমর সৌন্দর্য, কোনটাই আমাকে এমন অকস্মাৎ এত প্রচণ্ডভাবে বিচলিত করতে পারত না। আবার, আমার কল্পনাই যে আধো ঘুম থেকে জেগে উঠে ছবিটাকেই একটা জীবন্ত মানুষের মাথা বলে ভুল করেছে—তাও তো নয়। এই সব কথা ভাবতে ভাবতেই প্রায় একটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম কখনও বসে, কখনও অর্ধশয়নে থেকে প্রতিকৃতিটির দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে। অবশেষে প্রতিকৃতিটি দেখার এই ফলাফলের গোপন কারণটি ধরতে পেরে খুশি মনে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ছবিটির আসল জাদু হল তার পরিপূর্ণ জীবনময়তা; সেটাই আমাকে প্রথমে চমকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিমূঢ়, পরাভূত ও আতংকিত করে তুলেছিল। সশ্রদ্ধ ভীতির সঙ্গে শামাদানটিকে আবার যথাস্থানে রেখে দিলাম। আমার গভীর উত্তেজনার কারণটিকে এই ভাবে চোখের আড়াল করে দিয়ে আমি মনোযোগ দিলাম এই সব ছবি ও তার ইতিহাস সম্বলিত বইখানাতে।

অণ্ডাকৃতি প্রতিকৃতিখানির সংখ্যাটা খুঁজে নিয়ে নীচের এই অস্পষ্ট ও বিচিত্র কথাগুলি পড়তে লাগলাম ঃ

“সে ছিল এক অপরূপা সুন্দরী কুমারী ; যতটা মনোরমা, তার চাইতেও বেশী আনন্দময়ী। এক কুক্ষণে সে দেখেছিল, ভালবেসেছিল, এবং বিয়ে করেছিল এক চিত্রকরকে। চিত্রকর ছিল আবেগময়, পরিশ্রমী, গম্ভীর, আর ইতিমধ্যেই চিত্রশিল্পকেই গ্রহণ করেছিল বধূরূপে ; আর যুবতী ছিল বিরল রূপময়ী এক কুমারী, যত না মনোরমা তারও অধিক আনন্দে পরিপূর্ণা ঃ কেবলই আলো আর হাসি, হরিণ শাবকের মত চঞ্চলা। সব কিছু ভালবাসে, পছন্দ করে। ঘৃণা করে কেবল তার প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পকলাকে। ঘৃণা করে কেবল চিত্রকরের রং-দানি, তুলি ও অন্য সাজ-সরঞ্জাম ; যারা তাকে বঞ্চিত করেছে প্রিয়-দর্শন-সুখ থেকে। তাই চিত্রকর যেদিন তাকে জানাল নিজের মনোবাসনার কথা—জানাল সে তরুণী বধূটির প্রতিকৃতি আঁকতে চায়, সেদিন সে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল। তবু সে ছিল স্বভাবতই বিনীত ও বিশ্বস্ত, তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ শান্ত হয়ে বসেছে অন্ধকার বুরুজ-ঘরে—যেখানে ম্লান ক্যানভাসের উপর আলো ঝরে পড়ে একমাত্র মাথার উপর থেকে। কিন্তু চিত্রকর তার কাজের গৌরবেই মত্ত ; সে কাজ চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন। সে ছিল আবেগসর্বস্ব, অসংযত ও মেজাজী মানুষ। নিজের স্বপ্ন-বিলাসেই ডুবে থাকত। ভুলেও চোখ মেলে দেখত না যে সেই নির্জন বুরুজের মধ্যে যে ভৌতিক আলোটুকু এসে পড়ত তার ছোঁয়ায় নববধূর শরীর ও মন দুইই শুকিয়ে যাচ্ছে। সেটা সকলের চোখেই ধরা পড়ছে, একমাত্র চিত্রকরের চোখ ছাড়া। তবু বধূটি কোনরকম অভিযোগ না করে হেসে হেসেই দিন কাটাতে লাগল, কারণ সে দেখত তার বিখ্যাত চিত্রকর স্বামীটি তার নিজের কাজের মধ্যে পায় তীব্র আনন্দের খোরাক, দিন-রাত সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারই প্রিয়তমাকে আঁকতে। অথচ সেই প্রিয়তমাটি দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে। সত্যি কথা বলতে কি, যারাই প্রতিকৃতিখানা দেখে তারাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে ; বলে, এই প্রতিকৃতিটি যেমন এই চিত্রকরের ক্ষমতাকে প্রমাণ করে, ঠিক তেমনই প্রমাণ করে প্রিয়তমার প্রতি তার গভীর ভালবাসাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব শ্রম যখন পরিণতির কাছাকাছি পৌঁছে গেল তখন থেকে আর কাউকে সেই বুরুজে প্রবেশ করতে দেওয়া হত না ; কারণ কাজের নেশায় চিত্রকর তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে ; ক্যানভাস থেকে সে কদাচিৎ চোখ তোলে ; এমন কি স্ত্রীর মুখের দিকেও তাকায় না। এমনকি ক্যানভাসের উপর যে রংয়ের ছোপ সে লাগিয়েছে সেটাও যে ঐ মেয়েটির কপোল থেকেই নেওয়া তাও সে দেখতে চায় না। এইভাবে যখন অনেক সপ্তাহ কেটে গেল, কাজ শেষ হতে আর সামান্যই বাকি, শুধু মুখের উপর একটি তুলির টান আর চোখের উপর একটু রংয়ের ছোপ দিলেই হয়, তখন প্রদীপের শেষ শিখাটির মতই মেয়েটির মনের আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠল। চিত্রকর তখনই তুলির টানটি দিল, রংয়ের ছোপটি লাগাল ; এবং মুহূর্তের জন্য স্বীয় শিল্পকর্মের দিকে তাকিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পরমুহূর্তে, সেইভাবে একদৃষ্টিতে

চেয়ে থাকা অবস্থাতেই, তার শরীরটা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল, বিবর্ণ হয়ে গেল। উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে "এই তো প্রকৃত জীবন!" বলেই, সে সহসা ঘুরে দাঁড়াল প্রিয়তমাকে দেখতে ঃ—সে তখন মৃত!

অভিসার

The Assignment

এক দুর্ভাগা রহস্যময় মানুষ! —নিজের কল্পনার উজ্জ্বলতায় নিজেই পথভ্রান্ত; নিজের যৌবনের আগুনে নিজেই ঝাঁপ দিয়েছে! কল্পনায় আবার তোমাকে দেখতে পাচ্ছি! মূর্তি ধরে তুমি আর একবার উঠে এসেছ আমার সমুখে! —না—ওঃ ছায়াময় শীতল উপত্যকার আজকের তুমি নও—কিন্তু যেমনটি তোমার হওয়া উচিত—যে তুমি তোমার নিজের দেশ ভেনিসের এক ধ্যানগম্ভীর মহৎ জীবনকে অপচয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলে। হ্যাঁ! আমি আবার বলছি—তোমার যেমনটি হওয়া উচিত। এই জগৎটা ছাড়া আরও জগৎ নিশ্চয় আছে—জনগণের চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্য চিন্তা-ভাবনাও আছে—কূটতার্কিকের মতবাদ ছাড়া অন্য মতবাদও আছে। তাহলে কে তোমার চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে? তোমার স্বপ্নদর্শী দিনগুলোর জন্য কে তোমাকে দোষী করবে? তোমার যে সব কাজকর্ম শাশ্বত শক্তির কুলপ্লাবী স্রোতধারা মাত্র তাকে জীবনের অবক্ষয় বলে নিন্দা করবে কে?

ভেনিসের যে ঢাকা-দেওয়া খিলান-পথকে সেখানে বলে পন্তে দি সস্পিরি তারই নীচে তৃতীয় বা চতুর্থবার আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল যে লোকটির তার কথাই আমি বলছি। যে পরিবেশে আমাদের সেই দেখাটা হয়েছিল তাকেই আমি তুলে ধরছি এলোমেলো স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে। তথাপি আমার মনে পড়ছে—হায়! আমি কি ভুলতে পারি? —সেই গভীর মধ্যরাত্রি, সেই "ব্রীজ অব সাইজ", সেই নারীরত্ন, আর সেই রোমান্স—প্রতিভা যে ঘুরে বেড়াত সংকীর্ণ খালের এধার থেকে ওধার।

সে এক অস্বাভাবিক অন্ধকার রাত। খোলা চকের বড় ঘড়িটাতে ইতালীয় সন্ধ্যার পঞ্চম ঘণ্টাটি বেজে গেছে। ক্যাম্পানাইল স্কোয়ার নিঃশব্দ ও জনহীন; পুরনো ডিউক প্রাসাদের বাতিগুলি দ্রুত নিভে যাচ্ছে। বড় খালের পথ ধরে আমি ছোট চক থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। কিন্তু আমার গন্ডোলা সান মার্কো খালের মোহানার বিপরীত দিকে পৌঁছতেই রাতের বুক চিরে হঠাৎ ভেসে এল নারীকণ্ঠের একটি দীর্ঘায়িত উন্মত্ত চীৎকার। সে শব্দে চমকে উঠে আমি লাফ দিয়ে দাঁড়ালাম, আর

গণ্ডোলা-চালকের একমাত্র বৈঠাটি হাত ফসকে পড়ে গিয়ে সেই ঘন অন্ধকারে হারিয়ে গেল। তার ফলে আমরাও স্রোতের টানেই ভেসে চললাম। এখানকার সব স্রোতই বয়ে চলে বড় খাল থেকে ছোট খালের দিকে। আমরাও একটা পালকাবৃত বৃহদাকার শকুনির মত ধীরে ধীরে ভেসে চললাম "ব্রীজ অব সাইজ"-এর দিকে। এমন সময় ডিউক প্রাসাদের জানালায় জানালায় আর সিঁড়ির ধাপে ধাপে হাজার জ্বলন্ত মশালের আলো পড়ে মুহূর্তের মধ্যে সেই গাঢ় অন্ধকার রাত হয়ে উঠল সীসা-রংয়ের এক অস্বাভাবিক দিন।

একটি শিশু মায়ের কোল থেকে ফসকে সুউচ্চ প্রাসাদের উপরতলার একটি জানালা থেকে নীচে পড়ে গেছে একটা গভীর আবছা খালের মধ্যে। শান্ত জলরাশি সহজেই তাকে টেনে নিয়েছে বুকের মধ্যে। কাছাকাছি শুধু আমার গন্ডোলাই ছিল; তবু বহু দক্ষ সাঁতারুই ইতিমধ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পরে জলের উপরে তাকে বৃথাই খুঁজে মরছে। হায়রে! যে রত্নের সন্ধান তারা করছে সে যে এতক্ষণে নেমে গেছে কোন্ অতলে। প্রাসাদের প্রবেশ-মুখে জল থেকে মাত্র কয়েক ধাপ উপরে কালো পাথরের চওড়া পথের উপর দণ্ডায়মান মূর্তিটি যারা তখন দেখেছিল তার কেউ কোন দিন তাকে ভুলতে পারবে না। তার নাম মারচেসা এফ্রোদিতে—সারা ভেনিসের বড় আদরের মানুষ—হাসিখুশির মধ্যমণি—সব সুন্দরীর মধ্যে সেরা সুন্দরী—বৃদ্ধ অধৈর্য প্রণয়ী সেনতোনির তরুণী ভার্যা—প্রথম ও একমাত্র সন্তান এই সুন্দর শিশুটির জননী যে এখন শুয়ে আছে অন্ধকার শীতল জলরাশির নীচে।

মহিলা একাকি দাঁড়িয়ে আছে। তার রুপোর মত সুন্দর দুটি খোলা পা নীচেকার কালো পাথরের আয়নায় ঝিলমিল করছে। বল-নাচের ছাঁদে বাঁধা চুলের রাশি আধ-খোলা অবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে—তাতে হীরের মালা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে জড়ানো। বরফ-শুভ্র সূক্ষ্ম তন্তুতে বোনা বস্ত্রই তার দেহের একমাত্র আবরণ। তবু মধ্যরাতের উষ্ণ, বিষণ্ণ, শান্ত বাতাসেও সেই সূক্ষ্ম আবরণের একটি ভাঁজও নড়ছে না—উড়ছে না। অথচ কী আশ্চর্য! নীচের যে সলিল-সমাধিতে ডুবে গেছে তার একমাত্র আশার আলো তার উজ্জ্বল চোখ দুটি কিন্তু সেদিকে তাকিয়ে নেই,—এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে! আমার ধারণা প্রাচীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের কারাগারটিই ভেনিসের সব চাইতে উঁচু বাড়ি—কিন্তু ওই মহিলাটি কেমন করে সেই বাড়িটার দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যখন নীচেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে আছে তারই নিজের সন্তান? দূরের ঐ অন্ধকার, বিষণ্ণ কুলুঙ্গীটাও যেন হাঁ করে আছে তারই ঘরের জানালার ঠিক বিপরীত দিকে—তাহলে, সেই বাড়িটার ছায়ায়—তার স্থাপত্যরীতিতে—তার আইভিলতা ঝোলানো গম্ভীর কার্ণিসে—কী এমন থাকতে পারে যা মারচেসা দি মেনতোনি এর আগে হাজার বার দেখে নি? কী সব বাজে কথা! কে না জানে যে এই সব মুহূর্তে মানুষের চোখ ভাঙা আয়নার মত একটি দুঃখকে অনেক গুণ প্রতিবিম্বিত হতে—হাতের কাছের দুঃখকে দেখে অসংখ্য বস্তুতে প্রতিফলিত হতে?

মার্চেসার থেকে অনেকগুলি সিঁড়ি উপরে জল-দ্বারের খিলানের নীচে পূর্ণ সাজসজ্জায় মূর্তিমান যক্ষের মত দাঁড়িয়ে আছে মেন্তোনি স্বয়ং। মাঝে মাঝে সে নিজের গীটারে টোকা মারছে, আর কিছুক্ষণ পরে পরেই সন্তানকে সন্ধান করার নির্দেশ দিচ্ছে। আমিও কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম ; চীৎকারের শব্দ প্রথম কানে আসতেই সেই যে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম তারপর থেকেই যেন আমার চলৎ-শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেললাম। উত্তেজিত জনতার চোখে আমি যেন একটি ভৌতিক অশুভ উপস্থিতিতে পরিণত হলাম। পাণ্ডুর মুখ ও অনড় হাত-পা নিয়ে সেই গণ্ডোলায় চেপে আমিও তাদের সঙ্গেই ভেসে চললাম।

সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অনুসন্ধানকারীদের অনেকেই অনিবার্য দুঃখকে মেনে নিয়ে বিশ্রাম নিল। শিশুটির উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই (মায়ের তো নয়ই !)। কিন্তু এই সময় কারাগারের যে কুলুঙ্গির কথা আগেই বলেছি তার অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে এল আলখাল্লায় ঢাকা একটি মূর্তি। খাড়া পাড়ের উপর মুহূর্তমাত্র দাঁড়িয়ে থেকে সোজা ঝাঁপ দিল খালের মধ্যে। ঠিক পরের মুহূর্তেই জীবিত শিশুটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মূর্তিটি এসে দাঁড়াল কালো পাথরের উপর মার্চেসার পাশে। জলে জবজবে হয়ে ভিজে যাওয়ায় তার পায়ের আলখাল্লাটা খুলে পড়ে গেল মহিলার পায়ের নীচে। বিস্ময়বিমূঢ় দর্শকরা দেখল সেই যুবকটির সুঠাম মূর্তি যার নাম তখন ইওরোপের প্রায় সর্বত্র ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

উদ্ধারকারী একটি কথাও বলল না। কিন্তু মারচেসা ! সে তো তার সন্তানকে ফিরে পাবে—তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে—আদরে আদরে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। হায় ! কোথা থেকে আর এক জোড়া হাত এসে তাকে নবাগতের হাত থেকে তুলে নিল—নিয়ে গেল অনেক—অনেক দূরে—সকলের অলক্ষ্যে প্রাসাদের ভিতরে ! আর মার্চেসা ! তার ঠোঁট—সুন্দর ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল ঃ দুই চোখ জলে ভরে এল—একেন্হাস ফুলের পাপড়ির মত 'নরম আর প্রায় তরল' দুটি চোখ। হ্যাঁ ! ওই দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে—আর দেখুন ! মহিলার দেহ ও মন কেমন শিহরিত হয়ে উঠেছে। প্রস্তর মূর্তি ফিরে পেয়েছে জীবন ! মুখের মর্মর পাণ্ডুরতা, পাথরের বুকের ওঠা-নামা, পাথরের পাদুটির নিষ্কলুষ শুভ্রতা—হঠাৎ যেন সব কিছুর উপরেই ছড়িয়ে পড়ল অসংযত লালের বন্যা। ঘাসের রুপোলি ফুলের উপর দিয়ে যে ভাবে বয়ে যায় নাপোলির মৃদু বাতাস ঠিক তেমনই একটি মৃদু শিহরণে কেঁপে উঠল তার দেহ-লতা।

মহিলাটি কেন এমন রক্তিম হয়ে উঠল ! এ প্রশ্নের কোন জবাব নেই। শুধু এইটুকু বলতে পারি, মাতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক আতংকে তাড়াতাড়ি শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় পায়ে চটি পরে নি এবং ভেনিশিয়ো খোলা কাঁধের উপর উপযুক্ত আবরণীও চাপায় নি। এ ছাড়া তার রক্তিম হয়ে ওঠার আর কি কারণ থাকতে পারে ? —চারদিকের অনেকগুলি সন্ধানী চোখের দৃষ্টি কি ? —কম্পিত বুকের অস্বাভাবিক ওঠা-নামা কি ? মেন্তোনি প্রাসাদের দিকে এগিয়ে যাবার পরে আকস্মিকভাবে

নবাগতের একখানি হাত তার কাঁধকে ছুঁয়েছিল বলেই কি? সেই যুবকটির কাছ থেকে বিদায় নেবার কালে মহিলাটি এত নীচু গলায়—বিশেষ রকম নীচু গলায়ই বা অত্যন্ত দ্রুতলয়ে সেই অর্থহীন কথাগুলি বলেছিল কেন? সে বলেছিল, না কি জলের কুলুকুলু ধ্বনিকে আমি ভুল শুনেছিলাম, "তুমিই বিজয়ী হয়েছ—সূর্যোদয়ের এক ঘন্টা পরে—আমাদের দেখা হবে—এই কথাই রইল!"

* * *

গোলমাল থেমে গেল। প্রাসাদের ভিতরে সব আলো নিভে গেল, আর সেই আগন্তুক—এখন তাকে আমি চিনতে পেরেছি—একাকি দাঁড়িয়ে রইল পাথরের পথের উপর। সে তখন ধারণাতীত উত্তেজনায় কাঁপছে—চারদিকে তাকাচ্ছে একটা গণ্ডোলার সন্ধানে। আমি তাকে আমার গণ্ডোলায় উঠতে না বলে পারলাম না, আর সেও এই ভদ্রতাটুকুকে গ্রহণ করল। ফটকের কাছ থেকে একটা বৈঠা যোগাড় করে আমরা একত্রে তার বাসস্থানের দিকে এগিয়ে চললাম। খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে আমাদের সামান্য পূর্ব-পরিচয়ের সূত্র ধরে সে বেশ ভদ্রভাবেই কথাবার্তা বলতে লাগল।

এমন কতকগুলি বিষয় আছে যার খুটিনাটির দিকে নজর দিতে আমার বেশ ভাল লাগে। আগন্তুকের—সারা বিশ্বের কাছে এখনও সে তো আগন্তুক, তাই আমিও তাকে এই নামেই ডাকব—চেহারাটিও সেই রকম একটি বিষয়। উচ্চতায় হয় তো মাঝারির একটু নীচেই হবেঃ যদিও কোন তীব্র আবেগের মুহূর্তে তার দেহের উচ্চতা কিছুটা বেড়ে যায়। তার একহারা গড়নে "ব্রীজ অব সাইজ"-এ প্রকটিত কর্মতৎপরতার পরিচয় যতটা মেলে ঠিক ততটা মেলে না বিপদের মুহূর্তে যে হারকিউলিসসুলভ শক্তির জন্য তার খ্যাতি তার পরিচয়। দেবসুলভ মুখ ও থুতনি—অসংযত টানাটানা দুটি চোখ যার রং বদলায় বাদামি থেকে নিকষ কালো পর্যন্ত—মাথাভর্তি কোঁকড়ানো কালো চুলের নীচে অসাধারণ চওড়া কপালটিতে আলো ও হস্তি-দন্ত শুভ্রতার ঝিলিমিলি—সব কিছু মিলিয়ে এমন একটি দেহ-সৌষ্ঠভ ফুটে ওঠে যার তুলনা একমাত্র সম্রাট কমোডাস-এর মর্মরমূর্তি ছাড়া অন্য কোথাও আমি দেখি নি। অথচ তার মুখখানি এমনই যা সব মানুষই কখনও না কখনও দেখেছে, এবং পরে আর কখনও দেখে নি। সে মুখের কোন বৈশিষ্ট্য নেই—এমন কোন স্থায়ী প্রকাশভঙ্গী নেই যা স্মৃতির উপর চেপে বসে; সে মুখ মানুষ দেখামাত্রই ভুলে যায়—কিন্তু ভুলে গেলেও পুনরায় মনে আনবার একটা অস্পষ্ট ও অনিঃশেষ বাসনা থেকেই যায়। প্রতিটি দ্রুতগতি আবেগই যে তার মুখের দর্পণে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয় না তা নয়—কিন্তু যে কোন দর্পণের মতই আবেগটা যখন চলে যায় তখন তার কোন চিহ্ন মুখের দর্পণে রেখে যায় না।

সেই রাতে তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার সময় সে আমাকে অনুরোধ করল—আমার তখন মনে হয়েছিল যে ব্যাপারটা জরুরি—পরের দিন খুব সকালে আমি যেন তার

সঙ্গে দেখা করি। সেই মতে পরদিন সূর্যাস্তের পরেই আমি গিয়ে হাজির হলাম তার পালাজ্জোতে। বড় খালের তীরে রিয়াল্টোর কাছাকাছি অঞ্চলে বিষণ্ণ অথচ অসাধারণ জাঁকজমকপূর্ণ সেই বড় বাড়িটি অবস্থিত। মোজাইক-করা একটি প্রশস্ত ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল এমন একটি ঘরে যার অতুলনীয় উজ্জ্বলতা খোলা দরজা দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়ে আমার চোখকে ধাঁধিয়ে অন্ধ করে দিল।

জানতাম আমার পরিচিত মানুষটি ধনবান। যে রকম ভাষায় তার ধন-সম্পত্তির বর্ণনা আমি শুনেছি তাকে আমি নিজেই হাস্যকর অতিরঞ্জন বলে অভিহিত করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে আমারই বিশ্বাস হচ্ছিল না যে চতুর্দিকে যে রাজকীয় সমারোহ ঝলমল করে জ্বলছে তা ইওরোপের কোন মানুষের ধনৈশ্বর্যে আহরিত হতে পারে।

আগেই বলেছি সূর্য উঠে গেছে। অথচ ঘরের মধ্যে তখনও অনেক আলো জ্বলছে। এই অবস্থা থেকে এবং আমার বন্ধুর মুখে ক্লান্তির আভাষ দেখে অনুমান করলাম, বিগত রাতটাতে সে শয্যাগ্রহণই করে নি। ঘরটির স্থাপত্যরীতি ও সাজ-সজ্জা দেখলেই বোঝা যায় যে মানুষের চোখকে ঝলসে দিতে এবং তাকে চমকে দিতেই এ সব কিছুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। শালীনতাবোধ বা জাতীয়তার ধারণার প্রতি কোনরকম মনোযোগই দেওয়া হয় নি। এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে চোখ ঘুরতে লাগল, কিন্তু কোন বস্তুর উপরেই স্থির হয়ে বসল না—গ্রীক চিত্রকরদের কিমাকার মূর্তির উপরে নয়—ইতালীয় শিল্পীদের সব সেরা ভাস্কর্যগুলির উপরে নয়—মিশরের বৃহদাকার সব খোদাই কাজের উপরেও নয়। ঘরের সর্বত্র প্রসারিত দামী পর্দাগুলি দুলছে নীচু পর্দার বিষণ্ণ সুরের তালে তালে—সেই সুর কোথা থেকে আসছে সেটা কিন্তু অনাবিষ্কৃত। বিচিত্র সব ধুনোচি থেকে উৎসারিত পরস্পরবিরোধী ধূপের গন্ধে নাসারন্ধ্র পর্যুদস্ত হচ্ছে। মরকত ও বেগুনি রংয়ের সংখ্যাতীত আলোর ঝলকানিতে দর্শনেন্দ্রিয় বিপর্যস্ত। সেই সব কিছুর উপর জানালার ভিতর দিয়ে এসে পড়েছে নবোদিত সূর্যের কিরণমালা। গলিত চিলি-সোনার দামী কার্পেটের উপর পড়ে সেই কিরণমালা সহস্র শিখায় ঝলমলিয়ে উঠছে।

"হা! হা! হা! —হা! হা! হা" —অট্টহাসি হেসে উঠল ঘরের মালিক। আমাকে একটা আসন দেখিয়ে নিজে সটান শুয়ে পড়ল একটা অটোমানের উপর। আমার হতভম্বভাব দেখে বলল, "বুঝতে পেরেছি আমার ঘর দেখে তুমি বিস্মিত হয়েছ —এই সব পাথরের মূর্তি— ছবি—ভাস্কর্য ও পর্দার ব্যাপারে আমার নিজস্ব ধ্যান-ধারণা তোমাকে চমকে দিয়েছে। আমার এত জাঁকজমক তোমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে, কি বল? কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতে হবে প্রিয় মহাশয়, আমার এই অর্থহীন অট্টহাসিকে ক্ষমা করতেই হবে। বিস্ময়ে তুমি যে একেবারে বেহাল হয়ে পড়েছ। তার উপর, এমন কিছু জিনিস আছে যা পুরোপুরি হাস্যকর; তাতে মানুষ হয় হাসবে, নয়তো মরবে। হাসতে হাসতে মরা, আহা, তার চাইতে গৌরবের মৃত্যু আর কি হতে পারে! স্যার টমাস মোর—বড় ভাল মানুষ ছিলেন স্যার টমাস মোর—স্যার

টমাস মোর হাসতে হাসতেই মরেছিলেন। আচ্ছা, তুমি কি জান, স্পার্টাতে হাজারো দেবদেবীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হাজারো মন্দির ও বেদী ছিল। অথচ কী ভয়ানক আশ্চর্য ব্যাপার যে অন্য সব মন্দির নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও হাসির দেবতার মন্দিরটি আজও অক্ষুণ্ণ আছে! কিন্তু সে সব কথা থাক। তোমাকে নিয়ে এবম্বিধ ফুর্তি করার কোন অধিকার আমার নেই। তুমি তো বিস্মিত হতেই পার। আমার এই ছোট্ট রাজ-কক্ষটির মত কিছু তৈরী করা ইওরোপের সাধ্য নয়। আমার অন্য ঘরগুলি অবশ্য ঠিক এই মানের নয়—ফ্যাশনের উৎকট উদ্গারমাত্র। সেটাই তো ফ্যাশনের চাইতে ভাল—তাই নয় কি? অথচ এটা হয়েছে সকলের রাগের কারণ। যাই হোক, এ ব্যাপারে আমি একটু বেশী রকমের কড়া। আমি আর আমার খানসামাটি ছাড়া তুমিই একমাত্র লোক যে এই রাজকীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে!"

তার কথায় স্বীকৃতি স্বরূপ আমি মাথাটা নোয়ালাম। শয্যা থেকে উঠে আমার বাহুতে ভর দিয়ে ঘরময় ঘুরতে ঘুরতে সে বলতে লাগল, "এই যে ছবিগুলি দেখছ এসবই গ্রীক আমল থেকে সিমাবু পর্যন্ত, এবং সিমাবু থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাজানো। দেখতেই পাচ্ছ. ভাস্যুর মতামতের তোয়াক্কা না করেই এর অনেক ছবিকে নির্বাচন করা হয়েছে। এ সবই কিন্তু এই ঘরের পক্ষে বড়ই মানানসই অলংকরণ। আর এগুলি হচ্ছে অজ্ঞাতনামা মহান শিল্পীদের মহৎ শিল্পকর্ম। আবার এই যে অসমাপ্ত কাজগুলি দেখছ এদের শিল্পীরা তাদের কালে যথেষ্ট খ্যাতিমান হলেও আজকের শিল্পবোদ্ধারা তাদের ফেলে দিয়েছেন নীরবতার আস্তাকুড়ে আর আমার হাতে।" হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে প্রশ্ন করল, "এই ম্যাডোনা দেলা পিয়েতা' সম্পর্কে তোমার কি মত?"

ছবিখানির অপরূপ রূপের দিকেই আমি তাকিয়ে ছিলাম; সোৎসাহে বলে উঠলাম, "এটা তো গিদোর নিজের মূর্তি! তুমি এটা পেলে কেমন করে? ভাস্কর্যে ভেনাসের যে স্থান, চিত্রাংকনে সেও নিঃসন্দেহে সেই স্থানের যোগ্য।"

সে চিন্তিতভাবে বলল, "হ্যা! ভেনাস—সুন্দরী ভেনাস? —মেদিসির ভেনাস? —ছোট্ট মাথা আর সোনালী চুল? বাঁ হাতের কিছু অংশ (এখানে তার গলা এতই নেমে গেল যে শোনাই কষ্টকর) আর ডান হাতের সবটাই পুনঃ স্থাপন; আর আমার তো মনে হয় সেই ডান হাতের ভঙ্গীটুকুতেই যেন ঝরছে স্নেহের ধারা। এই এপোলোর ছবিটা তো কপি—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আর এমনি বোকা অন্ধ আমি যে এপোলোর স্পর্দ্ধিত প্রেরণাটাও ধরতে পারি নি। তুমি আমাকে করুণা করতে পার—কিন্তু আন্তিনুসকে বেছে নেওয়া ছাড়া আমার উপায় নেই। সক্রেটিসই তো বলেছিলেন না, "ভাস্কর একখণ্ড মর্মরের মধ্যেই তার মূর্তিটাকে পেয়েছিলেন?"

যাই হোক, এই রকম সব ছোটখাট বিষয় নিয়ে যে ভাবে লঘু-গুরু স্বরের মিশ্রণে সে অবিরাম বকে যাচ্ছিল, তার ভিতর দিয়েই বার বার আমার চোখে পড়েছে কিছুটা ত্রাসের আভাষ—কথা ও কাজের মধ্যে কিছুটা স্নায়বিক মলমের অবলেপন—এমন একটা অশান্ত উত্তেজনার প্রকাশ আমার কাছে যা সব সময়ই ব্যাখ্যাতীত মনে হয়েছে এবং অনেক

সময়ই আমার মনকে আতংকে ভরে তুলেছে। আবার মাঝে মাঝে কোন কথার গোড়ার দিকটা ভুলে গিয়ে কথার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কান পেতে থাকে, হয় কোন অতিথির প্রতীক্ষায় অথবা কোন কাল্পনিক শব্দের প্রত্যাশায়।

এই রকম কোন দিবাস্বপ্ন অথবা ক্ষণিক বিরতির ফাঁকে আমার পাশেই অটোমানের উপর রাখা পণ্ডিত-কবি পলিটিয়ানের সুন্দর ট্র্যাজেডি "দি অর্‌ফিও"-র একটা পাতা উল্টেই দেখতে পেলাম পেন্সিলে দাগ-দেওয়া একটি অংশ। তৃতীয় অংকের শেষের দিকের একটি অংশ—হৃদয়-বিদারক উত্তেজনায় ভরা একটি অংশ—এমন একটি অংশ যা পড়লে পুরুষ মাত্রই একটি মহৎ আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে এবং নারী মাত্রই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলবে। সমস্ত পাতাটাই চোখের জলের দাগে ভরা; আর তারই বিপরীত দিকের পাতায় নীচের ইংরেজী পংক্তিগুলি এমন হস্তাক্ষরে লেখা যার সঙ্গে আমার পরিচিত বন্ধুটির হস্তাক্ষরের কোন মিল নেই। সেটা যে তারই হাতের লেখা তা বুঝতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।

হে আমার ভালবাসা, তুমিই ছিলে আমার সব,
তোমার জন্যই কাঁদিত আমার মন,
সাগরের বুকে এক সবুজ দ্বীপ, ভালবাসা,
একটি ঝর্ণা, একটি পূজার বেদী,
পরীর দেশের ফলে, ফুলে সাজানো,
সে সব ফুলই আমার।

হায়, সে সুখ-স্বপ্ন বড়ই ক্ষণস্থায়ী!
হায়, নক্ষত্রোজ্জ্বল আশা,
তোমার উদয় হল যে মেঘে ঢেকে যাবারই জন্য!
ভবিষ্যতের ওপার থেকে কেন যে চেঁচিয়ে বলে,
"এগিয়ে যাও!" —কিন্তু আমার আত্মা যে ঘুরে মরে
অতীতের বুকে (অস্পষ্ট ব্যবধান!),
নির্বাক—নিশ্চল—অভিভূত!

কারণ—হায়! হায়। —আমার কাছে
জীবনের আলো যে নিভে গেছে।
"আর নয়—আর নয়—আর নয়,"
(এই বাণী গম্ভীর সমুদ্রকে আটকে রাখে
তীরভূমির বালুরাশিতে),
বাজ-পোড়া গাছে ফুটবে না ফুল,
আহত ঈগল মেলবে না পাখা।

আমার কাছে সময় আজ মোহগ্রস্ত;
আমার রাতের যত স্বপ্ন

সবই তো ঐ কালো আঁখিকে কেন্দ্র করে,
আর যেখানে তোমার পায়ের ধ্বনি বাজে
সেখানেই শুরু হয় কী এক অপার্থিব নাচ,
ইতালীর নদীর তীরে তীরে।
হায়! সেই অভিশপ্ত মুহূর্তটিতে
সাগরের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তারা তোমাকে বয়ে নিয়ে গেল
ভালবাসা থেকে সীমিত কাল ও অপরাধের দিকে,
একটি অপবিত্র উপাধানে! —
আমার কাছ থেকে, আমাদের কুয়াসার দেশ থেকে,
যেখানে রুপোলি উইলোগাছরা কাঁদে!

এই পংক্তিগুলো যে ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল—আমি বিশ্বাস করতাম না যে তাদের রচয়িতা ঐ ভাষাটা জানত—তাতে আমি মোটেই বিস্মিত হই নি। আমি এটা তো জানতাম যে সে অনেক কিছুই জানত, আর সেটা লোকের কাছে লুকিয়ে রাখতেও সে খুব মজা পেত। কিন্তু লেখাটার তারিখের সঙ্গে জায়গাটার নাম দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রথমে লেখা হয়েছিল লণ্ডন, কিন্তু পরে সেটাকে এমন ভাবে কাটাকুটি করা হয়েছে যাতে সন্ধানী চোখের কাছে সেটা লুকনো না থাকে। এইমাত্র বলেছি, জায়গাটার নাম দেখে আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না ; তার কারণ আমার বেশ মনে আছে আগেকার কোন কথাপ্রসঙ্গে আমি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কোন কালে লণ্ডন শহরে মার্চেসা ডি মেনতানির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল কিনা (বিয়ের আগে মহিলাটি বেশ কয়েক বছর সেই শহরে বাস করছিলেন), তখন—আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি—তখন সে আমাকে বলেছিল যে গ্রেট বৃটেনের সেই রাজধানী শহরে সে কোনদিন যায় নি। এখানে আরও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমি একাধিক বার শুনেছি যে উল্লেখিত ভদ্রলোকটি শুধু জন্মসূত্রেই নয়, শিক্ষাসূত্রেও একজন ইংরেজ।

* * *

আমি যে ট্রাজেডিখানা হাতে নিয়েছি সেটা খেয়াল না করেই সে বলল, "এখনও একটা ছবি আছে যা তুমি দেখ নি।" বলেই একটা পর্দা সরিয়ে সে মার্চেসা এফ্রোদিতের একটি পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি দেখাল।

কোন মানুষের কলাকৃতি সেই মহিলার অতিমানবিক সৌন্দর্যকে এর চাইতে ভাল করে আঁকতে পারত না। যে অপার্থিব মূর্তিটি আগের রাতে ডিউক প্রাসাদের সিঁড়িতে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছিল। সেই আর একবার আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। কিন্তু তার সারা মুখ হাসিতে ঝলমল করলেও তারই মধ্যে লুকিয়ে আছে (দুর্বোধ্য অসঙ্গীত) সেই বিষণ্ণতার সূক্ষ্ম রেখাটি যা চিরদিনই পূর্ণ সৌন্দর্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তার ডান বাহুটি ভাঁজ করা রয়েছে বুকের উপর। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে একটি বিচিত্র গড়নের পাত্রের দিকে। দৃশ্যমান একটি ছোট পরীসুলভ পা কোন-

রকমে মাটি ছুঁয়েছে ; আর আলোকোজ্জল পশ্চাৎপটের উপরে দেখা যায় কি যায় না এমনিভাবে উড়ছে দুটি সুন্দর সূক্ষ্ম পাখা। ছবি থেকে আমার দৃষ্টি এবার গিয়ে পড়ল আমার বন্ধুর উপর, আর আপনা থেকেই আমার ঠোঁট থেকে উচ্চারিত হল চাপম্যান-এর "বুসি ডি" এমবয়-এর বলিষ্ঠ কথাগুলি ঃ

"ওই সে উঠে দাঁড়িয়েছে
রোমক মূর্তির মত! সে দাঁড়িয়েই থাকবে
যতক্ষণ মৃত্যু তাকে মর্মরে পরিণত না করে!"

তারপরেই সে এগিয়ে গেল রুপোর কাজ করা একটা টেবিলের দিকে। টেবিলে সাজানো ছিল কয়েকটি আশ্চর্য সুন্দর পানপাত্র আর দুটি বড় ইউট্রাস্কান পাত্র, প্রতিকৃতির সামনেকার মতই অসাধারণ কারুকর্মে সাজানো। মনে হল তাতে জোহানিসবার্গারই ভরা ছিল। শেষ পর্যন্ত সে হঠাৎই বলল, "এস, একটু পান করা যাক। এখনও প্রাতঃকাল—তবু একটু পান করি এস।" দেবদূতের হাতের সোনার হাতুড়ির আঘাতে সূর্যোদয়ের প্রথম ঘণ্টাটি বেজে ওঠার সুরেলা ধ্বনিতে ঘরটা ভরে গেল। সেও বলতে লাগল, "সত্যি এখন বড় বেশী সকাল—কিন্তু তাতে কি? এস, আমরা পান করি! দূরের ওই যে মহান সূর্যকে পরাভূত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এই সব ঝলমলে বাতি ও ধূপদানগুলি, এস তার সম্মানে আমরা পাত্র ভরে নেই!" আর, একটি পূর্ণ পানপাত্র আমার হাতে দিয়ে সে দ্রুতগতিতে পরপর কয়েকটি সুরাপূর্ণ পাত্র ঢকঢক করে নিঃশেষ করে ফেলল।

তারপর একটি ধূপদানের উজ্জ্বল আলোর দিকে সুন্দর একটি পাত্রকে তুলে ধরে সে নিজের মনেই বলতে লাগল, "স্বপ্ন দেখাই আমার জীবনের কাজ। দেখতেই পাচ্ছ, সেই জন্যই নিজের জন্য গড়ে তুলেছি এই স্বপ্ন-কুঞ্জ। ভেনিসের বুকের উপর এর চাইতে ভাল কিছু কি গড়ে তুলতে পারতাম? এ কথা ঠিক যে তোমার চারদিকেই দেখতে পাচ্ছ স্থাপত্য-কৃতির এক জগা-খিচুড়ি। প্রাকমহাপ্লাবণ যুগের কারুকর্মে বিঘ্নিত হচ্ছে আইয়োনিয়ার সৌন্দর্য, আর মিশরের স্ফিনক্সরা সব ছড়িয়ে রয়েছে সোনার কার্পেটের উপর। তবু বলব, এই অসঙ্গতি কেবলমাত্র ভীরুদের চোখেই ধরা দেয়। স্থান ও কালের জুজুর ভয়েই মানুষ মহত্তের সাধনা থেকে দূরে থাকে। এক সময় আমি নিজেই অলংকরণবাদী ছিলাম ; কিন্তু সেই মহামূর্খামি আমার মনটাকেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এখন এই সবই আমার উদ্দেশ্যসাধনের সহায়ক হয়ে উঠেছে। এই সব আরবীয় ধূপদানের মতই আমার আত্মা অগ্নি-জ্বালায় জ্বলছে, এই দৃশ্যের প্রলাপবাণী আমাকে প্রস্তুত করে তুলছে সেই প্রকৃত স্বপ্নের দেশের ছবি দেখার উপযোগী করে যার দিকে এখন আমি দ্রুত এগিয়ে চলেছি।" হঠাৎই সে থামল ; মাথাটা বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল ; মনে হল সে এমন একটা শব্দ শুনছে যা আমি শুনতে পাচ্ছি না। অবশেষে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বে চোখ তুলে সে সোচ্চারে আবৃত্তি করল চিনচেস্টারের বিশপের দুটি পংক্তি ঃ

> "আমার জন্য ওখানেই অপেক্ষা কর! ওই ফাঁকা প্রান্তরেই
> আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবই করব।"

পরমুহূর্তেই সুরার শক্তির স্বীকৃতি হিসাবেই বুঝি সে সটান শুয়ে পড়ল অটোমানের উপর।

এবার সিঁড়িতে শোনা গেল দ্রুত পদশব্দ; দরজায় সজোরে ধাক্কা পড়তে লাগল বার বার। একটা দ্বিতীয় গোলযোগের আশংকা করছি এমন সময় মেন্‌তানির পারিবারিক ভৃত্যটি সবেগে ঘরে ঢুকে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করল কয়েকটি অসংলগ্ন কথা, "আমার কর্ত্রী! —আমার কর্ত্রী! —বিষ! —বিষ! —হায়, সুন্দরী—হায়, সুন্দরী এফ্রোদিতে।"

একান্ত বিমূঢ় হয়ে ছুটে গেলাম অটোমানটার কাছে; বিস্ময়কর সংবাদটি শোনাবার জন্য ঘুমন্ত লোকটিকে জাগাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু তার হাত-পা কঠিন হয়ে গেছে—ঠোঁট দুটি কালো হয়ে গেছে—একটু আগের সেই উজ্জ্বল চোখ দুটি মৃত্যুতে স্তব্ধ হয়ে গেছে। টলতে টলতে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেলাম—আমার হাত পড়ল একটা ভাঙা কালো পানপাত্রের উপর—আর সহসা এই ভয়ংকর সত্যের একটা সামগ্রিক চিত্রের চেতনা যেন বিদ্যুতের মত আমার মনকে আলোকিত করে তুলল।

বেরেনিস

Berenice

দুঃখ বহুবিধ। পৃথিবীর দুর্ভাগ্য নানারকমের। ইন্দ্রধনুর মতই দূরে দিগন্তে প্রসারিত, তার রংও ঐ ধনুর মতই বিচিত্র—একই রকম সুস্পষ্ট অথচ সুসংযোজিত। ইন্দ্রধনুর মতই দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত! এটা কি করে হল যে সুন্দরের কাছ থেকে আমি পেলাম এক ধরনের অরম্যতা? —শান্তির চুক্তি থেকে পেলাম দুঃখ? কিন্তু নীতিশাস্ত্রে যেমন ভাল থেকেই মন্দের উদ্ভব, তেমনই বাস্তবেও আনন্দ থেকেই জন্ম নেয় দুঃখ। হয় অতীত আনন্দের স্মৃতি হয়ে ওঠে আজকের যন্ত্রণা, অথবা আজকের যন্ত্রণার উৎপত্তি হয়েছিল কোন সম্ভাবিত আনন্দের মধ্যে।

আমার দীক্ষান্ত নাম এগাউস; পরিবারের নামটা বলব না। অথচ আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিষণ্ণ, ধূসর, হলগুলির চাইতে অধিক সম্মানিত কোন বাড়ি এ দেশে নেই। আমার বংশটাকেই লোকে বলে স্বপ্নদর্শীদের বংশ। পারিবারিক প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য—প্রধান কক্ষটির ফ্রেস্কো-চিত্র—শয়ন-কক্ষগুলির পর্দার বৈচিত্র্য—অস্ত্রশালার ভাস্কর্য-রীতি—কিন্তু বিশেষ করে প্রাচীন চিত্রাবলীর সংগ্রহশালা—

গ্রন্থাগার-কক্ষের গঠন-রীতি—এবং সর্বশেষ, সেই গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সব গ্রন্থের বিচিত্র স্বরূপ—এই সব কিছুই মানুষের সেই বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।

আমার প্রথম জীবনের স্মৃতি সেই কক্ষ ও তার গ্রন্থাবলীর সঙ্গেই জড়িত—সে বিষয়ে পরে আর কিছু বলব না। এখানেই আমার মার মৃত্যু হয়। আমিও এখানেই জন্মেছিলাম। কিন্তু এ কথা বলার কোন অর্থ হয় না যে আমি আগে কখনও ছিলাম না—আত্মার কোন অতীত অস্তিত্ব থাকে না। আপনারা এটা অস্বীকার করেন? —বেশ তো, এ বিষয়ে আমাদের মতের মিল নাই বা হলো। আমি নিজে এটা বিশ্বাস করি তাই বলে অন্যকেও বিশ্বাস করাতে চাই না। অবশ্য আজও মনে পড়ে কিছু বায়বীয় মূর্তির কথা—বিদেহী ও অর্থপূর্ণ কিছু চোখ—সুরেলা অথচ বিষণ্ন কিছু শব্দ; সে স্মৃতিকে তো আমি অস্বীকার করতে পারি না; ছায়ার মতই অস্পষ্ট, পরিবর্তনশীল, অনির্দিষ্ট, অস্থির এক স্মৃতি; আবার ছায়ার মতই যতদিন আমার যুক্তির সূর্যালোক অক্ষুণ্ন থাকবে ততদিন তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়া তো আমার পক্ষে অসম্ভব।

সেই ঘরে আমি জন্মেছিলাম। যে কালকে মনে হয়েছিল অস্তিত্বহীন অথচ আসলে তা নয় তারই এক দীর্ঘ রাত্রি থেকে অকস্মাৎ জেগে উঠেছিলাম একেবারেই এক পরীর দেশে—এক কল্পনার প্রাসাদে—মঠসুলভ চিন্তা-ভাবনা ও পাণ্ডিত্যের এক অনৈসর্গিক রাজ্যে। তাই তো এক বিস্মিত ও একাগ্র দৃষ্টিতে সেদিন চারদিকে তাকিয়েছিলাম—শৈশবে ঘুরে বেড়িয়েছি বইয়ের জগতে, আর যৌবনকে ক্ষয় করেছি দিবাস্বপ্ন দেখে। এটা বিশেষ করে উল্লেখ করার মত কোন কথা নয়। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কথা হল—বছরের পর বছর কেটে গেল, যৌবনের মধ্যগগনে পৌঁছেও আমি পিতৃপুরুষের এই প্রাসাদেই রয়ে গেলাম—আশ্চর্যের কথা হল, কী এক স্রোতহীনতা চাপা পড়ল আমার জীবনের ঝর্ণাধারা—আশ্চর্যের কথা হল, আমার সাধারণ চিন্তা-ভাবনাগুলিও কী রকম আমূল বদলে গেল। পৃথিবীর যা কিছু বাস্তব সব আমার চোখে দেখা দিল স্বপ্ন হয়ে, আর স্বপ্ন-রাজ্যের অসংযত ধারণাগুলি হয়ে উঠল আমার দৈনন্দিন জীবনের মাল-মশলা শুধু নয়, প্রকৃতপক্ষে আমার একমাত্র ও একান্ত অস্তিত্ব।

* * *

বেরেনিস ও আমি ছিলাম সম্পর্কিত ভাই-বোন। আমার পিত্রালয়েই দু'জন একসঙ্গে বড় হয়েছি। অথচ বড় হলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে—আমি ভগ্নস্বাস্থ্য ও বিষণ্ন—সে চঞ্চলা, মনোরমা, শক্তিতে উচ্ছ্বসিতা; সে ঘুরে বেড়াত পাহাড়ে পাহাড়ে—আমি বন্দী থাকতাম মঠের পড়াশুনার মধ্যে; আমি বাস করতাম আমার নিজের মধ্যে, সমস্ত দেহ-মন ঢেলে দিতাম বেদনাদায়ক একাগ্র ধ্যানে—সে বেপরোয়াভাবে ঘুরে বেড়াত জীবনের পথে পথে; সে পথে যে কোথাও ছায়া ঘনাতে পারে, বা নিঃশব্দে উড়ে যেতে পারে কাক-পক্ষ মহাকাল সে-চিন্তা তার মাথায়ই আসত না। বেরেনিস! —তার নামটা

মনে পড়ল—বেরেনিস ! —আর সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির ধূসর ধ্বংসস্তূপ থেকে হাজার কলমুখর উদ্বেলিত ছবি সে ডাক শুনে চমকে উঠল ! আহা, কত না স্পষ্ট হয়ে তার ছবি এসে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে—যেমনটি সে দাঁড়াত প্রথম জীবনের হাল্কা ও আনন্দময় দিনগুলিতে। আহা, কী উজ্জ্বল অথচ অদ্ভুত সৌন্দর্য ! আহা, আর্নহিমের বনের মধ্যে একটি পরী যেন ! তার অনেক ঝর্ণার মধ্যে সে ছিল একক নৈয়াদ ! তারপর—তারপর সবই রহস্য আর আতংক, যা এমন এক কাহিনী যেটা বলা উচিত হবে না। ব্যাধি—এক মারাত্মক ব্যাধি মরুভূমির তপ্ত বায়ুপ্রবাহের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল তার দেহের উপর ; আর আমার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে পরিবর্তনের ভূত তার উপর দিয়ে ঝড়ের মত বয়ে গেল, ছেয়ে ফেলল তার মন, তার অভ্যাস, তার চরিত্রকে এক অতি সূক্ষ্ম ও ভয়ংকর প্রভাবের সঙ্গে—এমন কি তার সত্তাটিকে পর্যন্ত বিঘ্নিত করে তুলল। হায়রে ! সংহারকর্তা এল আর গেল ! —আর তার শিকার—সে কোথায় গেল ? আমি তো তাকে চিনতে পারতাম না—অন্তত বেরেনিস বলে আর তাকে চিনতে পারি নি !

যে মারাত্মক প্রধান ব্যাধিটি আমার বোনটির নৈতিক ও দৈহিক সত্তায় এক ভয়ংকর বিপ্লব ঘটিয়ে দিল তার সঙ্গে আর যে অসংখ্য ব্যাধি তাকে আশ্রয় করল তার মধ্যে সব চাইতে কষ্টদায়ক ও অপ্রতিরোধ্য হিসাবে এমন এক ধরনের অপস্মার রোগের উল্লেখ করা যেতে পারে যাকে প্রায়শই মূর্ছা রোগ বলে অভিহিত করা হয়—এমন এক মূর্ছা যা প্রায় মৃত্যুর সামিল, আর যার হাত থেকে আরোগ্যলাভও ঘটে বিস্ময়কর দ্রুততায়। ইতিমধ্যে আমার নিজের ব্যাধি—আমাকে বলে দেওয়া হয়েছে আমি যেন সেটাকে অন্য কোন নাম না দেই—আমার নিজের ব্যাধিও তখন অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত একটা অভিনব ও অসাধারণ এক বিষয়কেন্দ্রিক উন্মত্ততা বা মনো-ম্যানিয়ার রূপ ধারণ করে প্রতি ঘণ্টায় বাড়তে বাড়তে আমাকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে ফেলল। এই মনোম্যানিয়া—এই নামেই যদি সেটাকে বোঝাতে হয়—এমন এক ধরনের মানসিক বিকৃতি যার তত্ত্বগত নাম অভিনিবেশ। এটা তো হতেই পারে যে রোগটাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না। সত্যি কথা বলতে কি, সাধারণ পাঠককে এই অদ্ভুত রোগের কথা ঠিক মত বোঝানো কোন মতেই সম্ভব নয়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লান্তিবিহীন ভাবে একটা বইয়ের কোন অকিঞ্চিৎকর অলংকরণ বা অক্ষরের দিকে অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে থাকা ; গ্রীষ্মকালের প্রায় সমস্তটা দিন ঘরের পর্দা বা মেঝের উপর তির্যকভাবে ছড়িয়ে পড়া ছায়ার দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে কাটানো ; একটা বাতির স্থির শিখা অথবা অগ্নিকুণ্ডের একটা জ্বলন্ত অঙ্গারের দিকে তাকিয়ে সারাটা রাত নিজেকে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলা ; একটা ফুলের গন্ধের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সারাটা দিন কাটিয়ে দেওয়া ; বার বার একটি অতি সাধারণ কথাকে উচ্চারণ করে করে শেষ পর্যন্ত তার অর্থটাকেই হারিয়ে বসে থাকা ; দীর্ঘ সময় ধরে একটানা শরীরটাকে সম্পূর্ণ শান্ত করে রাখার ফলে গতির বা দৈহিক অস্তিত্বের

ধারণাটাকেই হারিয়ে ফেলা ঃ রোগের আরও অনেক লক্ষণের মধ্যে এইগুলিই অত্যন্ত সাধারণ এবং সব চাইতে অল্প ক্ষতিকর।

যাই হোক, আমার রোগের সাময়িক বিরতির ফাঁকে ফাঁকে বেরেনিসের ব্যাধি সত্যি আমাকে কষ্ট দিত; তার সুন্দর, শান্ত জীবনের সেই পরিণতি আমার মনকে গভীরভাবে নাড়া দিত, আর আমিও মাঝে মাঝেই তার কথা ভেবে ভেবে মন খারাপ করে বসে থাকতাম। কিন্তু তার জীবনের অন্যসব পরিবর্তনের চাইতে আমার মন সব সময়ই ভাবতে ভালবাসত বেরেনিসের দৈহিক পরিবর্তনের কথা—বিশেষ করে তার ব্যক্তিসত্তার ভয়াবহ বিকৃতির কথা।

তার অতুলনীয় রূপের উজ্জ্বলতম দিনগুলিতে নিশ্চয়ই আমি তাকে কোনদিন ভালবাসি নি। প্রথম ভোরের ধূসর আলোর ভিতর দিয়ে—দুপুর বেলা বনের লতাপাতার ছায়ার মধ্যে—রাতে আমার লাইব্রেরির নীরবতার মধ্যে—চকিতে সে ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে—তখন তাকে আমি দেখতে পেতাম জীবিত বেরেনিসরূপে নয়, স্বপ্নের বেরেনিসরূপে; এই পৃথিবীর কোন পার্থিব জীব হিসাবে নয়, তার বিমূর্ত সত্তা হিসাবে; সে তখন প্রশংসার বিষয় নয়, বিশ্লেষণের বিষয়; ভালবাসার বস্তু নয়, জটিল চিন্তা-ভাবনার বস্তু। আর এখন—এখন তার উপস্থিতিতে আমি শিউরে উঠি; তাকে আসতে দেখলে আমার মুখ কালো হয়ে যায়; অথচ তার এই অসহায় অবস্থা দেখে আমার বুক ফেটে কান্না আসে; তখনই মনে পড়ে সে আমাকে অনেক দিন ধরেই ভালবাসত, আর এক অশুভ মুহূর্তে আমি তাকে বিয়ের কথাও বলেছিলাম।

শেষ পর্যন্ত আমাদের বিয়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগল, আর তখনই এক শীতের অপরাহ্নে আমি বসেছিলাম লাইব্রেরির ভিতরকার ঘরে। কিন্তু চোখ তুলেই দেখলাম, বেরেনিস দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

আমার উত্তেজিত কল্পনার জন্যই হোক—আর কুয়াসা ঢাকা আবহাওয়ার প্রভাবেই হোক—অথবা ঘরের গোধূলির আবছা আলোর জন্যই হোক—অথবা ধূসর পর্দাগুলি তাকে ঘিরে ঝুলে থাকার দরুনই হোক—কি কারণে যে তার মূর্তিটা এমন অস্পষ্ট হয়ে দুলছিল আমি জানি না। সে কোন কথা বলল না; আর আমি—পৃথিবীর বিনিময়েও আমার মুখেও একটা কথা জোগাল না। আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল একটা বরফ-ঠান্ডা স্রোত; একটা দুঃসহ উৎকণ্ঠা আমাকে চেপে ধরল; একটা তীব্র কৌতূহল আমার মনটাকে ছেয়ে ফেলল; চেয়ারে হেলান দিয়ে বেশ কিছু সময় আমি তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নিশ্চল, রুদ্ধশ্বাস হয়ে রইলাম। হায়! তার শরীরটা একেবারেই শুকিয়ে গেছে; দেহ-রেখার কোথাও তার আগেকার চেহারার চিহ্নমাত্র নেই। অবশেষে আমার জ্বলন্ত দৃষ্টি তার মুখের উপর পড়ল।

বিবর্ণ কপালটা ঠেলে উঠেছে; বিশেষভাবে চকচক করছে। একদা ঘোর কালো চুলের রাশির কিছুটা ঝুলে পড়ে হলুদ বর্ণ কপালটাকে আংশিক ঢেকে দিয়েছে। চোখ দুটি প্রাণহীন, আলোহীন, বুঝিবা মণিহীনও; আপনা থেকেই তার সেই চকচকে দৃষ্টি

www.boighar.blogspot.com

থেকে সরে গিয়ে আমার নজর রাখলাম তার পাতলা, কুঁচকানো ঠোঁটের উপর। ঠোঁট দুটি ফাঁক হয়ে গেল; একটা অর্থবহ হাসিতে বদলে-যাওয়া বেরেনিসের দাঁতগুলি ধীরে ধীরে আমার দৃষ্টিগোচর হল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি সে দৃশ্য আমাকে কোনদিন না দেখতে হত! আর যদি দেখতেই হল তো কেন আমার মৃত্যু হল না!

*   *   *

দরজা বন্ধ করার শব্দে চেতনা ফিরে পেয়ে তাকিয়ে দেখলাম, আমার বোনটি ঘর থেকে চলে গেছে। কিন্তু হায়! আমার মনের শৃংখলাহারা ঘর থেকে তো চলে যায় নি—তাড়িয়ে দিলেও চলে যাবে না—সেই দন্তপাটির সাদা ভৌতিক বর্ণচ্ছটা। কোথাও একটা দাগ নেই—এনামেলের উপর এতটুকু ছায়া পড়ে নি—কোথাও এতটুকু ক্ষয়ে যায় নি—কিন্তু তার সেই স্বল্পসময়ের হাসিটুকুই সেই দন্তপাটির ছাপ এঁকে দিয়েছে আমার স্মৃতিতে। সেগুলিকে তখন যেমন দেখেছিলাম তার চাইতেও অনেক বেশী স্পষ্ট ভাবে দেখতে পাচ্ছি এখন। দাঁত! —দাঁত! —সে দাঁত এখানে হাজির, সেখানে হাজির, সর্বত্র হাজির—একেবারে আমার সম্মুখে, ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে—লম্বা, সরু, অত্যন্ত সাদা দাঁতগুলি ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরা। তারপরই প্রচণ্ডরূপে দেখা দিল আমার মনোম্যানিয়া; তার বিস্ময়কর অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের বিরুদ্ধে সব প্রতিরোধই ব্যর্থ হয়ে গেল। বাইরের জগতের অসংখ্য বস্তুর মধ্যে থেকেও দাঁত ছাড়া অন্য কোন চিন্তা আমার মনে ঠাঁই পায় না। তার হাত থেকে মুক্তির জন্য হন্যে হয়ে উঠলাম। অন্য সব বস্তু, সব আগ্রহ সেই একটি চিন্তার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। আমার মনের চোখের সম্মুখে তারাই—কেবল তারাই উপস্থিত; তারাই হয়ে উঠল আমার মানস জীবনের মূল মন্ত্র। সব রকম আলোয়, সব রকম পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দেখলাম। তাদের বৈশিষ্ট্যকে জরিপ করলাম। তাদের গঠন-শৈলী নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলাম। তাদের অদল-বদল নিয়েও অনেক কথা ভাবলাম।

এইভাবেই আমাকে ঘিরে সন্ধ্যা নামল—তারপর অন্ধকার এল, থামল, চলে গেল—আবার দিন হল—দ্বিতীয় রাতের কুয়াসা চারদিকে জমল—সেই নির্জন ঘরে তখনও আমি একা বসে—তখনও আমি সেই একই চিন্তায় ডুবে আছি—তখনও সেই দন্তপাটির ভৌতিক দৃশ্য বীভৎস স্পষ্টতায় ঘরের পরিবর্তনশীল আলো-ছায়ার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। অবশেষে আমার সেই স্বপ্নের মধ্যে শুনতে পেলাম আতংক ও দুঃখের একটি আর্ত চীৎকার; তার একটু পরেই ভেসে এল অনেক কন্ঠের কোলাহল; তার সঙ্গে মিশে আছে দুঃখ অথবা বেদনার অনেক নিম্ন, ভগ্ন স্বর। আসন থেকে উঠলাম; লাইব্রেরির একটা দরজা খুলে দেখতে পেলাম, পাশের ঘরেই দাঁড়িয়ে কাঁদছে একটি দাসী; সে আমাকে দেখে জানাল, বেরেনিস আর ইহজগতে নেই! খুব ভোরেই তার দেহে অপস্মার দেখা দিয়েছিল, আর এখন রাত শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কবর খোড়া শেষ হয়ে গেছে; সমাধির উদ্যোগ-আয়োজনও সম্পূর্ণ।

*   *   *

দেখলাম, আমি লাইব্রেরিতেই বসে আছি, আর একাই বসে আছি। মনে হল যেন

একটা উত্তেজনাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে সবে জেগে উঠলাম। আমি জানতাম, সময়টা এখন মধ্যরাত্রি ; আর বেশ ভালকরেই জানতাম, সূর্যাস্তের পরেই বেরেনিসকে সমাহিত করা হয়েছে। কিন্তু তার মাঝখানের ভয়ংকর সময়টার কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। অথচ সেই সময়টার স্মৃতি বিভীষিকায় পরিপূর্ণ—অস্পষ্ট হবার জন্যই সে বিভীষিকা আরও ভয়ংকর, আর দ্ব্যর্থবাচক হবার জন্যই সে আতংক আরও দুঃসহ। আমার জীবনের যে ইতিবৃত্ত আগাগোড়া লেখা হয়েছে অস্পষ্ট, বীভৎস, আর দুর্বোধ্য স্মৃতির টুকরো দিয়ে, সে দিনের স্মৃতি তারই একটি ভয়ংকর পৃষ্ঠা। আমি সেটাকে পড়তে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি না ; অথচ যখন তখন একটা দূরাগত শব্দের ভূতের মত একটি নারীকণ্ঠের কর্কশ ও হৃদয়বিদারক আর্তনাদ যেন আমার কানে বাজতে থাকে। একটা কাজ আমি করেছি—সেটা কি ? প্রশ্নটা আমি জোর গলায় নিজেকেই করেছি, আর ঘরের ফিস্ ফিস্ প্রতিধ্বনি উত্তর দিয়েছে—"সেটা কি ?"

পাশের টেবিলে একটা বাতি জ্বলছে ; তার পাশেই আছে একটা ছোট বাক্স। বাক্সটা অদ্ভুত ; আগেও অনেকবার দেখেছি, কারণ বাক্সটার মালিক আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক। কিন্তু এটা সেখানে আমার টেবিলে এল কেমন করে, আর সেটা দেখে আমিই বা কেঁপে উঠলাম কেন ? এ সবের কোন ব্যাখ্যা নেই। শেষ পর্যন্ত আমার চোখ পড়ল একখানি বইয়ের খোলা পাতায়, এবং নীচে দাগ টানা তারই একটা বাক্যের উপর। সেই বাক্যটি পড়তে পড়তে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল কেন ? কেনই বা আমার দেহের রক্ত শিরায় শিরায় জমাট বেঁধে গেল ?

লাইব্রেরির দরজায় একটা মৃদু টোকা পড়ল—আর সমাধিস্থ লোকের মত বিবর্ণ একটি চাকর পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। তার দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল ; কথা বলল নীচু কাঁপা গলায়। সে কি বলল ? —কয়েকটি ভাঙা ভাঙা বাক্য শুনতে পেলাম। সে জানাল, একটা তীক্ষ্ম তীব্র চীৎকারে রাতের স্তব্ধতা খান খান হয়ে ভেঙে গেল—বাড়ির সব লোকজন একত্র হল—শব্দের দিকে খোঁজও করা হল। বলতে বলতেই তার স্বর উত্তেজনায় স্পষ্ট হয়ে উঠল ; ফিস্‌ফিস্ করেই জানাল—একটি সমাধি উন্মোচিত হয়েছে—আচ্ছাদনে ঢাকা দেহটি বিকৃত হয়েছে, অথচ এখনও তার নিঃশ্বাস পড়ছে—এখনও বুক দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছে—এখনও সে বেঁচে আছে !

সে আঙুল বাড়িয়ে আমার পোশাক দেখাল ; পোশাক কর্দমাক্ত, তাতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। একটি কথাও আমি বললাম না ; সে আস্তে আমার হাতটা ধরল ঃ সে হাতে মানুষের নখের দাগ। দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একটা বস্তুর প্রতি সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কয়েক মিনিট আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম ঃ একটা কোদাল। আর্তনাদ করে একলাফে আমি টেবিলের কাছে ফিরে গেলাম। বাক্সটাকে চেপে ধরলাম ; কিন্তু খুলতে পারলাম না। আমার কম্পিত হাত থেকে সজোরে নীচে পড়ে গিয়ে বাক্সটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল ; আর তার ভিতর থেকে ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে বেরিয়ে এল কয়েকটি দাঁত-তোলার যন্ত্রপাতি, আর বত্রিশটি ছোট ছোট, সাদা হাতির দাঁতের মত বস্তু ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল মেঝের উপর।

ইলিওনোরা

Eleonora

কল্পনার বলিষ্ঠতা এবং আবেগের আধিক্যের জন্য খ্যাত এক বংশে আমার জন্ম। লোকে আমাকে পাগল বলে; কিন্তু উন্মত্ততাই মহত্তম বুদ্ধিবৃত্তি কি না—যা কিছু গৌরবের—যা কিছু প্রগাঢ়—সে সবই রোগগ্রস্ত চিন্তার ফসল কি না—সাধারণ বুদ্ধির বিনিময়ে পাওয়া মনের একটা মহত্তর ভাব থেকে উদ্ভূত কি না—সে প্রশ্নের মীমাংসা তো আজও হয় নি। যারা দিবাস্বপ্ন দেখে তারা তো এমন অনেক কিছুই জানতে পারে যা কেবলমাত্র রাতে যারা স্বপ্ন দেখে তাদের জানার বাইরেই থেকে যায়। ধূসর দিবাস্বপ্নের মধ্যে তারা অনন্তের ক্ষণিক দর্শন লাভ করে। আর জেগে উঠে এই কথা ভেবে শিহরিত হয়ে ওঠে যে তারা এক মহান অতল রহস্যের একেবারে তীরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাত্র স্বল্পাংশের জন্য হলেও তারা জ্ঞানের সেই রূপকে জেনেছে যা কল্যাণময়? যা দুষ্ট জ্ঞান অপেক্ষা অধিক কাম্য। যতই হালবিহীন কম্পাসবিহীন হোক, তবু তো তারাই প্রবেশ করেছে “অনির্বচনীয় আলো”র এক প্রশস্ত মহাসাগরে।

তাই বলাই হোক যে আমি পাগল। অন্তত এটুকু মেনে নিচ্ছি যে, আমার মনের দুটি স্বতন্ত্র অবস্থা আছে—একটি স্বচ্ছ যুক্তির অবস্থা, আমার জীবনের প্রথম অধ্যায়ের ঘটনাবলীর স্মৃতি তার সাক্ষী,—আর একটি সন্দেহ ও ছায়াময়তার অবস্থা, যার সাক্ষী আমার বর্তমান এবং আমার জীবনের দ্বিতীয় মহৎ অধ্যায়ের স্মৃতি-ভাণ্ডার। সুতরাং প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে যা বলব তা তোমরা বিশ্বাস করো; আর পরবর্তী কালের বিষয়ে যা বলব তাকে তোমরা তার প্রাপ্য বিশ্বাসটুকুই দিও; অথবা তাকে পুরোপুরিই সন্দেহের চোখে দেখো; অথবা যদি তা না পার, তাহলে তার ইডিপাস-রহস্যকে নিয়ে খেলা করো।

যৌবনে যাকে আমি ভালবাসতাম, যাকে নিয়ে এই স্মৃতি-কথা আমি লিখছি শান্ত মনে, স্পষ্ট ভাষায়, সে আমার বহুকাল আগে মৃত মায়ের একমাত্র বোনের একমাত্র কন্যা। বোনটির নাম ছিল ইলিওনোরা। আমরা সর্বদাই একত্রে বসবাস করেছি “বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকা”য় গ্রীষ্মমণ্ডলের সূর্যের নীচে। পথ-প্রদর্শকবিহীন কোন মানুষ কোন দিন পা ফেলে নি সেই উপত্যকায়; কারণ জায়গাটি অনেক উঁচুতে একটি বিরাট পর্বতমালার মধ্যে অবস্থিত; তার অতি মধুর গুহাগুলিতে সূর্যের আলোর পথ চিররুদ্ধ। কোন চলতি পথ তার কাছাকাছি পর্যন্তও পৌঁছে নি; আমাদের সেই সুখের বাড়িতে যেতে হলে বনের হাজার হাজার গাছের ডালপালাকে সজোরে ভেঙে ফেলতে হত, লক্ষ লক্ষ সুগন্ধ ফুলকে মাড়িয়ে দিতে হত পায়ের তলায়। এইভাবেই

আমরা—আমি, আমার বোন ও তার মা—একান্তে বাস করতাম, উপত্যকার বাইরের জগৎটার কিছুই জানতাম না।

যে পর্বতমালা আমাদের দেশটাকে চারদিকে ঘিরে রেখেছিল তারই মাথার উপরকার আবছা অঞ্চল থেকে নেমে এসেছিল একটি সংকীর্ণ অথচ গভীর নদী; একমাত্র ইলিওনোরার দুটি চোখ ছাড়া আর সব কিছুর তুলনায় উজ্জ্বলতর সেই নদীটি নিঃশব্দ গমনে এঁকে বেঁকে চলতে চলতে আবার এক সময় হারিয়ে গেছে ওই পাহাড়েরই কোন্ অজ্ঞাত গহ্বরে। আমরা তাকে বলতাম "নিঃশব্দের নদী"; কারণ তার প্রবাহে কেমন যেন একটা চুপ-চাপ ভাব ছিল। সে নদীতে কখনও কুলুকুলু রব শোনা যেত না; এত ধীরে সে বয়ে যেত যে তার বুকের তলায় অনেক নীচে যে মুক্তোর মত পাথরের নুড়িগুলোকে দেখতে আমরা ভালবাসতাম সেগুলি পর্যন্ত স্রোতের টানে একটুও নড়ত না, গতিহীন সন্তুষ্টিতেই যার যার জায়গায় বসে চিরকাল ঝিলমিল করত।

উপত্যকার বুকময় ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা সেই নদী ও তার বহুতর উজ্জ্বল খালগুলির তীর থেকে চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে-থাকা পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বহুদূরবিস্তৃত সমগ্র অঞ্চলটি ঢেকে থাকত সম্পূর্ণ এক মাপের নরম সবুজ ঘাসে। দেখে মনে হত যেন একখানা বড় গালিচা পাতা রয়েছে। তারই মাঝে মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফুটে থাকত হলুদ বাটারকাপ, সাদা ডেইজি, নীলাভলাল ভায়োলেট, আর লোহিতবর্ণ এস্‌কোডেল। তার সেই অপরূপ রূপ যেন আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যে উচ্চকণ্ঠে শোনাত ঈশ্বরের প্রেম ও গৌরবের বাণী।

আমাদের হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাবের আগে পনেরোটি বছর আমি আর ইলিওনোরা হাতে হাত ধরে বেড়িয়েছি এই উপত্যকার এদিকে-ওদিকে। তারপর ইলিওনোরার তৃতীয় পঞ্চাব্দ এবং আমার চতুর্থ পঞ্চাব্দ শেষ হবার মুখে একদা সন্ধ্যাকালে পরস্পরকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে আমরা বসেছিলাম সর্পাকৃতি গাছটার নীচে, আর নীচের "নিঃশব্দের নদী"র জলে দেখছিলাম আমাদের প্রতিচ্ছবি। সেই মধুর দিনটির বাকি সময়ে আমরা কেউ কোন কথা বলি নি; পরের দিনও আমাদের অল্প কয়েকটি কথা ছিল আবেগে কম্পমান। প্রেমের দেবতা এরসকে আমরা টেনে তুলেছিলাম ঢেউয়ের উপর থেকে; এতদিনে বুঝতে পারলাম সেই দেবতা আমাদের বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছে আমাদেরই পূর্বপুরুষদের অগ্নিময় আত্মাকে। শতাব্দীকাল ধরে যে আবেগ ছিল আমাদের বংশের বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে এসে মিলল সেই কল্পনাবিলাস যার জন্যও আমাদের বংশের খ্যাতি কিছু কম ছিল না; আর এই দুইয়ে মিলে "বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকার" উপরে ছড়িয়ে দিল প্রলাপমুখর আশীর্বাণী। সব কিছুই বদলে গেল। যে সব গাছে কোন দিন ফুল ফোটে নি তাতে ফুটল তারার মত বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের ফুল। সবুজ গালিচার রং ঘনতর হল; একে একে সাদা ডেইজি ফুলগুলি শুকিয়ে গেলে তাদের জায়গায় মাথা তুলল লোহিতবর্ণ এস্‌কোডেল। আমাদের পথে পথে জীবনের সাড়া জাগল; যে দীর্ঘদেহ চক্রবাক পাখি এতদিন দেখাই যেত না সেও খুশি-ভরা সব পাখিদের সঙ্গে নিয়ে তার লাল পাখনা মেলে দিল আমাদের চোখের

সামনে। সোনালী ও রুপোলি মাছে নদী ভরে গেল ; একটু একটু করে নদীর অতল থেকে উঠে এল প্রথমে একটা কুলুকুলু ধ্বনি ; তারপর সেই ধ্বনি হয়ে উঠল এমন একটি ঘুম-পাড়ানি সুর যা ইয়োলুস-এর বীণার চাইতেও স্বর্গীয়—একমাত্র ইলিওনোরার কণ্ঠস্বর ব্যতীত অন্য সব সুর হতে মধুরতর। দীর্ঘদিন ধরে যে মেঘের দলকে জমতে দেখেছিলাম সন্ধ্যাতারার চারপাশের আকাশে সেই মেঘ সেখান থেকে উড়ে এসে উজ্জ্বল রক্তিম ও সোনালী আভার সমারোহ নিয়ে জমতে লাগল আমাদের মাথার উপরে ; দিনের পর দিন সেই মেঘমালা নীচে নামতে নামতে পাহাড়ের মাথায় এসে থামল। মনে হল, আমরা বুঝি চিরদিনের মত বন্দী হলাম আড়ম্বর ও উজ্জ্বলতার এক যাদুর কারাগারে।

ইলিওনোরার কমনীয়তা ছিল দেবদূতেরই অনুরূপ ; কিন্তু তার ছোট্ট জীবন ফুলের দেশেই কেটেছে বলে সে ছিল একটি সরল, নিষ্পাপ কুমারী। কোন রকম ছলাকলা তার ভালবাসাকে আড়াল করে নি। বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকায় বেড়াতে বেড়াতে আমরা আলোচনা করতাম, সম্প্রতিকালে প্রেম আমাদের দুজনকে কত না বদলে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত একদিন কথাপ্রসঙ্গে চোখের জলে ভাসতে ভাসতে মানব জীবনের সর্বশেষ অনিবার্য পরিণতির কথা উঠে পড়ল, আর সেদিন থেকেই আমাদের সব রকম কথার মধ্যেই এসে পড়ত এই বিষাদময় বিষয়টি, চারণ-কবি শিরাজ-এর গানের মত সব কথার মধ্যেই দেখা দিতে লাগল বার বার একই ছবি।

সে দেখতে পেত মৃত্যুর অঙ্গুলি নেমে এসেছে তার বুকের উপর—ক্ষণজীবী পতঙ্গের মতই সে পরিপূর্ণ কমনীয়তায় ভরে উঠেছে শুধু মৃত্যুরই জন্য। কিন্তু কবরকে তার বড় ভয়। একদা গোধূলি বেলায় "নিঃশব্দের নদী"র তীরে বসে সে আমাকে বলেছিল, এই একটি চিন্তাই তাকে কষ্ট দিচ্ছে যে, বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকায় তাকে কবর দেবার পরেই আমি চিরদিনের মত এই সুখের দেশকে ছেড়ে চলে যাব, এবং তার প্রতি আমার এই গভীর ভালবাসাকে বিলিয়ে দেব দৈনন্দিন জগতের অন্য কোন কুমারীকে। আর ঠিক তখনই ইলিওনোরার পায়ের উপর পড়ে তার ও ঈশ্বরের নামে আমি শপথ করেছিলাম, পৃথিবীর কোন কন্যার সঙ্গেই আমি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হব না—তার প্রিয় স্মৃতির প্রতি, অথবা যে ঐকান্তিক ভালবাসা দিয়ে সে আমাকে ধন্য করেছে তার প্রতি কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা করব না। আমার সেই পবিত্র শপথের সাক্ষী হলেন বিশ্বের সর্বশক্তিমান নিয়ন্তা। তাকে আরও বলেছিলাম, যদি কখনও এই শপথ আমি ভঙ্গ করি তাহলে যেন সেই সর্বশক্তিমানের অভিশাপ নেমে আসে আমার মাথায়। আমার কথা শুনে ইলিওনোরার উজ্জ্বল চোখ দুটি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল ; সে এমন ভঙ্গীতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল যেন একটা মারাত্মক বোঝা নেমে গেল তার বুকের উপর থেকে ; তার শরীর কাঁপতে লাগল ; সে ভীষণভাবে কাঁদতে শুরু করল ; তবু এই শপথকে খুশি মনে গ্রহণ করল ; মৃত্যু-শয্যাও তার কাছে

সহনীয় হয়ে উঠল। অল্প কিছুদিন পরেই শান্তভাবে মৃত্যুকে মেনে নিয়ে সে আমাকে বলেছিল, তার আত্মার শান্তির জন্য সেদিন আমি যা করেছিলাম তার বিনিময়ে মৃত্যুর পরেও সে আমার উপর নজর রাখবে, যদি সম্ভবপর হয় তাহলে রাত্রির অবসরে সে সশরীরে আমার কাছে ফিরে আসবে ; আর স্বর্গগত আত্মার পক্ষে সেটা যদি একান্তই সাধ্যাতীত হয় তাহলে মাঝে মাঝেই আমাকে ইঙ্গিতে তার উপস্থিতির কথা জানিয়ে দেবে—সন্ধ্যার বাতাসের সঙ্গে মিশে তার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়বে আমার দেহে, অথবা দেবদূতের ধূনোচির গন্ধ এনে সে সুগন্ধে ভরিয়ে দেবে আমার প্রশ্বাসের বাতাস। এই কথাগুলি বলতে বলতেই নিজের নিষ্পাপ জীবনটিকে সে নিবেদন করে দিল, আর আমার নিজের জীবনের প্রথম অধ্যায়টিরও সমাপ্তি ঘটল।

এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলেছি বিশ্বস্তভাবেই বলেছি। কিন্তু আমার প্রিয়তমার মৃত্যু মহাকালের যাত্রাপথে যে প্রাচীর তুলেছে তাকে পার হয়ে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা বলতে গিয়েই মনে হচ্ছে আমার মস্তিষ্কের উপর নেমে আসছে একটি গাঢ় ছায়া এবং এই প্রতিবেদনের পূর্ণ সত্যতা সম্পর্কে আমার সেই আস্থাও চলে যাচ্ছে। কিন্তু বলতে তো আমাকে হবেই। ক্লান্ত বছরগুলি একের পর এক কাটতে লাগল ; তখনও আমি বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকাতেই বাস করছি। কিন্তু তখন সব কিছুর উপরেই নেমে এসেছে দ্বিতীয় পরিবর্তন। তারা-ফুলগুলি গাছেই শুকিয়ে গেছে, আর ফোটে না। সবুজ গালিচার রং ফিকে হয়ে গেছে ; একে একে ঝরে পড়েছে সব লোহিতবর্ণ এস্‌কোডেল ; তার জায়গায় দলে দলে মাথা তুলেছে কালো চোখের মত ভায়োলেট ফুলের দল, শিশিরের ভারে অস্বস্তির সঙ্গে দুলছে। জীবন বিদায় নিয়েছে আমাদের পথ থেকে ; দীর্ঘকায় ফ্লেমিঙ্গো পাখিটা আর আমাদের সামনে রক্তিম পাখা মেলে ওড়ে না, হাসিখুশি, উজ্জ্বল পাখিদের সঙ্গে নিয়ে বিষণ্ণ মনে সেও উড়ে গেছে উপত্যকা থেকে পাহাড়ে। সোনালী ও রূপোলি পাখি সংকীর্ণ গিরি-নালা ধরে সাঁতরে চলে গেছে আমাদের এলাকার একেবারে শেষ প্রান্তে। আর সেই ঘুম-পাড়ানি সুর যা ছিল ইয়োলুসের বায়ু—বীণার চাইতেও নরম এবং একমাত্র ইলিওনোরার কণ্ঠস্বর ভিন্ন আর সব সুরের তুলনায় অধিকতর স্বর্গীয়, তাও একটু একটু করে দূরে সরে যেতে যেতে একদিন মিলিয়ে গেল তার মূল নৈঃশব্দের গভীরতায়। এবং তারপর সেই ঘন মেঘের দলও শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়াগুলিকে পরিত্যাগ করে চলে গেল সন্ধ্যাতারার দেশে, সঙ্গে নিয়ে গেল বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকার সব রূপ, সব ঐশ্বর্য, সব গৌরব।

তবু ইলিওনোরা কিন্তু ভোলে নি তার শপথ। দেবদূতদের ধূনচির দোলার শব্দ আমি শুনতে পাই ; একটি পবিত্র সুগন্ধ স্রোত ভেসে বেড়ায় উপত্যকার উপরে অনেক নির্জন মুহূর্তে বাতাসের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে অনেক দীর্ঘশ্বাস এসে আমার ভুরুকে স্নান করিয়ে দেয় ; রাতের বাতাস প্রায়শই ভরে ওঠে অস্পষ্ট কুলুকুলু ধ্বনিতে ; আর একবার—হায়, মাত্র একটি বার ! অতীন্দ্রিয় দুটি ঠোঁট আমার ঠোঁটকে স্পর্শ করে আমার মৃত্যুর মত ঘন ঘুমকে ভাঙিয়ে দিয়েছিল।

কিন্তু আমার অন্তরের শূন্যতা তাতেও ভরল না। আমার মন চাইল সেই ভালবাসা যা আগে আমাকে একেবারে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। শেষ পর্যন্ত ইলিওনোরার স্মৃতির ভারে সেই উপত্যকা আমার কাছে বেদনাময় হয়ে উঠল। একদিন জগতের অসার বস্তু ও কোলাহলমুখর জয়ের খোঁজে চিরদিনের মত সে উপত্যকাকে ছেড়ে এলাম।

* * *

পৌঁছে গেলাম এক বিচিত্র শহরে। সেখানকার সব কিছুই হয় তো বহুবর্ণ তৃণময় উপত্যকায় এতকাল যে মধুর স্বপ্ন আমি দেখেছি তাকে আমার স্মৃতি থেকে মুছে দিতে পারত। রাজ-দরবারের জাঁকজমক ও আড়ম্বর, অস্ত্রের উন্মত্ত ঝনঝনানি, নারীদের উজ্জ্বল মনোহারিত্ব আমার মস্তিষ্ককে উদ্‌ভ্রান্ত ও নেশাগ্রস্ত করে তুলল। কিন্তু আমার মন তখনও বিশ্বস্ত রইল তার শপথে; রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে তখনও অনুভব করতাম ইলিওনোরার উপস্থিতির ইঙ্গিত। হঠাৎ সে সবই বন্ধ হয়ে গেল; আমার চোখে জগৎটা আঁধারে ঢেকে গেল; যে অগ্নিময় চিন্তা ও ভয়ংকর প্রলোভন আমাকে ঘিরে ধরল তার দিকে তাকিয়ে ভয় পেলাম। অনেক, অনেক দূরের এক অজানা দেশ থেকে আমার রাজার দরবারে এসে হাজির হল এক কন্যা—আমার ভীরু অন্তর সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের কাছে আত্মনিবেদন করল—প্রেমের এক অতি আকুল ও ঘৃণ্য পূজার আবেগে বিনা সংগ্রামে আমি তার পায়ের তলায় মাথানত করলাম। যে উচ্ছ্বাস, যে প্রলাপ, যে পূজার উল্লাস নিয়ে চোখের জলে ভেসে সেই স্বর্গীয় এর্‌মেন্‌গার্ডের পায়ে—আহা, দেবদূত এর্‌মেন্‌গার্ড কত না সুন্দর ছিল।—আমার সমস্ত আত্মাকে নিবেদন করেছিলাম তার সঙ্গে তুলনায় উপত্যকাবাসিনী সেই তরুণীর প্রতি আমার ভালবাসা ছিল কতটুকু? তার স্মরণীয় চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে কেবল তাদের কথাই ভাবলাম—তাকেই ভাবলাম।

বিয়ে করলাম; শপথ-ভঙ্গের যে অভিশাপকে নিজে যেচে মাথায় নিয়েছিলাম তাকেও ভয় করলাম না। অবশ্য সে অভিশাপ নেমেও আসে নি আমার মাথায়। আরও একবার—কিন্তু এবার রাতের নিস্তব্ধতায়—আমার জাফরির ফাঁক দিয়ে ভেসে এল সেই নরম দীর্ঘশ্বাস যা আমাকে ভুলে গিয়েছিল; সেই দীর্ঘশ্বাস যেন পরিচিত মধুর স্বরে বলে উঠল—

“শান্তিতে ঘুমোও!—কারণ আজও প্রেমের দেবতাই রাজ্য চালায় রাজ্য শাসন করে; তোমার অন্তরের ভালবাসার মধ্যে এর্‌মেন্‌গার্ড নামের মেয়েটিকে তুমি গ্রহণ করেছ; তাতেই ইলিওনোরার কাছে দেওয়া শপথ থেকে তুমি মুক্তি পেয়েছ; কেন পেয়েছ তা তোমাকে জানানো হবে স্বর্গলোকে।”

মোরেল্লা

Morella

এক গভীর অথচ বিশেষ অনুরাগের চোখেই বান্ধবী মোরেল্লাকে আমি দেখতাম। অনেক বছর আগে আকস্মিকভাবেই তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে; প্রথম দেখার পর থেকেই আমার আত্মা এক অজ্ঞাতপূর্ব আগুনে জ্বলতে লাগল; কিন্তু সে আগুন প্রণয়ঘটিত নয়; আর ক্রমে এটাই আমার কাছে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠল যে আমি না পারলাম সেই আগুনের স্বরূপ বুঝতে, আর না পারলাম তাকে সংযত রাখতে। তবু দুজনের দেখা হত; নিয়তি আমাদের দুজনকে তাঁর বেদীতলে একসঙ্গে বেঁধে দিল। কোন দিন আমি ভালবাসার কথা মনে আনি নি, বা মুখেও বলি নি। সে অবশ্য সমাজ-সংসারকে ত্যাগ করে শুধু আমার সঙ্গেই যুক্ত হয়ে রইল, আমাকে সুখী করল। সে সুখ বিস্ময়ের;—সে সুখ স্বপ্ন দেখার।

মোরেল্লার পাণ্ডিত্য ছিল প্রগাঢ়। তার প্রতিভা সাধারণ ছিল না—তার মনের জোর ছিল অসুরের মত। আমি তা বুঝতাম, তাই অনেক ব্যাপারেই তার ছাত্র হয়ে গেলাম। যাই হোক, অচিরেই বুঝতে পারলাম, হয় তো তার প্রেসবুর্গের শিক্ষার জন্যই সে আমার সামনে এমন সব রহস্যময় লেখা এনে হাজির করত যেগুলিকে সাধারণত প্রাচীন জার্মান সাহিত্যের আবর্জনা বলে গণ্য করা হয়। কেন জানি না, এইগুলিই ছিল তার প্রিয় এবং সর্ব সময়ের পাঠ্যসঙ্গী—এবং কালক্রমে এ সবই যে আমারও প্রিয় বিষয় হয়ে উঠল তার সহজ ও সরল কারণটি হল অভ্যাস ও দৃষ্টান্তের প্রভাব।

আমার যদি ভুল না হয় তো বলি, এ সব ব্যাপারে আমার বিচার-বুদ্ধির বিশেষ কিছু করার ছিল না। আমার ভাবনা-চিন্তাগুলি কোন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। বা আমি যা কিছু পড়তাম তার রহস্যময়তার ছিঁটে ফোঁটাও আমার মনকে স্পর্শ করত না। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই নিজেকে আমার স্ত্রীর হাতে তুলে দিলাম, এবং অচঞ্চল হৃদয়ে তার পাঠ্যবস্তুর ভিতরে প্রবেশ করলাম। আর তখন—যখন নিষিদ্ধ পৃষ্ঠাগুলির উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম এবং অনুভব করতাম যে একটা নিষিদ্ধ ভাব আমার মধ্যে জ্বলে উঠছে, ঠিক তখনই মোরেল্লা তার ঠাণ্ডা হাতটা আমার হাতের উপর রাখত, এবং একটি মৃত দর্শনের ভস্ম থেকে খুঁচিয়ে তুলত এমন কতকগুলি বিচিত্র শব্দ যার বিস্ময়কর অর্থ আমার স্মৃতিতে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা হয়ে যেত। আর সেই সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি তার পাশে বসে থাকতাম, কান পেতে শুনতাম তার সুরেলা কণ্ঠস্বর—তারপর এক সময় তার সুরে লাগত ত্রাসের ছোঁয়া—আমার আত্মার উপর একটা ছায়া নেমে আসত—আমি বিবর্ণ

হয়ে যেতাম—আর তার সেই অপার্থিব স্বর শুনে আমার ভিতরটা থর্ থর্ করে কাঁপতে থাকত। এই ভাবে সহসা আনন্দ মিলিয়ে যেত ত্রাসে, অতি সুন্দর হয়ে উঠত অতি কদাকার, ঠিক যেমন হিন্নোম হয়ে যেত জি—হেন্না।

উল্লেখিত পুঁথিগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা যে সব প্রবন্ধ দীর্ঘদিন ধরে মোরেল্লা ও আমার আলাপচারির প্রায় একমাত্র বিষয়-বস্তু ছিল তার সঠিক চরিত্র নিরূপণ করার কোন প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় নীতিবাদের সঙ্গে যারা পরিচিত তারা সহজেই সেটা বুঝতে পারতেন, আর সে পরিচিতি যাদের নেই তাদের কাছে কিছুতেই বোধগম্য হবে না। ফিক্‌টের অনিয়ন্ত্রিত সর্বেশ্বরবাদ, বা শেলিং-এর আইডেণ্টিটিবাদ নিয়েই বেশীর ভাগ আলোচনা হত। কোন ব্যক্তির সত্তা মৃত্যুতে চিরদিনের মত হারিয়ে যায় কি যায় না—এই আলোচনায় আমি সর্বদাই খুব আগ্রহ বোধ করতাম; বিশেষ করে যে রকম উল্লেখযোগ্য ও উত্তেজিত ভঙ্গীতে মোরেল্লা আলোচনাটিকে উপস্থিত করত সেটা আমার মনকে খুবই টানত।

কিন্তু এতদিনে সেই সময়টি এসে গেল যখন আমার স্ত্রীর ভাব-ভঙ্গী যাদুমন্ত্রের মত আমাকে চেপে ধরতে লাগল। তার সরু আঙুলের ছোঁয়া, তার সুরেলা ভাষার নিম্নস্বর, তার বিষণ্ণ চোখ দুটির উজ্জ্বলতা—কিছুই আর আমার সহ্য হত না। এ সবই সে বুঝত, কিন্তু অভিযোগ করত না; মনে হত, আমার দুর্বলতা বা আমার মূর্খতা সম্পর্কে সে সচেতন, তবু মৃদু হেসে তাকেই বলত নিয়তি। মনে হত, তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা যে দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে তার কারণটা আমি না জানলেও সে জানত; কিন্তু সে বিষয় নিয়ে কোন রকম উচ্চবাচ্যই সে করত না। তথাপি সেও তো নারী; দিনের পর দিন সে শুকিয়ে যেতে লাগল। ক্রমে তার গালে লাল ছোপ পড়ল; কপালের নীল শিরাগুলি আরও ফুলে উঠল; আর এক মুহূর্তের জন্য আমার মনটা করুণায় বিগলিত হতে না হতেই পরমুহূর্তে তার অর্থবহ চোখের দিকে তাকিয়ে আমার মন অসুস্থ হয়ে পড়ত, মাথাটা ঘুরে যেত—ঠিক যে রকম ভাবে কোন মানুষের মাথা ঘুরে যায় যখন সে নীচের দিকে কোন ভয়ংকর অতলস্পর্শ খাদের দিকে তাকায়।

তাহলে কি আমি বলব যে মোরেল্লার মৃত্যুর মুহূর্তটিকেই আমি একান্তভাবে কামনা করতাম? তাই করতাম; কিন্তু ভঙ্গুর আত্মাও আরও অনেকদিন পর্যন্ত তার মাটির বাসাটিকে আঁকড়ে ধরে রইল—অনেক সপ্তাহ আর অনেক বিরক্তিকর মাস—যতদিন না আমার যন্ত্রণাদীর্ণ স্নায়ুগুলি আমার মনকে শাসনে আনতে পারল; যত দেরী হতে লাগল ততই আমি হিংস্র হয়ে উঠতে লাগলাম; শয়তান ভর করল আমার মনের উপর; দিনের শেষ বেলাকার ছায়ার মত তার শান্ত জীবনের শেষ মুহূর্তটি যত দীর্ঘায়িত হতে থাকল ততই প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা, প্রতিটি তিক্ত মুহূর্তকে আমি অভিশাপে জর্জরিত করতে লাগলাম।

হেমন্তকালের একটি সন্ধ্যায়, বাতাস যখন একেবারে স্থির হয়ে ছিল, সে সময় মোরেল্লা আমাকে তার শয্যার পাশে ডেকে আনল। একটা আবছা কুয়াসা সারা পৃথিবীকে ছেয়ে আছে, জলের উপর একটা তপ্ত আভা ছড়িয়ে পড়েছে, অক্টোবর মাসের

অরণ্যানীর ঘন পত্রপল্লবের ভিতর দিয়ে আকাশ থেকে নেমে এসেছে একটি ইন্দ্রধনু।

আমি কাছে যেতেই সে বলল, "আজ বড় ভাল দিন; অনেক দিনের মধ্যে বেঁচে থাকার বা মরে যাবার মত একটি দিন। পৃথিবীর পুত্রদের এবং জীবনের পক্ষে আজ বড় ভাল দিন—আহা, স্বর্গের কন্যাদের ও মৃত্যুর পক্ষেও বড় ভাল দিন।"

আমি তার কপালে চুমো খেলাম। সে বলতে লাগল ঃ

"আমি মরতে বসেছি, তথাপি আমি বেঁচে থাকব।"

"মোরেল্লা!"

"এমন কোন দিন আসে নি যেদিন তুমি আমাকে ভালবাসতে পারতে—কিন্তু জীবনে যাকে তুমি ঘৃণা করেছ, মৃত্যুতে তাকেই তুমি পূজা করবে।"

"মোরেল্লা!"

"আবার বলছি, আমি মরতে বসেছি। কিন্তু আমার অন্তরে আছে সেই ভালবাসার শপথ—আহা! সে কতটুকু—যা তুমি অনুভব করতে আমার জন্য—মোরেল্লার জন্য। আর আমার আত্মা যখন বিদায় নেবে সন্তানটি তখনও বেঁচে থাকবে—তোমার ও আমার সন্তান, মোরেল্লার সন্তান। কিন্তু আগামী দিনগুলি হবে দুঃখের দিন—যে দুঃখ অন্যসব অনুভূতি অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী, যেমন সব বৃক্ষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সাইপ্রেস। কারণ তোমার সুখের দিন শেষ হয়েছে; পিস্তামের গোলাপ বছরে দুবার ফোটে, কিন্তু এক জীবনে আনন্দ দু'বার আসে না। সময়ের সঙ্গে তুমি আর লুকোচুরি খেলতে পারবে না, কিন্তু মেহেদি ও দ্রাক্ষালতার কথা ভুলে গিয়ে এই মর্ত্যে থেকেই তোমাকে সমাধির অন্ধকার সইতে হবে, মক্কাতে যেমন মুসলমানরা করে থাকে।"

আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, "মোরেল্লা! মোরেল্লা! এ কথা তুমি জানলে কেমন করে?"—কিন্তু বালিশের উপর সে মুখটা ফিরিয়ে নিল; তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঈষৎ কেঁপে উঠল; এই ভাবেই তার মৃত্যু হল; তার মুখের কথা আর কোনদিন আমি শুনি নি।

অথচ তার সেই সন্তান—মৃত্যুশয্যায় যাকে সে জন্ম দিয়েছিল, আর মায়ের শেষ নিঃশ্বাস পড়ার আগে পর্যন্ত যে নিঃশ্বাসই ফেলে নি—সেই সন্তান, একটি মেয়ে—বেঁচে গেল। কি দেহে, কি বুদ্ধিতে সেই মেয়ে আশ্চর্য রকমের বড় হয়ে উঠল, স্বর্গগতা মায়ের একেবারে প্রতিবিম্বটি যেন। আমি তাকে ভালোবাসলাম—এত বেশী ভালবাসলাম যে পৃথিবীর কোন মানুষকে ততখানি ভালবাসা যায় বলে আমি বিশ্বাসই করতাম না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভালবাসার স্বর্গ অন্ধকারে ঢেকে গেল; বিষাদ, আতংক ও দুঃখের মেঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আগেই বলেছি, দেহে ও মনে মেয়েটি আশ্চর্য রকমের বড় হয়ে উঠল। সত্যি, তার দেহের এত দ্রুত বাড়-বৃদ্ধি ছিল বিস্ময়কর—কিন্তু তার মনের বাড়-বাড়ন্ত দেখে যে ঝড়ো চিন্তাগুলি আমার মনে এসে ভিড় করেছিল তা ছিল ভয়ংকর—বড় ভয়ংকর। যখন প্রতিদিন আবিষ্কার করতে লাগলাম এক শিশুর চিন্তা-ভাবনার মধ্যে এক প্রাপ্তবয়স্কা নারীর শক্তি ও মনোবৃত্তির প্রকাশ—যখন একটি শিশুর মুখে শুনতাম অভিজ্ঞতার বাণী—তার দুটি ডাগর চোখে

যখন ফুটে উঠত পরিণত বয়সের জ্ঞান ও আবেগ, তখন কি আমার মনের প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হতে পারত ? আমার ভয়ার্ত মনের কাছে এই সব কিছু অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল—যখন তাকে নিজের কাছে লুকিয়েও রাখতে পারি না। আবার ছুঁড়ে ফেলে দিতেও পারি না, তখন যদি কোন ভয়ংকর ও উত্তেজক সন্দেহ আমার মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে থাকে। অথবা আমার চিন্তা যদি ফিরে যায় সমাধিস্থ মোরেল্লার বিচিত্র সব কাহিনী ও মতবাদের মধ্যে, তাহলে সেটা কি খুবই বিস্ময়কর হবে ? তাই তো জগতের সন্ধানী চোখের সামনে থেকে সেই প্রাণীটিকে আমি দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলাম যাকে ভালবাসা দিতে নিয়তি আমাকে বাধ্য করেছে ; আর আমার বাড়ির কঠোর নির্জনতার মধ্যে বসে যন্ত্রণাদায়ক উৎকণ্ঠার সঙ্গে সতর্ক নজর রেখে চললাম আমার সেই আপন জনটির উপর।

আর যত বছর ঘুরতে লাগল ততই দিনের পর দিন সেই মুখখানির দিকে চেয়ে চেয়ে, আর তার বাড়ন্ত দেহের কথা ভেবে ভেবে আমি আবিষ্কার করলাম সেই শিশুর সঙ্গে তার বিষণ্ণ মৃত মায়ের নতুন নতুন সাদৃশ্য। তার হাসিটি যে তার মায়ের মত সেটা আমি সইতে পারতাম, কিন্তু সেই সাদৃশ্য যখন পূর্ণ একাত্মতা হয়ে ধরা দিত তখনই আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম। তার চোখ দুটি যে মোরেল্লার মত সেটা আমার সইত, কিন্তু সেই দুটি চোখও যে মোরেল্লার নিজের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও বিভ্রান্তিকর অর্থবহতা নিয়ে আমার মনের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখতে পেত ! কিন্তু সেই উঁচু কপাল, রেশমি কোঁকড়ানো চুল, সেই পাণ্ডুর আঙুল, কথার সেই একই বিষণ্ণ সুর, আর সর্বোপরি—ওঃ, সর্বোপরি—জীবিত প্রিয়জনটির মুখে মৃত মানুষের কথা ও ভাবের প্রকাশ—এই সব চিন্তা ও ভয় আমাকে কুরে কুরে খেত—সে চিন্তা-কীটের যে মৃত্যু নেই।

এমনি করে কেটে গেল তার জীবনের দুটি পঞ্চাব্দ, অথচ আমার মেয়েটি তখনও রয়ে গেল নামহীন। পিতৃস্নেহ থেকে উৎসারিত হত শুধু "আমার মেয়ে" ও "আমার প্রিয়" সম্ভাষণ ; সর্বক্ষণ কঠোর নির্জনতায় বাস করার ফলে অন্য কোন সম্ভাষণ জোটে নি তার কপালে। মোরেল্লার মৃত্যুর সঙ্গেই তার নামও মুছে গেছে। আমিও মেয়েকে তার মার কথা কিছু বলি নি ;—বলা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তার দীক্ষান্ত অনুষ্ঠানের সময় নামকরণের কথাটা আমার মনে হল। প্রাচীন ও নবীন, স্বদেশী ও বিদেশী অনেক নামই ঠোঁটের উপর এসে ভিড় করল। তাহলে একটি সমাহিত মৃত মানুষের স্মৃতিকে বিঘ্নিত করার কথা আমার মনে হল কেন ? কোন্ দানব আমাকে প্রেরণা দিল সেই নামটি উচ্চারণ করতে যা স্মরণ করামাত্রই আমার মাথা থেকে বুক পর্যন্ত লাল রক্তের আভায় ঝলসে গেল ? কোন্ শয়তান কথা বলল আমার মনের গহন থেকে যখন রাত্রির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে গির্জার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমি পবিত্র লোকটির কানে কানে বলেছিলাম—মোরেল্লা ? শয়তানেরও বাড়া কে যেন আমার সন্তানকে প্রচণ্ডভাবে সংকুচিত করে দিল, মৃত্যুর পাণ্ডুরতায় তাকে ঢেকে দিল ; সেই প্রায় অশ্রুত শব্দটি শুনেই চমকে উঠে সে তার কাঁচ-স্বচ্ছ চোখ দুটিকে মর্ত্যভূমি থেকে স্বর্গলোকের দিকে তুলে ধরেই আমাদের বংশানুক্রমিক গর্ভগৃহের কালো পাথরের উপর সটান শুয়ে পড়ে উত্তর দিল—"আমি এখানে !"

স্পষ্ট, অতিশয় স্পষ্ট ঐ দুটি সরল শব্দ আমার কানে প্রবেশ করল, আর সেখান থেকে গলিত সীসের মত হিস্ হিস্ করে ঢুকল আমার মস্তিষ্কে। বছরের পর বছর চলে যাবে, কিন্তু সেদিনের স্মৃতি কখনও মুছে যাবে না! ফুল ও দ্রাক্ষালতার কথাও আমার অজানা ছিল না—কিন্তু আমার দিন ও রাত্রিকে ছায়াচ্ছন্ন করে রাখল হেমলক আর সাইপ্রেস। স্থান ও কালের কোন হিসাব আমার কাছে রইল না; আমার আকাশ থেকে ভাগ্যের তারারা মিলিয়ে গেল; অতএব আমার পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল; পৃথিবীর মূর্তিগুলো চলমান ছায়ার মত আমার পাশ দিয়ে চলে যায়; তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাই শুধু মোরেল্লাকে। আকাশের বাতাস আমার কানে কানে শুধু একটি কথাই শোনায়, সমুদ্রের ঢেউ কুলুকুলু স্বরে কেবলি বলে—মোরেল্লা। কিন্তু সে তো মৃত; নিজের হাতে তুলে নিয়ে গেলাম সমাধি-স্থানে; আর যেখানে দ্বিতীয় মোরেল্লাকে শুইয়ে দিলাম সেই সমাধিতে প্রথম মোরেল্লার কোন চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আমি এক দীর্ঘ, তিক্ত হাসিতে ফেটে পড়লাম।

মেজেংগারস্টিন

Metzengerstein

বিভীষিকা ও ভবিতব্যতা সর্বকালেই সমানতালে চলে। তাহলে যে গল্প আমি বলতে বসেছি তার একটা তারিখ দিতে হবে কেন? শুধু এইটুকু বলাই তো যথেষ্ট, যে সময়ের কথা আমি বলছি তখন হাঙ্গেরির মধ্যবর্তী অঞ্চলে জন্মান্তরবাদে (মেটেম্-সাইকোসিস) একটা স্থির অথচ গোপন বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। সেই সব মতবাদ প্রসঙ্গে—অর্থাৎ সেগুলি মিথ্যা অথবা সম্ভাব্য কিনা—আমি কিছুই বলব না।

কিন্তু হাঙ্গেরির সেই কুসংস্কারের মধ্যে এমন কিছু কথা ছিল যা অতি দ্রুত যুক্তি-বিরুদ্ধ অসঙ্গতির দিকে চলে যাচ্ছিল। এ বিষয়ে প্রাচ্য দেশীয় বিশেষজ্ঞদের মতামতের সঙ্গে হাঙ্গেরীয়দের মতামতের অনেক মূলগত পার্থক্য ছিল।

বার্লিফিজিং এবং মেজেংগারস্টিন পরিবারদ্বয়ের মধ্যেকার রেষারেষিটা কয়েক শতাব্দী ধরে চলে আসছে। কিন্তু দুই পরিবার এই শত্রুতা আগে কখনও এতটা মারাত্মক হয়ে ওঠে নি। এই শত্রুতার মূল খুঁজে পাওয়া যায় একটি প্রাচীন ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে—"সওয়ার যেমন তার ঘোড়ার উপর বিজয়ী হয়, ঠিক তেমনি মেজেংগারস্টিন-এর মরণশীলতা যখন বিজয়ী হবে বার্লিফিজিং-এর অমরত্বের উপর, তখন একটি মহান নামের ভয়ংকর পতন ঘটবে।"

সত্যি কথা বলতে কি, কথাগুলি বিন্দুমাত্রও অর্থবহ ছিল না। কিন্তু অনেক কাল আগেকার কিছু তুচ্ছ কারণ থেকেই ঘটে গিয়েছিল অনুরূপ কিছু ঘটনা। তাছাড়া, দুটো জমিদারি পাশাপাশি থাকায় তাদের পরিচালনা ও শাসনের ব্যাপারে

দুপক্ষের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব। তদুপরি, নিকট প্রতিবেশীরা কদাচিৎ মিত্র হয়ে থাকে; আর বার্লিফিজিং দুর্গের অধিবাসীরা তাদের সুউচ্চ অলিন্দ থেকে মেজেঙ্গারস্টিন প্রাসাদের বাতায়ন-পথে সহজেই তাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পারত। অতএব বংশানুক্রমিক ঈর্ষায় অনুপ্রাণিত বিবাদের ফলে দুটি পরিবার যখন আগে থেকে বিসম্বাদে মগ্ন ছিল, তখন ভবিষ্যদ্বাণীর এই অকিঞ্চিৎকর কথাগুলি যে তাদের আরও বেশী দূরে সরিয়ে রাখবে তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ভবিষ্যদ্বাণীটির অর্থ—যদি তার মোটেই কোন অর্থ হয়—হয়তো এই যে, অধিকতর শক্তিমান পক্ষই শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে; আর তাই দুর্বলতার আর অল্পপ্রভাবশালী পক্ষটিও দুই পরিবারের তিক্ততর শত্রুতাকেই মনের মধ্যে পুষে রেখেছে।

বার্লিফিজিং-এর কাউন্ট উইলহেলম্ উচ্চ বংশের সন্তান হয়েও এই কাহিনীর সময়কালে ছিলেন এক অথর্ব, ভীমরতিগ্রস্ত বৃদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বী পরিবারের প্রতি এক অত্যাধিক বদ্ধমূল ব্যক্তিগত বৈরীতা ভিন্ন আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য তার ছিল না। তবে হ্যাঁ—অশ্বপ্রীতি এবং শিকারের প্রতি অনুরাগ তার এত বেশী ছিল যে অথর্ব দেহ, পরিণত বয়স, এবং মানসিক অক্ষমতা সত্ত্বেও প্রতিদিন তিনি শিকারের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পরতেন। অপরপক্ষে, মেজেংগারস্টিনের ব্যারন ফ্রেডেরিকের বয়স বেশী নয়। তার বাবা মন্ত্রী জি—যৌবনকালেই মারা যান। তার মা লেডি মেরিও দ্রুত তার অনুগমন করেন। সে সময় ফ্রেডেরিকের বয়স ছিল আঠারো বছর। একটা শহরে আঠারোটা বছর কিছু দীর্ঘ সময় নয়; কিন্তু একটা জনহীন দেশে—সেই পুরনো অঞ্চলের বিপুল জনহীনতার মধ্যে—ঘড়ির দোলকের শব্দ গভীরতর অর্থ বহন করে।

কতকগুলি বিশেষ কারণে বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারন ফ্রেডেরিক তার বিরাট জমিদারির মালিক হয়ে বসলেন। তার আগে হাঙ্গেরির কোন সম্ভ্রান্ত মানুষের এত বড় জমিদারি ছিল না। তার দুর্গের সংখ্যা ছিল অগুণতি। কি আকারে, কি জাঁকজমকে "মেজেংগারস্টিন প্রাসাদ"ই ছিল সকলের সেরা। তার জমিদারির সীমানা কখনও সঠিকভাবে নির্দ্ধারিত হয় নি; কিন্তু তার প্রধান পার্কটির ব্যাস ছিল পঞ্চাশ মাইল জুড়ে।

অতিপরিচিত চরিত্রের এই যুবক মালিকটি যখন এতবড় একটা সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে বসলেন তখনই তার ভবিষ্যৎ চাল-চলন কেমন হবে সে সম্পর্কে আলোচনার অবধি থাকল না। প্রকৃতপক্ষে, তিন দিনের মধ্যেই নতুন মালিকটির আচরণ হেরডকেও ছাড়িয়ে গেল—ছাড়িয়ে গেল তার অতি বড় গুণগ্রাহীদের প্রত্যাশাকেও। নির্লজ্জ ব্যাভিচার—উৎকট বিশ্বাসঘাতকতা—অশ্রুতপূর্ব অত্যাচার—তার কম্পমান প্রজাদের অচিরেই বুঝিয়ে দিল, তারা যতই একান্ত বশ্যতা স্বীকার করুক—তার নিজের বিবেক যতই পরিশুদ্ধ হয়ে উঠুক—কোন কিছুই এই ক্ষুদে ব্যক্তিগুলোর নির্ম্মম ছোবলের হাত থেকে তাদের বাঁচাতে পারবে না। চতুর্থ দিন রাতেই দেখা গেল, বার্লিফিজিং দুর্গের আস্তাবলে আগুন লেগেছে; আর আশপাশের সকলেই একমত হয়ে ব্যারনের দুর্ব্যবহার ও দুষ্কর্মের ভয়াবহ তালিকায় অগ্নিসংযোগের অপরাধটাকেও যোগ করে দিল।

কিন্তু এই ঘটনাকে নিয়ে চারদিকে যখন হৈ-চৈ পড়ে গেল তখন যুবক জমিদারটি

মেজেঙ্গারস্টিন প্রাসাদের দোতলার একটি নির্জন বড় ঘরে যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে রইলাম। ম্লান হয়ে আসা দামী পর্দাগুলি দেওয়ালের উপর এদিক-ওদিকে দুলছে, আর তারই উপরে দেখা যাচ্ছে হাজারো খ্যাতিমান পূর্বপুরুষদের ছায়া-ছায়া বিরাট সব ছবি। এখানে—লোমের দামী পোশাকে সজ্জিত পুরোহিত ও পোপের পদস্থ কর্মচারিগণ স্বেচ্ছাচারী জমিদারের সঙ্গে পাশাপাশি বসে এক পার্থিব রাজার ইচ্ছাকে নামঞ্জুর করে দিচ্ছে, অথবা মহামান্য পোপের হুকুমের জোরে পরম শত্রুর বিদ্রোহী রাজদণ্ডকে সংযত করছে। ওখানে—মেজেংগারস্টিনের রাজন্যবর্গের দীর্ঘ প্রতিকৃতি—তাদের শক্তিমান যুদ্ধাশ্বগুলির পায়ের তলায় পিষ্ট মৃত সৈনিকদের শব—যে কোন বলিষ্ঠ স্নায়ুর অধিকারীকেও হতচকিত ক'রে তোলে। আবার এখানে—বিগত কালের বিলাসপরায়ণা হংসীসমা সুন্দরীদের ছবিগুলো কাল্পনিক সুরের তালে তালে নেচে নেচে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

ব্যারন যখন বার্লিফিজিং-এর আস্তাবলের ক্রমবর্ধমান হৈ-হল্লা শুনছিলেন, বা শোনার ভান করছিলেন—অথবা নতুন কোন দুষ্কর্মের কথা ভাবছিলেন, তখন নিজের অজান্তেই তার চোখ পড়ল অস্বাভাবিক রং-এ আঁকা একটি প্রকাণ্ড ঘোড়ার ছবি—পর্দার উপরে তাকে দেখানো হয়েছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পরিসরের এক আরবি পূর্বপুরুষের সম্পত্তি রূপে। ছবির সম্মুখভাগে ঘোড়াটি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল প্রস্তর-মূর্তির মত, আর পিছনে দেখা যাচ্ছে কোন মেজেংগারস্টিনের ছুরিকাঘাতে নিহত তারই পরাজিত সওয়ার।

নিজের অজ্ঞাতেই তার দৃষ্টি কোথায় পড়েছিল সেটা বুঝতে পেরেই ফ্রেডেরিকের ঠোঁটে ফুটে উঠল শয়তানির প্রকাশ। তবু তিনি দৃষ্টি ফেরালেন না। বরং তিনি কোন মতেই বুঝতে পারলেন না কেন একটা গভীর উদ্বেগ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে এমনভাবে ছেয়ে ফেলেছে। যত সেদিকে তাকাচ্ছেন ততই তিনি বেশীমাত্রায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ছেন—ততই তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ছে পর্দার আকর্ষণ থেকে নিজের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনা। কিন্তু বাইরের হৈ-হল্লা হঠাৎ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি জোর করে নিজের মনোযোগকে ফেরালেন জ্বলন্ত আস্তাবল থেকে ঘরের বাতায়ন-পথে ঢুকে-আসা উজ্জ্বল লাল আলোর দিকে।

কিন্তু সে কাজটি বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না ; তার দৃষ্টি আপনা থেকেই আবার গিয়ে পড়ল দেওয়ালের উপর। সভয়ে এবং সবিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন. বৃহদাকার ঘোড়ার মাথাটির অবস্থান পাল্টে গেছে। আগে দেখেছিলেন, ঘোড়ার মাথাটি যেন সমবেদনায় ঘাড় বেঁকিয়ে ঝুঁকে পড়েছে স্বীয় প্রভুর শায়িত দেহের উপর ; আর এখন দেখলেন, সেই ঘাড় সম্পূর্ণ প্রসারিত হয়েছে ব্যারনের দিকে। যে চোখ দুটি আগে অদৃশ্য ছিল, এখন তাতে দেখা দিয়েছে এক মানবিক ভাবের প্রকাশ ; দুই চোখে জ্বলছে অস্বাভাবিক অগ্নিময় দীপ্তি ; ক্রুদ্ধ ঘোড়াটির বিস্মায়িত ঠোঁটের ফাঁকে পুরোপুরি দেখা যাচ্ছে বিরক্তিকর দাঁতের পাটি।

আতংকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যুবক জমিদার টলমল পায়ে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। দরজাটাকে সটান খুলে দিতেই একটা লাল আলোর ঝলক ঘরের একেবারে

ভিতরে এসে পড়ায় তার নিজের ছায়ার বহিঃরেখাটি আঁকা পড়ল দোদুল্যমান পর্দার উপরে ; যদিও তিনি তখনও দরজার চৌকাঠের উপরেই দাঁড়িয়েছিলেন, তথাপি তার মনে হল তার ছায়াটা যেন ছবির ঠিক সেই জায়গাতে গিয়েই পড়েছে যেখানে আঁকা রয়েছে আরবি বার্লিফিজিং-এর নির্মম বিজয়ী হত্যাকারীর মূর্তি।

মনের চাপ লাঘব করতে ব্যারন ছুটে বের হলেন খোলা বাতাসে। প্রাসাদের প্রধান ফটকে তার দেখা হল তিন অশ্বপালের সঙ্গে। অনেক কষ্টে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তার একটা বৃহদাকার অগ্নি-বর্ণ ঘোড়াকে তীব্র উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠা থেকে বিরত করছে।

সঙ্গে সঙ্গেই যুবক ব্যারন বুঝতে পারলেন, ঘরের পর্দার উপর আঁকা রহস্যময় ঘোড়াটি তার চোখের সম্মুখের হিংস্র জন্তুটিরই হুবহু প্রতিকৃতি। ভাঙা ভাঙা জিজ্ঞাসু গলায় তিনি বললেন, "কার ঘোড়া ? একে তোমরা কোথায় পেলে ?"

একজন অশ্বপাল উত্তর দিল, "এটা আপনারই সম্পত্তি কর্তা, অন্তত অপর কোন মালিক একে দাবী করছে না। বার্লিফিজিং দুর্গের জ্বলন্ত আস্তাবল থেকে পালিয়ে যাবার সময় আমরা একে ধরে ফেলেছি। এর সারা দেহ তখন প্রচণ্ড ক্রোধে ধোঁয়া ও ফেনায় ঢেকে গিয়েছিল। বুড়ো কাউণ্টের বিদেশী ঘোড়ার কোন বাচ্চা মনে করে আমরা এটাকে তার আস্তাবলেই ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার সহিসরা কিছুতেই একে তাদের ঘোড়া বলে স্বীকার করল না ; ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, কারণ আগুনের হাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যাবার মত অনেক চিহ্ন এর দেহে রয়েছে।"

দ্বিতীয় অশ্বপাল বলে উঠল, "এর কপালে ডব্লু. ভি. বি. অক্ষরগুলিও খুবই স্পষ্ট-ভাবে দেগে দেওয়া রয়েছে। তাই আমি ভেবেছিলাম, অক্ষর তিনটি উইলহেলম্ ভন বার্লিফিজিং-এরই (Wilhelm Von Berlifitzing) আদ্য অক্ষর—কিন্তু দুর্গের সকলেই সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, এ ঘোড়াটাকে তারা চেনেই না।

যুবক ব্যারন সহজ গলায় বললেন, "খুবই আশ্চর্য ! তোমরা ঠিকই বলেছ, এটি একটি অসাধারণ ঘোড়া—অদ্ভুত ঘোড়া ! আবার সন্দেহজনকভাবে নিখোঁজও বটে।" একটু থেমে আবার বললেন, "তাহলে এটা আমারই হোক ; হয়তো ফ্রেডেরিক মেজেংগারস্টিনের মত একজন সওয়ার বার্লিফিজিং-এর আস্তাবল ফেরৎ এই শয়তানটাকেও পোষ মানাতে পারবে।"

"আপনি ভুল করছেন কর্তা ; আমরা তো বলেছি, ঘোড়াটা কাউণ্টের আস্তাবল থেকে আসে নি। তা যদি হত তাহলে তো ঘোড়াটাকে আপনার পরিবারের কোন লোকের কাছে আনতামই না।"

"তা ঠিক !" ব্যারন শুকনো গলায় বললেন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে শোবার ঘরের বাহক-ভৃত্যটি দ্রুত পায়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এল। প্রভুর কানে কানে জানাল, উল্লেখিত ঘরের পর্দার একটা ছোট অংশ হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে। কথাগুলি ফিস্‌ফিস্ করে বলা হলেও অশ্বপালদের কৌতূহলী কানে সব কথাই গেল।

যুবক ফ্রেডেরিক নানান আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। অবশ্য অচিরেই সেটা সামলে নিলেন ; তার মুখে ফুটে উঠল অটল বিদ্বেষের প্রকাশ। তৎক্ষণাৎ তিনি হুকুম

দিলেন, আলোচ্য ঘরটাকে এখনই তালাবন্ধ করা হোক, এবং তার চাবিটা তুলে দেওয়া হোক তার হাতে।

বালক-ভৃত্যটি সেখান থেকে চলে যাবার পরেই ব্যারন কর্তৃক দত্তক নেওয়া বড় ঘোড়াটি আবার দ্বিগুণ শক্তিতে লাফালাফি, ঝাপাঝাপি শুরু করল, এবং মেজেংগারস্টিন প্রাসাদ থেকে তাদের আস্তাবল পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘ রাস্তাটিতে ছুটাছুটি করতে লাগল। ব্যারনের অধীনস্থ জনৈক সামন্ত বলল, "বৃদ্ধ শিকারী বার্লিফিজিং-এর দুঃখ-জনক মৃত্যুর সংবাদ কি আপনি শুনেছেন ?"

সহসা তার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্যারন বললেন, "না। মারা গেছেন! তুমি বলছ ?"

"কথাটা প্রকৃতই সত্য প্রভু ; আর খবরটা, আশা করি, আপনার কাছে অপ্রীতিকরও নয়।"

শ্রোতার মুখের উপরে একটা দ্রুত হাসির ঝিলিক খেলে গেল। "কেমন করে তার মৃত্যু হল ?"

"তার একটি প্রিয় শিকারী ঘোড়াকে উদ্ধার করতে অবিবেচকের মত ছুটে গিয়ে তিনি নিজেই আগুনে পুড়ে মারা গেছেন।"

"স—ত্যি না—কি !" ব্যারন সোচ্চারে এমনভাবে কথাটা বললেন যেন একটু একটু করে একটা উত্তেজক ধারণার সত্যতাকে অনুধাবন করতে পেরেছেন।

সামন্ত আবার বলল, "সত্যি।"

"বিস্ময়কর !" শান্ত গলায় কথাটা বলে যুবক নিঃশব্দে প্রাসাদের দিকে পা বাড়ালেন।

এই দিন থেকেই অসংযত-চরিত্র যুবক ফ্রেডেরিক ভন মেজেংগারস্টিনের বাইরের আচরণে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল। তার ব্যবহার সব রকম প্রত্যাশাকে নিরাশ করল ; কারও মতামতের সঙ্গেই তা আর মিলল না। পার্শ্ববর্তী ভদ্রসমাজের সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার যে খুব একটা সুখকর ছিল তা নয়। নিজের জমিদারির বাইরে তাকে কদাচিৎ দেখা যায় ; এত বড় সামাজিক পরিবেশে তিনি সম্পূর্ণ সঙ্গীহীন হয়ে গেলেন—অবশ্য যদি সেই অস্বাভাবিক, চঞ্চল ও অগ্নি-বর্ণ ঘোড়াটি, যার পিঠে এখন তিনি যখন-তখন সওয়ার হয়ে বসেন, যদি কোন রহস্যময় অধিকারে তার বন্ধুত্বের দাবী করতে পারে তো সেটা স্বতন্ত্র কথা।

প্রতিবেশীদের কাছ থেকে মাঝে মাঝেই অসংখ্য আমন্ত্রণ আসে। "ব্যারন কি তার উপস্থিতি দিয়ে আমাদের উৎসবকে সম্মানিত করবেন ?" "ব্যারন কি আমাদের শূকর-শিকারে যোগদান করবেন ?"—"মেজেংগারস্টিন শিকার করেন না" ; "মেজেংগারস্টিন উপস্থিত হতে পারবেন না ;" এই ছিল তার উদ্ধত, সংক্ষিপ্ত জবাব।

উদ্ধত ভদ্রসমাজ বার বার এই অপমান সহ্য করল না। এ ধরনের আমন্ত্রণের সংখ্যা কমতে কমতে এক সময় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। যাই হোক, সদ্য সংগৃহীত বাহনটির প্রতি এই মাত্রাতিরিক্ত অনুরাগ শেষ পর্যন্ত সব বুদ্ধিমান লোকের চোখেই কুৎসিত ও অস্বাভাবিক আসক্তি রূপে প্রতিভাত হতে লাগল। মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড রৌদ্র—

রাত্রির নিস্তব্ধ প্রহরে—রোগে বা সুস্থ অবস্থায়—শান্ত আবহাওয়ায় বা ঝড়ে সব সময়ই দেখা যেত যুবক মেজেংগারস্টিন সেই বৃহদাকার অশ্বের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছেন। ঘোড়াটির একগুঁয়ে ধৃষ্টতার সঙ্গে কোথায় যেন তার নিজের চরিত্রেরও একটা মিল আছে।

যদিও ব্যারনের অশ্বশালার অন্য সব ঘোড়ার একটা করে অর্থপূর্ণ নাম ছিল, তিনি কিন্তু এই ঘোড়াটার কোন নাম দেন নি। তার আস্তাবলটাও ছিল অন্য সব ঘোড়ার আস্তাবল থেকে অনেক দূরে; আর ঘোড়াটির ডলাই-মলাই ও অন্য সব কাজের ভারও মালিক নিজের কাঁধেই নিলেন, অন্য কারও হাতে ছেড়ে দিলেন না; এমন কি তিনি নিজে ছাড়া অন্য কেউ তার খুপড়িতে ঢুকতেও পারত না। আরও একটি লক্ষ্য করার মত বিষয় আছে। বার্লিফিজিং-এর আগ্নিকাণ্ড থেকে বাঁচবার জন্য ঘোড়াটি যেদিন পালিয়ে যাচ্ছিল সেদিন যে তিন অশ্বপাল তাকে ধরেছিল তারা সে কাজের জন্য ব্যবহার করেছিল শেকলের লাগাম ও ফাঁস—অথচ সেই তিন জনের একজনও নিশ্চয় করে বলতে পারে না যে সেই সময়ে বা তার পরবর্তী কালে ব্যারন কখনও সেই ঘোড়ার দেহটি কখনও স্পর্শ করেছেন।

ব্যারনের অনুচরবর্গের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যে এই দুর্ধর্ষ ঘোড়াটির প্রতি যুবক ব্যারনের অসাধারণ অনুরাগের ব্যাপারে তিলমাত্র সন্দেহ পোষণ করত; অন্তত কেবলমাত্র অতিসামান্য কদাকার বালক ভৃত্যটি ছাড়া অন্য কেউ তো নয়ই। তার শারীরিক বিকৃতি নিয়ে সকলেই নানা কথা বলে; আর তার মতামত কেউ কেউ বড় একটা গুরুত্ব দেয় না। কে জানে কোন্ দুঃসাহসে সেই বলেছিল, তার মালিক যখনই সেই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন তখনই তার শরীর অকারণেই ঈষৎ শিউরে ওঠে; আর যতবারই অভ্যাসগতভাবে দীর্ঘ পথ ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসেন ততবারই একটা উৎকট জয়োল্লাসে তার মুখের মাংসপেশীগুলি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

একদা ঝড়ের রাতে গাঢ় ঘুম থেকে জেগে উঠে মেজেংগারস্টিন পাগলের মত নেমে এলেন তার ঘর থেকে, আর তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চেপে উধাও হয়ে গেলেন বনের আড়ালে। এ ঘটনা তো হামেসাই ঘটে; তাই বিশেষ কারও নজরে পড়ল না; কিন্তু তার ফিরে আসার বিলম্ব দেখে বাড়ির সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবার পরে দেখা গেল মেজেংগারস্টিন প্রাসাদের ছাদের মনোহারী প্রাচীরগুলি একটা প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ফলে সশব্দে ভেঙে পড়ছে, আর প্রাসাদের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

আগুন যখন প্রথম চোখে পড়ে ততক্ষণে সেটা এতই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে যে প্রাসাদের কোন একটি অংশকে তার হাত থেকে রক্ষা করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। বিস্ময়াভিভূত প্রতিবেশীরা সহানুভূতিহীন ঔদাসীন্যে না হলেও নিষ্ক্রিয়ভাবেই নীরবে দাঁড়িয়ে দেখল। কিন্তু নতুন ও ভয়ংকর কিছু অচিরেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দূরের বন থেকে মেজেংগারস্টিন প্রাসাদের প্রধান ফটক পর্যন্ত প্রসারিত প্রাচীন ওক গাছের ছায়ায় ঢাকা দীর্ঘ পথ ধরে ঝড়ের গতিকেও অতিক্রম করে ছুটে আসছে একটি ঘোড়া, তার পিঠে টুপিবিহীন বিপর্যস্ত এক আরোহী।

অশ্বারোহী যে নিয়ন্ত্রণাতীত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ

নেই। তার মুখের যন্ত্রণা, সারা দেহের ক্লান্তি এক অমানবিক পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করছেঃ কিন্তু একটি মাত্র আর্তস্বর ছাড়া তার রক্তাক্ত ছিন্ন ঠোঁট থেকে আর কোন শব্দই উচ্চারিত হল না; তীব্র ভয়ে দুই ঠোঁটকে দাঁতে চেপে ধরার ফলেই তার মুখের এই অবস্থা হয়েছে। মাত্র একটি মুহূর্ত! আগুনের লেলীহান শিখার গর্জন ও বাতাসের হাহাকারকে ছাপিয়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল অশ্বক্ষুরের কর্কশ খটাখট শব্দ—আর এক মুহূর্ত পরেই একলাফে প্রধান ফটক ও গড়খাই পার হয়ে ঘোড়াটি পেঁাছে গেল প্রাসাদের ভেঙে-পড়া সিঁড়ির উপরে এবং সওয়ারকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘূর্ণিবাত্যাতাড়িত লেলিহান অগ্নির গহ্বরে।

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঝড়; নেমে এল মৃত্যুর স্তব্ধতা। একটা সাদা আগুন বাড়িটাকে ঢেকে দিল শবাচ্ছাদনের মত, আর একটি অস্বাভাবিক আলো ছড়িয়ে পড়ল দূর হতে দূরান্তে; একটি মেঘ ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ছাদের উপরে গড়ে তুলল এক বিরাট মূর্তি—একটি ঘোড়া।

ছায়ামূর্তি—একটি নীতিগল্প

Shadow—A Parable

আপনারা যারা পাঠক তারা এখনও বেঁচে আছেনঃ কিন্তু আমি যে লেখক সে অনেক দিন আগেই ছায়ার দেশে চলে গিয়েছি। আমার এই স্মৃতিকথা মানুষের চোখে পড়ার আগে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটবে, অনেক গোপন কথা প্রকাশ পাবে, অনেক শতাব্দী পার হয়ে যাবে। আর যখন চোখে পড়বে তখনও কেউ অবিশ্বাস করবে, কেউ সন্দেহ করবে, আবার লোহার স্টাইলাস দিয়ে যে অক্ষরগুলি খোদাই করছি তার মধ্যে কেউ কেউ খুঁজে পাবে অনেক চিন্তার খোরাক।

সেটা ছিল এক ত্রাসের বছর, এবং ত্রাসের চাইতেও তীব্রতর এমন এক অনুভূতির যার কোন নাম আজও পৃথিবীতে দেওয়া হয় নি। অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটেছে, অনেক লক্ষণ দেখা দিয়েছে, এবং জলে-স্থলে, দূরে-নিকটে সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে মহামারীর কালো পাখা। যাদের কপাল ভাল তারা এখনও জানে না যে স্বর্গভূমিতে এই রোগের ছায়া পড়েছে; আর আমি—গ্রীক ওইনসও স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, সাতশ' চুরানব্বইতম বছরের সেই কল্পান্ত-কাল আবার ফিরে এসেছে যখন মেষরাশির সঞ্চারের ফলে বৃহস্পতি যুক্ত হয়েছে ভয়ংকর শনির রক্ত-বলয়ের সঙ্গে। আমি যদি খুব বেশী ভুল না করে থাকি, দূর আকাশের এই সব শক্তির প্রভাব যে কেবল পৃথিবীর বলয়ের উপর পড়েছে তাই নয়, পড়েছে মানুষের কল্পনা ও ধ্যানের উপরেও।

টোলেমাইস নামের এক শহরের একটি বড় হলের চার দেওয়ালের মধ্যে একদা রাত্রে আমরা সাতজন বসেছিলাম লাল চীনা মদের বোতল সামনে নিয়ে। একটা পিতলের উঁচু

দরজা ছাড়া ঘরে ঢোকার আর কোন পথ ছিল না। দরজাটি তৈরী করেছিল কারিগর করিনোস; তার এমনই কলাকৌশল যে ভিতর থেকেই বন্ধ হয়। ছায়া-ছায়া ঘরের কালো পর্দা আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল চাঁদ, তারা, আর জনহীন পথঘাট—কিন্তু আড়াল করতে পারে নি অশুভের পূর্বলক্ষণ ও স্মৃতিকে। আমাদের চারদিকে এমন কিছু বাস্তব ও অবাস্তব—ঘুরে বেড়াচ্ছিল যার কোন স্পষ্ট বিবরণ আমি দিতে পারব না। একটা পাষাণভার যেন আমাদের উপর ঝুলছিল। ঝুলছিল আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর—ঘরের আসবাবপত্রের উপর—আমাদের পানপাত্রগুলির উপর; সব কিছুই যেন সেই ভারের চাপে ক্রমশ নীচে নামছিল—শুধু মাথার উপরকার সাতটি লোহার বাতি-দান যেখানে ছিল সেখান থেকেই লম্বা, সরু আলোর রেখা ছড়িয়ে স্থির হয়ে জ্বলতে লাগল; নীচের যে গোলাকার আবলুস কাঠের টেবিলটাকে ঘিরে আমরা বসেছিলাম তার উপর সেই আলোর রেখাগুলো পড়ে একটা আয়নার সৃষ্টি হল, আর সেই আয়নার মধ্যে আমরা প্রত্যেকে দেখতে পেলাম নিজ নিজ মুখ ও সঙ্গীদের আনত চোখের অস্থির দৃষ্টি। তথাপি আমরা হাসতে লাগলাম এবং উৎকট আনন্দে মেতে উঠলাম; অ্যানাক্রিয়নের যে সব গান গাইতে লাগলাম সে তো পাগলামিরই নামান্তর; আর লাল মদ রক্তের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও আমরা সেই মদে ডুবে গেলাম। আমাদের ঘরে আরও একজন বাসিন্দা ছিল—সে যুবক যৈলাস। শবাচ্ছাদনে ঢাকা তার মৃতদেহটি ছিল সটান শায়িত—সে দৃশ্যের খলনায়ক সে। হায়! আমাদের হৈ-হুল্লোড়ে সে কোনরকম অংশ নেয় নি, কেবল তার প্লেগবিকৃত মুখ এবং মৃত্যুর স্পর্শে অর্ধবিকৃত চোখ দুটি দেখে মনে হল, সে বুঝি আমাদের এই আমোদ-প্রমোদের ঠিক ততখানি আগ্রহ দেখিয়েছে যতখানি আগ্রহ একটি মৃত ব্যক্তি দেখাতে পারে আসন্নমৃত্যু একদল মানুষের আমোদ-প্রমোদে। যদিও আমি ওইনস বুঝতে পারছিলাম যে মৃতের চোখ দুটি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে, তবুও আমি যেন জোর করেই সেই তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে বুঝতে চাইলাম না; বরং আবলুস কাঠের আয়নার গভীরে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঁচু গম্ভীর গলায় গাইতে লাগলাম টীয়স-পুত্রের গানগুলি। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার গান থেমে গেল; তার প্রতিধ্বনি ঘরের লোমের পর্দার উপর দিয়ে পাক খেতে খেতে দুর্বল ও অস্পষ্ট হতে হতে দূরে—বহুদূরে মিলিয়ে গেল। আরে! ও কী! যে পর্দার ভিতরে গানের কথাগুলি মিলিয়ে গেল, সেখান থেকেই বেরিয়ে এল একটি কালো অস্পষ্ট ছায়া-মূর্তি—চাঁদ যখন আকাশ থেকে নীচে নেমে আসে তখন সেই পারে একটি মানুষের মূর্তি থেকে তেমন একটি ছায়ামূর্তি গড়তে; কিন্তু সে ছায়ামূর্তি কোন মানুষের নয়, দেবতার নয়, কোন পরিচিত কারওই নয়। কিছুক্ষণ পর্দার আড়ালে নড়াচড়া করে শেষ পর্যন্ত সে এসে দাঁড়াল পিতলের দরজার সামনে। কিন্তু সে ছায়া-মূর্তি আবছা ও অস্পষ্ট—না মানুষের, না দেবতার—গ্রীসের দেবতার নয়, ফ্যালু-ডিয়ার দেবতার নয়, মিশরের দেবতারও নয়। ছায়ামূর্তি খিলানের নীচে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল, একটু নড়ল না, একটা কথাও বলল না, এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যতদূর মনে পড়ে, দরজাটা ছিল যুবক যৈলাসের আচ্ছাদিত শবদেহের পায়ের কাছে। কিন্তু আমরা যে সাতজন সেখানে ছিলাম তাদের কারওই চোখ মেলে

ছায়ামূর্তিকে দেখার সাহস ছিল না, চোখ নীচু করে তাকিয়ে রইলাম আবলুস কাঠের আয়নার গভীরে। শেষ পর্যন্ত আমি, ওইনাসেই, নীচু গলায় কথা বললাম, ছায়ামূর্তির নাম—ঠিকানা জানতে চাইলাম। ছায়ামূর্তি উত্তর দিল, "আমি ছায়ামূর্তি, ময়লা জলের কেরোনিয়াম খালের তীরবর্তী হেলুসিয়ন প্রান্তরের নিকটস্থ টোলেমাইস সমাধিক্ষেত্রের কাছে আমার বাস।" তখন আমরা কি করলাম—আতংকে আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলাম ; ছায়ামূর্তির কণ্ঠস্বর কোন একটি জীবের কন্ঠস্বর নয়, অসংখ্য মানুষের কণ্ঠস্বর নানা বিচিত্র সুরে ও লয়ে মিলেমিশে আমাদের কানে ধ্বনিত হল হাজার হাজার প্রয়াত বন্ধুর ভুলে-না-যাওয়া পরিচিত স্বরাঘাতে।

নৈঃশব্দ্য—একটি উপকথা

Silence—A Fable

আমার মাথায় হাত রেখে দৈত্য বলল, "কান পেতে শোন। যে জায়গার কথা আমি বলছি সেটা লিবিয়ার একটি মরুভূমি অঞ্চল—জাইরে নদীর তীরে অবস্থিত। সেখানে কোন নিস্তব্ধতা নেই, কোন নৈঃশব্দ নেই।

"জাফরান রংয়ের নদীর জল সাগরের দিকে বয় না সূর্যের রক্ত-চক্ষুর নীচে চিরদিন চিরকাল এক উত্তাল গতিতে অবিরাম উথাল-পাতাল করে। নদীর দুই কুলের সরস জমি থেকে দুই দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে বিরাট আকারের কুমুদফুলের এক বিবর্ণ মরুভূমি। সেই নির্জনতায় তারা একে অন্যকে দেখে নিঃশ্বাস ফেলে, আর দীর্ঘ কদাকার গলাকে আকাশের দিকে মেলে ধরে এদিক-ওদিক মাথা দোলায়। মাটির নীচ থেকে উৎসারিত ঝর্ণাধারার মত তাদের ভিতর থেকেই উঠে আসে একটা অস্পষ্ট কুলকুল ধ্বনি। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

"কিন্তু তাদের রাজ্যেরও একটা সীমানা আছে—কালো ভয়ংকর, সুউচ্চ অরণ্যের সীমানা। হেব্রাইডিসের ঢেউয়ের মতই সেখানেও নীচু ঝোঁপঝাড় অবিরাম আন্দোলিত হয়। কিন্তু আকাশে কোথাও এতটুকু বাতাস নেই। অথচ আদ্যিকালের দীর্ঘ বৃক্ষরাজি কড় কড় শব্দে চিরকাল এদিক ওদিকে দোলে। তাদের মাথার উপর থেকে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরে চির-শিশিরবিন্দু। আর তাদের শেঁকড়ের নীচে আশ্চর্য সব বিষ-ফুল জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে থাকে। আর মাথার উপরে ধূসর মেঘের দল জোরালো খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে চিরকাল ছুটে চলে পশ্চিমদিক পানে ; তারপর জলপ্রপাতের মত ভেঙে পড়ে দিগন্তের রক্তরাঙা প্রাচীরের উপর। কিন্তু কোন বাতাস সেখানে বয় না। আর জাইরে নদীর তীরে তীরে নেই নিস্তব্ধতা, নেই নৈঃশব্দ্য।

"তখন রাত্রিকাল ; বৃষ্টি পড়ছিল ; যখন পড়ছিল তখন ছিল বৃষ্টি, কিন্তু পরে তা হয়ে গেল রক্ত। আমি দাঁড়িয়েছিলাম লম্বা কুমুদ লতার মাঝখানে বিলান জমিতে ; আমার মাথায় বৃষ্টি পড়ল—আর নির্জনতার শোকে কুমুদ ফুলেরা একে অন্যের দিকে নিঃশ্বাস ফেলল।

"হঠাৎ পাতলা, ভৌতিক কুয়াসার ভিতর দিয়ে চাঁদ উঠল ; চাঁদের রংও লাল হয়ে গেল। আর নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বড় ধূসর পাহাড়ের উপর আমার চোখ পড়ল ; চাঁদের আলো পড়েছে তার গায়। পাহাড়টা ধূসর, বিবর্ণ ও উঁচু—আর পাহাড়ের সামনে পাথরের উপর অনেক অক্ষর খোদাই করা ; কুমুদ ফুলের বিলান জমির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি তীরের কাছে পৌঁছে গেলাম যাতে পাথরে লেখা অক্ষরগুলি পড়তে পারি। কিন্তু পড়তে পারলাম না। আবার বিলান জমির দিকেই ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় চাঁদ উঠল পুরোপুরি লাল হয়ে ; মুখ ঘুরিয়ে আবার পাহাড়ের দিকে তাকালাম, অক্ষরগুলির দিকে তাকালাম ; লেখা আছে—নিঃসঙ্গতা।

"উপরে তাকালাম ; পাহাড়ের চূড়ায় একটি মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি কি করে দেখবার জন্য কুমুদলতার মধ্যে লুকিয়ে পড়লাম। লোকটির চেহারা দীর্ঘ ও দশাসই, কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত প্রাচীন রোমের টোগায় ঢাকা। তার দেহ-রেখা অস্পষ্ট—কিন্তু দেহসৌষ্ঠব দেবতার মত ; রাতের স্বচ্ছ আবরণ, কুয়াসার স্বচ্ছ আবরণ, আর চাঁদ ও শিশিরের স্বচ্ছ আবরণ তার মুখশ্রীকে ঢাকতে পারে নি। তার ভুরু চিন্তায় উন্নত। তার চোখ উৎকণ্ঠায় উদ্‌ভ্রান্ত ; তার চিবুকের স্বল্প কয়েকটি ভাঁজের মধ্যেই পড়তে পারলাম দুঃখের উপকথা—ক্লান্তি, মানুষের প্রতি বিরক্তি, আর নির্জনতার কামনা।

"আর লোকটি পাহাড়ের উপর বসে আছে ; হাতের উপর মাথাটি হেলানো, তাকিয়ে আছে জনশূন্য প্রান্তরের দিকে। নীচের অশান্ত ঝোঁপঝাড়ের দিকে তাকাল, উপরে দীর্ঘ প্রাচীন বৃক্ষরাজির দিকে তাকাল। আরও উপরে তাকিয়ে দেখল আকাশ আর রক্তিম চাঁদ। আর আমি কুমুদলতার আশ্রয় থেকে লোকটির কাজকর্ম দেখতে লাগলাম। আর লোকটি সেই নির্জনতায় কাঁপতে লাগল ; কিন্তু রাত শেষ হয়ে আসছে ; লোকটি পাহাড়ের উপরেই বসে রইল।

"তখন আমি বিলান জমির ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে চলে গেলাম জলার ধারে যেখানে জলহস্তীরা বাস করে। আমি তাদের ডাকলাম, আর আমার ডাক শুনে জলহস্তীরা বেরিয়ে এসে পাহাড়ের পাদদেশে চাঁদের নীচে দাঁড়িয়ে ভয়ংকরভাবে গর্জন করতে লাগল। লোকটি তখনও নির্জনতায় কাঁপছে ; কিন্তু রাত বাড়ছে, আর সেও পাহাড়ের উপর বসে আছে।

"তখন আমি প্রকৃতিকে উন্দামতার অভিশাপ দিলাম ; আর অমনি একটা ভয়ংকর ঝড় উঠল আকাশে, অথচ একটু আগেও সেখানে এতটুকু বাতাস ছিল না। ঝড়ের দাপাদাপিতে আকাশ সীসের বর্ণ ধারণ করল—লোকটির মাথায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে লাগল—নদীতে বন্যা দেখা দিল—আর নদী ফেনায় ফেনায় উদ্বেল হয়ে উঠল—কুমুদ ফুলেরা

আর্তনাদ করে উঠল—ঝড়ের সামনে ভেঙে পড়ল গাছ—বজ্র গর্জে উঠল— আর বিদ্যুৎ চমকাল—পাহাড়ের ভিত্তি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। নিজের আশ্রয়স্থলে থেকেই আমি লোকটির কার্যকলাপ দেখতে লাগলাম। লোকটি নির্জনতায় কাঁপছে ;—কিন্তু রাত বাড়ছে, আর সে বসে আছে পাহাড়ের উপর।

“তখন আমি রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলাম, নৈঃশব্দের অভিশাপ, অভিশাপ দিলাম নদীকে, কুমুদকে, বাতাসকে, অরণ্যকে, আকাশকে, বজ্রকে ও কুমুদের দীর্ঘশ্বাসকে। অভিশাপগ্রস্থ হয়ে তারা গতিহীন স্থির হয়ে গেল। চাঁদ আর কেঁপে কেঁপে আকাশের পথে হাঁটে না—বজ্র মরে গেল—বিদ্যুৎ চমকাল না—মেঘেরা নিশ্চল ঝুলে রইল—জল নীচে নেমে গেল—গাছরা আর দোলে না—কুমুদরা ফেলে না দীর্ঘশ্বাস—সীমাহীন বিশাল মরুভূমিতে শব্দের ছায়াটুকুও পড়ে না। আবার পাহাড়ের অক্ষরগুলির দিকে তাকালাম ; সেগুলি বদলে গেছে ; ফুটে উঠেছে নতুন লেখা—নৈঃশব্দ।

“আর আমার চোখ পড়ল লোকটির মুখের উপর, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। অতি দ্রুত সে হাতের উপর থেকে মাথা তুলল, উঠে দাঁড়িয়ে কান পাতল। কিন্তু সীমাহীন বিলান মরুভূমিতে কোন শব্দ ছিল না, আর পাহাড়ের গায়ে লেখা ছিল—নৈঃশব্দ। লোকটি শিউরে উঠে মুখ ফেরাল ; তারপর দ্রুতপায়ে অনেক দূরে চলে গেল ; আর তাকে দেখতে পেলাম না।”

এখন ম্যাগির বইতে অনেক ভাল ভাল গল্প আছে—ম্যাগির লোহা-বাঁধানো বিষণ্ণ সব পুঁথিতে। আমি বলছি, তাতে আছে আকাশের, পৃথিবীর এবং মহাসাগরের গৌরবময় ইতিহাস—আছে সেই সব জীনদের কথা যারা শোসন করত সমুদ্র, পৃথিবী, আর উঁচু আকাশকে। সাইবিলস্‌ও বলে গেছে অনেক কাহিনী। সেকালের আরও অনেক ভাল ভাল কথা আছে পুরনো পুঁথির পাতায়—কিন্তু, আল্লাহর দোয়ায়—কবরের পাশে বসে যে উপকথাটি দৈত্য আমাকে বলেছিল সেটাকেই আমি সব চাইতে আশ্চর্য বলে মনে করি। গল্প শেষ করে দৈত্য আবার কবরের মুখের কাছে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠল। আর আমি তার সঙ্গে হাসতে পারলাম না বলে দৈত্য আমাকে অভিশাপ দিল। আর যে বনবিড়ালটি এতকাল কবরে বাস করত সে কবর থেকে বেরিয়ে এসে দৈত্যের পায়ের কাছে শুয়ে পড়ে এক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জেরুজালেমের কাহিনী

A Tale of Jerusalem

তিন হাজার নয়শ' একচল্লিশ বিশ্বাব্দের তামুজমাসের দশম দিবসে বুজি-বেন-লেভি ও ফ্যারিসীয় সাইমিয়নকে আবেল—ফিস্তিম বলল, “চল, আমরা দ্রুত চলে যাই বেঞ্জামিন ফটক সংলগ্ন দুর্গপ্রাকারে। সেটা ডেভিডের শহর, আর কাফেরদের শিবির

সেখান থেকে দেখাও যায়। এটাই চতুর্থ প্রহরের শেষ ঘণ্টা—সূর্যোদয়ের ক্ষণ; পম্পের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পৌত্তলিকরা নিশ্চয় কুরবানির ভেড়া নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।”

সাইমিয়ন, আবেল—ফিস্তিম ও বুজি-বেন-লেভি তিনজনই পবিত্র শহর জেরুজালেমের গিজবারিম, বা কুরবানির উপ-সংগ্রহকারী।

ফ্যারিসীয় বলল, “তাড়াতাড়ি চল; কারণ এই পৌত্তলিকরা উদারতায় অভ্যস্ত নয়, আর বাল-পূজারীদের পক্ষে চপলমতিত্ব তো চিরদিনই একটা গুণবিশেষ।”

বুজি-বেন-লেভি বলল, ‘তারা চপলমতি আর বিশ্বাসহন্তা এ কথা সত্য, কিন্তু সে কেবল এডোনইয়ের লোকদের ব্যাপারে। কে কবে শুনেছে যে এমোনাইটরা নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে উদাসীন? আমি তো মনে করি, আল্লাহর বেদীর জন্য আমাদের হাতে কয়েকটা ভেড়া তুলে দিয়ে তার বিনিময়ে মাথাপ্রতি ত্রিশ শেকেল কামানোটা খুব একটা উদারতার পরিচায়ক নয়।”

আবেল ফিস্তিম বলল, “তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ বেন-লেভি, এই ভাবে আল্লাহর বেদীর জন্য ক্রীত ভেড়াগুলিকে আমরা যে দেহের ক্ষুধা মেটাবার কাজে লাগাব না তার কোন নিশ্চয়তা কিন্তু রোমক পম্পেকে দেওয়া হয় নি।”

প্যারিসীয় এবার চীৎকার করে বলল, “মোল্লা হিসাবে যে দাঁড়ি কামানো আমার পক্ষে নিষিদ্ধ তার পাঁচটি কোণের দোহাই!—আমরা কি সেই দিনটির অপেক্ষায়ই বেঁচে আছি যেদিন রোমের এক পাপাচারী পৌত্তলিক হঠাৎ নবাব আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করবে যে পবিত্র দ্রব্যসামগ্রিকে আমরা নিজেদের দেহের ক্ষুধা মেটাবার উদ্দেশ্যে আত্মসাৎ করব? আমরা কি সেই দিনটির অপেক্ষায় বেঁচে আছি যেদিন”—

আবেল ফিস্তিম বাধা দিয়ে বলল, “ফিলিস্তিমির অভিপ্রায় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন আমরা করব না, কারণ আজই প্রথম তার লোভ অথবা উদারতার দ্বারা আমরা লাভবান হচ্ছি; বরং চল তাড়াতাড়ি আমরা প্রাকারের কাছে পৌঁছে যাই যাতে সেই মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় নৈবেদ্যের অভাব না ঘটে যার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা আকাশের বৃষ্টিধারা নেভাতে পারে না, যার ধোঁয়ার স্তম্ভকে কোন ঝড় স্থানচ্যুত করতে পারে না।”

আমাদের উপযুক্ত গিজবারিম শহরের যে অংশে গিয়ে উপনীত হল, যার সঙ্গে জড়িত স্থপতি রাজা ডেভিডের নাম, সেটাকেই মনে করা হয় জেরুজালেমের সব চাইতে সুরক্ষিত অঞ্চল, কারণ সেটা অনেক উঁচু ও খাড়া জিয়ন পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানে পাথর কেটে তৈরী করা প্রশস্ত গভীর পরিখাটিকে আরও সুরক্ষিত করা হয়েছে তার ভিতরের তীরবরাবর একটি দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিয়ে। সেই প্রাকারের মাঝে মাঝে বসানো হয়েছে শ্বেত পাথরের চতুষ্কোণ গম্বুজ; সব চাইতে নীচু গম্বুজটির উচ্চতা ষাট হাত, আর সবচাইতে উঁচুটি একশ বিশ হাত। সুতরাং সাইমিয়ন ও তার সঙ্গীরা যখন জেরুজালেমের সব চাইতে উঁচু এড্‌মি-বেজেক গম্বুজের মাথায় পৌঁছে গেল তখন তারা যে উচ্চতা থেকে নীচের শত্রুশিবিরের দিকে তাকাল সেটা কিয়পুসের পিরামিড অপেক্ষা অনেক ফুট এবং বেলুস মন্দির অপেক্ষা কয়েক ফুট বেশী উঁচু।

মাথা ঘুরে যায় এতটা উঁচু থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে ফ্যারিসীয় দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলে বলল, "সত্যি, কাফেররা তো সাগর-বেলায় বালুকণার সমতুল—বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পঙ্গপালের মত। রাজোর উপত্যকা হয়ে উঠেছে এডোমিনের উপত্যকা।"

এই সময় একটি রোমক সৈনিক কর্কশ গলায় চীৎকার করে বলল, 'রৌপ্য মোকেলের ঝুড়িটা নীচে নামিয়ে দাও! যে মুদ্রাটির নাম উচ্চারণ করতে এক রোমক মহাপুরুষের চোয়াল ভাঙার জো হয়েছিল সেই অভিশপ্ত মুদ্রাসমেত ঝুড়িটা নামিয়ে দাও! আমাদের প্রভু পম্পেয়ুস যে দয়া করে তোমাদের পৌত্তলিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠান শুনতে রাজী হয়েছেন, সেজন্য তোমাদের কৃতজ্ঞতাকে কি তোমরা এইভাবেই জানাতে চাও? সত্যিকারের দেবতা ফীবুস এক ঘন্টা হল তার রথে চড়েছেন—সুর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই কি দুর্গ-প্রাকারে সমবেত হওয়া উচিত ছিল না? ঈডিপোল! তোমরা কি মনে কর পৃথিবীর কুত্তাদের সঙ্গে লেন-দেন চালাবার জন্য প্রতিটি কুকুরশালার বেড়ার ধারে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আমাদের আর কোন কাজ নেই? নামিয়ে দাও! আমি বলছি—আর দেখো, তোমাদের বাজে জিনিসগুলোর রং যেন ভাল হয়, আর ওজনটাও ঠিক থাকে!"

"এলু এলোহিম!" আবেগের সঙ্গে কথাটা উচ্চারণ করেই ফ্যারিসীয় মুর্ছিত হয়ে মন্দিরের গায়ে ঢলে পড়ল—এলু এলোহিম!—দেবতা ফীবুস কে?—পাপী লোকটা কার কথা বলছে! তুমি বুজি-বেন-লেভি, তুমি তো জেন্টিলদের পুঁথিপত্র পড়েছ, টেরাফিমদের দেশে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছ!—ঐ পৌত্তলিক কি নেরগালের কথা বলছে?—অথবা আসিমাহ?—অথবা নিভাঁজ?—অথবা টার্টাক?—অথবা এড্রামালেচ?—অথবা এনামালেচ?—অথবা সুকোথ-বেনিথ?—অথবা ডাগন?—অথবা বেলিয়াল?—অথবা বাল-পিওর?—অথবা বালজিবাবের কথা?"

"কোনটাই নয়—কিন্তু সাবধান! দড়িটাকে বড় বেশী দ্রুত আঙুলের ফাঁক দিয়ে ছাড়ছ; কারণ ঝুড়িটা যদি ওই মুখ বের করা পাথরের গায়ে ধাক্কা খায় তাহলে সব পবিত্র মাল উল্টে পড়ে যাবে।"

কোন-রকমে বানানো যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারী ঝুড়িটাকে সযত্নে নামিয়ে দেওয়া হল নীচের জনতার মাঝখানে; কিন্তু অত উঁচুতে থাকার জন্য এবং কুয়াসা জমে ওঠার জন্য রোমকদের কাজকর্ম ভালভাবে দেখা গেল না।

আধঘণ্টা কেটে গেল।

অনেক নীচে চোখ রেখে ফ্যারিসীয় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "আমাদের অনেক দেরী হয়ে যাবে! কাঠোলিম আমাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করবে।"

আবেল ফিত্তিমও সায় দিয়ে বলল, "দেশে আর আমাদের খাওয়া জুটবে না—দাড়িতে আর আতর লাগাতে পারব না—মন্দিরের সুক্ষ্ম বস্ত্র আর কোমরে জড়াতে পারব না।"

বেন-লেভি গালাগাল দিয়ে উঠল, "অপদার্থ! ওরা কি আমাদের টাকাটা মেরে দেবে নাকি? অথবা, হায় পবিত্র মোজেস! ওরা কি গির্জার শেকেলগুলি ওজন করছে না কি?

শেষ পর্যন্ত ফ্যারিসীয় চেঁচিয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত ওরা সংকেত দিয়েছে।—টেনে তোল আবেল-ফিত্তিম!—আর তুমি বুজি-বেন-লেভি তুমিও টান!"

গিজবারিম টানতে শুরু করল ; ক্রমবর্ধমান কুয়াসার ভিতর দিয়ে তাদের বোঝাটা দুলতে দুলতে উপরে উঠতে লাগল।

এক ঘণ্টা পরে দড়ির অপর প্রান্তে একটা কিছু দেখতে পেয়েই বেন-লেভি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল, "বুশোহ্ হে ! বুশোহ্ হে !"

"বুশো হে !—কী লজ্জার কথা !—এটা তো দেখছি এঙ্গোডির জঙ্গল থেকে আনা একটা ভেড়া, জেহোসাকাটি উপত্যকার মতই লোমশ !"

আবেল ফিত্তিম বলল, "এটা তো একেবারে বাচ্চা ! ওর ঠোঁটের ডাক আর পায়ের ভাঁজ দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। ওর চোখ দুটো পেক্টোরালের মুক্তোর চাইতেও সুন্দর, আর মাংসও হেব্রনের মধুর মত।"

ফ্যারিসীয় বলল, "বালনের চারণভূমি থেকে এটাকে আনা হয়েছে। পৌত্তলিকরা আমাদের সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করেছে !—এস, আমরা সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করি !—ধন্যবাদ জানাই তারের যন্ত্রে—বীণার তারে অন্য সব বাদ্যযন্ত্রের সুরে !"

ঝুড়িটা গিজ্‌বারিমের কয়েক ফুট নীচে পৌঁছতেই আঁতকে উঠে সকলে দেখতে পেল, ঝুড়িতে রয়েছে একটা বড়সড় শুয়োরের বাচ্চা।

তিনজনেরই চোখ উল্টে গেল। "এবার এল্ এমনু !" তিনজন একসঙ্গে কথাগুলি বলে হাতের দড়িটা ছেড়ে দিল। শূকর-শাবকটি শটান নেমে গিয়ে ছিটকে পড়ল ফিলিস্তিনদের মধ্যে। "এল্ এমানু !—ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন !—এ মাংসের নাম তো মুখেও আনা যাবে না !"

আয়তাকার বাক্স

The oblong Box

কয়েক বছর আগে চার্লস্টন, এস.-সি. থেকে নিউ ইয়র্ক শহরে যাবার জন্য আমি টিকিট কেটেছিলাম ক্যাপ্টেন হার্ডির সুন্দর ডাক-জাহাজ "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স"-এ। মাসের (জুন) পনেরো তারিখে আমাদের যাত্রা করার কথা, অবশ্য আবহাওয়া যদি ভাল থাকে। আমার আলাদা শয়ন-কক্ষের কিছু বিধি-ব্যবস্থা করার জন্য চোদ্দ তারিখে একবার জাহাজে গেলাম।

দেখলাম, আমাদের সঙ্গে অনেক যাত্রী যাচ্ছে ; তার মধ্যে মহিলার সংখ্যাটাই একটু বেশী। যাত্রী-তালিকায় আমার কয়েকজন পরিচিতও ছিল ; অন্য অনেকের মধ্যে তরুণ শিল্পী মিঃ কর্ণেলিয়াস ওয়াটের নামটা দেখে খুব খুশী হলাম ; সে আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সি—বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহপাঠী ছিল ; তখনই আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সে ছিল প্রতিভাসুলভ সাধারণ মেজাজের মানুষ—মানুষের প্রতি

ঘৃণা, অনুভূতিপ্রবণতা ও উদ্যমের একটি সংমিশ্রণ। এই সব গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একটি উষ্ণ ও আন্তরিক বিরল হৃদয়।

দেখলাম, তিনটি শয়ন-কক্ষে তার নামের কার্ড লাগানো রয়েছে; আর একবার যাত্রী-তালিকায় চোখ বুলিয়ে দেখলাম সে টিকিট কেটেছে নিজের, স্ত্রীর, ও দুই বোনের জন্য। শয়ন-কক্ষগুলি বেশ বড়, দুটো করে বার্থ আছে—একটার উপর আরেকটা। অবশ্য বার্থগুলি এত বেশী ছোট যে একজনের বেশী লোক ধরে না। আমি বুঝতে পারলাম না, চারজনের জন্য তিনটে শয়ন-কক্ষ কেন। সেই সময় আমার মনের এমন একটা অবস্থা চলছিল যখন মানুষ তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অতিমাত্রায় কৌতূহল বোধ করে ঃ তাই লজ্জার সঙ্গেই স্বীকার করছি, শয়ন-কক্ষের এই সংখ্যার গরমিল নিয়ে নানাবিধ অশালীন ও অসঙ্গত জল্পনা-কল্পনা আমার মনের মধ্যে ভীড় করল। নিশ্চয়ই সে কাজটা আমার করার কথা নয়, তবু এই সমস্যার সমাধানের চিন্তায়ই আমি যেন ডুবে গেলাম। অবশেষে এমন একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যার কথা ভেবে আমি নিজেই অবাক হয়ে গেলাম, কেন এটা আগেই আমার মাথায় আসে নি। নিজেকেই বললাম, “চতুর্থ লোকটি চাকরই হবে। আমি কী বোকা! আরও আগেই এমন সরল সমাধানটা আমার মনেই আসে নি। “আবার যাত্রী-তালিকার কাছে ফিরে গেলাম—পরিষ্কার দেখলাম সে-দলের সঙ্গে কোন চাকর যাচ্ছে না; যদিও আসলে একটি চাকর সঙ্গে নেবার কথাই ছিল—কারণ প্রথমে “এবং চাকর” কথাটা লিখে পরে সেটা কেটে দেওয়া হয়েছে। নিজের মনেই বললাম, “নির্ঘাৎ কোন বাড়তি মালপত্র, যা সে নিজের চোখের সামনে রাখতে চায়—মাদ-গুদামে রাখতে চায় না—আরে, এই তো পেয়ে গেছি—একটা ছবি বা ঐ রকম কিছু—ইতালীয় ইহুদি নিকোলিনোর সঙ্গে এই নিয়েই তো দর-কষাকষি হচ্ছিল।” কথাটা মনে ধরল, এবং আপাতত কৌতূহলটাকে মন থেকে সরিয়ে দিলাম।

ওয়াটের বোন দুটিকে আমি ভালই চিনতাম, খুব অমায়িক ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। তার স্ত্রীটি সদ্যবিবাহিতা, এখনও তাকে দেখি নি। তার কথা অনেক সময়ই বলেছে, এবং বেশ উৎসাহসহকারেই বলেছে। তার বর্ণনামতে স্ত্রীটি অতুলনীয়া সুন্দরী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী। সুতরাং তার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহও বেশ ছিল।

যেদিন আমি জাহাজে গিয়েছিলাম (চোদ্দই) ওয়াটও তার দল নিয়ে সেদিন সেখানে আসবে এ রকম কথা ছিল—ক্যাপ্টেন আমাকে তাই জানিয়েছিলেন—এবং নববধূর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমি এক ঘণ্টা বেশী সময় জাহাজে অপেক্ষাও করলাম, কিন্তু তখনই ক্ষমা ভিক্ষা করে একটা চিঠি এল। “মিসেস ডব্লু একটু অসুস্থ হয়ে পড়ায় আগামীকাল জাহাজ ছাড়ার সময়ের আগে জাহাজে উপস্থিত হতে পারছেন না।”

আগামীকাল এল। আমি হোটেল থেকে জাহাজ-ঘাটের উদ্দেশে রওনা হব এমন সময় ক্যাপ্টেন হার্ডি আমার সঙ্গে দেখা করে জানালেন, “বিশেষ কোন অবস্থার জন্য তিনি স্থির করেছেন দু'একদিনের মধ্যে “ইণ্ডিপেণ্ডেন্স” যাত্রা শুরু করবেন না, আর সব কিছু ঠিক হয়ে গেলে তিনি নিজেই আমাকে দিন-ক্ষণ জানাবেন।”

আমি খুব অবাক হলাম, কারণ কড়া দক্ষিণমুখী বাতাস তখন বইছিল। তবু

বাড়ি ফিরে গিয়ে বসে বসে আমার ধৈর্যহীনতাকে হজম করা ছাড়া আর কিছুই আমার করার ছিল না।

প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে প্রত্যাশিত খবরটি পেলাম না। শেষ পর্যন্ত সেটা এল, আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে গিয়ে হাজির হলাম ; জাহাজে যাত্রীর ভীড় জমে গেছে ; চারদিকে নানা রকম হৈ-হট্টগোল। আমি উপস্থিত হবার দশ মিনিটের মধ্যেই ওয়াটের দলও এসে পড়ল। দলে দুই বোন, নববধূ, আর শিল্পী—শেষোক্ত লোকটির সেই চিরাচরিত মানববিদ্বেষী মেজাজ। সে মেজাজ দেখতে আমি অভ্যস্ত, তাই সেটাকে বিশেষ আমল দিলাম না। এমন কি স্ত্রীটিকেও সে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল না—এই সৌজন্যমূলক কাজটির দায় চাপল তার বোন মেরিয়ানের কাঁধে—বুদ্ধিমতী মিষ্টি মেয়েটি অল্প কয়েকটি কথায় আমাদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দিল।

মিসেস ওয়াটের মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। আমার অভিবাদন গ্রহণ করতে সে ঘোমটা তুলে নিল। স্বীকার করছি, আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মিসেস ওয়াটকে একটি সাধারণ-দর্শন স্ত্রীলোক বলেই আমার মনে হয়েছিল। আমি মনে করি, একেবারে কুৎসিত না হলেও তার কাছাকাছিরই মানুষ। তার পোশাকে, সজ্জায় অবশ্য অসাধারণ সুরুচির পরিচয় ছিল। তাই মহিলাটি যে বুদ্ধি ও মনের রমনীয়তার গুণেই আমার বন্ধুর হৃদয়কে মোহিত করেছিল সে বিষয়ে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। অল্প কয়েকটি কথা বলেই সে মিঃ ডব্লুকে নিয়ে তার শয়ন-কক্ষে চলে গেল।

আমার পুরনো কৌতূহল আবার ফিরে এল। এটা নিশ্চিত যে দলে কোন চাকর ছিল না। অতএব বাড়তি মালপত্রের খোঁজ করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই একটা আয়তাকার পাইন কাঠের বাক্স নিয়ে জাহাজ-ঘাটে একটা গাড়ি এসে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যাত্রা শুরু হল ; অচিরেই আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম।

আগেই বলেছি, বাক্সটা আয়তাকার। লম্বায় ছ'ফুট আর চওড়ায় আড়াই ফুট। আকারটাই অদ্ভুত। দেখেই বুঝলাম, আমি যা অনুমান করেছিলাম সেটাই ঠিক। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আমি আগেই অনুমান করেছিলাম, শিল্পী-বন্ধুটির বাড়তি মালপত্র অবশ্যই হবে কয়েকটি ছবি, অন্তত একটি ছবি ; কারণ আমি জানতাম, কয়েক সপ্তাহ ধরে সে নিকোলিনোর সঙ্গে দর-দাম করছিল ঃ—আর এখন এই যে বাক্সটা দেখছি আকার দেখলেই বোঝা যায় যে এতে লিওনার্দোর "শেষ ভোজ"-এর একটা কপি ছাড়া আর কিছু থাকতেই পারে না ; আর ফ্লোরেন্সে থাকাকালে পরিচিত তরুণ শিল্পী রুবিনির আঁকা এই "শেষ ভোজ" ছবির একটা কপিই কিছুদিন যাবৎ নিকোলিনোর কাছেই আছে বলেও আমি জানতাম। সুতরাং এ ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে বলেই আমি ধরে নিলাম। নিজের বুদ্ধির বহর দেখে নিজেই মুখ টিপে হাসলাম। এই প্রথম আমি জানলাম ওয়াট তার শিল্পগত কোন কথা আমার কাছেও গোপন রাখতে পারে।

অবশ্য একটা জিনিস আমাকে খুব গোলমালে ফেলে দিল। বাক্সটাকে বাড়তি শয়ন-

কক্ষে ঢোকান হল না। সেটাকে রাখা হল ওয়াটের ঘরে ; আর সেখানে সেটা রইল প্রায় গোটা মেঝে জুড়ে ; তাতে শিল্পী ও তার স্ত্রীর খুবই অসুবিধা হবার কথা ; তাছাড়া, যে আলকাতরা বা রং দিয়ে বড় বড় অক্ষরগুলি সেই বাক্সের উপর লেখা হয়েছিল তার থেকে একটা তীব্র, অবাঞ্ছিত, এবং আমার মতে বিশেষ বিরক্তিকর গন্ধ বের হচ্ছিল। বাক্সের ডালার উপর লেখা ছিল ঃ "মিসেস এডিলেড কার্টিস, আলবানি, নিউ ইয়র্ক। অবধায়ক কর্ণেলিয়াস ওয়াট, এস্কয়ার। এটা উপরের দিক। সাবধানে হতে লাগাতে হবে।"

এখন, আমি জানতাম আলবানির মিসেস এডিলেড কার্টিস হলেন শিল্পীর শাশুড়ি —কিন্তু পুরো ঠিকানাটাই আমার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হল ; আমাকে হতবুদ্ধি করাই যেন তার উদ্দেশ্য ; আমি তখনই মনস্থির করে ফেললাম, এই বাক্সটা ও তার ভিতরকার মালকে কোন মতেই আমার মানববিদ্বেষী বন্ধুর নিউইয়র্কস্থিত চেম্বার্স স্ট্রীটের স্টুডিয়োর আরও উত্তরে যেতে দেওয়া হবে না।

প্রথম তিন চার দিন আবহাওয়া বেশ ভালই চলল। যাত্রীরাও তাই খোশমেজাজে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। অবশ্য ওয়াট ও তার বোনদের ব্যতিক্রম বলেই মনে হল। বাকিদের সম্পর্কেও আমার ধারণা ভাল হল না। ওয়াটের আচরণকে আমি বিশেষ গুরুত্ব দেই না। তাকে একটু অতিরিক্ত বিষণ্ন মনে হল—কেমন যেন গুম হয়ে রইল—তার এই খামখেয়ালিপনার জন্য আমি প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। অবশ্য বোনদের ব্যাপারে আমি কোন অজুহাত দেখাতে পারব না। সমুদ্রযাত্রার অধিকাংশ সময়টাই তারা তাদের শোবার ঘরেই কাটাল ; বার বার বলা সত্ত্বেও অন্য যাত্রীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে রাজী হল না।

মিসেস ওয়াটকে অনেক বেশী প্রীতিপ্রদ মনে হল। আসলে সে খুব গল্পবাজ, আর সমুদ্রযাত্রায় সেটা তুচ্ছ করার মত প্রশংসাপত্র নয়। অধিকাংশ মহিলার সঙ্গেই তার বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল। আমাদের সব্বাইকেই সে বেশ ফুর্তিতে রাখল। আসলে কথাটা হল, অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম, মিসেস ডব্লু-র কথায় অন্যরা তার সঙ্গে সঙ্গে যত না হাসে তার চাইতে অনেক বেশী হাসে তাকে দেখে। ভদ্রজনরা তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলত না ; অচিরেই মহিলারা তার সম্পর্কে বলতে শুরু করল "মহিলার মনটি ভাল, তবে কিছুটা উদাসীন। পুরোপুরি অশিক্ষিত, এবং নিশ্চিতরূপে ইতরজন।" সব চাইতে অবাক লাগল, ওয়াট কেমন করে এহেন মালের খপ্পরে পড়ল। ধন-সম্পত্তি এ সমস্যার একটা সমাধান হতে পারত, কিন্তু ওয়াট আমাকে বলেছে মহিলাটি একটা ডলারও নিয়ে আসে নি, অথবা কোন সূত্রে পাবে এমন আশাও নেই। সে বলেছে, "সে বিয়ে করেছে ভালবাসার জন্য, শুধুই ভালবাসার জন্য, আর বউটি তার ভালবাসার তুলনায় যোগ্যতর।" এ সব কথা ভাবতেই আমি কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে যেতাম। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ ছাড়া আর কিই বা ভাবতে পারি? সে নিজে কত রুচিবান, বুদ্ধিমান, খুঁতখুঁতে স্বভাব, আর সৌন্দর্যের এত বড় সমঝদার! এটা ঠিক যে মহিলাটি তাকে বিশেষ পছন্দ করত—সব কথা প্রসঙ্গেই মিঃ ওয়াটকে "প্রেমিক স্বামী" বলে উল্লেখ করত—তা নিয়ে সকলে অনেক হাসি-ঠাট্টাও করত। এদিকে জাহাজের সব

যাত্রী লক্ষ্য করেছে যে মিঃ ওয়াট খোলাখুলিভাবেই মিসেসকে এড়িয়ে চলে, অধিকাংশ সময়ই নিজের শয়ন-কক্ষে একাকি বন্দী হয়ে থাকে, আর তার স্ত্রী খুশীমত বড় কেবিনে বসে সকলের সঙ্গে ফূর্তি করে।

যা কিছু দেখেছি এবং শুনেছি তা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, ভাগ্যবিড়ম্বনার ফলে, অথবা কোন ক্ষণিক আবেগের বশে আমার শিল্পী-বন্ধু এমন একটি নারীর সঙ্গে নিজেকে বেঁধেছে যে সর্বাংশে তার থেকে অনেক নিম্নস্তরের এবং তার স্বাভাবিক পরিণতিতেই দেখা দিয়েছে এক সর্বাত্মক দ্রুত বিরক্তি। অন্তরের অন্তস্তল থেকে তাকে আমি করুণা করি কিন্তু সেজন্য "শেষ ভোজ" এর ব্যাপারে লুকোচুরিকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না।

একদিন সে ডেকে এল। অভ্যাসমতই তার হাত ধরে এদিক-ওদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। মনে হল, তার মনের বিষণ্ণ ভাবটা মোটেই কমে নি। আমি দু' একটা হাসি-ঠাট্টার কথা বললাম, আর সেও চেষ্টা করে ঈষৎ ম্লান হাসি হাসল। বেচারি! অবশেষে সাহস করে একটা জোর ধাক্কা দিলাম। মনে মনে স্থির করলাম, একটা বেশ অলংকারবহুল ভূমিকা দিয়ে শুরু করে প্রসঙ্গক্রমে আয়তাকার বাক্সটার প্রসঙ্গ তুলব—একটু একটু করে তাকে বুঝিয়ে দেব যে তার এই রহস্যের খোঁজ-খবর আমিও অল্প-স্বল্প রাখি। প্রথমেই শুরু করলাম "বাক্সটার অদ্ভুত আকার" দিয়ে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সবজান্তার মত হাসলাম, চোখ ঠারলাম, তর্জনী বাড়িয়ে তার পাঁজরে আস্তে আস্তে খোঁচাও দিলাম।

ওয়াট যে ভাবে আমার এই নির্দোষ রসিকতাকে গ্রহণ করল তা দেখেই আমার স্থির বিশ্বাস হল যে সে পাগল হয়ে গেছে। প্রথমে সে এমন ভাবে আমার দিকে তাকাল যেন আমার কথার রসিকতা বোঝাই তার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু কথাগুলি যতই তার মগজে ঢুকতে লাগল ততই তার চোখ দুটি সেই অনুপাতে কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল। ক্রমে সে লাল হয়ে উঠল—তারপর অতিমাত্রায় পান্ডুর—আর তারপরেই যেন আমার কথায় খুবই মজা পেয়েছে এমনি ভাবে হো হো করে হাসতে শুরু করল। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এই রকম অট্টহাসি সে দশ মিনিট বা তারও বেশী সময় ধরে একটানা চালিয়ে গেল, এবং তারপরেই ডেকের উপর ধপ্ করে সটান পড়ে গেল। দৌড়ে তাকে তুলতে গিয়ে মনে হল সে মারা গেছে।

লোকজন ডেকে অনেক কষ্টে তার সম্বিত ফিরিয়ে আনলাম। কিছুটা সামলে নিয়ে প্রথমে কিছুক্ষণ সে আবোল-তাবোল বকতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রক্ত মোক্ষম করে তাকে শুইয়ে দিলাম। পরদিন সকালে সে সুস্থ হয়ে উঠল। আমি অবশ্য তার দৈহিক সুস্থতার কথাই বলছি, মনের নয়। ক্যাপ্টেনের পরামর্শমত যাত্রার বাকি সময়টা আমি তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। বন্ধুর পাগলামি সম্পর্কে আমার সঙ্গে একমত হয়ে ক্যাপ্টেন আমাকে সতর্ক করে দিলেন। জাহাজের অন্য কোন যাত্রীকে এ ব্যাপারে কোন কথাই যেন না বলি।

ওয়াটের মূর্ছার পরেই এমন কিছু ঘটনা ঘটল যাতে তার সম্পর্কে আমার কৌতূহল অনেকগুণ বেড়ে গেল। আমি স্নায়বিক উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়লাম—বেশীমাত্রায়

কড়া সবুজ চা খেতে লাগলাম ; রাতে ভাল ঘুম হত না—বস্তুত, বলা যায় দুটো রাত ঘুমতেই পারলাম না। এখন, জাহাজের অন্য সব একক পুরুষ যাত্রীদের মতই আমার শয়ন-কক্ষটিও খুলত প্রধান কেবিন বা খাবার ঘরের ভিতর দিয়ে। ওয়াটের ঘর তিনটি ছিল পিছনের কেবিনে ; একটি ছোট ঠেলা দরজা দিয়ে সে কেবিনটাকে প্রধান কেবিন থেকে পৃথক করা হয়েছে, আর রাতেও সে ঠেলা দরজায় তালা দেওয়া হত না। বাইরে সব সময়ই একটা ঝড়ো হাওয়া বইত ; তার ধাক্কাতেই ঠেলা দরজাটা মাঝে মাঝে খুলে যেত, আর খোলাই থাকত, কারণ কেউ আর কষ্ট করে উঠে সেটাকে বন্ধ করে দিত না। কিন্তু আমার বার্থটা এমন জায়গায় ছিল যাতে আমার নিজের শয়ন কক্ষের দরজা খোলা থাকলে এবং সেই সঙ্গে ঠেলা দরজাটা খোলা থাকলে (আর গরমের জন্য আমার দরজাটা সব সময়ই খোলা থাকত) পিছনের কেবিনটা আমি খুব স্পষ্ট দেখতে পেতাম, বিশেষ করে যে অংশে মিঃ ওয়াটের শয়ন কক্ষগুলি ছিল সেটা আরও ভাল করে চোখে পড়ত। হ্যাঁ, দুই রাতেই (পর পর নয়) জেগে থাকার সময় প্রায় এগারোটা নাগাদ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম মিসেস ডব্লু অতি সন্তর্পণে লুকিয়ে বেরিয়ে গেল মিঃ ডব্লুর শয়ন-কক্ষ থেকে এবং বাড়তি ঘরটাতে ঢুকে ভোর হওয়া পর্যন্ত সেখানে কাটাল, ভোরে স্বামী ডাকলে তবে ফিরে গেল। তারা যে আসলে আলাদা হয়ে গেছে সেটা খুব পরিষ্কার। তারা আলাদা ঘরে থাকে—নিঃসন্দেহে একটা পাকাপাকি বিবাহ-বিচ্ছেদেরই প্রস্তুতি ; মনে হল এই তো—বাড়তি শয়ন-কক্ষের এটাই তো রহস্য।

আরও একটা ব্যাপারের প্রতিও আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। যখন দুটো রাত আমি জেগে কাটিয়েছি সেই সময় মিসেস ওয়াট বাড়তি শয়ন-কক্ষে চলে যাবার পরেই তার স্বামীর ঘর থেকে কিছু সাবধানী চাপা শব্দ আমার কানে এসেছে। সাগ্রহে কিছুক্ষণ কান পেতে শোনার পরেই তারা অর্থটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল। শিল্পী-বন্ধু বাটালি ও কাঠের হাতুড়ির সাহায্যে আয়তাকার বাক্সটি খোলার চেষ্টা করার ফলেই শব্দটা হচ্ছিল ; বোঝা গেল, হাতুড়ির মাথাটা পশম বা তুলোর কোন নরম বস্তু দিয়ে ঢেকে দেওয়ার ফলেই শব্দটা চাপা ও অস্পষ্ট শোনাচ্ছিল।

এইভাবে শব্দ শুনতে আমি পর পর আরও বুঝতে পারলাম কখন ডালাটা খুলে ফেলা হল—কখন বাক্সটাকে নীচেকার কাঠের তলায় ঢুকিয়ে দেওয়া হল ; বার্থের কাঠের সঙ্গে বাক্সের ডালার ঠোক্করের শব্দ থেকেই শেষোক্ত ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলাম। তারপরই সব একেবারে চুপচাপ ; দুই রাত্রেই ভোর না হওয়া পর্যন্ত আর কোন শব্দই শুনতে পাই নি। অবশ্য প্রায় শোনা যায় না এরকম একটা চাপা ফোঁপানোর মত শব্দের কথাও উল্লেখ করতে পারি—তবে তার সবটাই আমার কল্পনাপ্রসূত কি না তা বলতে পারব না। ফোঁপানি বা দীর্ঘশ্বাসের মত শোনালেও মনে হয় সে শব্দটা হয় তো আমার কানের মধ্যেই বাজছিল। নিঃসন্দেহে মিঃ ওয়াট শিল্পী-মনের খেয়াল মেটাতেই চেষ্টা করেছিল। ভিতরকার মূল্যবান ছবিটি দেখে চোখের ক্ষিধে মেটাবার জন্যই সে আয়তাকার বাক্সটি খুলেছিল। অবশ্য সেটা তো তার ফুঁপিয়ে কাঁদবার কোন কারণ হতে পারে না। তাই আবারও বলছি, এটা হয়তো ক্যাপ্টেন হার্ডির

সবুজ চায়ের কল্যাণে আমার উত্তেজিত কল্পনার খেয়ালের ফসল। দুই রাত্রেই ভোরের ঠিক আগে আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি, মিঃ ওয়াট বাক্সের ডালাটাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে মুখ ঢাকা হাতুড়ি পিটিয়ে পেরেকগুলোকে যথাযথভাবে ঠুকে দিয়েছে। সে কাজটা সেরে তবেই সে পোশাক বদলে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে মিসেস ডবলুকে ডেকেছে।

এইভাবে সাগরের বুকে সাতদিন কেটে গেল। আমরা যখন হাতেরাস অন্তরীপের অদূরে ঠিক তখনই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে প্রচণ্ড ঝড় উঠে এল। আবহাওয়ার গতিক দেখে আমরা আগে থেকেই এই ঝড়ের আশংকা করেছিলাম। জাহাজের পাল-হাল সব কিছুই সেই ভাবে ঠিক করে রাখা ছিল। ফলে আটচল্লিশ ঘণ্টা আমরা নিরাপদে এগিয়ে চললাম। কিন্তু তারপরেই ঝড়ের বেগ নতুন করে বেড়ে সেটা হারিকেনের রূপ ধারণ করল, জাহাজের পিছনের পাল ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেল। বড় বড় ঢেউ আমাদের জাহাজের উপর আছড়ে পড়তে লাগল। এই দুর্ঘটনায় আমাদের তিনটি লোক ছিটকে জলে পড়ে গেল। কোনরকমে একটু সামলে ওঠবার আগেই সামনের পালটাও ছিঁড়ে গেল। তাই নিয়েই আরও কয়েক ঘণ্টা কাটল। জাহাজও আগের চাইতে অনেক স্থিরভাবে চলতে লাগল।

ঝড় তখনও চলছে। থামবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ছেঁড়া পাল আরও ছিঁড়ে গেল। সকলেই যখন সেটাকে মেরামত করতে ব্যস্ত তখনই ছুতোর এসে জানাল জাহাজের খোলে চার ফুট জল ঢুকেছে। সংকটকে আরও ঘনীভূত করে পাম্পগুলিও বিকল হয়ে প্রায় অকেজো হয়ে পড়ল।

দেখা দিল হট্টগোল ও হতাশা—তবু সব ভারী মালপত্র জলে ফেলে দিয়ে জাহাজটাকে যাতে হাল্কা করা যায় তার চেষ্টা হতে লাগল ; যে দুটো মাস্তুল তখনও খাড়া ছিল তাও কেটে ফেলা হল। কিন্তু পাম্পগুলোর কিছু করা গেল না ; আর খোলের ছিদ্রটাও অতি দ্রুত বেড়ে চলল।

সূর্য অস্ত যাবার পরে ঝড়ের বেগ অনেকটা কমে এল ; সমুদ্রও শান্ত হল ; আমাদের মনেও নতুন করে বাঁচার আশা জাগল। রাত আটটার পরে মেঘ কেটে গিয়ে ভরা চাঁদ দেখা দিল—সৌভাগ্যের একটুখানি ছোঁয়ায় আমাদের ভেঙে পড়া মনে আবার খুশীর হাওয়া লাগল।

অবিশ্বাস্য পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত সবচাইতে বড় নৌকাটিকে ঠিকঠাক করে নিয়ে সকল কর্মী ও অধিকাংশ যাত্রী তাতে বোঝাই করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সে দলটা নৌকো ছেড়ে দিল, এবং অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে তিন দিন পরে নিরাপদে পেঁছিল ওক্রাকোক খাঁড়িতে।

ক্যাপ্টেনসহ চোদ্দজন যাত্রী জাহাজের পিছনের গলুইতে বাঁধা ছোট নৌকোটাকে ভরসা করে জাহাজেই থেকে গেল। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে তবে নৌকোটাকে জলে ভাসান গেল। জলস্পর্শ করা মাত্রেই যে নৌকোটা ডুবে গেল না সেটা অলৌকিক ব্যাপার। যাই হোক, তখন তাতে আরোহী রইল ক্যাপ্টেন ও তার স্ত্রী, মিঃ ওয়াট ও

তার দল, একজন মেক্সিকান অফিসার, তার স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে, আর নিগ্রো খানসামাটি সহ আমি নিজে।

কিছু অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কিছু খাবারদাবার, আর পিঠের উপর জামাকাপড়ের বোঁচকা ছাড়া আর কিছু সঙ্গে রাখার মত জায়গা আমাদের ছিল না। এর বেশী কিছু বাঁচাবার কথা কারও মনেও আসে নি। কিন্তু জাহাজ থেকে কয়েক বাঁও দূরে যাওয়া মাত্রই মিঃ ওয়াট যখন উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন হার্ডির কাছে দাবী করল যে তার আয়তাকার বাক্সটিকে তুলে আনতে নৌকোটাকে জাহাজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে—তখন কারওই বিস্ময়ের অবধি রইল না।

কঠিন গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, স্থির হয়ে বসুন মিঃ ওয়াট ; চুপচাপ বসে না থাকলে আপনি তো আমাদের সকলকেই ডুবিয়ে মারবেন। দেখছেন না, সমুদ্রের জল জাহাজের একেবারে কাণায় উঠে গেছে।

মিঃ ওয়াট তথাপি দাঁড়িয়ে থেকেই চেঁচিয়ে বলল, “বাক্সটা ! আমি বাক্সটার কথা বলছি ! ক্যাপ্টেন হার্ডি, আপনি আপত্তি করতে পারেন না, আপত্তি করবেন না। এর ওজন তো সামান্য—কিছুই না—একেবারেই কিছু না। আপনার গর্ভধারিণী মায়ের দোহাই—ঈশ্বরের ভালবাসার দোহাই—আপনার মুক্তি আশার দোহাই, আমার একান্ত মিনতী বাক্সটা আনার ব্যবস্থা করুন।”

শিল্পীর কাতর আবেদনে ক্যাপ্টেন মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলেন ; কিন্তু তার পরেই কঠোর হয়ে উঠলেন ; বললেন—

“মিঃ ওয়াট, আপনি উন্মাদ। আপনার কথা আমি শুনতে পারি না। আমি বলছি, বসে পড়ুন, নইলে আপনিই নৌকাটা ডুবিয়ে দেবেন। দাঁড়ান—ওকে আটকান—ওকে চেপে ধরুন !—উনি হয়তো জলে ঝাঁপ দেবেন—ঐ যাঃ আমি বুঝতে পেরেছিলাম—উনি শেষ হয়ে গেলেন।”

ক্যাপ্টেন কথাগুলি বলতে বলতেই মিঃ ওয়াট নৌকো থেকে লাফ দিল। জাহাজের শিকল থেকে একটা দড়ি ঝুলছিল। কি অমানুষিক প্রচেষ্টায় মিঃ ওয়াট সেই দড়িটা ধরে ঝুলে পড়ল, আর পরমুহূর্তেই জাহাজের ডেকে উঠে পাগলের মত ছুটে গেল নীচের কেবিনের দিকে।

ততক্ষণে ঝড়ের ঝাপটায় আমরা নৌকোর একেবারে শেষ প্রান্তে আছড়ে পড়েছি। উত্তাল সমুদ্রবক্ষে একেবারেই অসহায়। তবু নৌকোটাকে ফেরাবার একটা শেষ চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঝড়ের মুখে ছোট নৌকোটা তখন একটা পালকের মত। এক নজর তাকিয়েই বুঝতে পারলাম, হতভাগ্য শিল্পীর বাঁচার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে আমাদের দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখলাম, উন্মাদ লোকটি (তাছাড়া আর কি তাকে বলব) দৈত্যের মত গায়ের শক্তিতে আয়তাকার বাক্সটাকে টানতে টানতে ডেকের উপর উঠেছে। চরম বিস্ময়ে আরও দেখলাম, তিন ইঞ্চি মোটা দড়িটা দিয়ে প্রথমে বাক্সটাকে কয়েক প্যাঁচ জড়িয়ে বাঁধল, তার পর তার সঙ্গে জড়াল নিজের দেহটাকে। আরও এক মুহূর্তে পরে দেহ এবং বাক্স দুইই সাগরের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে চোখের নিমেষে চিরদিনের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে সেই স্থানটির দিকে তাকিয়ে থেকে আবার আমরা বৈঠাতে হাত লাগালাম। ঘণ্টাখানেক সকলেই স্তব্ধ—নির্বাক। অবশেষে আমিই প্রথম কথা বললাম।

“আপনি কি লক্ষ্য করেছেন ক্যাপ্টেন কত অল্প সময়ে ওরা ডুবে গেল? এটা কি খুবই অস্বাভাবিক নয়? সে যখন নিজেকে বাক্সটার সঙ্গে বেঁধে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল তখনও কিন্তু আমার মনে ক্ষীণ আশা ছিল যে শেষ পর্যন্ত সে বেঁচে যাবে।”

ক্যাপ্টেন বললেন, “ওরা স্বাভাবিকভাবেই ডুবে গেছেন; তবে বিদ্যুৎগতিতে এই যা। ওরা আবার ভেসে উঠবে, কিন্তু নুনটা গলে যাবার আগে নয়।”

“নুন!” আমি আঁতকে উঠলাম।

মৃতের স্ত্রী ও বোনদের দেখিয়ে ক্যাপ্টেন বললেন, “চুপ! সুযোগ মত অন্য সময়ে এ নিয়ে কথা বলা যাবে।”

অনেক কষ্ট পেলাম; কোন রকমে প্রাণেও বেঁচে গেলাম; কিন্তু নিয়তি আমাদের এবং বড় নৌকোর সহযাত্রীদের বন্ধুবিহীন করে দিল। শেষ পর্যন্ত চারটি দিন চরম কষ্ট সহ্য করে মৃতপ্রায় অবস্থায় আমরা নৌকো থেকে নামলাম রনোক দ্বীপের বিপরীত দিকের সৈকতে। সেখানে সাতদিন ছিলাম। উদ্ধারকারী সংস্থার লোকরা আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে নি। শেষ পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক যাবার ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

“ইণ্ডিপেণ্ডেন্স” ধ্বংস হবার মাসখানেক পরে ঘটনাচক্রেই ব্রডওয়েতে ক্যাপ্টেন হার্ডির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কথাপ্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই জাহাজ—দুর্ঘটনা এবং বিশেষ করে বেচারি ওয়াটের মন্দ ভাগ্যের কথাও উঠল। তার কাছেই নিম্নলিখিত বিবরণটি জেনেছিলাম।

শিল্পী টিকিট কেটেছিল নিজের স্ত্রীর, দুই বোনের ও একটি চাকরের। সত্যি সত্যি তার স্ত্রীটি খুবই মনোরমা ও গুণবতীই ছিল। চোদ্দই জুন সকালে (যেদিন আমি প্রথম জাহাজে গিয়েছিলাম) মহিলাটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারাও যায়। যুবক স্বামীটি শোকে উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়ল—ঘটনাচক্রে তার নিউইয়র্কে যাত্রায়ও বাধা পড়ল। প্রিয় পত্নীর মৃতদেহটিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়া একান্ত দরকার আবার এক সার্বিক কুসংস্কার যে প্রকাশ্যে সে কাজটি করার পথে বিঘ্নস্বরূপ সে কথাও তো সর্বজনবিদিত। একটা মৃতদেহের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রা করতে হবে এ-কথা জানলে নয়-দশমাংশ যাত্রীই তো জাহাজ ছেড়ে পালাবে।

এই সংকটে ক্যাপ্টেন হার্ডিই ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথমে মৃতদেহটাতে সুগন্ধি তেল মাখিয়ে তারপর বড় আকারের একটা বাক্সের মধ্যে ভরে প্রচুর পরিমাণ নুন দিয়ে ঢেকে ভাল করে বাক্সের ডালা বন্ধ করে পণ্যদ্রব্য হিসাবে সেটাকে জাহাজে তোলা হোক। মহিলাটির মৃত্যুর সংবাদ কাউকে জানানো হবে না; আর যেহেতু এটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে মিঃ ওয়াট তার স্ত্রীর টিকিট কেটেছিলেন, তাই এমন একজনের প্রয়োজন দেখা দিল যে সমুদ্রযাত্রার সময়টা তার স্ত্রী সেজে সঙ্গে থাকবে। মৃত মহিলার দাসীকে সহজেই সে কাজ করতে রাজী করানো গেল। গোড়ায় যে বাড়তি শয়ন কক্ষটি এই মেয়েটির জন্যই নেওয়া হয়েছিল সেটা এখন ফাঁকাই থেকে গেল। অবশ্য

প্রতি রাতে নকল—স্ত্রীটি সেই শোবার ঘরে ঘুমায়। দিনের বেলা সে সাধ্যমত তার কর্ত্রীর ভূমিকাটি পালন করত—যাকে জাহাজের অন্য কোন যাত্রীই চিনত না।

স্বভাবতই আমার ভুলগুলি হয়েছিল অতিমাত্রায় অসতর্ক, অতিমাত্রায় কৌতূহলী, এবং অতিমাত্রায় আবেগশীল মেজাজের দরুন। কিন্তু সম্প্রতিকালে রাত্রে আমি কদাচিৎ ভালভাবে ঘুমতে পারি একটা মুখ আমাকে সারাক্ষণ তাড়া করে। একটা ভৌতিক হাসি চিরকাল আমার কানে বাজে, চিরকাল বাজবে।

এক সপ্তাহে তিনটি রবিবার

Three Sundays in a Week

“তুমি পাষাণ-হৃদয়, তোমার মাথায় গোবর ভর্তি, তুমি একগুঁয়ে, ভোঁতা, বদরাগী, ছাতা-পড়া, সেকেলে এক বুড়ো মানুষ!”—একদা অপরাহ্ণে কল্পনায় ঘুসি বাগিয়ে কল্পনাতেই কথাগুলি আমি বললাম আমার মাননীয় খুড়ো মশায় ভ্যাবলারামকে।

শুধু কল্পনাতেই। ঘটনা হল, ঠিক সেই সময় আমি যা বলতাম এবং যা বলার সাহস হত না, আমি যা করতাম এবং যা করার ইচ্ছা হত—এই দুইয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ অকিঞ্চিৎকর গরমিল থাকত।

বসার ঘরের দরজা খুলেই দেখি, অগ্নিকুণ্ডের তাকের উপর দুই পা রেখে আর হাতের থাবায় মদে ভর্তি একটা বোতল ধরে বুড়ো শুশুক বসে আছে।

আস্তে দরজাটা বন্ধ করে সূক্ষ্মতম হাসিটি হেসে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললাম, “প্রিয় খুড়োমশায়, তুমি সর্বদাই এত বেশী দয়ালু আর বিবেচক, আর এত ভাবে তোমার উপচিকীর্ষার প্রমাণ রেখেছ যে—যে আমার এই ছোট্ট কথাটি আর একবার তোমার কাছে তোলামাত্রই তোমার পূর্ণ সম্মতি আমি পাবই।”

তিনি বললেন, “হুম্! বলে যাও বাপু, বলে যাও!”

“আমি নিশ্চিত জানি, হে আমার প্রিয়তম খুড়োমশায় (তুমি একটা বুড়ো ভাম!), কেট-এর সঙ্গে আমার মিলনে বাধা দেবার কোন পরিকল্পনা তোমার নেই। এটা তোমার একটা রসিকতামাত্র, আমি জানি—হা! হা! হা!—মাঝে মাঝে তুমি কী মধুময়ই না হয়ে ওঠ।”

“হা! হা! হা!” তিনি বললেন, “তুমি জাহান্নামে যাও! হ্যাঁ, ঠিক তাই!”

আমি অবশ্য নিশ্চিত জানি, তুমি ঠাট্টা করছিলে। দেখ, খুড়োমশায়, বর্তমানে কেট ও আমার একমাত্র বাসনা এই—তোমার পরামর্শটি দিয়ে তুমি আমাদের ধন্য কর—পরামর্শ মানে সময়টা—তুমি তো বুঝতেই পারছ খুড়োমশায়—মানে—এক কথায়—আমাদের বিয়েটা কখন হলে তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হয়—বুঝতেই তো পারছ?

“কখন হলে, ওরে শয়তান!—কি বলতে চাও তুমি?—বরং বল কখন হয়ে গেলে।”

'হা। হা! হা!—হে! হে! হে!—হি! হি! হি!—হো! হো! হো!—হু! হু! হু!—আঃ, ভাল! চমৎকার!—কী একখানা বুদ্ধি! কিন্তু খুড়োমশায়, এই মুহূর্তে আমরা যা জানতে চাইছি তাহলে, তুমি সঠিক সময়টা বাতলে দাও।"

"ওঃ!—সঠিক ?"

"হ্যাঁ খুড়োমশায়—অবশ্য তোমার যদি মত থাকে।"

"আচ্ছা ববি, আমি যদি ব্যাপারটা অনেক পিছিয়ে দেই—এই ধর, এক বছর বা ঐ রকম কোন সময় ?—সেটা কি সঠিক হবে ?"

"তা—আপনি যদি সঠিক মনে করেন।"

"ঠিক আছে ববি, বাছা আমার, তুমি বড় ভাল ছেলে, নয় কি ? তুমি যখন সঠিক সময়টাই চাও, তাহলে আমিও অন্তত এই একটিবার তোমাকে ধন্য করব।"

"সোনা খুড়ো আমার!"

"চুপ কর বাবাজী! (আমার গলা ছাপিয়ে)—এই একবার তোমাকে ধন্য করব। তুমি আমার সম্মতি পাবে—আর আমার ভোজটা, ভোজের কথা ভুললে কিন্তু চলবে না—আমি দেখছি। কখন হতে পারে ? আজ রবিবার—তাই না ? তাহলে ঠিক কবে তোমাদের বিয়ে হবে—ঠিক কবে! এবার মন দিয়ে শোন!—যে সপ্তাহে তিনটে রবিবার একসঙ্গে হাজির হবে! আমার কথা কানে যাচ্ছে তো বাবাজী! হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন ? আমি বলছি, তুমি কেটকে পাবে, আর সেই সঙ্গে ভোজও খাবে, যখন এক সপ্তাহে তিনটে রবিবার এক সঙ্গে হাজির হবে—কিন্তু তার আগে নয়—ব্যাটা হতভাগা চরিত্রহীন—তার আগে নয়, আমি মাথা কুটে মরলেও না। তুমি আমাকে জান—আমি এক কথার মানুষ—এবার ভাগ হিয়াসে!" এইখানে সে ঢক্‌ঢক্‌ করে মদ গিলতে লাগল, আর আমিও হতাশ হয়ে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

আমার খুড়ো ভ্যাবলরাম ছিল "একটি রুচিবান বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোক", কিন্তু ঐ নামের গানের লোকটির সঙ্গে তার তফাৎ এই যে তার কতকগুলি দুর্বল দিকও ছিল। সে ছিল ছোটখাট, টাকাওয়ালা, জমজমাট, প্রেমিকপুরুষ, অর্ধগোলাকৃতি দেহ এমন একটি মানুষ যার ছিল লাল নাক, মোটা খুলি, লম্বা টাকার থলে, আর নিজের মর্যাদা সম্পর্কে প্রচণ্ড সচেতনতা। চরিত্রের অসাধারণ বৈচিত্র্যের জন্যই বাইরে থেকে লোকে তাকে একটি কৃপণ লোক বলেই জানত। অনেক চমৎকার লোকের মতই তারও ছিল মানুষকে আশা দিয়ে নিরাশ করার একটা বিচিত্র মনোভাব। যে কোন অনুরোধেই তার প্রথম স্পষ্ট জবাব ছিল "না!" কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুব অল্প অনুরোধই সে প্রত্যাখ্যান করত। টাকার থলের দিকে হাত বাড়ালে সে কঠোরভাবে আত্মরক্ষা করত, কিন্তু গোঁ ধরে বসে থাকতে পারলে প্রাপ্ত টাকার অংকটা মোটাই হত। দানের বেলায় তার মত উদার হাতে অথচ অকরুণভাবে আর কেউ দান করত না।

এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমি সারাটা জীবন কাটিয়েছি। আমার বাবা-মা মৃত্যুকালে আমাকে তার হাতে দিয়ে গেছে একটি মূল্যবান উত্তরাধিকাররূপে। আমি বিশ্বাস করি বুড়ো শয়তান আমাকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসে—যদিও কেটকে যতটা ভালবাসে ততটা নয়—কিন্তু তার হাতে পড়ে আমি তো বেঁচে আছি কুকুরের

মত। প্রথম বছর থেকে পঞ্চম বছর পর্যন্ত সে প্রতিদিন আমাকে নিয়মিত বেত মেরে ধন্য করেছে। পাঁচ থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় আমাকে "শোধনালয়"-এর ভয় দেখিয়েছে। পনেরো থেকে বিশ পর্যন্ত এমন একটা দিনও কাটে নি যেদিন সে মাত্র এক শিলিং দিয়ে আমাকে বিদায় করে দেবার হুমকি দেয় নি। আমি ছিলাম একটা দুঃখী কুকুর তা ঠিক—কিন্তু সেটাই তো হয়ে উঠেছিল আমার চরিত্রের একটা অংশ—আমার বিশ্বাসের একটি বিন্দু। অবশ্য কেট ছিল আমার নির্ভরযোগ্য বন্ধু, আর সে কথা আমি জানতাম। মেয়েটি বড় ভাল; সে আমাকে কথা দিয়েছে, গুল-তাপ্পি দিয়ে খুড়োমশায় ভ্যাবলরামের সম্মতি আদায় করতে পারলেই সে আমাকে বিয়ে করবে। বেচারি! তার বয়স পনেরো বছর। যৎসামান্য টাকা-পয়সা যা আছে তাতে কোনরকমে টেনে-টুনে চলে যায়। পনেরোতে যা আছে, একুশেও তার হের-ফের ঘটবে বলে মনে হয় না। বুড়ো ভদ্রলোকের কাছে বার বার ধর্না দিয়েছি, কোন ফল হয় নি। আমাদের মত দুটি বাচ্চা ইঁদুরকে নিয়ে ধেড়ে ইঁদুরের মত যে খেলা সে খেলেছে তাতে স্বয়ং জোভেরও বিক্ষুব্ধ হবার কথা। মনে-প্রাণে বুড়ো আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করার মত একটা অজুহাত আবিষ্কার করতে পারলেই নিজের পকেট থেকে সে দশ হাজার পাউণ্ড দিয়ে দিতে রাজী আছে। কিন্তু আমরা এমনই মূর্খ যে বিয়ের ব্যাপারটা নিজেরাই ঠিক করে ফেলেছি। আমার বিশ্বাস এমত অবস্থায় বিয়েতে বাধা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভবও নয়।

তার কিছু দুর্বলতার কথা আগেই বলেছি। আমি কিন্তু তার একগুঁয়েমির কথা বলি নি। দুর্বলতা বলতে আমি বোঝাতে চেয়েছি তার এক ধরনের মেয়েলি কুসংস্কারের কথা। স্বপ্ন এবং অমঙ্গলের লক্ষণাদিতে তার অগাধ বিশ্বাস। ঠুনকো সম্মানবোধ ও কথা রাখারাখির ব্যাপারে সে বড়ই খুঁত-খুঁতে। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটিই সংক্ষেপে বলি।

এদিকে হল কি—নিয়তির খেলাই বলতে হবে—আমার বাগদত্তার পরিচিত দুটি নৌ-বিভাগের লোক একবছর পরে বিদেশ থেকে এসে ইংলণ্ডের মাটিতে পদার্পণ করলেন। দশই অক্টোবর রবিবার বিকেলে আমরা দুজন পূর্বব্যবস্থামত সেই দুই ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে আমার ভ্যাবলরাম খুড়োর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম—এই ঘটনাটা আমাদের সব আশা-আকাংখা চুরমার হয়ে যাবার স্মরণীয় সিদ্ধান্তের ঠিক তিন সপ্তাহ পরে ঘটেছিল। প্রথম আধা ঘণ্টা সাধারণ বিষয় নিয়েই আলোচনা হল; স্বভাবতই তার পরে ইচ্ছা করেই আমরা আলোচনাটাকে এইভাবে ঘুরিয়ে দিলাম ঃ

ক্যাপ্টেন প্র্যাট। "দেখুন, ঠিক এক বছর আমি এখানে ছিলাম না। আজ ঠিক এক বছর পূর্ণ হল—একটু ভেবে দেখছি! হাঁ!—আজই দশই অক্টোবর। আপনার নিশ্চয় মনে আছে মিঃ ভ্যাবলরাম যে গতবছর এই দিনেই আমি আপনার কাছে এসেছিলাম বিদায় নিতে। ভাল কথা, ব্যাপারটা আকস্মিক যোগাযোগই বটে—আমাদের এই বন্ধু ক্যাপ্টেন স্মিদার্টনও আজ ঠিক এক বছর হল এখানে অনুপস্থিত ছিলেন।"

স্মিদার্টন। "হাঁ, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় একবছর। মিঃ ভ্যাবলরাম, আপনার

নিশ্চয় মনে আছে গত বছর ঠিক এই দিনে ক্যাপ্টেন প্র্যাটের সঙ্গে আমিও এসেছিলাম আপনাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে।”

খুড়ো। “হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ—খুব মনে আছে—খুবই অদ্ভুত ব্যাপার! আপনারা দুজনেই ঠিক একবছর আগেই গিয়েছিলেন। খুবই আশ্চর্য যোগাযোগ! ডক্টর ডাব্‌ল্‌ এল. ডী যাকে বলেন ঘটনার এক অসাধারণ যোগাযোগ। ডক্টর ডাব্‌—”

কেট। (বাধা দিয়ে) “ব্যাপারটা আশ্চর্য তো বটেই; কিন্তু পাপা, ক্যাপ্টেন প্র্যাট ও ক্যাপ্টেন স্মিদার্টন ঠিক একই পথে যান নি, আর বুঝতেই পারছেন সেটাই দুজনের মধ্যে একটা পার্থক্য।”

খুড়ো। “অত কথা আমি বুঝি না বাবা! কি করে বুঝব? আমি তো মনে করি, এর ফলে ব্যাপারটা আরও উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে। ডক্টর ডাব্‌ল্‌ এল. ডী.—”

কেট। “তা কেন? ক্যাপ্টেন প্র্যাট গিয়েছিলেন হর্ন অন্তরীপ ঘুরে, আর ক্যাপ্টেন স্মিদার্টন গিয়েছিলেন উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে।”

খুড়ো। “ঠিক তাই!—একজন গেলেন পূর্ব দিকে, অপরজন গেলেন পশ্চিম দিকে, আর দুজনই গোটা পৃথিবীটাকেই চক্কর দিলেন। ভাল কথা, ডক্টর ডাব্‌ল্‌ এল. ডী—”

আমি। (তাড়াতাড়ি) “ক্যাপ্টেন প্র্যাট, আপনারা কিন্তু কাল সন্ধ্যাটা আমাদের সঙ্গেই কাটাবেন—আপনি এবং স্মিদার্টন—আপনারা সমুদ্রযাত্রার গল্প শোনাবেন, আর আমরা হুইস্ট খেলব, আর—”

প্র্যাট। “কিন্তু—আপনি ভুলে গেছেন যে কাল রবিবার। বরং অন্য কোন দিন সন্ধ্যায়—”

কেট। “আরে, রাখুন তো!—রবার্ট অত ভুলোমন নয়। আজই তো রবিবার।”

খুড়ো। “ঠিক—ঠিক!”

প্র্যাট। “দু'জনের কাছেই আমি ক্ষমা চাইছি—কিন্তু এত ভুল আমার হয় না। আমি জানি কাল রবিবার—কারণ—”

স্মিদার্টন। (সবিস্ময়ে) “আপনারা বলছেন কি? আমি জানতে চাই, এতকাল কি রবিবার ছিল না?”

সকলে। “গতকাল, বটে! আপনি হেরে গেছেন!”

খুড়ো। “আজই রবিবার, আমি বলছি—আমি জানি না নাকি?”

প্র্যাট। “আহা, না!—আগামী কাল রবিবার।”

স্মিদার্টন। “আপনারা সকলেই পাগল—প্রত্যেকটি প্রাণী। আমি এই চেয়ারে বসে আছি এটা যেমন সত্য, কাল যে রবিবার ছিল সেটাও তেমনই সত্য।”

কেট। (লাফিয়ে উঠে) “বুঝতে পেরেছি—আমি সব বুঝতে পেরেছি। পাপা, এটা যেন আপনার বিচার-সভা বসেছে—আপনার জ্ঞানের বিচার হচ্ছে। ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দিন, এক মিনিটে আমি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসলে, ব্যাপারটা খুবই সরল। মিঃ স্মিদার্টন বলছেন, গতকাল ছিল রবিবার; তাই ছিল; তিনি

ঠিকই বলেছেন। ববি, খুড়োমশায় এবং আমি বলছি, আজই রবিবার ; এটাও ঠিক ; আমরাও ঠিকই বলেছি। ক্যাপ্টেন প্র্যাট বলছেন আগামীকাল হবে রবিবার ; তাই হবে ; তিনিও ঠিকই বলেছেন। আসলে আমরা সকলেই ঠিক বলেছি, একটি সপ্তাহে তিনটে রবিবার এক হয়ে গেছে।”

স্মিদার্টন। (একটু থেমে) “ভাল কথা প্র্যাট, কেট আমাদের উপর টেক্কা মেরেছে। আমরা কী বোকা ! মিঃ ভ্যাবলরাম, ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়িয়েছে : সকলেই জানেন, পৃথিবীর পরিধি চব্বিশ হাজার মাইল। এখন এই পৃথিবীটা নিজের অক্ষের উপর ঘোরে—ঘোরে ঠিক চব্বিশ ঘণ্টায় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এই চব্বিশ হাজার মাইল একবার পরিক্রমা করে। বুঝতে পারছেন মিঃ ভ্যাবলরাম ?”

খুড়ো। “নিশ্চয়—নিশ্চয়—ডক্টর ডাব—”

স্মিদার্টন। (তার কণ্ঠস্বর চাপা দিয়ে) “আচ্ছা মশায়, তাহলে এটা হচ্ছে ঘণ্টায় এক হাজার মাইল গতিতে। এখন, ধরুন আমি এখান থেকে জাহাজে চেপে এক হাজার মাইল পূবে গেলাম। অবশ্যই আমি এখানে লণ্ডনে সূর্যোদয় আশা করব এক ঘণ্টায়। আমি সূর্যোদয় দেখছি আপনার এক ঘণ্টা আগে। সেই একই দিকে আরও একহাজার মাইল গেলে আমি সূর্যোদয় আশা করব দুই ঘণ্টায়,—আরও একহাজার মাইল হলে তিন ঘণ্টায়, এবং এই ভাবেই চলতে থাকবে, শেষ পর্যন্ত পুরো পৃথিবীটাকে পরিক্রমা করে আবার যখন এই জায়গাতেই ফিরে আসব, তখন পূর্ব দিকে চব্বিশ হাজার মাইল চলার ফলে আমি লণ্ডনের সূর্যোদয় চব্বিশ ঘণ্টার আগে আশা করতে পারি না ; অর্থাৎ আমি আপনার তুলনায় একঘণ্টা এগিয়ে আছি। বুঝলেন তো ?”

খুড়ো। “কিন্তু ডাব্‌ল্‌ এল. ডী—”

স্মিদার্টন। (চড়া গলায়) “অপর পক্ষে ক্যাপ্টেন প্র্যাট যখন এখান থেকে পশ্চিম দিকে এক হাজার মাইল জাহাজে চড়লেন তখন হল এক ঘণ্টা, আর যখন পশ্চিম দিকে চব্বিশ হাজার মাইল জাহাজে চড়লেন তখন সময় হল চব্বিশ ঘণ্টা, অথবা লণ্ডনের সময় থেকে একদিন পিছনে। এইভাবে, আমার কাছে গতকাল ছিল রবিবার—এইভাবে আপনার কাছে আজই রবিবার—আর এই ভাবে প্র্যাটের কাছে আগামীকাল হবে রবিবার। আরও বড় কথা কি জানেন মিঃ ভ্যাবলরাম। এটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমাদের সকলের কথাই ঠিক ; আমাদের একজনের ধারণা অন্যজনের ধারণার চাইতে অধিক গ্রহণযোগ্য হবারও কোন দার্শনিক কারণই থাকতে পারে না।”

খুড়ো। “আমার চোখ খুলে গেছে ! দেখ কেট, দেখ ববি ! তোমরা ঠিকই বলেছ, এটা আমারই বিচার হচ্ছে। কিন্তু আমি এক কথার মানুষ—সেটা মনে রেখো। যখন খুশি তুমি এই মেয়েটিকে গ্রহণ করতে পার। জোভের দোহাই ! সব মিটে গেল। তিন রবিবার সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি চললাম ; এ বিষয়ে ডাব্‌ল্‌ এল. ডী-র মতামতটা নিতে হবে।

ঘণ্টা-ঘরের শয়তান

The Devil in the Belfry

সকলেই মোটামুটি জানে, ওলন্দাজ শহর ভণ্ডারভট্টিমিটিস্ পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর জায়গা—অন্তত তাই ছিল। কিন্তু যে কোন বড় সড়ক থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত বলে হয়তো আমার পাঠকদের অনেকেই কোন দিন সেখানে যান নি। তাই জায়গাটার কিছু বিবরণ দিচ্ছি। সেই সঙ্গে সম্প্রতি সেই শহরের সীমানার মধ্যে যে বিপজ্জনক ঘটনাগুলি ঘটেছে তারও একটা ইতিহাস আমি দিলাম। যেচে কাঁধে নেওয়া এই কাজটা আমি যে সাধ্যমত ভালভাবেই সম্পন্ন করতে পারব, আমাকে যারা জানেন তাদের কারোরই সে সম্পর্কে কোনরকম সন্দেহ থাকার কথা নয়।

নানা মুদ্রা, পাণ্ডুলিপি ও শিলালিপির সাহায্যে একথা আমি বেশ জোর দিয়েই বলতে পারি যে, ভণ্ডারভট্টিমিটিস্ শহরটি বর্তমানে যে অবস্থায় আছে একেবারে আদ্যিকাল থেকেই ঠিক সেই অবস্থায়ই ছিল। অবশ্য, শহরটির উৎপত্তি-কাল সম্পর্কে আমি সঠিক করে কিছু বলতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে শহরটির প্রাচীনতার ব্যাপারে যে কোন সুদূর অতীতকেই কল্পনা করা যেতে পারে এবং আজকের যুগে যেমন দেখছি চিরকাল ঠিক তেমনটিই ছিল। শহরের প্রবীণতম লোকটিও শহরের কোথাও কোনরকম পরিবর্তনের কথা স্মরণ করতে পারে না; বরং এই শহরের যে কোনরকম পরিবর্তন ঘটতে পারে সে সম্ভাবনাকেও অপমানজনক বলে মনে করে। একটি সম্পূর্ণ গোলাকার উপত্যকায় অঞ্চলটি অবস্থিত; তার পরিধি সিকি মাইলের মত; চারদিকই শান্ত পাহাড়ে ঘেরা; অধিবাসীরা কখনও সেই সব পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে সাহস করে নি। এ প্রসঙ্গে তারা একটি যুক্তিই দেখায়—পাহাড়ের অপর দিকে কোন কিছু আছে বলে তারা বিশ্বাস করে না।

উপত্যকার চারদিক ঘিরে (সবটাই সমতল এবং টালির রাস্তা) গড়ে উঠেছে পর পর ষাটটি ছোট ছোট বাড়ি। সব বাড়িরই পিছন দিকে পাহাড় আর সামনের কেন্দ্রস্থলটি প্রতিটি বাড়ির ফটক থেকেই ঠিক ষাট গজ দূরে। প্রতিটি বাড়ির সামনে আছে একটি গোলাকার বাগান, একটি সূর্য-ঘড়ি ও চব্বিশটা বাঁধাকপি। সবগুলি বাড়ি দেখতে হুবহু একরকম। শহরের অতি প্রাচীনতার দরুন ভাস্কর্য-রীতিটাও একটু অদ্ভুত, কিন্তু তাতে বাড়িগুলির সৌন্দর্যের তিলমাত্র হানি ঘটে নি। দেওয়ালের ইঁটগুলো কড়া-পোড়ানো, তার রং লাল, আর চারদিকটা কালো; ফলে দেওয়ালগুলো দেখায় বড় মাপের দাবার ছকের মত। পাশকপালিগুলো সামনের দিকে বাড়ানো; সবগুলি বাড়ির কার্নিসই সমান উঁচু। জানালাগুলি ছোট ছোট, তাতে বড় বড় শার্সি। কাঠের আসবাবপত্রেও গাঢ় রং লাগানো; তাতে যে সব খোদাই কাজ করা হয়েছে তাদের পার্থক্যও যৎসামান্য; কারণ স্মরণাতীত কাল থেকে ভন্ডারভট্টিমিটিসের

ছুতোররা দুটো জিনিসই সর্বত্র খোদাই করেছে—ঘড়ি আর বাঁধাকপি। অবশ্য সে কাজটা তারা খুব ভালই করে।

বাইরের মতই সব বাড়ির ভিতরটাও একই রকম। আসবাবপত্রও সব একইভাবে পরিকল্পিত। মেঝেতে একই চৌকো টালি বসানো; চেয়ার ও টেবিলের একই রকম কালো দেখতে কাঠ আর সরু বাঁকানো পা। অগ্নিকুন্ডের তাকগুলি সমান চওড়া আর সমান উঁচু, তার উপর শুধু যে ঘড়ি আর বাঁধাকপি খোদাই করা রয়েছে তাই নয়, মাঝখানে একেবারে উপরে আছে একটি সত্যিকারের ঘড়ি, আর সেটা বাজে আশ্চর্য একরকম শব্দ করে। আবার প্রতিটি বাঁধাকপি ও ঘড়ির মাঝখানে দাঁড়ানো পেট মোটা একটি চীনা মানুষ—তার পেটের বড় গর্তটার ভিতর দিয়ে চোখে পড়ে একটা ঘড়ির ডায়াল-প্লেট।

অগ্নিকুন্ডগুলি বেশ বড় আর গভীর। তাতে সব সময় গনগনে আগুন জ্বলছে, আর তার উপর বসানো একটা বড় পাত্রে মাংস সিদ্ধ হচ্ছে। বাড়ির ভালমানুষ গৃহিণীটি সব সময় সেখানে কর্মব্যস্ত। স্ত্রীলোকটি বেঁটে, মোটা ও বুড়ি; নীল চোখ ও লাল মুখ; মাথায় লাল হলুদ ফিতে জড়ানো বড় টুপি। কমলা রংয়ের পোশাকটি পিছনে ঢোলা, কিন্তু কোমরে আঁটোসাঁটো গোবদা পায়ে সবুজ মোজা; লাল চামড়ার জুতোর উপরে বাঁধাকপির মত করে হলুদ ফিতে বাঁধা। তার বাঁ হাতে একটা বড় ওলন্দাজ ঘড়ি, আর ডান হাতে খুন্তি। পাশে দাঁড়িয়ে থাকে একটা ধুমসি বিড়াল।

বাড়ির তিনটে ছেলেই বাগানে শুয়োর চড়ায়। প্রত্যেকের উচ্চতা দুই ফুট। তাদের মাথায় তিন-কোণা উঁচু টুপি, গায়ের ওয়েস্ট-কোট উরু অবধি নামানো, হরিণের চামড়ার ব্রীচেস পরা, পায়ে পশমের লাল মোজা ও রুপোর বকলেশ লাগানো ভারী জুতো। প্রত্যেকের মুখে পাইপ, আর ডান হাতে ছোট ঘড়ি। এই ধোঁয়া ছাড়ে আর তাকায়, আবার এই তাকায় আর ধোঁয়া ছাড়ে।

সামনের দরজাতেই উঁচু-পিঠ ও চামড়া-ঢাকা আরাম কেদারায় বসে থাকে স্বয়ং বুড়ো কর্তাটি। ছোটখাটো ভুঁড়িওয়ালা বুড়ো মানুষটির বড় বড় চোখ দুটি গোল-গোল, থুতনিটা দুই ভাঁজ করা। পোশাকপত্র ছেলেদের মতই—অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। একমাত্র তফাৎ, তার পাইপটা আরও বড়, আর সে ধোঁয়াও বের করতে পারে অনেক বেশী। ছেলেদের মতই তারও একটা ঘড়ি আছে, তবে ঘড়িটা থাকে তার পকেটে। সে বসে থাকে বাঁ হাঁটুর উপর ডান পাটা রেখে, মুখে গম্ভীর ভাব, অন্তত একটা চোখ সব সময়ই স্থির নিবদ্ধ থাকে সমতলের মাঝখানের একটি বিশেষ বস্তুর উপর।

শহর পরিষদ ভবনের মাথায় বস্তুটি অবস্থিত। শহর-পরিষদের সদস্যরা সকলেই ছোটখাট, গোলগাল, তেল-চুকচুক বুদ্ধিমান মানুষ; সকলেরই বড় বড় চোখ আর ভাঁজ-করা থুতনি। আমি যতদিন শহরে ছিলাম তার মধ্যে তারা কয়েকটি সভা ডেকেছিল এবং নিম্নোক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল ঃ

“সেকালের বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা অন্যায় ঃ”

“ভন্ডারভট্টিমিটিসের বাইরে কোন কিছুই সহনীয় নয় ঃ”

"আমাদের ঘড়ি ও বাঁধাকপিকেই আমরা ধরে রাখব।"

পরিষদের সভা-কক্ষের মাথায় আছে একটা উঁচু চূড়া, সেই চূড়ার মধ্যে আছে একটা ঘণ্টা-ঘর, আর সেখানেই আছে—স্মরণাতীত কাল থেকেই আছে—পল্লীর গর্ব ও বিস্ময়ের বস্তু—ভণ্ডারভাট্টিমিটিস্ শহরের বড় ঘড়িটি। আর চামড়া-ঢাকা আরাম কেদারায় বসে বুড়ো ভদ্রলোক এই বস্তুটির দিকেই তাকিয়ে থাকে।

বড় ঘড়িটার সাতটা মুখ—চূড়ার সাতটি দিকের প্রত্যেক দিকে একটা করে—যাতে সব দিক থেকেই সহজে ঘড়িটা দেখা যায়। মুখগুলি বড় ও সাদা, কাঁটাগুলি মোটা ও কালো। ঘণ্টা-ঘরের একজন তদারক আছে; তার একমাত্র কাজ ঘড়িটার তদারক করা; আর এই কাজটাই হচ্ছে কর্মহীন বৈতনিক পদের সেরা নিদর্শক—কারণ ভণ্ডার-ভাট্টিমিটিসের ঘড়ির কোন গোলমালের কথা আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি। কিছুকাল আগে পর্যন্তও সেরকম যে কোন ধারণাকেই ধর্মবিরোধী বলে গণ্য করা হত। সুদূর অতীত কাল থেকে বড় ঘড়িটা সব সময়ই নিয়মিত বাজে। সঠিক সময় জানার এমন স্থান আর কোথাও ছিল না।

যে সব মানুষ কর্মহীন অবৈতনিকের পদে কাজ করে সচরাচর লোকে তাদের সম্মানের চোখেই দেখে, আর যেহেতু ভণ্ডারভাট্টিমিটিসের ঘণ্টা-ঘরের তদারককারী লোকটি কর্মহীন বৈতনিকদের মধ্যে সব সেরা পদটির অধিকারী তাই তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্মানিত লোক বলে মনে করা হয়। একগুঁয়ে লোকরা পর্যন্ত তাকে সম্মানের চোখে দেখে। তার কোটের লেজ সব থেকে লম্বা—তার পাইপ, তার জুতোর বকলেশ, তার চোখ, আর তার পেট—সবই এতদঞ্চলের অন্য বুড়ো ভদ্রলোকদের চাইতে অনেক—অনেক বড়; আর তার থুতনিটার শুধু দুই ভাঁজ নয়, একেবারে তিন ভাঁজ।

আমি তো ভণ্ডারভিট্টিমিটিসের চমৎকার ছবিটি আঁকলাম: হায়রে, এমন সুন্দর ছবিটির কপালে এত দুর্ভোগও ছিল।

পুরনো অধিবাসীদের মধ্যে অনেক দিন থেকেই একটা কথা প্রচলিত ছিল যে "পাহাড়ের উপর থেকে ভাল কিছু কখনই আসবে না।" কথাটাকে সকলে ভবিষ্যদ্বাণী বলেই মনে করত। গতকাল দুপুরের পাঁচ মিনিট আগে পূর্বদিকে পাহাড়ের মাথায় একটা অদ্ভুতদর্শন বস্তু দেখা গেল। সেই ঘটনার প্রতি সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। চামড়ায়-মোড়া আরাম কেদারায় উপবিষ্ট প্রতিটি বেঁটে বুড়ো ভদ্রলোকের একটি চোখ বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সেই দিকে, আর অন্য চোখটি রইল চূড়ার উপরকার ঘড়িটার দিকে।

দুপুরের তিন মিনিট বাকি থাকতেই সকলে বুঝতে পারল যে সেই অদ্ভুত প্রাণীটি খুবই বেঁটে একটি বিদেশী যুবক। দ্রুতপায়ে সে পাহাড় থেকে নেমে এল। তখনই সকলে তাকে ভাল করে দেখতে পেল। এ ধরনের ফিনল্যাণ্ড দেশের মানুষের মত কোন বেঁটে লোককে ভণ্ডারভাট্টিমিটিসে এর আগে কখনও দেখা যায় নি। গাঢ় নস্যি রংয়ের মুখ, লম্বা খাড়া নাক, মটর-দানার মত চোখ, চওড়া মুখ, চমৎকার দাঁতের পাটি। মুখভর্তি গোঁফ-দাড়ি থাকার দরুন মুখের বাকি অংশটা ভাল দেখা গেল না।

তার মাথাটা খোলা, চুল পরিপাটি। পরনে আটোসাটো লেজ-ঝোলা কালো কোট (তার এক পকেট থেকে ঝুলছে মস্ত বড় সাদা রুমাল), কালো ব্রীচেস, কালো মোজা, আর কালো শাটিনের ফুল-আটকানো পাম্প-সু। তার এক বগলে বড় একটা টুপি, আর অন্য বগলে নিজের চাইতে পাঁচগুণ বড় একটা বেহালা। বাঁ হাতে সোনার নস্যদানি; অদ্ভুতভাবে পা ফেলে ফেলে পাহাড় থেকে নামার সময়ে সে পরম সুখে অনবরত নস্য টানছিল। ঈশ্বর আমার সহায় হোন! —ভণ্ডারভাট্টিমিটিসের নাগরিকদের চোখে সে একটা দেখার মত দৃশ্যই বটে!

সহজ কথায় বললে, যতই দন্তবিকাশ করুক লোকটির মুখে কিন্তু একটা অশুভ ও ধৃষ্টতার ভাব ফুটে উঠেছিল ; সে যখন লাফিয়ে লাফিয়ে পল্লীর ভিতর প্রবেশ করল তখন তার পুরনো পাম্প-সু দেখে সকলের মনেই একটা সন্দেহ উঁকি দিল ; আর তার লেজ-ঝোলা কোটের পকেট থেকে ঝুলে-থাকা কেম্ব্রিকের সাদা রুমালের নীচে উঁকি দেবার বিনিময়ে অনেক নাগরিকই কিছু ঘুষ দিতেও রাজী ছিল। কিন্তু সেই দেমাকী শয়তানটা যখন এখানে একটু প্রাচীন নাচ দেখাল তো ওখানে একটু কোমর দোলালো, তখন নাগরিকদের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

কিন্তু শহরের ভাল মানুষগুলো ভাল করে চোখ খুলে তাকাবার আগেই তখন দুপুরের ঠিক দেড় মিনিট আগেই সেই ইতর লোকটা একলাফে তাদের একেবারে মাঝখানে এসে দাঁড়াল ; তারপর নানারকম অঙ্গ-ভঙ্গী করে এখানে একটু ওখানে একটু নেচে নেচে পাখির মত উড়ে গিয়ে শহর-পরিষদ ভবনের মাথার উপরকার ঘণ্টা-ঘরে উঠে পড়ল। ঘণ্টা-ঘরের লোকটি সব দেখে শুনে হতভম্ব হয়ে ধূমপান করতে লাগল। কিন্তু বেঁটে লোকটি সটান তার নাকটা ধরে এক পাক ঘুরিয়ে দিল এক ধাক্কা ; তার মাথায় পটি মারল ; লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ; তার হাতের ফাঁকা বেহালাটা দিয়ে তাকেই এমন ধোলাই দিল যে মনে হল ভণ্ডারভাট্টিমিটিসের ঘণ্টা-ঘরে বুঝি এক-দল ঢাকী সমানে ঢাক বাজিয়ে চলেছে।

এই বেআইনী আক্রমণের প্রতিশোধ নিতে শহরের অধিবাসীরা কী ভয়ানক কাণ্ড করেছিল সেটা কেউ জানে না, তবে দুপুর হতে তখন মাত্র আধা সেকেণ্ড বাকি ছিল। ঘণ্টা বাজার সময় আসন্ন, সকলেই যার যার ঘড়ির দিকে চোখ রাখতেই ব্যস্ত। অবশ্য এটা ঠিক যে বাড়ির চূড়ায় সেই লোকটি ঘড়িটাকে নিয়ে এমন কিছু করছিল যেটা তার করার কথা নয়। কিন্তু ঘড়িটা যেই বাজতে শুরু করল অমনি সকলেই ঘড়ির শব্দ গুণতে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে লোকটির কাজকর্মের দিকে নজর রাখবার সময়ই তাদের হল না।

"ও যানা" ঘড়িটা বেজে উঠল।

ভণ্ডারভাট্টিমিটিসের প্রতিটি বুড়ো ভদ্রলোক চামড়া-ঢাকা আরাম কেদারায় বসে বলে উঠল, "ভন!" তার ঘড়িতেও বাজল "ভন!" সঙ্গে সঙ্গে ছেলেদের ঘড়িতেও বাজল "ভন!" এবং বিড়াল আর শুয়োরদের লেজ-মার্কা জেবঘড়িতেও সেই একই শব্দ বেজে উঠল।

"টু!" বড় ঘণ্টাতে বেজে উঠল ; আর

"ডু!" বেজে উঠল জেবঘড়িতে।

"থ্রি! ফোর! ফাইভ! সিক্স! সেভেন! এইট! নাইন! টেন!" ঘড়িতে পর পর বেজে গেল।

"ড্রি! ভোর! ফাইবে! স্যাক্স! সেবেন! আইট! নয়েন! তেন!" অন্য সব ঘড়িতে বাজল।

"ইলেভেন!" বড় ঘড়িটা বলল।

"ইলেবেন!" সবাই সমস্বরে সায় দিল।

"টুয়েল্‌ভ্!" ঘড়ি বলল।

"ড্‌বলেফ্!" খুশি হয়ে গলা নামিয়ে সকলেই উচ্চারণ করল।

যার যার ঘড়ি বন্ধ করে বেঁটে বুড়ো ভদ্রলোকরা বলল, "এখন সময় ঠিক ড্‌ব্‌লেফ্!" কিন্তু বড় ঘড়িটা তখনও থামল না।

ঘড়ি বলল, "থার্‌টিন!"

"ডের টিউফেল!" ঢোক গিলে বুড়ো ভদ্রলোকরা কথাটা উচ্চারণ করল ; তখন তাদের মুখ কালো হয়ে গেল, মুখ থেকে পাইপ খসে পড়ল, সকলেরই ডান পা বাঁ হাঁটুর উপর থেকে নেমে এল।

"ডের টিউফেল!" সকলেই আর্তনাদ করে উঠল। "ডার্‌টন! ডার্‌টিন! —মেইন গট্, এখন তো ঘড়িতে বাজে ডার্‌টিন!"

তারপর যে ভয়ংকর দৃশ্যের অবতারণা হল তা আর বলে কি হবে? গোটা ভণ্ডারভট্টিমিটিসই মুহূর্তের মধ্যে শোকে হাহাকার করে উঠল।

ছেলে—বুড়ো সকলেই নানাভাবে গলা ছেড়ে বিলাপ করতে লাগল। বুড়োরা পাইপে নতুন করে তামাক ভরে নিয়ে আরাম কেদারায় দেহ এলিয়ে দিয়ে এত ঘন ঘন এত বিপুল পরিমাণে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল যে দেখতে দেখতে গোটা উপত্যকা দুর্ভেদ্য ধোঁয়ার জালে ঢেকে গেল।

এদিকে সব বাঁধাকপি টকটকে লাল হয়ে উঠল ; মনে হয় স্বয়ং "নিক" বুঝি ঘড়ির রূপ ধরে সব কিছুর উপর ভর করেছে। আসবাবপত্রের উপর খোদাই-করা ঘড়িগুলো ভূতে-পাওয়ার মত নাচতে শুরু করল, আর অগ্নিকুণ্ডের তাকের উপরকার ঘড়িগুলো তীব্র ক্রোধ সামলাতে না পেরে এমনভাবে অনবরত কেবল "থারটিন—থারটিন" বাজতে লাগল, আর তাদের দোলকগুলো এমনভাবে বেঁকে-চুরে দুলতে লাগল যে সে ভয়ংকর দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। —কিন্তু অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল ; লেজে-বাঁধা জেবঘড়িগুলোর এই আচরণ সহ্য করতে না পেরে বিড়াল আর শুয়োরগুলো লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, আঁচড়ে-কামড়ে, মিয়াও-মিয়াও আর ঘোঁত-ঘোঁত করে, সকলের মুখের উপর লাফিয়ে উঠে আর পেটিকোটের ভিতর ঢুকে পড়ে এমন একটা নক্কারজনক হৈ-হট্টগোলের সৃষ্টি করল যা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কিন্তু এ সব কিছুর চাইতেও দুঃখের কথা হল, বাড়িটার মাথায় বসে বেঁটে

শয়তানটা তখন যা খুশি তাই করে চলেছে। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝেই সে ব্যাটাকে দেখা যাচ্ছে। ঐ তো, ঘণ্টা-ঘরের লোকটা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে, আর শয়তানটা তার বুকের উপর চেপে বসে আছে। ঘণ্টার দড়িটাকে দাঁতে কামড়ে ধরে অনবরত মাথা ঝাঁকিয়ে সে এমন বিচ্ছিরি শব্দ করছে যে সে কথা ভাবলে এখনও আমার কানে তালা লেগে যায়। বড় বেহালাটাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে তার তারের উপর দুই হাতকে এলোপাথাড়ি চালিয়ে তালে-বেতালে এমন এক ঝংকার তুলছে যেন একটা সাক্ষাৎ পাগলা গারদ!

এই পর্যন্ত দেখেই আমি বিরক্ত হয়ে সে স্থান ত্যাগ করে চলে এসেছি। এবার—সঠিক সময় ও সুরকে যারা ভালোবাসেন তাদের কাছে আমার আবেদন রাখছি। চলুন আমরা দল বেঁধে সেই শহরে যাই, আর সেই বেঁটে লোকটাকে বাড়ির মাথা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভণ্ডারভট্রিমিটিসের পুরনো দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনি।

নাক নিয়ে নাকাল

Lionising

আমি হচ্ছি—মানে, ছিলাম—একটি মহাপুরুষ; কিন্তু আমি "জুনিয়াস"-এর লেখক নই, বা মুখোশধারীও নই, কারণ আমার নাম রবার্ট জোন্স, আর আমি জন্মেছিলাম ফুম্-ফুজ শহরের কোন এক জায়গায়।

আমার জীবনের প্রথম কাজটি ছিল দুই হাত দিয়ে নিজের নাকটা চেপে ধরা। তা দেখেই মা বলেছিল, আমি একটি প্রতিভাঃ—আর বাবা আনন্দে চোখের জল ফেলতে ফেলতে আমাকে উপহার দিয়েছিল একখানি নিদানবিষয়ক (NOSOLOGY) গ্রন্থ। জাঙ্গিয়া পরার বয়স হবার আগেই আমি সে বিদ্যাটি আয়ত্ত করে ফেললাম।

বিজ্ঞানের চর্চা চলতেই থাকল, আর অচিরেই আমি বুঝতে পারলাম, বেশ খাড়া একটা নাক থাকলে তার দৌলতেই একটা মানুষ সিংহের মর্যাদায় উঠে যেতে পারে। কিন্তু আমার মনোযোগ কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ রইল না। রোজ সকালে দু'বার করে আমার লম্বা নাকের মাথাটাকে টেনে দিতাম এবং ছয় চুমুক করে মদ গিলতাম।

বড় হলে একদিন বাবা আমাকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। দুজন আসনে বসলে বাবা বলল, "আচ্ছা বাবা, তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি?"

আমি জবাব দিলাম, "নসলজি বাবা।"

বাবা জানতে চাইল, "নসলজিটা কি রবার্ট?"

আমি জবাব দিলাম, "নাসিকা-বিজ্ঞান বাবা।"

বাবা বলল, "নাক বলতে কি বোঝায় বলতে পার?"

আমি জবাব দিলাম, "দেখ বাবা, প্রায় হাজারখানেক লেখক নাকের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। (এই সময় আমি ঘড়িটা বের করলাম।) এখন সময় দ্বিপ্রহর বা তার কাছাকাছি; সবগুলি সংজ্ঞার কথা বলতে গেলে রাত দুপুর হয়ে যাবে। শুরুতেই বলি ঃ—বার্থোলিনাসের মতে, নাক হচ্ছে মুখের সেই স্ফীত অংশ—সেই আঁব—সেই বৃহদাকার আঁচিল—সেই—"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বলল, "ওতেই হবে বরার্ট। তোমার জ্ঞানের প্রাচুর্য দেখে আমি বজ্রাহত হয়েছি—আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করছে। (এখানে সে চোখ বুজে বুকের উপর হাত রাখল।) চলে এস! (এবার সে আমার হাতটা চেপে ধরল।) ধরে নিচ্ছি, তোমার শিক্ষা শেষ হয়েছে—এবার তোমাকে নিজের পথ দেখতে হবে—আর নাক-বরাবর এগিয়ে চলা ছাড়া তোমার গত্যন্তর নেই—সুতরাং—সুতরাং—সুতরাং (এবার বাবা আমাকে লাথি মেরে সিঁড়ি থেকে দরজার বাইরে বের করে দিল) সুতরাং আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হোন!"

আমার বুকের মধ্যে যেন শুনতে পেলাম ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। এই দুর্ঘটনাই আমার কাছে শাপে বর হয়ে দেখা দিল। স্থির করলাম, বাবার আদেশ মতই কাজ করব। চলব নাক-বরাবর। সেখানে দাঁড়িয়েই নাকটাকে বার দুই টানলাম। তার পরই লিখে ফেললাম নাসিকা-বিজ্ঞানের উপর একখানা পুস্তিকা।

সারা ফুম্-ফুজে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

"আশ্চর্য প্রতিভা!" লিখল "কোয়ার্টারলি" পত্রিকা!

"উঁচুদরের শরীরতত্ত্ববিদ!" লিখল "ওয়েস্ট মিন্স্টার।"

"সাহসী লোক বটে!" লিখল "ফরেনার।"

"চমৎকার লেখক!" লিখল "এডিনবরা।"

"গভীর চিন্তাশীল!" লিখল "ডাবলিন।"

"মহাপুরুষ!" লিখল "বেন্টলি।"

"ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ!" লিখল "ফ্রেজার।"

"আমাদেরই একজন!" লিখল "ব্ল্যাকউড।"

"লোকটি কে?" লিখল "মিসেস ব্যাস-ব্লু।"

"লোকটি কি করে?" লিখল মিস ব্যাস-ব্লু।—কিন্তু এসব কথায় আমি কানই দিলাম না। —সোজা ঢুকে গেলাম এক শিল্পীর দোকানে।

আত্মসুখসসর্বস্ব দেশের রাণী তার প্রতিকৃতি আঁকাবার জন্য বসে আছে; অমুক-তমুক দেশের জমিদার রাণীর পোষা কুকুরটিকে কোলে নিয়ে বসে আছে; এদেশ-সেদেশের বাবুটি তার সঙ্গে দহরম-মহরম চালাচ্ছে; আর ছুঁয়ো-না দেশের রাজাবাহাদুর রাণীর আসনের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

শিল্পীর কাছাকাছি গিয়ে আমি নাকটা বাড়ালাম।

রাণী বলল, “আহা, কী সুন্দর !”

জমিদার দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “আহারে !”

বাবুটি আর্তস্বরে বলল, “ওঃ, ভীষণ !”

রাজা বাহাদুর বলল, “ওঃ, কী ঘেন্না !”

শিল্পী শুধাল, “এর জন্য কত নেবো ?”

রাণী চীৎকার করে বলল, “নাকের জন্য !”

আসনে বসে আমি বললাম, “এক হাজার পাউণ্ড।”

শিল্পী মন্ত্রমুগ্ধের মত বলল, “সুন্দর !”

আমি বললাম, “এক হাজার পাউণ্ড।”

নাকটাকে আলোর দিকে ফিরিয়ে শিল্পী বলল, “আপনি কথা দিচ্ছেন ?”

ভাল করে নাক ঝেড়ে আমি বললাম, “দিচ্ছি।”

শ্রদ্ধার সঙ্গে নাকটা ছুঁয়ে শিল্পী বলল, “এটা সম্পূর্ণ আসল তো ?”

নাকটাকে একদিকে বেঁকিয়ে বললাম, “হুম !”

অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাল করে দেখে সে বলল, “এর কোন অনুকৃতি নেই তো ?”

নাকটাকে উপরে তুলে বললাম, “একটাও না।”

সে সবিস্ময়ে বলল, “আশ্চর্য !”

আমি বললাম, “এক হাজার পাউণ্ড।”

সে বলল, “এক হাজার পাউণ্ড ?”

আমি বললাম, “ঠিক তাই।”

সে বলল, “এক হাজার পাউণ্ড ?”

আমি বললাম, “একেবারে ঠিক।”

সে বলল, “তাই পাবেন। কী অপূর্ব কলাকৌশল !” সেখানেই আমাকে একটা চেক কেটে দিয়ে সে আমার নাকের একটা রেখাচিত্র এঁকে নিল। আমি জেরমিন স্ট্রীটে একটা বাসা নিলাম, আর “নাসিকা-বিজ্ঞান”-এর নিরানব্বইতম সংস্করণটি রাণীকে পাঠিয়ে দিলাম। সঙ্গে পাঠালাম নাকের ডগার একটা প্রতিকৃতি। ওয়েল্‌সের যুবরাজ আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

সেখানে সমবেত হল নানা দিকদেশ থেকে আগত যত সব মহামহা পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তি। যথাসময়ে আমিও গিয়ে হাজির হলাম। প্রত্যেকেই যার যার বিষয়ের উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রোমহর্ষক বক্তব্য রাখল। আমি বললাম নিজের কথা—নিজের কথা আর নিজের কথা; —আমার “নাসিকা-বিজ্ঞান”-এর কথা, আমার পুস্তিকার কথা, আর নিজের কথা। নাকটা তুলে ধরে আবারও নিজের কথাই বললাম।

যুবরাজ বলল, “আশ্চর্য বুদ্ধিমান মানুষ !”

অতিথিরা বলল, “চমৎকার !”

পরদিন আত্মসুখসর্বস্ব দেশের রাণী আমার সঙ্গে দেখা করতে এল।

আমার থুতনিতে টোকা দিয়ে বলল, “ওগো সুন্দর, তুমি কি আলমাক-এ একবার যাবে ?”

“নিশ্চয় যাব,” আমি বললাম।

“নাকসহ তো ?” রাণী শুধাল।

“ঠিক যেমনটি আছি” আমি জবাব দিলাম।

“তাহলে এই আমার কার্ড রইল। আমি বলতে পারি তো তুমি যাবে ?”

“প্রিয় রাণীসাহেবা, আমার সারা অন্তর নিয়ে যাব।”

“উঁহু, তা হবে না ! তোমার গোটা নাক নিয়ে যেতে হবে।”

“নাকের প্রতিটি অংশই নিয়ে যাব প্রিয়া”—বলেই নাকটাকে দু'একবার মোচড় দিতেই হাজির হলাম আলমাক-এ।

বাড়ি-ঘর দম বন্ধ-করা ভিড়ে ঠাসা।

সিঁড়ি থেকেই একজন বলল, “তিনি আসছেন !”

আর একটু উঠে আর একজন বলল, “তিনি আসছেন।”

আরও উপর থেকে একজন বলল, “তিনি আসছেন।”

রাণী মহাউল্লাসে বলে উঠল, “সে এসে গেছে ! আমার প্রিয়জনটি এসে গেছে !” —দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে সে আমার নাকের উপর তিন তিনবার চুমো খেল।

তারপরই শুরু হল হট্টগোল। চারদিক থেকেই ছুঁড়ে দেওয়া হল নানা কটূক্তি, নানা বিদ্রূপ। শেষ পর্যন্ত ব্লাডেননাফ-এর নির্বাচক পর্যন্ত অশ্লীল ভাষায় আমাকে গালাগালি করতে লাগল।

সহ্য হল না। খুব রেগে গেলাম। ব্লাডেননাফ-এর নির্বাচকের দিকে ছুটে গিয়ে বললাম, “মশাই, তুমি একটা বড় বাঁদর।”

তারপর যা হবার তাই হল। দু'জনে কার্ড-বিনিময় করলাম। পরদিন সকালে চক-গোলাবাড়িতে মুখোমুখি হয়ে এক ঘুসিতে তার নাকটা উড়িয়ে দিলাম। তারপর গেলাম বন্ধুদের কাছে।

প্রথম বন্ধু বলল, “মুখ্খু !”

দ্বিতীয় বলল, “বোকা !”

তৃতীয় বলল, “হাঁদা !”

চতুর্থ বলল, “গাধা !”

পঞ্চম বলল, “ভ্যাবলা !”

ষষ্ঠ বলল, “হাবলা !”

সপ্তম বলল, “ভাগ হিয়াসে !”

কথাগুলি শুনে বড়ই মর্মাহত হলাম। তাই বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম।

তাকে প্রশ্ন করলাম, “বাবা, আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি ?”

বাবা উত্তর দিল, “শোন বাছা, তোমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য এখনও “নাসিকা-বিজ্ঞান” অধ্যয়ন। কিন্তু নির্বাচকের নাকে আঘাত করে তুমি লক্ষ্যকেও ছাড়িয়ে গেছ।

তোমার একটা ভাল নাক আছে তা সত্যি ; কিন্তু ব্লাডেন্‌নাফের ত নাকই নেই। তাই তো তোমাকে সকলে ধিক্কার দিল, আর সে হয়ে গেল আজকের নায়ক। আমি মানছি যে, ফুম্-ফুজে একটা সিংহের মহত্তের পরিমাপ হয় তার নাকটা কত বড় তাই দিয়ে—কিন্তু হা ঈশ্বর! যে সিংহের নাকই নেই তার সঙ্গে কি প্রতিযোগিতায় নামতে আছে!

শয়তানের কাছে তোমার মাথাটা বাজি রেখো না

একটি নীতি-গল্প

Never Bet the Devil Your Head

আমার মৃত বন্ধু টবি ড্যামিটের নিন্দাবাদ করতে আমি বসি নি। সত্যি সে ছিল এক দুর্ভাগা কুকুর, আর সে মরেছেও কুকুরের মত। কিন্তু তার অসৎকর্মের জন্য কেবল সে নিজেই দায়ী ছিল না ; তার মায়েরও অনেক ত্রুটি ছিল। শিশুকাল থেকেই মা তাকে বেদম মারধোর করেছে। আর মাত্রাতিরিক্ত গালমন্দ ও মারধোরের ফলেই দিনের পর দিন সে খারাপ থেকে আরও খারাপ হয়ে গেল।

ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল। তখন এমন অবস্থা দাঁড়াল যে জুয়ারীর ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাই তার মুখে যোগাত না। সে যে সত্যি সত্যি জুয়া খেলত তা নয়। আসলে বাজি ধরাটা তার একটা কথার মাত্রা হয়ে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ অর্থহীনভাবেই সে কথাগুলি উচ্চারণ করত। ফলে যখন সে বলত "তোমার সঙ্গে আমি হেন-তেন বাজি ধরব", তখন কেউ তার কোন দামই দিত না। তথাপি এই বাজি ধরার ব্যাপারটা থেকে তাকে বিরত করাটাকে আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম। তাকে বললাম, অভ্যাসটা নীতিবিরুদ্ধ। তাকে বোঝাতে চাইলাম, এটা ইতর জনের বদভ্যাস। সমাজও এটাকে ভাল চোখে দেখে না। তাকে বকাবকি করলাম—কোন ফল হল না। প্রতিবাদ জানালাম—বৃথা হল। অনুরোধ করলাম—সে হাসল। উপদেশ দিলাম—সে বিদ্রূপ করল। ভয় দেখালাম—সেও প্রতিজ্ঞা করে বসল। লাথি মারলাম—সে পুলিশ ডাকল। তার নাক টানলাম, সে সশব্দে নাক ঝাড়ল। শেষ পর্যন্ত বলেই বসল, এ ধরনের কাজ দ্বিতীয়বার করলে সে তার মাথাটাই শয়তানের কাছে বাজি ধরবে।

ড্যামিটের জীবনে আর একটা পাপ ছিল তার দারিদ্র্য। অসম্ভব রকমের গরিব ছিল সে ; আর নিঃসন্দেহে সেই কারণেই তার বাজি ধরার ব্যাপারটা কখনই অর্থনৈতিক রূপ পেত না। "তোমার সঙ্গে এক পাউন্ড বাজি ধরলাম"—এ রকম কথা তার মুখে কদাচিৎ শোনা যেত ; সাধারণতই সে বলত "তোমার যা খুশি তাই বাজি ধরছি", অথবা

“তুমি সাহস করে যা বাজি ধরবে তাতেই আমি রাজী ; অথবা আরও বেশী অর্থপূর্ণভাবে বলত “আমার মাথাটাই শয়তানের কাছে বাজি রাখব।”

শেষোক্ত বাজির বয়ানটাই তাকে সর্বাধিক খুশি করত ; —হয় তো তাতে কোন আর্থিক ঝুঁকি থাকত না বলেই ; ড্যামিট অতিরিক্ত কৃপণও হয়ে উঠেছিল। হয়তো এ সবই আমার নিজের ভাবনা-চিন্তার কথা, হয়তো বন্ধুর ঘাড়ে এ সব দোষ চাপিয়ে দেওয়াটাও ঠিক নয়। তবু মস্তিষ্ককেও ব্যাংক-নোটের মত বাজি রাখার চিন্তাটাই যে একান্ত অশোভন এই সত্যটাই আমি কোনমতেই বন্ধুকে বোঝাতে পারলাম না। শেষপর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়াল যে অন্য সবরকম বাজি ছেড়ে দিয়ে সে একান্তভাবে “আমার মাথাটাকেই শয়তানের কাছে বাজি রাখব” এই কথাটাকেই আঁকড়ে ধরে রইল। তার এই মনোভাব দেখে ক্রমেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। অনেক দুঃখে তার এই মনোবৃত্তির নাম দিলাম—অদ্ভুত। মিঃ কোলরিজ হয় তো একে বলতেন—রহস্যময় ; মিঃ কান্ট বলতেন—সর্বেশ্বরবাদ ; মিঃ ইমারসন বলতেন—অতিমাত্রায় বড় এক ধাঁধা। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভাল লাগত না। মিঃ ড্যামিটের মন ক্রমেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। স্থির করলাম, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বাঁচাব। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাজেই লেগে গেলাম। তাকে নতুন করে বোঝাবার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম।

আমার বক্তৃতা শেষ হতেই মিঃ ড্যামিট এমন সব আচরণ করত যার অর্থ ঠিক বোঝাই যেত না। কখনও সে আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে চুপ করে থাকত। পরক্ষণেই মাথাটা একদিকে হেলিয়ে ভুরু দুটোকে অনেকখানি উপরের দিকে তুলে ধরত। তারপর দুই হাতের তালু প্রসারিত করে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিত। তারপর ডান চোখে পিট পিট করে তাকাত। তারপর বাঁ চোখেও সেই একই প্রক্রিয়া। তারপর দুটো চোখই শক্ত করে বন্ধ করত। আবার তারপরেই দুটো চোখ মেলে এত বড় বড় করে তাকাত যে তার পরিণতির কথা ভেবে আমি খুব ভয় পেয়ে যেতাম। তখন নাকের উপর বুড়ো আঙুলটা ধরে অন্য আঙুলগুলোকে অদ্ভুত সব ভঙ্গীতে নাড়াচাড়া করত। তারপর দুটো হাত মুড়ে বুকের উপর রেখে আমার কথাগুলির জবাব দিত।

তার বক্তব্যের প্রধান প্রধান কথাগুলি আমার মনে পড়ে। আমি চুপ করলেই সে বাধিত হবে। আমার কোন পরামর্শ সে শুনতে চায় না। আমার বকুনিকে সে ঘৃণা করে। নিজেকে সামলে চলার মত বয়স তার হয়েছে। আমি কি এখনও তাকে খোকা ড্যামিটই মনে করি নাকি ? তার চরিত্রের প্রতি কোনরকম কটাক্ষ করতে চাই নাকি ? তাকে অপমান করার বাসনা কি আমার আছে ? আমি কি বোকা ? আর একবার নতুন করে জানতে চায়, আমি যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি সেটা আমার মা জানে কি না। সে বলত, আমি যে চুপ করে আছি তাতেই ধরা পড়ে গেছি। এ ব্যাপারে সে শয়তানের কাছে তার মাথাটা বাজি রাখতেও রাজী।

আমার উত্তর না শুনেই মিঃ ড্যামিট দ্রুত সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।

পালিয়ে ভালই করল। নইলে আমার যে পরিমাণ রাগ হয়েছিল, হয় তো তাকে দু'ঘা মেরেই বসতাম।

কিন্তু খোদা শেফা মিদেহেদ—আল্লাহ্ সকলকে শান্তি দিন—তুমি অপর কারও পা মাড়িয়ে দিলে মুসলমানরা এই কথাটা বলে থাকে। আমি তো কর্তব্যের খাতিরেই এ কাজ করছি, অতএব মানুষের মতই এ অপমানও হজম করে নিলাম। উপদেশের মাত্রা কমিয়ে দিলেও তার সঙ্গকে একেবারে ছেড়ে দিতে পারলাম না। তার কথাবার্তা শুনে দুঃখে চোখে জল এলেও হাসিমুখে তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসাই করে চলতাম।

একদিন হাতে হাত ধরে বেড়াতে বেড়াতে আমরা নদীর দিকে এগোতে লাগলাম। পথে একটা সেতু পার হতে হবে। রোদ-বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেতুর মাথাটা ঢাকা দেওয়া; ফলে ভিতরটা চলাফেরার পক্ষে বেশ অন্ধকার। বাইরে এত আলো, আর ভিতরটা এত অন্ধকার দেখে আমার মেজাজটা কেমন যেন বিগড়ে গেল। ড্যামিটের কিন্তু কোনরকম ভাবান্তর দেখা গেল না। বরং তাকে অস্বাভাবিক রকমের খোশ মেজাজের বলেই মনে হল। এমন কি সে বলেই ফেলল, আমার যে মন খারাপ হয়েছে এ জন্য সে শয়তানের কাছে তার মাথাটা বাজি রাখতেও রাজী আছে। তারপর লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, চীৎকার-চেঁচামেচি করে; বড় বড় কথা বলে সে একটা হুলুস্থুলু কাণ্ড বাঁধিয়ে বসল; অথচ সারাক্ষণ তার মুখটা বেশ গুরুগম্ভীরই থাকল। যাই হোক, সেতুটা একেবারে পার হবার মুখে পড়ল বেশ উঁচু একটা ঘোরানো ফটক। সেটাকে যথারীতি ঘুরিয়ে আমি ফটকটা পার হয়ে গেলাম। কিন্তু মিঃ ড্যামিট সে পথেই গেল না। সে গোঁ ধরে বসল, ঘোরানো ফটকটাকে লাফিয়ে পার হবে। কিন্তু আমি ভালভাবেই জানতাম তা সে পারবে না। অনেক করে বোঝালাম; বললাম, মুখে যতই বড়াই করুক আসলে যা বলছে তা সে কিছুতেই করতে পারবে না। কথাটা বলেই বোধ হয় ভুল করলাম, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই সে বাজি ধরে বসল, শয়তানের কাছে তার মাথাটাই বাজি রইল, এ কাজ সে করবেই।

তাকে কিছু বলতে যাব এমন সময় আমার পাশ থেকেই কার যেন কাশি শুনতে পেলাম—কাশিটা শোনাল অনেকটা "আহেম!" শব্দের মত। চমকে উঠে চারদিকে তাকাতেই চোখ পড়ল সেতুটার এক কোণে—সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ভদ্র চেহারার একটি খোঁড়া বৃদ্ধ মানুষ। লোকটির সারা দেহেই সম্ভ্রমের সুস্পষ্ট ছাপ; পরনে কালো সুট, শার্টটা ধপধপে পরিষ্কার, সাদা গলাবন্ধের উপর কলারটা পরিপাটি করে নামানো, মাথার চুল মেয়েদের মত মাঝখানে ভাগ করে সিঁথি করা। তার হাত দুটি যুক্ত করে পেটের উপর রাখা, আর চোখ দুটি সযত্নে মাথার দিকে তোলা।

আরও ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম, তার সারা শরীর একটা রেশমি কালো এপ্রনে ঢাকা; সেটা আমার কাছে অদ্ভুত বলে মনে হল। যাই হোক, আমি কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক দ্বিতীয়বার বললেন "আহেম!"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলাম না; এ ধরনের মন্তব্যের কোন জবাব

সরাসরি দেওয়া যায় না। ড্যামিটের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কি করছ ড্যামিট? শুনতে পাও নি?"—ভদ্রলোক বলছেন "আহেম!"

কথাটা শোনামাত্রই ড্যামিট যেন কেমন হয়ে গেল। তার সারা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত ঢোঁক গিলে বলে উঠল, "বলছ কি? তুমি ঠিক শুনেছ উনি এই কথাগুলি বলেছেন? দেখ, আমি যা ভেবেছি তা করবই; কোন কিছুই আমাকে আটকাতে পারবে না। এই তাহলে—আহেম!"

ঈশ্বর জানেন কেন, এতে বুড়ো ভদ্রলোকটিকে বেশ খুশি-খুশি মনে হল। সেতুর কোণ থেকে একলাফে এগিয়ে তিনি ড্যামিটের হাতটা ধরে পরম সমাদরে ঝাঁকুনি দিলেন; সারাক্ষণ তার মুখের দিকেই তাকিয়ে রইলেন এক অবিমিশ্র অনুকম্পায়।

সরল হাসি হেসে বললেন, "ড্যামিট, আমি নিশ্চিত জানি তুমি এ বাজি জিতবে, কিন্তু নিছকই আনুষ্ঠানিকভাবে তোমার একটা পরীক্ষা আমাদের নিতে হবে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বন্ধুটি তার কোট খুলে ফেলল, পকেট-রুমালটা কোমরে বেঁধে নিল, এবং চোখ দুটোকে উল্টে আর মুখের দুটি কোণকে ঝুলিয়ে দিয়ে মুখের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়ে জবাব দিল, "আহেম!" একটু থেমে আবার বলল, "আহেম!" তার বেশী আর একটা কথাও মুখ থেকে বের হল না। আমি ভাবলাম, "আহারে!" কোথায় গেল তার সেই অবিরাম বকবকানি!"

বুড়ো ভদ্রলোক এবার হাত ধরে তাকে নিয়ে গেলেন সেতুটার ছায়ার নীচে—ঘোরানো ফটকটা থেকে কিছুটা আগে। তারপর বললেন, "দেখ বাবা, বিবেকের খাতিরেই তোমাকে এটুকু পথ দৌড়বার সুযোগ দিচ্ছি। আমি ঐ ফটকটার কাছে না পৌঁছনো পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর, যাতে আমি দেখতে পাই তুমি সেতুটাকে ভালভাবে পার হলে না শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের মত পার হলে; আর লাফ দেবার সময় পায়রার ডানার উড়াল দেবার ভঙ্গীটা দেখাতে যেন ভুলো না। কি জান, ঐ ভঙ্গীটাই তো আসল। আমি বলব "এক, দুই, তিন, ছোটো।" মনে রাখবে, "ছোটো" বললে তবেই দৌড় শুরু করবে। এখানে তিনি ঘোড়ানো ফটকটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, এক মুহূর্ত গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন, তারপর মুখ তুলে ঈষৎ হাসলেন, তারপর এপ্রনের দড়িটা কসে বেঁধে নিয়ে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ড্যামিটের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত কথামত নির্দেশটি ঘোষণা করলেন—

এক—দুই—তিন—এবার ছোটো!

ছোট কথাটির সঙ্গে সঙ্গেই আমার বন্ধুটি জোরে দৌড় শুরু করল। ঘোরানো ফটকটা বেশী উঁচু নয়, আবার খুব নীচুও নয়। তাই আমি নিশ্চিত ছিলাম, সে ওটা পার হতে পারবে। তবু—যদি না পারে? —হায়, সেটাই তো আসল প্রশ্ন—যদি না পারে তাহলে? বললাম, "এই বুড়ো ভদ্রলোকের কি অধিকার আছে আর একটি ভদ্রলোককে লাফ দেওয়াবার? তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—কে সে? সে যদি আমাকে লাফ দিতে বলত, আমি কিছুতেই দিতাম না। সে যত বড় শয়তানই হোক

আমি তার পরোয়া করি না।” আগেই বলেছি, সেতুটা খিলানযুক্ত, এবং অদ্ভুতভাবে আচ্ছাদিত; ফলে সব সময়ই একটা অস্বস্তিকর প্রতিধ্বনি শোনা যায়—আমার শেষের কথাগুলি উচ্চারণের সময় সেই প্রতিধ্বনি যতটা শুনতে পেলাম আগে তা পাই নি।

কিন্তু আমি যা বলেছি, যা ভেবেছি, আর যা শুনেছি সে তো একমুহূর্তের ব্যাপার। দৌড় শুরু করার পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই বেচারি টবি দিল এক লাফ। আমি দেখলাম, খুব সাবলীলভাবে দৌড়ে গিয়ে সে চমৎকারভাবে সেতুর উপর থেকে লাফ দিল; দুটো পা নড়তে লাগল ওড়ার ভঙ্গীতে। দেখলাম, আশ্চর্য ভঙ্গীতে ডানা ওড়ানোর কায়দায় বাতাসে ভর করে সে অনেক উঁচুতে উঠে গেল ঠিক ঘোড়ানো ফটকটার মাথার উপরে। কিন্তু মুহূর্তকাল পরেই ডামিট সটান নীচে নেমে চিত হয়ে পড়ে গেল ঘোরানো ফটকের এপারেই। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি দেখতে পেলাম, ঘোরানো ফটকের ঠিক উপরে খিলানের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা কি যেন ধপ্ করে তার এপ্রনের উপর পড়তেই সেটাকে ধরে এপ্রনের ভিতর গুটিয়ে অতি দ্রুত ছুটতে শুরু করল। বিস্ময়ে আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম; কিন্তু কোন কিছু ভাববার সময় নেই; মিঃ ড্যামিট তখনও স্থির হয়ে পড়ে আছে; তাকে এখনই সাহায্য করতে হবে। তার কাছেই ছুটে গেলাম; বুঝতে পারলাম তার আঘাত গুরুতর। আসলে তার মাথাটাই নেই; অনেক খুঁজেও কোথাও সেটার হদিস পেলাম না। স্থির করলাম, তাকে বাড়িতে নিয়ে একজন হোমিওপ্যাথকে ডেকে পাঠাব। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মাথায় এল; সেতুর একটা জানালা খুলে দিতেই করুণ সত্যটি মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঘোরানো ফটকের প্রায় পাঁচ ফুট উপরে সেতুর দুই পারকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য বরগার মত আড়াআড়িভাবে বসানো রয়েছে একটা চওড়া লোহার পাত। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, লাফ দেওয়ামাত্রই আমার হতভাগ্য বন্ধুটির গলা সেই পাতলা লোহার পাতের উপর গিয়ে পড়েছিল।

তাকে বাঁচানো গেল না। হোমিওপ্যাথ ভদ্রলোকের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগল; একসময় সে মারাই গেল। যারা বড় বেশী হৈ-চৈ করে জীবন কাটাতে চায় তাদের একটা শিক্ষা হয়ে গেল। চোখের জলে তার কবরকে ভিজিয়ে দিলাম; সংকারের দরুন যৎসামান্য খরচের একটা বিল পাঠালাম যথাযথ সংস্থার কাছে। সে হতভাগারা টাকা দিতে রাজী হল না; অগত্যা মিঃ ড্যামিটকে কবর থেকে তুলে এনে কুকুরের খাদ্য হিসাবে বিক্রি করে দিলাম।

"তুমিই সেই মানুষ"

র‍্যাট্‌ল্‌বরো রহস্যের ক্ষেত্রে এবার আমি ঈডিপাসের ভূমিকায় অবতীর্ণ হব।

দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি, যে ঘটনার বিবরণ আমি কিছুটা হাল্কা চালেই দিতে বসেছি সেটা ঘটেছিল ১৮—এর গ্রীষ্মকালে। শহরের অন্যতম ধনী ও সম্ভ্রান্ত নাগরিক মিঃ বার্ণাবাস শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি গত কয়েকদিন হল সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এক শনিবার খুব সকালে মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি র‍্যাট্‌ল্‌বরো থেকে অশ্বারোহণে যাত্রা করেছিলেন প্রায় পনেরো মাইল দূরবর্তী শহরে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে, আর সেইদিন রাতেই তার ফিরে আসারও কথা ছিল। যাত্রার দুই ঘণ্টা পরে তাকে না নিয়েই ঘোড়াটি ফিরে এল। যাত্রার সময় ঘোড়ার পিঠে জিনের সঙ্গে যে থলেগুলো বাঁধা ছিল সেগুলোও পাওয়া যায় নি। ঘোড়াটা আহত অবস্থায় এসেছিল; তার গায়েও কাদা মাখানো ছিল। এই সব কারণে নিরুদ্দিষ্ট লোকটির বন্ধুদের মনে যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। আর রবিবার সকালেও যখন তার দেখা পাওয়া গেল না তখন গোটা শহরের লোকই তার খোঁজ পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল।

এই খোঁজের ব্যাপারে সর্বাধিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখালেন মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দির ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ চার্লস গুডফেলো। সকলেই তাকে ডাকত চার্লি গুডফেলো বা বুড়ো চার্লি গুডফেলো বলে। কিন্তু ব্যাপারটা এক বিস্ময়কর যোগাযোগ, নাকি নামেরই গুণ সেটা আমি আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি; তবে এটা সন্দেহাতীত ভাবে নিশ্চিত যে, আজ পর্যন্ত চার্লস নামধারী এমন একটি লোককেও আমি দেখি নি যে সাহসী, সৎ, সদন্তকরণ, দিল-খোলা, এবং সেই সঙ্গে শ্রুতিসুখকর কণ্ঠস্বর ও শুদ্ধ বিবেকের অধিকারী নয়।

এখন, "বুড়ো চার্লি গুডফেলো" র‍্যাট্‌ল্‌বরোতে বসবাস শুরু করেছেন ছ' মাসের বেশী হয় নি, আর এখানে আমার আগেকার তার কোন খোঁজ-খবরও কেউ রাখে না; অথচ এরই মধ্যে শহরের সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় জমাতে তার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নি। এখন তো সকলের কাছেই তার মুখের একটি কথাই হাজার কথার সমান; আর মেয়েরা তো তার কথায় একেবারে পঞ্চমুখ।

আগেই বলেছি, মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি র‍্যাট্‌ল্‌বরোর সব চাইতে ধনী এবং সব চাইতে গণ্যমান্য লোক, আর তার সঙ্গে "বুড়ো চার্লি গুডফেলো"র এতই দহরম-মহরম যে তাকে তো আপন ভাই বলেই মনে হয়। দুজন বাস করেন পাশাপাশি বাড়িতে; যদিও মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি কদাচিৎ "বুড়ো চার্লি"র বাড়িতে যান, এবং কখনও তার বাড়িতে কিছু খান না, তবু দুই বন্ধুর ঘনিষ্ঠতায় কোন বাধা পড়ে নি; কারণ "বুড়ো চার্লি" দিনে তিন-চারবার প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ-খবর নেন, প্রায়ই সেখানে প্রাতরাশ ও চায়ের পাট সারেন; ডিনার সারতেও ভুল করেন না; আর দুই বুড়ো মিলে কত যে মদ গেলেন তার কোন নিরাকরণ নেই। বুড়ো চার্লির প্রিয় পানীয় হল

"শাতু-মার্গো", আর ভাল মানুষ মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি'ও সর্বদাই কড়া নজর রাখেন যাতে বুড়ো বন্ধুটি প্রাণভরে সেই মদ গিলতে পারেন। একদিন হল কি—যখন অনেক মদ পেটে পড়ল আর সেই অনুপাতে বুদ্ধি গেল গুলিয়ে, তখন স্যাঙাতের পিঠে এক থাপ্পড় কসিয়ে বুড়ো ভদ্রলোক বলে উঠলেন—"তোমাকে আসল কথাটি বলছি বুড়ো চার্লি, জন্মাবধি তোমার মত এমন আমুদে বুড়ো মানুষ আমি আর একটিও দেখি নি ; তাইতো এই মদটা যখন তুমি এতই ভালবাস তখন "শাতু-মার্গো"র একটা বড় বাক্স তোমাকে আমি উপহার দেবই। তুমি দেখে নিও—আজই একটা ডবল বাক্সের অর্ডার আমি শহরে পাঠাব। "মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি'র উদারতার এই ছোট নমুনাটির কথা উল্লেখ করলাম শুধু দুই বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার পরিমাপটা বোঝাবার জন্য।

তারপর রবিবার সকালে যখন বোঝা গেল যে মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি'র কোন বিপদ ঘটেছে, তখন সব চাইতে বেশী বিচলিত হতে দেখলাম "বুড়ো চার্লি গুডফেলো" কেই। দুঃসংবাদটি শোনামাত্রই তার মুখ এতই বিবর্ণ হয়ে গেল যেন নিরুদ্দিষ্ট লোকটি তার নিজের দাদা বা বাবা ; তার সারা শরীর এমনভাবে কাঁপতে লাগল যেন তাকে পালা-জ্বরে ধরেছে।

শোকে তিনি এতই মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যে কোন কিছু করা বা ভাবাই তার পক্ষে সম্ভব হল না। ফলে বেশ কিছুদিন যাবৎ এ ব্যাপারে তিনি অন্য কাউকেই কিছু করতে দিলেন না ; বললেন, এই পরিস্থিতিতে আপাতত কিছুদিন দু'এক সপ্তাহ বা দু'একমাস—অপেক্ষা করেই দেখা যাক কিসে কি হয়, মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি নিজেই ফিরে এসে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলেন কি না। আমি ভাল করেই জানি, শোক খুব তীব্র হলে অনেকে এই ভাবেই সময় কাটাতে চায়।

"বুড়ো চার্লি"র জ্ঞান ও বিবেচনা-শক্তির উপর র‍্যাট্‌ল্‌বরোর অধিবাসীরা এত বেশী আস্থাবান ছিল যে তাদের প্রায় সকলেই বুড়োর প্রস্তাব মেনে নিল। কিন্তু তাতে বাদ সাধল মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি'র দুশ্চরিত্র ও লম্পট যুবক ভাইপোটি। তার নাম পেনিফেদার। চুপচাপ বসে থাকার স্বপক্ষে কোন যুক্তিই সে শুনল না ; সে চাইল, অবিলম্বে নিহত লোকটির মৃতদেহের সন্ধান করা হোক। এই নিয়ে কিছুক্ষণ কিছু বাক-বিতন্ডা ও তর্কাতর্কি হল। বিশেষ করে "বুড়ো চার্লি" ও মিঃ পেনিফেদারের মধ্যে তো একপ্রস্থ তর্কের লড়াইই হয়ে গেল। তবে এটা কোন নতুন ঘটনা নয় ; গত তিন-চার মাস ধরেই দুজনের মধ্যে দারুণ মনকষাকষি চলছিল। একদিন তো খুড়োর বাড়িতে এসে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করায় মিঃ পেনিফেদার খুড়োর বন্ধুটিকে এক ঘুসিতে একেবারে ধরাশায়ী করে ফেলেছিল। "বুড়ো চার্লি" অবশ্য ব্যাপারটাকে বেশী দূর গড়াতেই দেন নি। ধীরে সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক-আশাক ঠিক করে নিয়ে পাল্টা ঘুসি চালাবার বদলে "পরে দেখে নেব" বলে তখনকার মত সরে পড়েছিলেন।

সে যাই হোক (ঘটনাটা এখানে অবান্তর)। প্রধানত মিঃ পেনিফেদারের পীড়াপীড়িতেই র‍্যাট্‌ল্‌বরোর লোকরা শেষ পর্যন্ত স্থির করল—দলে দলে ভাগ হয়ে তারা নিরুদ্দিষ্ট মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি'র খোঁজে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। "বুড়ো চার্লি"-র

কোন বাধাই তারা মানে নি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত "বুড়ো চার্লি"-ই তাদের আগে আগে চললেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাপারে "বুড়ো চার্লি" অপেক্ষা ভাল পথ-প্রদর্শক আর কেউ হতে পারত না। সকলেই জানত তার চোখ দুটি বন-বিড়ালের মতই তীক্ষ্ণদৃষ্টি। কিন্তু প্রায় সপ্তাহকাল ধরে অলিতে-গলিতে, এ-পথে সে-পথে, সারা দিন সারা রাত খোঁজাখুঁজি করেও মিঃ শাটলওয়ার্দির চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেল না। অবশ্য "চিহ্নমাত্র" কথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া ঠিক হবে না। কিছু চিহ্ন অবশ্যই পাওয়া গিয়েছিল। ভদ্রলোকের ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ অনুসরণ করে শহর থেকে তিন মাইল দূরে বড় রাস্তাটার ধারেই একটা জায়গায় পৌঁছন গেল। সেখান থেকে একটা ছোট গলি-পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় আধা মাইল ঘুরে আবার বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে। সেই গলি-পথে ঘোড়ার ক্ষুরের ছাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধানকারী দলটা শেষ পর্যন্ত একটা বদ্ধ জলার ধারে গিয়ে পৌঁছল। গলির ডান দিকের ঝোঁপ-জঙ্গলে সবকিছুই প্রায় ঢেকে গেছে। জলার ওপারে অশ্বক্ষুরের চিহ্নমাত্রও চোখে পড়ল না। অবশ্য দেখে মনে হল সেখানে একটা ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়েছে এবং মানুষের চাইতে বড় ও ভারী একটা দেহকে গলি থেকে জলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দু'বার খুঁজেও সেখানে কিছু না পাওয়ায় দলটি হতাশ হয়ে ফিরেই যাচ্ছিল, এমন সময় বিধাতাপুরুষই যেন মিঃ গুডফেলোর কানে কানে বলে দিল—জলার সবটা জলই তুলে ফেলা হোক। সকলেই এক বাক্যে "বুড়ো চার্লি"-র প্রস্তাবটি সমর্থন করল, তার অনেক গুণকীর্তনও করল। দলের অনেকেই কোদাল নিয়ে এসেছিল, কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই নালা কেটে জলটা বের করে দেওয়া হল। জলের তলাটা দৃষ্টিগোচর হতেই তলাকার কাদা-মাটির ঠিক মাঝখানে চোখে পড়ল কালো ভেলভেটের একটা ওয়েস্টকোট। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত প্রায় সকলেই সেটাকে পেনিফেদারের সম্পত্তি বলে চিনতে পারল। ওয়েস্ট কোটটা বেশ ছেঁড়া ও রক্তমাখা ছিল। দলের অনেকেরই স্পষ্ট মনে পড়ল, যেদিন সকালে মিঃ শাটলওয়ার্দি শহরে যাত্রা করেছিলেন সেই সময় ওই ওয়েস্টকোটটা তার মালিকের গায়েই ছিল: আবার কেউ কেউ শপথ করেই বলল যে, সেই স্মরণীয় দিনটির পরবর্তী সময়ে মিঃ পি-কে আর সেই জামাটি পরতে দেখা যায় নি; অথবা এমন কথাও কেউ বলল না যে মিঃ শাটলওয়ার্দির নিখোঁজ হবার পরেও মিঃ পি.-র গায়ে তারা ওই জামাটা দেখেছে।

ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠল যখন দেখা গেল যে মিঃ পেনিফেদারের মুখ ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে, আর এ বিষয়ে তার নিজের কি বলার আছে জানতে চাওয়া হলে সে একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারল না। ফলে, ভ্রষ্টচরিত্র হওয়া সত্ত্বেও যে কয়টি বন্ধু তার তখনও ছিল তারাও একযোগে তাকে পরিত্যাগ করল, এবং শত্রু-মিত্র সকলেই সমস্বরে তাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করার দাবী জানাল। কিন্তু অপর পক্ষে মিঃ গুডফেলোর মহত্ত্ব যেন অধিকতর উজ্জ্বলতায় ঝলমল করে উঠল। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তিনি মিঃ পেনিফেদারের পক্ষ সমর্থন করলেন এবং সেই প্রসঙ্গে একাধিকবার জানালেন, "মিঃ গুডফেলোর উত্তরাধিকারী" এই অসংযতচরিত্র যুবকটিকে

তিনি একান্তভাবেই ক্ষমা করেছেন। তিনি বললেন, "অন্তরের অন্তস্থল থেকে তিনি তাকে ক্ষমা করেছেন; এবং তিনি (মিঃ গুডফেলো) নিজে এই সন্দেহকে বড় করে তো দেখবেনই না, বরং সাধ্যমত চেষ্টা করবেন, যতটুকু বাগ্মিতা তার আছে তার সবটুকু উজার করে দিয়ে সেই সন্দেহের তীব্রতাকে হ্রাস করবেন।"

মিঃ গুডফেলো প্রায় আধা ঘন্টা ধরে যে পরিশ্রম করলেন সেটা তার মস্তিষ্ক এবং হৃদয় দুইয়েরই কৃতিত্ব বহন করলেও তাতে উপস্থিত শ্রোতাদের মন বিশেষ নরম হল না। বরং যুবকটির প্রতি যে সন্দেহ ছিল সেটা গভীরতর হয়ে জনতার মনে ক্রোধের আগুনকে জ্বালিয়ে তুলল।

এক্ষেত্রে সন্দেহের পাত্রটিকেই "বৃদ্ধ ভদ্রলোক মিঃ গুডফেলোর উত্তরাধিকারী" বলে উল্লেখ করাটাই হয়েছিল বক্তার সব চাইতে মারাত্মক ভুল। সাধারণ মানুষরা এ কথাটা আগে কখনও ভাবেই নি। তারা শুধু এইটুকুই জানত যে দু'একবছর আগে খুড়ো মশায়টি (এই ভাই-পো ছাড়া তার আর কোন জীবিত আত্মীয় ছিল না) তাকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়েছিলেন; তবে এতদিনে উত্তরাধিকার নিয়ে দুজনের সে ঝগড়াঝাটি মিটে গিয়েছিল বলেই তারা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু "বুড়ো চার্লি'র" কথাগুলি তাদের সে ধারণাকে কিছুটা পাল্টে দিল। তাহলে কি খুড়োর ভয় দেখানোটা নেহাৎই লোক-দেখানো ব্যাপার ছিল? তার বেশী কিছু নয়? আর তখনই সোজাসুজি উঠে এল একটাই প্রশ্ন—এই ঘটনার ফলে উপকৃত হবে কে? কুই বোনো (cui bono)? এই প্রশ্নটাই বুঝি ওয়েস্টকোটের চাইতেও বড় করে যুবকটির কপালে এঁকে দিল অপরাধের ছাপ। "কুই বোনো" কথা দুটির আইনগত অর্থ হল—কুই, কার; বোনো, এতে সুবিধা হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রশ্নটি সরাসরি মিঃ পেনিফেদারের দিকেই আঙুল দেখায়। খুড়োমশায় যুবকটির স্বপক্ষেই উইল করে পরে তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু সে ভয়টা বাস্তবে রূপায়িত হয় নি; মনে হয়, মূল উইলটি বদলানো হয় নি। যদি বদলানো হত তাহলে যুবকটির দিক থেকে সম্ভাবিত খুনের একমাত্র অভিপ্রায় হত সাধারণ প্রতিশোধস্পৃহা; তবে সেখানেও নতুন করে খুড়োর মন পাবার একটা আশাও থাকত। কিন্তু উইল অপরিবর্তিত থেকেও পরিবর্তনের আতংক খড়্গের মত ঝুলে ছিল ভাই-পোটির মাথার উপরে, আর সেটাই খুনের বড় প্রেরণা হয়ে দেখা দিল। র‍্যাট্‌ল্‌বরোর বুদ্ধিমান অধিবাসীরা সেই সিদ্ধান্তেই উপনীত হল।

তদনুসারে মিঃ পেনিফেদারকে সেখানেই গ্রেপ্তার করা হল, এবং আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে তাকে সঙ্গে নিয়ে দলটা বাড়ির পথ ধরল। অবশ্য পথে এমন আর একটা ঘটনা ঘটল যাতে তাদের সন্দেহটা আরও ঘনীভূত হল। মিঃ গুডফেলো মহা উৎসাহে সকলের থেকে একটু এগিয়েই চলছিলেন; হঠাৎ দেখা গেল তিনি কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে ঘাসের উপর থেকে একটা ছোট জিনিস তুলে নিলেন। আরও দেখা গেল, জিনিসটাকে তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে তিনি সেটাকে কোটের পকেটে লুকিয়ে ফেলার মত একটা চেষ্টা করলেন; কিন্তু সেটা সকলেরই চোখে পড়ে যেতে তারা মিঃ গুডফেলোকে বাধা দিল। তখন দেখা গেল, ঘাস থেকে তুলে-নেওয়া সেই

জিনিসটি একটা স্পেনীয় ছুরি, আর ডজনখানেক লোক সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল সে ছুরিটা মিঃ পেনিফেদারের। তাছাড়া, ছুরির হাতলে তার নামের আদ্য অক্ষরগুলিও লেখা ছিল। ছুরির ফলাটাও ছিল খোলা ও রক্তাক্ত।

ভাই-পোটির অপরাধ সম্পর্কে এখন আর কোন সন্দেহই থাকল না। র‍্যাট্‌ল্‌বরো পৌঁছানমাত্রই তদন্তের জন্য তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হল।

এখানে ব্যাপারটা আরও একটা বিষম বাঁক নিল। মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি নিখোঁজ হবার দিন সকালে সে কোথায় ছিল সেই প্রশ্নের জবাবে বন্দী অক্লেশে বলে দিল যে সেদিন সকালে রাইফেলটা নিয়ে সে হরিণ-শিকারে গিয়েছিল বদ্ধজলাটার ঠিক সেই অঞ্চলটাতেই যেখানে মিঃ গুডফেলোর বুদ্ধিমত্তার ফলেই রক্তমাখা ওয়েস্টকোটটা পাওয়া গিয়েছিল।

এবার মিঃ গুডফেলো চোখের জল ফেলতে ফেলতে তদন্তের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন, সৃষ্টিকর্তার কাছে তিনি কঠোর কর্তব্যবোধের দায়ে আবদ্ধ; সে দায় সঙ্গী-সাথীদের প্রতি দায়ের চাইতে অনেক বড়; তাই এ ব্যাপারে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারেন না। নানা দিক বিবেচনা করেই এতদিন তিনি চুপ করে ছিলেন, কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন আকার ধারণ করেছে, এত বেশী জোরাল হয়ে উঠেছে যে সব কথাই তিনি খুলে বলবেন; তাতে যদি তার (মিঃ গুডফেলোর) বুক ভেঙে যায় তো যাবে। তারপরই তিনি বলতে শুরু করলেন, মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি নিখোঁজ হবার আগের দিন বিকেলে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভাই-পোকে বলেছিলেন—তিনি (মিঃ গুডফেলো) নিজের কানে শুনেছেন—যে আগামীকাল তিনি শহরে যাবেন "ফার্মারস্‌ এ্যাণ্ড মেকানিকস্‌" ব্যাংকে একটা মোটা টাকা জমা দিতে; সেই সঙ্গে মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি স্পষ্ট ভাষায় ভাই-পোকে আরও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে মূল উইলটি বদলাতে তিনি কৃতসংকল্প, আর নতুন উইলে তাকে একটা শিলিংও দেওয়া হবে না। এবার তিনি (সাক্ষী) আসামীর কাছে জানতে চাইলেন, তিনি (সাক্ষী) যা যা বললেন সেটা সর্বৈব সত্য কি না। সকলকে অবাক করে দিয়ে মিঃ পেনিফেদার খোলাখুলিই জানাল যে সবই সম্পূর্ণ ঠিক।

এবার ম্যাজিস্ট্রেট কর্তব্যবোধ দুজন কনেস্টবলকে পাঠালেন খুড়োমশায়ের বাড়িতে আসামীর ঘরটা তল্লাসী করতে। তল্লাসী চালিয়ে তারা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল লোহা-বাঁধানো গেরুয়া রংয়ের একটা অতিপরিচিত নোট বই নিয়ে যেটা অনেক বছর ধরেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক সব সময় সঙ্গে রাখতেন। নোট-বইটার ভিতরে দামী জিনিস যা ছিল সবই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বন্দী সেগুলো দিয়ে কি করেছে, বা সেগুলি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, অনেক চেষ্টা করেও ম্যাজিস্ট্রেট সে সম্পর্কে কোন কথাই বের করতে পারলেন না। বস্তুত, সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই সে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করল। বুড়ো ভদ্রলোকের বিছানার কাছ থেকে কনেস্টবলরা আরও একটা শার্ট ও গলায় বাঁধবার রুমাল পেয়েছিল যাতে তার নামের আদ্য অক্ষরগুলি লেখা ছিল এবং দুটোতেই মৃত ব্যক্তির রক্ত মাখানো ছিল।

ঠিক এই সময়ে ঘোষণা করা হল যে নিহত ভদ্রলোকের ঘোড়াটি আঘাতের ফলে

এইমাত্র আস্তাবলেই মারা গেছে। মিঃ গুডফেলো সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, অবিলম্বে ঘোড়াটির পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষা করা হোক। তাই করা হল; এবং বুঝিবা আসামীর অপরাধকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতেই মিঃ গুডফেলো বিস্তর খোঁজাখুঁজির পরে ঘোড়াটার বুকের ভিতর থেকে অসাধারণ বড় আকারের একটা বুলেট টেনে বের করলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল, বুলেটটা মিঃ পেনিফেদারের রাইফেলের নলের সঙ্গে ঠিকঠাক খাপ খেয়ে যাচ্ছে, অথচ এই শহরের বা তার আশপাশের অন্য সকলের বন্দুকের নলের তুলনায় সেটা অনেক বেশী বড়। বুলেটটা পাবার পরে তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট আর কোন সাক্ষীর কথাই শুনতে চাইলেন না, সঙ্গে সঙ্গে আসামীকে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন—কোনরকম জামিনই গ্রাহ্য করলেন না। মিঃ গুডফেলো অবশ্য এই কঠোর নির্দেশের বিরুদ্ধে খুবই লড়লেন এবং যত টাকা লাগে লাগুক তিনি জামিনদার হতেও রাজী হলেন। কিন্তু সহানুভূতির তোড়ে তিনি হয় তো ভুলেই গিয়েছিলেন যে এই ধরাধামে তিনি (মিঃ গুডফেলো) এক ডলার দামের সম্পত্তির বড় মালিক নন।

বিচারের ফলাফল তো আগেই বোঝা গিয়েছিল। পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য প্রমাণগুলি এতই অভ্রান্ত এবং স্থির সিদ্ধান্তের অনুকূল ছিল যে জুরিরা তাদের আসনে বসে থেকেই চটপট রায় দিলেন "খুনের দায়ে দোষী।" কিছুক্ষণ পরেই হতভাগ্য যুবক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল এবং তাকে কাউণ্টি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল আইনের অনমনীয় প্রতিহিংসার প্রতীক্ষায় দিন গুণতে।

ইতিমধ্যে "বুড়ো চার্লি গুডফেলো"র এই মহৎ আচরণ শহরের সৎ নাগরিকদের চোখে তাকে দ্বিগুণ প্রিয় করে তুলল। তার জনপ্রিয়তা দশগুণ বেড়ে গেল। সকলের কাছ থেকেই তার আমন্ত্রণ আসতে লাগল। তিনিও আগেকার কৃপণতা ভুলে গিয়ে মাঝে মাঝে নিজের বাড়িতেও মজলিস বসাতে লাগলেন। নানারকম হাসি-তামাসায় মজলিস সরগরম হয়ে উঠত।

কিন্তু একদিন নিম্নলিখিত চিঠিখানা হাতে পেয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুবই অবাক হয়ে গেলেন:

চার্লস গুডফেলো, এস্কোয়ার, র‍্যাটলবরো,
প্রেরক—এইচ, এফ, বি, এ্যাণ্ড কোং
শাত, মার, এ—নং ১—৬ ডজনবোতল (½ গ্রোস)

"চার্লস গুডফেলো, এস্কোয়ার,—

"প্রিয় মহাশয়,—প্রায় দুই মাস হইল আমাদের শ্রদ্ধেয় পত্র-লেখক মিঃ বার্নাবাস শাটলওয়ার্দি-প্রেরিত অর্ডার মোতাবেক অদ্য সকালে হরিণ মার্কা ও বেগুনি সিলসহ শাতু মার্গো-র একটি ডবল বাক্স আপনার ঠিকানায় পাঠাইলাম। বাক্সের নম্বর ও মার্কা পার্শ্বে উল্লেখিত হইল।

আপনার বিনীত সেবক
হগস্ ফ্রগস্ বগস্ এ্যাণ্ড কোং

'—শহর, ২১শে জুন, ১৮—

পুনশ্চ—এই চিঠি পাইবার পরদিন বাক্সটি মালগাড়িযোগে আপনার কাছে পৌঁছিবে। মিঃ শাটল্‌ওয়ার্দিকে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিবেন।

এইচ, এফ, বি, এ্যাণ্ড কোং

আসলে মিঃ গুডফেলো মিঃ শাটল্‌ওয়ার্দির মৃত্যুর পরে প্রতিশ্রুত শাতু মার্গো পাবার আশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাই চিঠিটাকে তিনি একটি বিশেষ অনুগ্রহের প্রতীক হিসাবেই গ্রহণ করলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি পরদিনই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বড় রকমের একটা ভোজ-সভার আয়োজন করে ফেললেন। মিঃ শাটল্‌ওয়ার্দির উপহারের সদ্ব্যবহার করাটাই অবশ্য ভোজ-সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। অবশ্য নিমন্ত্রণ-পত্রে সে কথাটি তিনি উল্লেখই করলেন না। অনেক ভেবে-চিন্তেও আমি সেটা বুঝতে পারি নি।

পরদিন এল। মিঃ গুডফেলোর বাড়িতে বড় বড় লোকদের বেশ একটা বড় জমায়েতই হল। বস্তুত শহরের অর্ধেক লোকই সেখানে হাজির হল—তাদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু গৃহস্বামীকে যথেষ্ট বিব্রত করে শাতু মার্গোর বাক্সটা এসে হাজির হল এক ঘণ্টা দেরী করে—"বুড়ো চার্লি"র দেওয়া মহৎ ভোজ্যের প্রতি অতিথিবৃন্দের যথোচিত ন্যায়বিচার করার পরে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এসে হাজির হল একটা পেল্লায় বাক্স। তার দর্শনেই পুরো দলটার মনে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, বাক্সটাকে খাবারের টেবিলের উপর তোলা হোক এবং ভিতরের মালগুলো টেবিলেই সাজানো হোক।

যেমন কথা তেমনই কাজ। আমিও তাতে হাত লাগালাম। ঠেলাঠেলি করে বাক্সটাকে টেবিলের উপর তোলা হল। তাতে টেবিলের অনেক বোতল ও গ্লাস ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। "বুড়ো চার্লি"র নেশাটা বেশ জমে উঠেছে; মুখটা বড় বেশী লাল। নকল মর্যাদার ভাব দেখিয়ে তিনি টেবিলের মাথায় বসে একটা ডিকেণ্টারকে জোরে জোরে ঠুকতে ঠুকতে সবাইকে হুঁসিয়ার করে দিতে লাগলেন, "মাল বের করার সময়" সকলেই যেন শান্ত থাকেন।

কিছুক্ষণ হৈ-হল্লা চলার পরে শেষ পর্যন্ত শান্তি ফিরে এল। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে, নেমে এল একটা গুরুগম্ভীর নিস্তব্ধতা। বাক্সের ডালাটা খোলার অনুরোধ আমাকে করা হল বলে আমি সাতিশয় খুশি মনে কাজে হাত দিলাম। একটা বাটালি ঢুকিয়ে দিয়ে হাতুড়ি দিয়ে কয়েকটা মৃদু আঘাত করতেই বাক্সের ডালাটা হঠাৎই প্রচণ্ড বেগে ছিটকে উঠে গেল, আর সেই মুহূর্তেই যেন লাফিয়ে উঠে গৃহস্বামীর একেবারে মুখোমুখি হয়ে বসে পড়ল ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত, গলিত প্রায় একটি মৃতদেহ—স্বয়ং মিঃ শাটল্‌ওয়ার্দির মুমূর্ষু, নিষ্প্রভ দুটি চোখ স্থির, বিষণ্ণ দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল মিঃ গুডফেলোর মুখের দিকে; স্পষ্ট গলায় ধীরে ধীরে বললেন:—"তুমিই সেই লোক!" আর তারপরেই যেন পরিপূর্ণ তৃপ্তিসহকারে বাক্সটার পাশ দিয়ে গড়িয়ে টেবিলের উপর টানটান হয়ে শুয়ে পড়লেন; হাত-পাগুলো থরু-থরু করে কাঁপতে লাগল।

তারপর যে দৃশ্যের অবতারণা হল সেটা বর্ণনার অতীত। দরজা দিয়ে, জানালা

দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কয়েকজন হৃষ্টপুষ্ট লোক তো ভয়েই মূর্ছা গেল। চীৎকার-চেঁচামেচির প্রথম ধাক্কাটা কেটে যাবার পরে সকলেরই চোখ পড়ল মিঃ গুডফেলোর দিকে। কিছুক্ষণ আগেও যে মুখ ছিল জয়ের উল্লাসে আর মদের প্রভাবে রক্তিমাভ, সেই বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে এখন মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণার যে ছাপ আঁকা পড়েছে। হাজার বছর বেঁচে থাকলেও তা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। কয়েক মিনিট তিনি মর্মর-মূর্তির মত স্থানু হয়ে বসে রইলেন; দুটি চোখ যেন নিজেরই অন্তরে নিবদ্ধ; বুঝিবা নিজেরই হত্যাকারী আত্মার ধ্যানে মগ্ন। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুতের ঝিলিকের মতই সহসা মনের সেই ভাবে বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়ল। একলাফে চেয়ার থেকে উঠে তিনি আপাদমস্তক টানটান হয়ে টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়লেন, তারপর দ্রুত স্বতঃ উৎসারিত কণ্ঠে সেই জঘন্য অপরাধের স্বীকারোক্তি সবিস্তারে ঘোষণা করলেন যার দায়ে মিঃ পেনিফেদার তখনও বন্দীশালায় বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গুণছিল।

তার বক্তব্যের সারমর্ম মোটামুটি এইরকম ঃ— তিনি মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দিকে অনুসরণ করে জলাটা পর্যন্ত যান; সেখানে তার ঘোড়াকে লক্ষ্য করে পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়েন; অশ্বারোহীকে সাবাড় করেন কুঁদোর আঘাতে; পকেট বইটা হাতিয়ে নেন; এবং ঘোড়াটাকে মৃত মনে করে জলার ধারে ঝোঁপঝাড় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। নিজের ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দির দেহটাকে অনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে ভাল করে লুকিয়ে রাখেন।

ওয়েস্টকোট, ছুরি, পকেট-বই ও বুলেট যেখানে যেখানে পাওয়া গেছে সব তিনিই রেখেছেন; উদ্দেশ্য—মিঃ পেনিফেদারের উপর প্রতিশোধ নেওয়া। রক্তমাখা রুমাল ও শার্ট আবিষ্কারও তারই কীর্তি।

রক্ত-জলকরা বর্ণনার শেষের দিকে হতভাগ্য খুনীর গলার স্বর মাঝে মাঝেই রুদ্ধ হয়ে যায়—ফাঁকা ফাঁকা শোনায়। সব কথা বলা হয়ে যাবার পরে তিনি উঠে দাঁড়ান, টেবিল থেকে কয়েক পা পিছিয়েই পড়ে যান—তার মৃত্যু ঘটে।

যে উপায়ে যথাসময়ে এই স্বীকারোক্তিটি তার মুখ থেকে বের করা হয়েছিল সেটা খুবই সরল। মিঃ গুডফেলোর অতিরিক্ত দিলখোলা ভাবটা আমার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল, আর তাই প্রথম থেকেই আমার মনে সন্দেহ জেগেছিল। মিঃ পেনিফেদার যখন তাকে আঘাত করেছিল তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম; সেই সময় তার মুখে ক্ষণিকের জন্যও যে শয়তানীর ভাবটা ফুটে উঠেছিল তা দেখেই আমার নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল, প্রতিহিংসার যে হুমকি তিনি তখন দিলেন সম্ভব হলে সেটাকে পুরোপুরিই কার্যে পরিণত করবেন। সুতরাং র‍্যাট্‌ল্‌বরোর ভালমানুষ অধিবাসীর “বুড়ো চার্লি”র কার্যকলাপকে যে দৃষ্টিতে দেখছিলেন গোড়া থেকেই আমি তার উপর নজর রেখেছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোখে ধরা পড়ল, সন্দেহজনক যা কিছু আবিষ্কৃত হল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে সব কিছুর পিছনেই ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু যে ঘটনাটি এ ব্যাপারের প্রকৃত ছবিটা আমার চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল সেটা হল মিঃ জি-র ঘোড়ার গায়ে বিঁধে থাকা

বুলেটটা। র‍্যাট্‌ল্‌বরোর অধিবাসীরা ভুলে গেলেও আমি ভুলে যাই নি যে ঘোড়ার গায়ের একটা গর্ত ছিল যেটা দিয়ে বুলেটটা ঢুকেছিল এবং অন্য একটা গর্ত ছিল যেটা দিয়ে সেটা বেরিয়েও গিয়েছিল। যখন দেখলাম সেই বেরিয়ে যাওয়া বুলেটটাই আবার পাওয়া গেল ঘোড়ার দেহের মধ্যে তখনই আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, বুলেটের আবিষ্কর্তা নিজেই সেটাকে সেখানে রেখে দিয়েছিলেন। বুলেটের ব্যাপার থেকে যে ধারণাটা মনে জেগেছিল সেটাই বদ্ধমূল হল রক্তমাখা শার্ট ও রুমালের ব্যাপারে; কারণ পরীক্ষা করে জানা গেল যে রক্তটা লাল মদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই সব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে যখন সম্প্রতিকালে মিঃ গুডফেলোর দান-ধ্যান ও ব্যয়-বাহুল্যের চিন্তাটা যোগ করলাম তখন থেকেই মুখে না বললেও সন্দেহটা আমার মনের মধ্যে কাজ করে চলছিল।

ইতিমধ্যে আমি গোপনে খুব তোড়জোড়ের সঙ্গে মিঃ শাট্‌ল্‌ওয়ার্দি'র মৃতদেহের খোঁজ করতে লাগলাম; আর বলাই বাহুল্য খোঁজ করতে লাগলাম প্রধানত সেই সব অঞ্চলে যেদিকটাতে মিঃ গুডফেলো তার দলবলকে নিয়ে যান নি। ফলে কয়েকদিন পরেই একটা শুকনো কুয়ো দেখতে পেলাম যার মুখটা ঝোঁপ-ঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে; আর সেই কুয়োর তলায়ই যা খুঁজছিলাম তা পেয়ে গেলাম।

এখন ঘটনাক্রমে দুই বুড়োর আলাপচারির ফাঁকে মিঃ গুডফেলো যখন বাড়ির কর্তাকে খুশি করতে তাকে এক বাক্স "শাতু মার্গো" উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তখন আমি আড়াল থেকে সেটা শুনে ফেলেছিলাম। আর সেই ইঙ্গিতটাকেই আমি কাজে লাগাতে চেষ্টা করলাম। তিমি মাছের একখণ্ড শক্ত হাড় যোগাড় করে সেটাকে মৃতদেহের গলা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলাম, এবং একটা পুরনো মদের বাক্সের মধ্যে মৃতদেহটাকে এমনভাবে ভাঁজ করে ভরে দিলাম যাতে ডালাটা খুললেই তিমির হাড়ের সঙ্গে মৃতদেহটাও সোজা হয়ে ওঠে। সেই অবস্থায়ই ডালাটাকে বেশ জোরে চেপে ধরে পেরেক ঠুকে এঁটে দিলাম। অবশ্য এটা আমি আগেই ভেবেছিলাম যে পেরেকগুলো খুলে যাওয়ামাত্রই ডালাটা ছিটকে উঠে যাবে, আর দেহটাও সোজা হয়ে উঠবে।

সব ব্যবস্থা যথাযথভাবে শেষ করে যে ভাবে তাতে মার্কা দিলাম, নম্বর বসালাম, ঠিকানা লিখলাম সে কথা তো আগেই বলেছি। তারপর যে মদ-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মিঃ শাটলওয়ার্দি'র লেন-দেন ছিল তাদের নামে একটা চিঠি লিখে আমার চাকরকে নির্দেশ দিয়ে রাখলাম। আমি সংকেত করলেই সে যেন বাক্সটাকে একটা ঠেলাগাড়িতে করে মিঃ গুডফেলোর দরজায় পৌঁছে দেয়। অবশ্য যে কথাগুলি মৃতদেহের মুখ দিয়ে বলতে চেয়েছিলাম সেজন্য আমাকে নির্ভর করতে হয়েছিল আমার নিজেরই স্বরক্ষেপণ ক্ষমতার উপর; আর তার ফলাফলের জন্য আমি নির্ভর করেছিলাম খুনী হতভাগার বিবেকের উপর।

আশা করি আর কিছু ব্যবস্থা করার নেই। মিঃ পেনিফেদারকে সেখানেই মুক্তি দেওয়া হল, উত্তরাধিকার সূত্রে খুড়ো মহাশয়ের সব সম্পত্তি সে পেল, অতীত অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে কাজে লাগাল, জীবনের নতুন পথে পা দিল, এবং সেই থেকে সুখে নতুন জীবন কাটাতে লাগল।

স্ফিংস

নিউ ইয়র্কের সেই ভয়ংকর কলেরা মহামারীর সময় আমার এক আত্মীয়ের হাওসন নদীর তীরবর্তী মনোরম কুটীরে একপক্ষকালের জন্য তার অবসর জীবনের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলাম। এখানে আমাদের চারপাশে গ্রীষ্মকালীন সাধারণ আমোদ-প্রমোদের সব রকম ব্যবস্থাই ছিল। বনের পথে ঘুরে বেড়ানো, ছবি আঁকা, নৌকো চালানো, মাছ ধরা, স্নান করা, গান-বাজনা করা, আর বই পড়া—এই সব নিয়ে আমাদের দিনগুলি বেশ সুখেই কেটে যেত, কিন্তু বাদ সাধল প্রত্যহ সকালে জনবহুল শহর থেকে পাওয়া ভয়াবহ খবরগুলো। এমন একটি দিনও কাটে না যেদিন কোন না কোন পরিচিত জনের মৃত্যু সংবাদ আসে না। ক্রমে মৃত্যুসংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই প্রতিদিন কোন বন্ধুর মৃত্যু সংবাদ পাবার আতংক যেন আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল। শেষপর্যন্ত কোন পত্রবাহক দেখলেই আমরা ভয়ে কেঁপে উঠতাম। এমন কি দক্ষিণের বাতাসকেই মৃত্যুর গন্ধে ভারী বলে মনে হত। এই চিত্তবিবসকারী চিন্তা যেন আমাদের একেবারে পেয়ে বসল। অন্য কোন কিছু বলতে পারি না ভাবতে পারি না, স্বপ্নও দেখতে পারি না। গৃহকর্তার মেজাজটি কিন্তু এতটা উত্তেজনাপ্রবণ নয়; নিজে যথেষ্ট মন-মরা হলেও আমার মেজাজ ঠিক রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। ত্রাসের কারণ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন থাকলেও তার ছায়াকে তিনি ভয় করতেন না।

যে অস্বাভাবিক বিষণ্ণতার মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছিলাম তার ভিতর থেকে আমাকে তুলে আনার জন্য তার সমস্ত চেষ্টাই কিন্তু অনেকাংশে ব্যর্থ হয়ে গেল তার লাইব্রেরির কয়েকখানি বইয়ের কল্যাণে। এই বইগুলির চরিত্রই এমন যে আমার বুকের ভিতরকার সুপ্ত বংশানুক্রমিক কুসংস্কারগুলি নতুন করে মাথা তুলতে শুরু করল। তার অজ্ঞাতেই আমি বইগুলি পড়ছিলাম, আর তাই আমার অসার কল্পনার বহর দেখে প্রায়ই তিনি কিছু বুঝতে পারতেন না।

আমাদের একটি প্রিয় আলোচনার বিষয় ছিল অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস—আমার জীবনের সেই অধ্যায়ে আমি ছিলাম সেই বিশ্বাসের একজন জোরালো সমর্থক। বিষয়টি নিয়ে আমাদের মধ্যে দীর্ঘ উত্তপ্ত আলোচনা হত—তিনি বলতেন, এ ধরনের বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন—আমি বলতাম, যেকোন স্বতস্ফূর্ত ও প্রচলিত বিশ্বাসের মধ্যে কিছু অভ্রান্ত সত্য অবশ্যই থাকে, আর তাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা তার প্রাপ্য।

আসল ঘটনা হল, আমি এই কুটীরে আসার ঠিক পরেই আমাকে নিয়ে এমন একটা ব্যাখ্যাতীত ঘটনা ঘটে গেল যার অনেকটাই ছিল ভাবী অমঙ্গলসূচক, আর তাই আমি সেটাকে অশুভ লক্ষণ বলেই মনে করেছিলাম। আমি তাতে ভয় পেলাম; এতই বিচলিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম যে অনেক দিন পর্যন্ত বন্ধুকে ঘটনাটির কথা বলতেই পারলাম না।

একটা খুবই গরম দিন শেষ হবার মুখে আমি একটা বই হাতে নিয়ে খোলা জানালায় বসেছিলাম। আমার দৃষ্টির সামনে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত নদীর দুই তীর, অনেক দূরের পাহাড়ের দৃশ্য—আমার কাছ থেকে সব চাইতে নিকটবর্তী একটি জায়গায় পাহাড়ে ধ্বস নামার ফলে গাছগুলি পড়ে যাওয়ায় বেশ ন্যাড়া দেখাচ্ছে। আমার চিন্তাপ্রবাহ কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই বইটাকে ফেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পার্শ্ববর্তী শহরের দুঃখ ও জনহীনতার মধ্যে। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলতেই আমার চোখ দুটি গিয়ে পড়ল পাহাড়ের সেই ন্যাড়া মুখটার উপর, একটা কিছুর উপর—এমন বিকৃতদর্শন একটি জীবন্ত রাক্ষসের উপর যে অতি দ্রুত পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নেমে এল, এবং শেষ পর্যন্ত নীচের ঘন অরণ্যের মধ্যে মিলিয়ে গেল। জীবটি যখন প্রথম দৃষ্টিগোচর হল তখন নিজের মানসিক সুস্থতার ব্যাপারেই আমার সন্দেহ হল—অন্তত আমার চোখ দুটির সুস্থতার ব্যাপারে তো বটেই; বেশ কিছু সময় কেটে যাবার পরে আমি নিশ্চিত হতে পারলাম যে আমি পাগলও হয়ে যাই নি, বা স্বপ্নও দেখি নি। তথাপি যখনই আমি রাক্ষসটির বিবরণ দিয়েছি (আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছি এবং ভালভাবে লক্ষ্য করেছি), তখন আমার পাঠকরা নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যাপারে আমার মত এতটা নিশ্চিত হতে পারেন নি।

বনের যে অল্প কয়েকটি মহীরুহ ধ্বংসের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেয়েছে তারই অন্যতম যে বড় গাছটার পাশ দিয়ে প্রাণীটি চলে গেল তার ব্যাসের সঙ্গে তুলনা করে প্রাণীটির আকারের অনুমান করে আমার মনে হল এখানকার জলপথে চলাচলকারী যে কোন জাহাজ অপেক্ষা সেটা আকারে বড়। আমি জাহাজের কথা বললাম, কারণ রাক্ষসটার আকৃতি দেখে এই উপমাটাই আমার মনে এসেছিল—আমাদের চুয়াত্তর টনওয়ালা যে কোন জাহাজের খোল থেকেই প্রাণীটির দেহের রেখাচিত্রের একটা মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যেতে পারে। প্রাণীটির মুখের অবস্থান ষাট-সত্তর ফুট লম্বা একটা সাধারণ হাতির দেহের মত মোটা শুঁড়ের একেবারে শেষপ্রান্তে। যেখান থেকে এই শুঁড়টি বেরিয়েছে সেখানে এত বেশী পরিমাণ কালো লোম রয়েছে যা এক কুড়ি মহিষও তাদের শরীর থেকে জোগান দিতে পারবে না; আর সেই লোমের ভিতর থেকে পাশাপাশি নীচের দিকে নেমে গেছে যে দুটি চকচকে দাঁত তা বুনো শুয়োরের দাঁতের মত দেখতে হলেও তাদের পরিসর অসংখ্যগুণ বেশী। শুঁড়ের দু'দিক থেকে সমান্তরালভাবে সামনে বেরিয়ে গেছে একটি বৃহদাকার দন্ত; ত্রিশ বা চল্লিশ ফুট লম্বা, দেখে মনে হল ত্রিভুজাকৃতি স্বচ্ছ স্ফটিক দিয়ে তৈরী ঃ—অস্ত-সূর্যের আভা পড়ে সেটা ঝলমল করছে। দাঁতের গঠন অনেকটা মাটির দিকে মুখ-করা একটা কীলকের মত। সেখান থেকে বেরিয়েছে দুইজোড়া পেখম-মেলা পাখা—প্রতিটি পাখা প্রায় একশ' গজ লম্বা—এক জোড়ার উপর আর এক জোড়া; সব পাখাই ধাতুর আঁশে ঘন-আবৃত; প্রতিটি আঁশের ব্যাস দশ বারো ফুট। লক্ষ্য করে দেখলাম উপরের ও নীচের পাখাগুলো শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা। কিন্তু সেই ভয়ংকর বস্তুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সারা বুক জুড়ে একটা মড়ার খুলি আঁকা, আর সেটা কালো শরীরের উপর ঝকঝকে সাদা দিয়ে এমন সঠিকভাবে আঁকা হয়েছে যে মনে হয় বুঝি কোন শিল্পী যত্ন করে কাজটা

করেছে। সেই ভয়ংকর জন্তুটি—বিশেষ করে তার বুকের ছবিটা দেখে আমার মনের মধ্যে যুগপৎ ত্রাস ও ভীতির সঞ্চার হল, একটা আসন্ন বিপদের অনুভূতি জাগল। কোন যুক্তি দিয়েই সে অনুভূতিকে আমি মন থেকে সরাতে পারলাম না। এমন সময় আমার নজরে পড়ল, সেই জন্তুটার প্রকাণ্ড দুটি চোয়াল হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল, আর তার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল এত প্রচণ্ড একটা সকরুণ স্বর যা আমার স্নায়ুকে মৃত্যু-ঘন্টার মত আঘাত করল, এবং রাক্ষসটি পাহাড়ের পাদদেশে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া মাত্রেই আমি মূর্ছিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেলাম।

মূর্ছাভঙ্গ হবার পরে আমার প্রথমেই ইচ্ছা হল যা দেখলাম, যা শুনলাম সব বন্ধুকে জানাব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরম বিতৃষ্ণার ফলে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করলাম।

শেষ পর্যন্ত এই ঘটনার তিন-চারদিন পরে এক সন্ধ্যায় আমরা দুজন ঠিক সেই ঘরটাতে বসেছিলাম যে ঘর থেকে সেই ভৌতিক দৃশ্যটি দেখেছিলাম—আমি বসেছিলাম সেই একই আসনে সেই একই জানালার ধারে, আর বন্ধুটি পাশেই একটা সোফায় শরীর এলিয়ে দিয়েছিলেন। স্থান ও কালের এই মিলই যেন সেদিনের ঘটনার বিবরণটি তাকে শোনাতে আমাকে অনুপ্রাণিত করল। আদ্যোপান্ত সব কথা সে শুনল—প্রথম দিকে প্রাণ খুলে হাসতে লাগল—কিন্তু ক্রমেই তার চোখে মুখে এমন একটা গম্ভীর ভাব ফুটে উঠতে লাগল যেন আমার মানসিক অসুস্থতা সম্বন্ধে এনারাই নিশ্চিত হয়ে গেছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে আর একবার রাক্ষসটাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম—ভয়ে চীৎকার করে উঠে তার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করলাম। তিনিও সাগ্রহে তাকালেন, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না—যদিও সেটা যে ভাবে ন্যাড়া পাহাড়টা থেকে নীচে নেমে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাকে শোনালাম।

এবার আমি ভীষণ ভয়ে পেয়ে গেলাম। মনে হল, এ দৃশ্য হয় আমার মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ, অথবা উন্মাদ রোগগ্রস্ত হবার পূর্বসূচনা। সভয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে দুটি হাতে মুখ ঢাকলাম। আবার যখন চোখ খুললাম, সেই প্রতিচ্ছায়াটিকে আর দেখতে পেলাম না।

বন্ধুটি অবশ্য ততক্ষণে তার মনের প্রশান্তি অনেকটা ফিরে পেয়েছেন; ভৌতিক জন্তুটা সম্পর্কে তিনি আমাকে নানাভাবে প্রশ্ন করতে লাগলেন। তারপর আমার জবাব শুনে সম্পূর্ণ খুশি হয়ে এমনভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন যেন একটা অসহ্য বোঝা তার বুকের উপর থেকে নেমে গেছে; আর তারপরেই তিনি অতিমাত্রায় ধীর স্থিরভাবে আমাদের পূর্ব আলোচনার সূত্র ধরে দর্শনশাস্ত্রের নানা বিষয়ক আলোচনায় মেতে উঠলেন।

একসময় একটু থেমে একটা বুক-কেসের কাছে গিয়ে একখানা প্রাণিতত্ত্বের বই নিয়ে এলেন। তারপর বইখানির ছোট হরফগুলি যাতে ভাল দেখতে পান এই অজুহাতে আমার সঙ্গে আসন পাল্টা-পাল্টি করে তিনি জানালার ধারে আমার হাতল-চেয়ারটায় বসলেন এবং খোলা বই সামনে রেখে আগের মতই আলোচনা শুরু করে দিলেন।

বললেন, "রাক্ষসটার বর্ণনা দিতে গিয়ে তুমি যদি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলির উপর এত বেশী জোর না দিতে তাহলে সেটা যে কি তা আমি কোনদিনই তোমাকে বোঝাতে পারতাম না। প্রথমেই একখানা স্কুল-পাঠ্য বই থেকে তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি ইন্‌সেক্টা বা পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্গত লেপিডপ্‌টেরা বা বহু শ্রেণী সমন্বিত জাতির অন্তর্গত—ক্রিপাস্‌কুলারিয়া পরিবারের অন্তর্গত—স্ফিংস প্রজাতির বিবরণ। বিবরণটি এই রকম ঃ

"ধাতুর মত চকচকে ছোট ছোট রঙিন আঁশে ঢাকা ঝিল্লিময় চারটি ডানা ; চোয়াল থেকে ঝুলে-পড়া পাকানো নাকওয়ালা মুখ ; তার দুই পাশে প্রচুর লোম ; নীচেকার ডানা দুটি উপরের ডানার সঙ্গে শক্ত লোম দিয়ে আটকানো ; লম্বা লাঠির মত স্ফটিকস্বচ্ছ শুঁয়ো ; তীক্ষ্ম মুখ তলপেট। একসময় মাথার খুলিসমন্বিত স্ফিংস এক ধরনের করুণ কান্নার মত শব্দ করে সাধারণ মানুষের মনে যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার করত ; তার উপরে আছে দেহাবরণের উপর মড়ার খুলির কুল-চিহ্ন।"

এইখানে বইখানি বন্ধ করে সামনে ঝুঁকে যে ভঙ্গীতে আমি বসেছিলাম "রাক্ষস" কে দেখার মুহূর্তে, ঠিক সে ভঙ্গীতে বসে বন্ধু উচ্চগ্রামে বলে উঠলেন, "আঃ, এই তো হয়েছে ? পাহাড়ের মুখে সে উঠে যাচ্ছে ; আমিও স্বীকার করছি একটা অদ্ভুতদর্শন জীবই বটে। তবু আপনি কল্পনায় যেমনটি দেখেছিলেন ততটা বড়ও নয়, তত দূরেও নয় ; আসলে ব্যাপারটা হল, জানালাটার শার্সি বরাবর মাকড়শা যে জাল বুনেছে সেটা বেয়ে প্রাণীটা যখন এঁকেবেঁকে উপরের দিকে উঠছে তখন আমি দেখছি সেটা লম্বায় এক ইঞ্চির ষোলভাগের এক ভাগ, এবং আমার চোখের মণি থেকে ঐ একই দূরত্ব।"

ভেকবাবাজী

রাজার মত এমন পরিহাস-সচেতন মানুষ আমি কখনও দেখি নি। মনে হত, তিনি বুঝি পরিহাসের জন্যই বেঁচে আছেন। পরিহাস-রস প্রধান একটা গল্প বেশ জমিয়ে বলতে পারাটাই ছিল তার কৃপালাভের নিশ্চিততম পথ। তাই তো রাজার ন'জন মন্ত্রীই ছিলেন পরিহাস-রসিকতার জন্য বিখ্যাত। রাজার মতই তারাও সকলেই ছিলেন দশাসই, স্থূলবপু, তৈলসিক্ত, এবং অননুকরণীয় পরিহাসরসিক। রসিকতা করলেই মানুষ মোটা হয় কিনা, অথবা স্থূলতার মধ্যেই এমন কিছু আছে কিনা যা মানুষকে পরিহাসপ্রবণ করে তোলে, তা আমি জানি না ; কিন্তু এটা ঠিক যে পরিহাস-রসিক অথচ ক্ষীণকায় এমন লোক বিরল।

অন্য সব কলাকুশলতা, অথবা তার ভাষাতে, বুদ্ধির "ভূত" দের নিয়ে রাজার কোনরকম মাথাব্যথা ছিল না। তামাসার বিস্তারটাকেই তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করতেন, আর সে জন্যে দরকার হলে তার দৈর্ঘ্যকেও সহ্য করতেন। সূক্ষ্ম পরিহাসে তিনি

ক্লান্তি বোধ করতেন। ভলতেয়ারের "জাদিগ" অপেক্ষা র‍্যাবেলে-র "গর্গাণ্টুয়া"ই তার বেশী পছন্দ; আর মোটের উপর, মৌখিক পরিহাস অপেক্ষা বাস্তব পরিহাসই ছিল তার কাছে অধিক রুচিকর।

যখনকার কথা আমি বলছি, তখনও রাজ-দরবার থেকে বিদূষক বৃত্তিটা একেবারে উঠে যায় নি। মহাদেশের অনেক বড় বড় রাজাই তখনও বিদূষকদের পুষতেন; তারা টুপি ও ঘণ্টাসহ নানা রংয়ের পোশাক পরত, যে কোন সময় তাদের মুখে চুটকি গল্পের খৈ ফুটত; বিনিময়ে তাদের কপালে জুটত রাজ-উচ্ছিষ্টের কিছু টুকরো অংশ।

আমাদের রাজারও যথারীতি একজন বিদূষক ছিল। আসল কথা হল, সাত মন্ত্রীর মত সাতজন জ্ঞানী ব্যক্তির—রাজার নিজের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—জ্ঞানের বোঝার ভারসাম্য রক্ষার জন্যও একজন বোকা লোক তার দরকারই ছিল।

রাজার বেতনভুক বিদূষকটি অবশ্য একটি বিদূষক মাত্রই ছিল না। রাজার চোখে তার দাম তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল, কারণ ভাঁড় হওয়া ছাড়াও সে ছিল বামন ও পঙ্গু। তখনকার দিনে ভাঁড় আর বামন দুইই ছিল সব দরবারের শোভা; একজন ভাঁড়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসা এবং একটি বামনকে দেখে হাসা—এ দুটি ছাড়া তো অনেক রাজার দিন কাটানোই দায় হত। কিন্তু আগেই বলেছি, শতকরা নিরানব্বই জন বিদূষকই হত স্থূলকায়, গোলাকার, ও কিছুটা জড়দ্গব ধরনের। অতএব একাধারে তিন গুণের আকর "ভেকবাবাজী"কে (এটাই ছিল তার ভাঁড়ের নাম) নিয়ে রাজামহাশয় বেশ মনের সুখেই ছিলেন।

আমার ধারণা "ভেক-বাবাজী" নাম দীক্ষান্তকালে পুরোহিতরা বামন লোকটিকে দেয় নি; সে স্বাভাবিক মানুষের মত হাঁটা-চলা করতে পারে না বলে সাত মন্ত্রীই একমত হয়ে নামটি তাকে দিয়েছিল। বস্তুত, ভেকবাবাজী একটা অদ্ভুত ভঙ্গীতে চলাফেরা করত,—না লাফিয়ে চলা, না শরীরটাকে দুমড়ে চলা, দুইয়ের মাঝামাঝি একটা ভঙ্গীমা। তার সেই অপূর্ব চলন-ভঙ্গী দেখলেই লোকে হেসে কুটিপাটি হত। আর তাই বিশাল ভুঁড়ি ও অতিস্ফীত মাথা সত্ত্বেও সেই ছিল দরবারে রাজার একমাত্র সান্ত্বনাস্থল।

তবে পা দুটির বিকৃতির জন্য রাস্তায় বা মেঝেতে হাঁটা চলা করতে ভেকবাবাজীর খুব কষ্ট ও অসুবিধা হলেও ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রকৃতি তাকে দুই বাহুর মাংসপেশীতে যে অসাধারণ শক্তি দিয়েছিল তার কল্যাণে গাছ বা দড়ির ব্যাপারে অথবা কোন কিছু বেয়ে ওঠার ব্যাপারে সে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিতে পারত। সে ধরনের কাজ-কর্মে ব্যাঙের চাইতেও তার মিল ছিল কাঠবিড়ালি বা বাঁদরের বাচ্চার সঙ্গেই বেশী।

ভেকবাবাজী মূলত কোন দেশ থেকে এসেছিল আমি সঠিক বলতে পারব না। তবে আমাদের রাজার দরবার থেকে যোজন যোজন দূরের এমন কোন অসভ্য দেশ থেকে সে এসেছিল যার নাম কেউ কোন দিন শোনে নি। ভেকবাবাজী ও একটি তরুণী মেয়েকে (তরুণীটি অপেক্ষা যৎসামান্য অতিরিক্ত বেঁটে আর আশ্চর্য নর্তকী) আশপাশের রাজ্য থেকে জোর করে ধরে এনে রাজার চিরবিজয়ী সেনাপতিরা রাজাকে ভেট দিয়েছিল।

এই পরিস্থিতিতে দুই ক্ষুদে বন্দীর মধ্যে যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। বস্তুত অচিরেই তারা পরস্পরের দারুণ বন্ধু হয়ে উঠল। অনেক রকম খেলা দেখাতে পারলেও ভেকবাবাজী খুব একটা জনপ্রিয় ছিল না বা ত্রিপেত্তাকেও সেরকম সাহায্য করতে পারত না; কিন্তু বামন হলেও ত্রিপেত্তা রূপে, লাবণ্যে সকলকেই মোহিত করে রেখেছিল, সকলেই তাকে আদরকরত। ফলে রাজ-দরবারে তার যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল, আর সুযোগ পেলেই ভেকবাবাজীর ভালর জন্য সেই প্রভাব সে কাজে লাগত।

কি উপলক্ষে তা ভুলে গেছি, একবার রাজা একটি মুখোসনৃত্যের আয়োজন করলেন; আর আমাদের রাজদরবারে যখনই কোন মুখোসনৃত্যের ব্যবস্থা হত তখনই ভেকবাবাজী আর ত্রিপেত্তা দুজনকেই খেলা দেখাতে হত। এ ব্যাপারে ভেকবাবাজীর বিশেষ দক্ষতাও ছিল।

উৎসবের রাত সমাগত। ত্রিপেত্তার চোখের সামনেই ঝলমলে হলটাকে মুখোসনৃত্যের উপযোগী করে সাজানো হল। গোটা দরবার প্রত্যাশায় উন্মুখ। সকলেই যার যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত; কোথাও এতটুকু ঢিলেমি বা আলস্যের ছায়া মাত্র নেই। ব্যতিক্রম শুধু রাজা ও তার সাত মন্ত্রী। একমাত্র রসিকতা করা ছাড়া অন্য কোন কারণে তারা এ ব্যাপারে এত ইতস্তত করেছিলেন আমি বলতে পারব না। হয়তো অতিমাত্রায় মোটা হবার দরুন তারা মনস্থির করতে পারছিল না। কিন্তু সময় তো বয়েই চলল; শেষ ভরসা হিসাবে তারা ত্রিপেত্তা ও ভেকবাবাজীকে পাঠাল।

দুই বন্ধু রাজার ডাকে এসে হাজির হল। মন্ত্রিসভার সাত সদস্যকে নিয়ে রাজা তখন মদের টেবিলে বসেছেন। দেখেই মনে হল, তার মেজাজ খারাপ। তিনি জানতেন ভেকবাবাজী মদ পছন্দ করে না, কারণ মদ পেটে পড়লেই পঙ্গু মানুষটা যেন পাগল হয়ে যায়, আর পাগলামী কখনও সুখের জিনিস নয়। কিন্তু তার বাস্তব রসিকতাগুলি রাজার খুব প্রিয়, তাই অনেক সময়ই মেজাজ ভাল করার জন্য রাজা জোর করে ভেকবাবাজীকে মদ খাইয়ে দিতেন।

সঙ্গিনীকে নিয়ে বিদূষক ঘরে ঢুকতেই রাজা বললেন, "এস হে ভেকবাবাজী, তোমার অনুপস্থিত বন্ধুদের স্বাস্থ্যরক্ষার্থে এটা গলায় ঢেলে নাও তারপর নতুন নতুন খেলা দেখাও। আমার চাই চরিত্র—নতুন চরিত্র—যা সচরাচর দেখা যায় না। একঘেয়ে ভাঁড়ামী দেখে-শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এস, পান কর! মদই তোমার বুদ্ধিতে শান দেবে।"

অগ্রিম পাওনা পেয়ে ভেকবাবাজী যথারীতি কিছু তামাসা দেখাবার চেষ্টা করল; কিন্তু তখন জমল না। সেটা ছিল বেচারি বামনের জন্মদিন। "অনুপস্থিত বন্ধুদের" স্বাস্থ্য পান করার হুকুমে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। রাজার হাত থেকে সবিনয়ে পানপাত্রটা নেবার পরে চোখের জলের অনেকগুলি বড় বড় ফোঁটা তাতে মিশল।

বামন অনিচ্ছাসত্ত্বেও পানপাত্রটি শূন্য করতেই রাজা হো-হো করে হেসে উঠলেন। "দেখ, এক গ্লাস ভাল মদের কত কেরামতি! এর মধ্যেই যে তোমার চোখ দুটি চকচক করছে!"

বেচারি! চকচক করছে, না অশ্রুজলে টলমল করছে! কাঁপা হাতে পানপাত্রটা টেবিলে রেখে সে অর্ধোন্মাদ দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাল। রাজার "পরিহাসের" সাফল্য দেখে সকলেই খুব মজা পেল।

ভুঁড়িদার প্রধানমন্ত্রী বলল, "এবার খেলা শুরু হোক।"

রাজা বললেন, "ঠিক; এস হে ভেকবাবাজী, আমাদের সাহায্য কর। বিচিত্র সব চরিত্র দেখাও হে; আমরা চাই নতুন নতুন চরিত্র—হা! হা! হা!"

সাত মন্ত্রী একযোগে সেই হাসির ধুয়া ধরল। ভেকবাবাজীও হাসল—ক্ষীণ, অর্থহীন হাসি।

রাজা অধৈর্য হয়ে বললেন, "শুরু কর। কি হল? তোমার কি কিছুই দেখবার নেই?"

মদ তাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছে; বামন কোনরকমে জবাব দিল, "আমি নতুন কিছু করার কথা ভাবছি।"

স্বেচ্ছাচারী রাজা হিংস্রস্বরে বলে উঠলেন, "আচ্ছা! কী বলতে চাও তুমি? ওহো বুঝতে পেরেছি। তোমার আরও মদ চাই। এই তো, নাও, খাও!" রাজা আর এক পাত্র পূর্ণ করে পঙ্গু লোকটির দিকে এগিয়ে ধরলেন। সে কিন্তু হাঁ করে তাকিয়েই রইল; ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগল।

"খাও বলছি! নইলে শয়তানের দিব্যি—"

বামন ইতস্তত করতে লাগল। রাজা রেগে আগুন। সভাসদদের মুখে ব্যঙ্গের হাসি। ত্রিপেত্তার মুখ মরার মত সাদা হয়ে গেছে। সিংহাসনের কাছে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে সে রাজাকে মিনতি করল তার বন্ধুকে ক্ষমা করতে।

তার ঔদ্ধত্যে অবাক হয়ে রাজা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি করবেন বা বলবেন—কেমন করে রাজার উপযুক্তভাবে ক্ষোভ প্রকাশ করবেন ভেবেই পেলেন না। শেষ পর্যন্ত মুখে একটি কথাও না বলে ত্রিপেত্তাকে ঠেলে দিলেন, পানপাত্রের সবটা মদ ঢেলে দিলেন তার মুখে।

অসহায় মেয়েটি কোনরকমে উঠে দাঁড়াল; একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলারও সাহস হল না; টেবিলের নীচে তার জায়গায় গিয়ে বসল।

আধ মিনিটের জন্য নেমে এল মৃত্যু-নীরবতা। একটা পাতা পড়লে, একটা পালক পড়লেও বোধ হয় শোনা যেত। সেই স্তব্ধতাকে ভেঙে শোনা গেল একটা চাপা, কর্কশ একটানা খস্‌-খস্‌ শব্দ; মনে হল, শব্দটা যেন একই সঙ্গে ঘরের প্রতিটি কোণ থেকে আসছে।

"কেন-কেন—কেন তুমি এ রকম শব্দ করছ?" বামনের দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকিয়ে রাজা প্রশ্ন করলেন।

মনে হল, লোকটির নেশা অনেকটাই কেটে গেছে; স্বেচ্ছাচারী রাজার দিকে শান্ত, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল:

"আমি—আমি? আমি কেন করব?"

জনৈক সভাসদ বলল, "মনে হল শব্দটা বাইরে থেকে আসছে। আমার তো ধারণা, জানালার কাছে কাকাতুয়াটা খাঁচার তারের উপর ঠোঁটে শান দিচ্ছে।"

এ কথায় অনেকখানি আশ্বস্ত হয়ে রাজা বললেন, "বটে, কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারতাম যে শব্দটা এই উড়নচণ্ডীর দাঁতের খিট-খিট শব্দ।"

এ কথা শুনে বামন হেসে ফেলল (রাজা নিজে একজন পরিহাস-রসিক হয়ে কারও হাসিতে আপত্তি করতে পারেন না) এবং তার মুখের ভিতরকার এক পাটি বড় বড় জোরালো, বিশ্রী দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তার উপরে সে যতখুশি মদ গিলবার বাসনাও নিবেদন করল। এতে রাজা শান্ত হলেন, এবং আরও এক পাত্র টেনেও কোনরকম বেসামাল না হয়ে ভেকবাবাজী মুখোসনৃত্যের নতুন পরিকল্পনায় মন দিল।

যেন জীবনে কোন দিন মদ খায় নি এমনি অতি শান্তভাবে সে বলতে লাগল, "কিসে কি হল আমি বলতে পারব না, কিন্তু মহারাজ মেয়েটিকে আঘাত করে তার মুখে মদ ছিটিয়ে দেবার ঠিক পরে—মহারাজ এ হেন কাজটি করলেন, আর কাকাতুয়াটিও বাইরের জানালা থেকে অদ্ভুত শব্দ করল, তার ঠিক পরেই আমার মনে একটা নতুন ধারণা জন্ম নিল, আমাদের অনেক পল্লীনৃত্যের মধ্যে একটি—আমাদের মুখোশনৃত্যের সময় প্রায়ই আমরা সেটা দেখাই ঃ কিন্তু এখানে সেটাই হবে সম্পূর্ণ নতুন। দুর্ভাগ্যের বিষয় সে নাচটির জন্য আটজনের একটা দল দরকার, আর—"

"এই তো আমরা আছি!" নিজের মহা-আবিষ্কারে খুশি হয়ে রাজা হো-হো করে হেসে বললেন, "একেবারে গুণে-গুণে আটজন—আমি আর আমার সাত মন্ত্রী। এস, বল কি নতুন নাচ হবে?"

পঙ্গু লোকটি জবাব দিল, "আমরা এটাকে বলি—আট শৃংখলিত ওরাং-ওটাং; ভাল করে দেখাতে পারলে ভারী মজার নাচ।"

উঠে দাঁড়িয়ে চোখের পাতা নীচু করে রাজা বললেন, "আমরা অভিনয় করে দেখাব।"

ভেকবাবাজী বলতে লাগল, "খেলাটার বাহারই হচ্ছে নাচ দেখে মেয়েরা যে ভাবে ভয় পাবে তাতে।"

"বাহবা! বাঃ!" এক কণ্ঠে বলে উঠলেন রাজা ও তাঁর মন্ত্রীর দল।

বামন বলেই চলেছে, "আমি আপনাদের ওরাং-ওটাং সাজিয়ে দেব; সে কাজটা আমার হাতেই ছেড়ে দিন। চেহারা এমন অদ্ভুতভাবে মিলে যাবে যে সকলেই আপনাদের আসল জন্তু বলে ভুল করবে—আর অবশ্যই তারা যতটা ভয় পাবে ঠিক ততটাই বিস্মিতও হবে।"

রাজা চেঁচিয়ে বললেন, "আঃ, অসাধারণ হবে! ভেকবাবাজী! আমি তোমাকে মানুষ করে দেব।"

"ঠুং-ঠাং শব্দের ফলে সকলের মধ্যে গোলমালটা বাড়াবার জন্যই শিকলগুলো ব্যবহার করা হবে। ধরে নেওয়া হবে পাহারাদারদের হেপাজৎ থেকে আপনারা দল বেঁধে পালিয়েছেন। একটা মুখোসনৃত্যে আটটি শৃংখলিত ওরাং-ওটাংকে সমবেত

প্রায় সকলেই আসল জন্তু বলে ভুল করবে ; তারা বন্য পশুর মত গর্জন করতে করতে ছুটে এসে সুসজ্জিত ও ঝলমলে পোশাক-পরা নরনারীর ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এই বিপরীত ভাবের সমাহার হবে অননুকরণীয়।”

রাজা বললেন, “তা তো হতেই হবে। মন্ত্রী-পরিষদ দ্রুত উঠে পড়ল ভেকবাবাজীর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে।

খুব সহজেই দলটাকে ওরাং-ওটাং সাজানো হল ; কার্যত ব্যাপারটা দাঁড়ালও বেশ ভালো। যে সময়কার গল্প আমি বলছি তখন সভ্য জগতের মানুষ আসল ওরাং-ওটাং কদাচিৎ চোখে দেখেছে ; আর যেহেতু বামনটি সকলের চোখে-মুখে জন্তুর আদল ফোটাতে তাদের অতিমাত্রায় বীভৎস করে রং মাখিয়েছে, তাই তারা যে আসলেই আটটি ওরাং-ওটাং তাতে সন্দেহ করার কোনরকম সুযোগই ছিল না।

রাজা ও তার মন্ত্রীদের প্রথমেই পরানো হল আঁটো-সাঁটো মোজার মত তৈরী শার্ট ও পাজামা। তারপর তাদের সারা গায়ে আলকাতরা মাখিয়ে দেওয়া হল। দলের কেউ কেউ তাতে পাখির পালক গুঁজে দেবার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু বামন সঙ্গে সঙ্গে সেটা নাকচ করে শন পাটের ব্যবস্থা করল এবং আলকাতরার প্রলেপের উপর শন পাটের একটা ঘন আস্তরণ লাগিয়ে দেওয়া হল। এবার একটা বড় শিকল যোগাড় করা হল। প্রথমে শিকলটাকে রাজার কোমরে জড়িয়ে শক্ত করে গিঁট দেওয়া হল ; দলের আর একজনকেও সেই একইভাবে শিকল দিয়ে বাঁধা হল, এবং একে একে সকলকেই একইভাবে সেই শিকলে বাঁধা হল। শিকলে বাঁধার পর্ব শেষ হলে প্রত্যেককে পরস্পরের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখে তাদের একটা বৃত্তাকারে দাঁড় করানো হল ; এবং সমস্ত ব্যাপারটা যাতে বেশ স্বাভাবিক রূপ নেয় সেই উদ্দেশ্যে শিকলের বাকি অংশটাকে সমকোণের মাপে দুটো ব্যাসের মত সেই বৃত্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হল—বর্তমান কালে বোর্নিও-তে শিম্পাঞ্জী বা অন্য সব বড় বাঁদরকে ধরবার জন্য যে ভাবে ফাঁদ পাতা হয় অনেকটা ঠিক তারই অনুকরণে।

যে গোলাকার বড় হলটাতে মুখোশনৃত্য প্রদর্শিত হবে সেটার সব ব্যবস্থা ও তদারকির ভার দেওয়া হল ত্রিপেত্তার উপর ; তবে মনে হয় কোন কোন ব্যাপারে সে তার বামন বন্ধুটির পরামর্শ মতই কাজ করেছে। তার প্রস্তাবক্রমেই হলের বড় ঝাড়-বাতিটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে ; তা না হলে সেই ঝাড়-বাতির মোম গলে গলে ফোঁটায় ফোঁটায় নীচে পড়ে অতিথিদের বহুমূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদকে নষ্ট করে দিতে পারে। তবে হলটিকে আলোকিত রাখার জন্য হলের কোণে কোণে অনেক শামাদান বসানো হয়েছে, আর দেওয়ালের গায়ে বসানো পঞ্চাশ-ষাটটি নারীমূর্তির ডান হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে সুগন্ধি জ্বলন্ত মশাল।

ভেকবাবাজীর পরামর্শক্রমে আট ওরাং-ওটাংকেই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বসিয়ে রাখা হল ; হল্লাকারীদের উপস্থিতিতে হলটা কানায় কানায় ভরে গেলে তবে তাদের সামনে জন্তুগুলিকে উপস্থিত করা হবে। ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার শব্দ থেমে যেতেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে তারা ছুটে গেল—শিকলের টানে অনেকেই পড়ে গেল—গড়াগড়ি খেতে লাগল—জড়াজড়ির একশেষ হতে লাগল।

নাচিয়েরা তো যেমন উত্তেজিত তেমনই খুশি। রাজার মন আনন্দে ভরে গেল। যেমন ভাবা হয়েছিল, অতিথিদের মধ্যে অনেকেই হিংস্র-দর্শন জীবগুলিকে ওরাং-ওটাং না হোক, কোন না কোন রকমের বনজন্তু বলেই মনে করে বসল। রমণীরা অনেকেই ভয়ে মূর্ছা গেল; রাজামশায় যদি আগে থেকেই সতর্ক হয়ে সব অস্ত্রশস্ত্র হল থেকে সরিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো তার দলটিকে নিজেদের রক্ত দিয়েই এই মজাদার দৃশ্য অভিনয়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। বাস্তবক্ষেত্রে এই দাঁড়াল যে সকলেই দরজার দিকে ছুটে গেল; কিন্তু রাজার আদেশ মত তিনি মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়ামাত্রই হলের সব দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল; আর বামনের নির্দেশক্রমে চাবিগুলি জমা দেওয়া হয়েছিল তারই কাছে।

হৈ-হট্টগোল যখন চরমে পেঁচেছে, এবং প্রতিটি মানুষই নিজের নিরাপত্তা নিয়েই অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত (কারণ তখন ভিড়ের চাপে পিষ্ট হবার বিপদটাই ছিল সব চাইতে বেশী)—তখনই দেখা গেল, যে শিকল থেকে ঝাড়-বাতিটা ঝুলে থাকে এবং সাময়িকভাবে যেটাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সেটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে এবং একসময়ে তার বড়শির মত বাঁকানো প্রান্তটা মেঝে থেকে তিন ফুটের মধ্যে নেমে এসেছে।

এর ঠিক পরেই রাজা তার সাত বন্ধুকে নিয়ে সারা হলটাকে চক্কর মারতে মারতে এসে হাজির হলেন একেবারে মাঝখানে এবং অবশ্যই সেই শিকলটার ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে। বামনটি সারাক্ষণ তাদের ঠিক পিছন-পিছন থেকে নানাভাবে তাদের উৎসাহ যোগাচ্ছিল; এবার সে করল কি, তাদের দুই টুকরো শিকল যে বিন্দুতে সম-কোণে পরস্পরকে ছেদ করেছে সেই জায়গাটা চেপে ধরে অতি দ্রুতে ঝাড়-বাতির নীচেকার হুকটা শিকলের সেই বিন্দুতে আটকে দিল; আর সঙ্গে সঙ্গে কোন্ অদৃশ্য হাতের টানে ঝাড়-বাতিটা উপরে উঠে গেল এবং তার অনিবার্য পরিণতিতে আট ওরাং-ওটাং একেবারে মুখোমুখি হয়ে শূন্যে ঝুলতে লাগল।

ততক্ষণে মুখোশ-নাচের দলটার ভয় অনেকটা কেটে গেছে; এবার সমস্ত ব্যাপারটাকেই একটা পরিকল্পনামাফিক মজাদার খেলা মনে করে তারা এমন অট্টহাসি হাসতে শুরু করল যে বন-মানুষদের অবস্থা একেবারে সঙ্গীণ হয়ে উঠল।

“ওদের আমার হাতে ছেড়ে দাও!” ভেকবাবাজী চীৎকার করে বলে উঠল। তার কর্কশ কণ্ঠস্বর সব হট্টগোল ছাপিয়ে হলময় ধ্বনিত হতে লাগল। ওদের আমার হাতে ছেড়ে দাও। মনে হচ্ছে ওদের আমি চিনি। ভাল করে মুখগুলো দেখতে পারলেই আপনাদের বলে দিতে পারব ওরা কারা।”

এইবার হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ভিড়ের মাথার উপর দিয়ে সে দেওয়ালের কাছে চলে গেল; একটা পরীর হাতে জ্বলন্ত মশালটা তুলে নিয়ে আবার আগের মতই ঘরের মাঝখানে ফিরে এল—বানরের মত একলাফে উঠে গেল রাজার মাথার উপরে—সেখান থেকে শিকল বেয়ে কয়েক ফুট উঠে মশালটাকে নীচু করে ধরে ওরাং-ওটাংয়ের দলটাকে ভাল করে দেখতে দেখতে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, “অচিরেই বুঝতে পারব এরা কারা!”

এবার হলের মধ্যে সমবেত সকলেই হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল; আর স্বয়ং বিদূষক তীব্রস্বরে একটা শিস দিয়ে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে শিকলটা একটানে সবেগে প্রায়

ত্রিশ ফুট উপরে উঠে গেল—সেই সঙ্গে উঠে গেল বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত আট ওরাং-ওটাং; তারা তখন স্কাই-লাইট আর মেঝের মাঝামাঝি জায়গায় দোদুল্যমান। ভেকবাবাজী কিন্তু তখনও তাদের থেকে সেই একই দূরত্বে থেকে জ্বলন্ত মশালটাকে তাদের দিকে তাক করে ধরে আছে—যেন তাদের পরিচয় জানার চেষ্টাই করছে।

তাদের এইভাবে উঠে যেতে দেখে হলের সব মানুষই বিস্ময়ে হতবাক্। মিনিট-খানেক ধরে মৃত্যু-নীরবতা। সেই নীরবতাকে ভেঙে কানে আসছিল একটা মৃদু অথচ কর্কশ খ্যাঁস-খ্যাঁস শব্দ, ঠিক যেরকম শব্দ রাজা ও তার মন্ত্রি-সভার সদস্যরা আগেও শুনতে পেয়েছিল। এবার কিন্তু শব্দটা কোথা থেকে আসছে সেবিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। শব্দটা আসছিল বামনের সূচী-সূক্ষ্ম দাঁতের পাটি থেকে। সেই তো দাঁতে দাঁত চেপে সজোরে ঘসছে, তার মুখ থেকে ফেনা ঝরছে, উন্মাদের মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে রাজা ও তার সাত সঙ্গীর ওল্টানো মুখের দিকে।

ক্রুদ্ধ বিদূষক অবশেষে বলে উঠল, "আঃ—হা! আঃ—হা! এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি এরা কারা!" এই সময় রাজাকে আরও ভাল করে দেখার ভান করে জ্বলন্ত মশালটাকে সে রাজার গায়ের শন পাটের আবরণের উপর চেপে ধরল, আর সঙ্গে সঙ্গে সব কিছু দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল। আধা মিনিটও লাগল না, আটটা ওরাং-ওটাংই ভীষণভাবে জ্বলতে লাগল। সমবেত সকল মানুষ নীচ থেকে তাদের দিকে তাকিয়ে আতংকে হাহাকার করতে লাগল, কিন্তু তাদের তিলমাত্র সাহায্যও করতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত আগুনের লকলকে জিভগুলি ক্রমেই বাড়তে থাকায় বিদূষক শিকল বেয়ে আগুনের ছোঁয়ার বাইরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য জনতা আবার নিশ্চুপ হয়ে গেল। সেই সুযোগে বামন আবার বলতে লাগল ঃ

"এখন আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি এই মুখোসধারীরা কি চরিত্রের মানুষ। এরা হলেন এক মহারাজা আর তার সাত মন্ত্রী—যে রাজা একটি অসহায় মেয়েকে আঘাত করতে কুণ্ঠিত হয় না, আর এমন সাত মন্ত্রী যারা তার এই অত্যাচারকে সমর্থন করে। আর আমি—আমি তো এক সাধারণ ভেকবাবাজী—এক ভাঁড়—আর এটাই আমার শেষ তামাশা!"

বামনের কথাগুলি শেষ হতে না হতেই দুই দারুণ দাহ্য পদার্থ শন পাট ও আল-কাতরার সংমিশ্রণে প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে তার প্রতিহিংসার কাজটি পূর্ণ হল। আটটি ঝলসানো, কালো, বীভৎস মৃতদেহ তালগোল পাকিয়ে শিকল থেকে ঝুলতে লাগল। তাদের লক্ষ্য করে হাতের মশালটা ছুঁড়ে দিয়ে পঙ্গু মানুষটি ধীরে সুস্থে সিলিং পর্যন্ত উঠে স্কাই-লাইটের ভিতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সকলেই মনে করে, ত্রিপেত্তাই হলের ছাদের উপর বসে তার বন্ধুর অগ্নিময় প্রতি-হিংসা সাধনের সহায়ক হয়ে কাজ করেছে; তারপর দু'জন একসঙ্গে পালিয়ে চলে গেছে নিজেদের দেশে ঃ কারণ তাদের দুজনকেই আর কখনও কেউ দেখে নি।

একাধারে চারমূর্তি

(মানবাঘুট)

এন্টিয়োকাস এপিফেনিসকে সকলেই মহাপুরুষ এজেকিল-এর "গগ" বলে মনে করে। অবশ্য সাইরাস-এর পুত্র ক্যাম্বিসেস-এরই এই সম্মান যথার্থ প্রাপ্য। বস্তুত, এ ধরনের কোন খেতাব বা সম্মান-নিদর্শনের প্রয়োজন সিরিয়ার অধিপতির নেই। খৃস্টের আবির্ভাবের একাত্তর বছর আগে তার সিংহাসনে আরোহণ, অথবা রাজত্ব দখল করা ; ইফেসাস-এর ডায়ানার মন্দির লুণ্ঠনের চেষ্টা ; ইহুদিদের প্রতি তার নির্মম শত্রুতা ; পরম পবিত্রকে অপবিত্র করা ; এবং এগারো বছরের ঝঞ্ঝাবহুল রাজত্বের পরে তাবাতে তার শোচনীয় মৃত্যু—এ সবই বড় মাপের ঘটনা ; আর তাই যে সমস্ত অপবিত্র, কাপুরুষোচিত, নিষ্ঠুর, মূঢ় ও খেয়ালি কর্মকাণ্ড নিয়ে গড়ে উঠেছে তার ব্যক্তিগত জীবন ও খ্যাতি, তাদের পরিবর্তে পূর্বোক্ত ঘটনাবলীই ইতিহাসকারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বেশী।

* * *

শান্ত পাঠক, ধরে নেওয়া যাক যে পৃথিবীতে এখন সময়টা তিন হাজার আটশ' ত্রিশ, আর কয়েক মিনিটের জন্য কল্পনা করা যাক যে আমরা উপস্থিত হয়েছি মানুষের এক কিম্ভূত বাসস্থান এন্টিয়োক শহরে। এ কথা ঠিক যে আমি যে শহরটির কথা বলছি সেটা ছাড়াও সিরিয়া এবং অন্য অন্য দেশে ঐ একই নামের আরও ষোলটি শহর আছে। কিন্তু আমাদের শহরটির প্রচলিত নাম ছিল এন্টিয়োকিয়া এপিডাফ্‌ন্‌—যে গ্রামে একটি দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে সেই ডাফ্‌ন্‌ গ্রামের নিকটেই শহরটি অবস্থিত বলেই এই নামকরণ। মহান আলেকসান্ডারের পরে এ দেশের প্রথম রাজা সেলুকাস নিকানরই তার পিতা এন্টিয়োকাসের স্মৃতিতে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (যদিও এ বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে) ; আর সেই থেকেই এটা সিরীয় রাজাদের বাসস্থান হয়ে ওঠে। রোমক সাম্রাজ্যের বাড়-বাড়ন্তের কালে প্রাচ্য প্রদেশগুলির প্রধান কর্মচারীর কর্মস্থল ছিল এই শহর ; বড় বড় সম্রাটদের অনেকেই (বিশেষ করে ভেরাস এবং ভ্যালেন্সের নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে) তাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় এখানেই কাটিয়েছেন। মনে হচ্ছে, আমরা শহরেই পৌঁছে গেছি। এবার তাহলে এই প্রাচীরে উঠে দৃষ্টি মেলে দেওয়া যাক শহর এবং পার্শ্ববর্তী দেশের উপর।

"ওই যে প্রশস্ত ও স্রোতবতী নদীটি অসংখ্য ঝর্ণাকে সঙ্গে নিয়ে নির্জন পার্বত্য পথ পেরিয়ে অবশেষে অট্টালিকাশ্রেণীর ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে, ওটা কোন্‌ নদী ?"

ওটাই অরন্টেস্‌ নদী ; দক্ষিণ দিকে প্রায় বারো মাইল বিস্তৃত একখানি প্রশস্ত দর্পণের মত দেখতে ভূমধ্যসাগর ভিন্ন এই নদীটি ছাড়া আর কোথাও জল চোখে পড়বে না। ভূমধ্যসাগর তো সকলেই দেখেছেন ; কিন্তু আমি বলছি, খুব অল্প লোকই এন্টিয়োককে পলকের জন্যও দেখেছেন। অল্প লোক বলতে আমি আপনার-আমার

মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের কথাই বলছি। সুতরাং সমুদ্রের কথা এখন থাক, আমাদের সব মনোযোগ দেওয়া যাক নীচের ওই গৃহশ্রেণীর উপর। মনে রাখবেন, এখন সময়টা তিন হাজার আটশ' ত্রিশ। এটা যদি আরও পরবর্তী কাল হত—যেমন, যদি আঠারোশ' পয়তাল্লিশ হত, তাহলে এই অসাধারণ দৃশ্যটি থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে এন্টিয়োক হবে একটি শোকবহ ধ্বংসস্তূপ। ততদিনে তিনটে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরপর তিনটে ভূমিকম্পের ফলে শহরটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। সত্যি কথা বলতে কি, তখন সে শহরের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা হবে এতই জনহীন ও ধ্বংসাবশেষ যে রাজ্যের অধিপতি তার বাসস্থান সরিয়ে নিয়ে যাবেন দামাস্কাসে। ঠিক আছে। দেখছি, আমার পরামর্শে আপনাদের লাভই হয়েছে। এই সব বাড়ি-ঘর দেখে সময়টাতো ভালই কাটছে—

—এই শহরের যা গর্ব
সেই সব স্মৃতিস্তম্ভ আর বিখ্যাত সব কিছু দেখে
চোখ তোমাদের ভরে গেল—

ক্ষমা করবেন; আমি ভুলেই গেছি যে আরও সতেরোশ' পঞ্চাশ বছরের আগে সেক্সপীয়রের আবির্ভাবই ঘটবে না। কিন্তু এপিদাফনের এই রূপকে কি আমি অদ্ভুত সুন্দর বলতে পারি না?

"শহরটা সুরক্ষিত; আর এ ব্যাপারে সে প্রকৃতি ও শিল্পকৃতি দুইয়ের কাছেই সমান ঋণী।"

খুব ঠিক।

"এখানে অসংখ্য রাজকীয় বাড়ি-ঘর আছে।"

তা আছে।

"আর এখানকার অসংখ্য জাঁকজমকপূর্ণ সুন্দর মন্দির যে কোন উচ্চপ্রশংসিত পুরাবস্তুর সঙ্গেই তুলনীয়।"

এ সবই আমি স্বীকার করছি। তবু এখানে তো রয়েছে অন্তহীন মাটির বাড়ি, আর জঘন্য বস্তি। চারদিকেই প্রতিটি নর্দমা প্রচুর জঞ্জালে পরিপূর্ণ; পৌত্তলিকদের ধূপের ধোঁয়ায় ঢাকা না পড়লে দুর্গন্ধে এখানে টেকা দায় হত। এত অসহ্য রকমের সরু রাস্তা, বা আশ্চর্য রকমের ঢ্যাঙা বাড়ি কি কখনও চোখে দেখেছেন? মাটির বুকে কী বিষণ্ণ ছায়াই তারা ফেলে! শেষহীন স্তম্ভগুলি থেকে ঝোলানো বাতিগুলি সারা দিন জ্বলে তাই রক্ষা; না হলে তো ধ্বংস হয়ে যাবার সময় মিশরে যে অন্ধকার নেমেছিল সেই রকম অন্ধকারে আমরাও ঢাকা পড়ে যেতাম।

"জায়গাটা সত্যি আশ্চর্য! ঐ বড় বাড়িটার কি মানে হয়? দেখুন! অন্য সব বাড়িকে ছাড়িয়ে ওটা যেন আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, আর তাও কিনা রাজ-প্রাসাদের পূর্ব দিকটাকে আড়াল করে!"

ওটাই নতুন সূর্য-মন্দির; সিরিয়ায় তাঁকে পূজা করা হয় এলাহ্ গাবালাহ্ নামে। পরবর্তীকালে একজন কুখ্যাত রোমক সম্রাট একটি নতুন পূজার প্রবর্তন করবেন এবং সেই থেকে তার নতুন উপাধি হবে "হেলিওগাবালুস।" নিশ্চয়ই আপনারা ঐ মন্দিরের

দেবতাকে একঝলক দেখতে চাইবেন। সেজন্য আপনাদের আকাশের দিকে তাকাতে হবে না ; সূর্যদেবতা ওখানে নেই—অন্তত সিরিয়ার লোকরা যে সূর্যদেবতার উপাসনা করে তিনি তো ননই। সে দেবতা থাকেন দূরের ঐ মন্দিরে। তিনি পূজিত হন একটি বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের মূর্তিরূপে, স্তম্ভের মাথায় আছে একটি শংকু বা পিরামিড—অগ্নির প্রতীক।

"শুনুন !—দেখুন !—ওই হাস্যকর মানুষগুলি কে ? অর্ধ-উলঙ্গ, মুখে রং-মাখা যে মানুষগুলি জনতার প্রতি চীৎকার করছে, নানারকম অঙ্গভঙ্গী করছে ?"

ওদের মধ্যে কিছু আছে ভণ্ড। বাকিরা দার্শনিক দলভুক্ত। অবশ্য তাদের মধ্যে যারা জনতাকে লাঠিপেটা করছে তারা সব রাজ-দরবারের প্রধান সভাসদ—সব সময় রাজাকে হাসি-খুশি রাখাই তাদের কাজ।

"কিন্তু এখানে আমরা কী দেখছি ? হা ঈশ্বর ! সারা শহর যে বন্যপশুতে ভরে গেছে ! কী ভয়ংকর দৃশ্য !—কী বিপজ্জনক ব্যবস্থা !"

ভয়ংকর বলতে চান বলুন ; কিন্তু বিপজ্জনক মোটেই নয়। কষ্ট করে একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন, প্রতিটি জন্তু কেমন শান্তভাবে তার মালিকের পিছন-পিছন চলেছে ; কারও কারও গলায় অবশ্য দড়ি বাঁধা আছে, কিন্তু সেগুলি প্রধানত বড় বেশী ভীতু প্রাণী। সিংহ, ব্যাঘ্র, আর চিতাগুলি কিন্তু সম্পূর্ণ ছাড়া। অতি সহজেই তাদের শেখানো হয়েছে নানারকম কাজ, এবং যার যার মালিকের খানসামা হিসাবেই তারা কাজ করে থাকে। এ কথা ঠিক যে কখনও কখনও স্বয়ং প্রকৃতি-দেবী নিজেকে প্রকাশ করে বসেন ; কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে যদি কোন সশস্ত্র সৈনিক কোন জন্তুর পেটে যায়, অথবা একটা বড় ষাঁড়ের ঘাড় মটকে দেওয়া হয়, তাহলেও সে ঘটনা নিয়ে এপিডফনু-এর লোকরা কোনরকম উচ্চবাচ্য করে না।

"কিন্তু ওটা কিসের অসাধারণ গোলমাল শুনতে পাচ্ছি ? এটা নিশ্চয় এণ্টিয়োকের পক্ষেও একটু বেশী জোরালো শব্দ ! শুনে মনে হচ্ছে বিক্ষোভটা অসাধারণ কিছু।"

হ্যাঁ—নিঃসন্দেহে। রাজা কোন অভিনব দৃশ্যের ফরমাস করেছেন—হয়তো হিপোড্রোমে কোন মল্লযুদ্ধের খেলা চলছে—অথবা হয়তো সিদিয়ান বন্দীদের গণ-বলি হচ্ছে—অথবা তার নতুন প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে—অথবা একটা সুন্দর মন্দিরকে ভেঙে ফেলা হচ্ছে—অথবা ইহুদিদের একটা দলকে জীবন্ত পোড়ানো হচ্ছে। অট্টহাসির শব্দ আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। বেতালা বাজনায় বাতাস ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে, লক্ষ কণ্ঠের কোলাহলে হয়ে উঠেছে ভয়ংকর। চলুন, নেমে যাই, ওখানে কী মজার কাণ্ড হচ্ছে দেখে আসি ! এই দিকে—সাবধান ! আমরা প্রধান রাজপথে এসে পড়েছি ; এটার নাম "টাইমার্কাস সরণি।" জলস্রোত বয়ে চলেছে এই পথে, সে বন্যার বেগ সামলানো বড়ই কঠিন। তারা ছুটে আসছে হেরাক্লিডেস গলি ধরে, আর সে গলিটা এসেছে সোজা প্রাসাদ থেকে—সুতরাং খুব সম্ভব রাজাও আছেন সেই হুল্লোড়-কারীদের দলে। ঠিক—ঐ তো শুনতে পাচ্ছি ঘোষকের চীৎকার ; প্রাচ্য দেশের জমকালো ভাষায় সে ঘোষণা করছে রাজার আগমন-বার্তা। তিনি যখন অশিমাহু মন্দিরের পাশ দিয়ে যাবেন তখন আমরা একঝলক তার দর্শন পাব। চলুন, আমরা

ভজনালয়ের অলিন্দে গিয়ে আশ্রয় নেইগে ; অচিরেই রাজা এখানে পৌঁছে যাবেন। ততক্ষণে এই মূর্তিটাকে ভাল করে দেখে নেওয়া যাক। এটা কিসের মূর্তি ? ওহো, এটাই তো অশিমাহ্‌দেবের আসল রূপ। অবশ্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা না মেষ, না ছাগল, না অর্ধ-ছাগ, অর্ধ-নর ; আর্কেডীয়দের দেবতা প্যান-এর সঙ্গেও এর বিশেষ মিল নেই। অথচ আগামী দিনের পণ্ডিতজনরা এই সব রূপই আরোপ করবেন সিরীয়দের দেবতা অশিমাহ্‌-র মূর্তিতে। এবার চশমা পড়ে নিন ; বলুন এটা কি ! এটা কি !

"কী সর্বনাশ ! এ তো একটা বানর !"

ঠিক—একটা বেবুন ; কিন্তু তাই বলে দেবতা হিসাবে ছোট নয়। তাঁর নামকরণ হয়েছে গ্রীক শব্দ "সিমিয়া" থেকে—পুরাতত্ত্ববিদরা কত মূর্খই হতে পারেন ! কিন্তু দেখুন !—দেখুন !—দূরে একটা লোমশ বাচ্চা লাফাচ্ছে। সে কোথায় চলেছে ? চীৎকার করে কি বলছে ? ওহো, সে বলছে, রাজা বিজয়-যাত্রায় বেরিয়েছেন ; তার পরিধানে রাজকীয় সাজ ; এইমাত্র নিজের হাতে তিনি এক হাজার শৃংখলিত ইজরাইলী বন্দীর নিধন-পর্ব সমাধা করেছেন ! এই মহাকর্মের দরুন ইতর লোকগুলো তার জয়-গানে আকাশ ভরে তুলেছে ! কান পেতে শুনুন ! ঐ আসছে একদল অনুরূপ সৈন্য। রাজার প্রশস্তিতে তারা একটি ল্যাটিন গান বেঁধেছে, আর সেটাই গাইতে গাইতে চলেছে ঃ

মিলে, মিলে, মিলে,
মিলে, মিলে, মিলে,
ডেকোলাভিমাস, উনাস হোমো !
মিলে, মিলে, মিলে, মিলে, ডেকোলাভিমাস !
মিলে, মিলে, মিলে !
ভিভাট ক্যুই মিলে, মিলে অক্সিডিট !
ট্যান্টাম্ ভিনি হ্যাভেট নেমো
কোয়ান্টাম স্যাঙ্গুইনিস্ এফুডিট !

কথাগুলির ভাষান্তর করলে এই রকম দাঁড়ায় ঃ

এক হাজার, এক হাজার, এক হাজার,
এক হাজার, এক হাজার, এক হাজার,
আমরা করেছি হত্যা মাত্র একটি যোদ্ধা নিয়ে !
এক হাজার, এক হাজার, এক হাজার, এক হাজার,
আবারও গান গাই এক হাজারকে নিয়ে !
সোহো !—এস আমরা গাই
মোদের রাজার দীর্ঘ জীবন চাই,
যে রাজা মেরেছে হাজার জনকে একটিই হাত দিয়ে !
সোহো !—আমরা আওয়াজ তুলি,

আমাদের মুঠিগুলি
দিয়েছেন রাজা ভরি
এত লাল রক্ত দিয়ে যা তুমি পাবে না
সারা সিরিয়া শহর ঘুরি !

"ভেরীর আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন ?"

হ্যাঁ—রাজা আসছেন ! দেখুন ! জনতার মুখ প্রশংসায় লাল হয়ে উঠেছে ; শ্রদ্ধায় তারা চোখ তুলেছে আকাশে ! তিনি আসছেন ! তিনি আসছেন !—ঐ তো তিনি !

"কে ?—কোথায় ?—রাজা ?—আমি তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না ;—তার আভাষও পাচ্ছি না।"

তাহলে আপনি অন্ধ।

"খুব সম্ভব। আমি তো এখনও একদল নির্বোধ ও উন্মাদের হট্টগোল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না—একটি বিরাটকায় বাঘুট (চিতাবাঘ+উট)-এর সম্মুখে ষাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে তার ক্ষুরে একটি চুমো খাবার জন্য তারা হুড়োহুড়ি করে মরছে। দেখুন ! সেই পশুটি যথোচিতভাবেই এক ভক্তকে একটি লাথি মারলেন—তারপর আর এক ভক্তকে—আর এক—আর এক। সত্যি, জন্তুটি যে ভাবে তার পা চালাচ্ছে তার প্রশংসা না করে আমি পারছি না।"

ভক্তই বটে !—আরে, এরাই তো এপিডাফনের ভদ্র, স্বাধীন নাগরিকজন ! জন্তু বললেন, তাই না ? খুব সাবধান, কেউ যেন শুনতে না পায়। আপনি কি বুঝতে পারছেন না, জন্তুটির আকৃতি মানুষের মত ? আরে মশায়, ঐ বাঘুট যে সে লোক নন, তিনিই তো এন্টিয়োকাস এপিফেনিস—সিরিয়ার রাজা বিখ্যাত এন্টিয়োকাস—প্রাচ্য দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাচারী ! এ কথা সত্য যে কখনও কখনও তাকে বলা হয় এন্টিয়োকাস এপিমেনেস—পাগলা এন্টিয়োকাস—কিন্তু বলা হয় এই কারণে যে তার সদগুণাবলী অনুধাবন করার মত ক্ষমতা সকলের থাকে না। আর এ কথাও সত্য যে এই মুহূর্তে তিনি পশু-চর্মের অন্তরালে আত্মগোপন করে সাধ্যমত সেই বাঘুটের ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করার চেষ্টা করেছেন ; আর সেটা করছেন রাজা হিসাবে স্বীয় মর্যাদাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। তাছাড়া, রাজার চেহারাটা যেমন দশাসই, পোশাকটাও তো সেই মতই হওয়া চাই। অবশ্য আমরা আরও অনুমান করতে পারি যে একটা কোন বিশেষ আনুষ্ঠানিক প্রয়োজন না হলে তিনি এই রূপ গ্রহণ করতেন না। এখন সেই অনুষ্ঠানটি হল একসহস্র ইহুদির বলিদান ; কী আশ্চর্য মর্যাদার সঙ্গেই না রাজামশায় চার পায়ে হাঁটছেন ! দেখতেই পাচ্ছেন, তার লেজটি তুলে ধরেছে রাজার দুই প্রধান উপপত্নী এলিন ও আর্গেলেস। চলুন, হিপোড্রোম পর্যন্ত আমরা তাকে অনুসরণ করি, এবং যে বিজয়-সঙ্গীতটি তিনি এখনই শুরু করবেন সেটি কান পেতে শুনি :

এপিফানেস ছাড়া আর কে আছে রাজা ?
বল—জান তোমরা কেউ ?
এপিফানেস ছাড়া আর কে আছে রাজা ?

সাবাস !—সাবাস !—হেউ !
এপিফানেস ছাড়া কেউ নেই—কেউ নেই,
না—কেউ নেই ;
তাহলে মন্দিরটাকে গুঁড়িয়ে দাও,
সূর্যটাকে নিভিয়ে দাও !

আহা, কী সুরেলা গান ! জনতা চীৎকার করে তাকে বলছে "কবির রাজা", "প্রাচ্যের গৌরব", "বিশ্বের হৃদয়রঞ্জন", "বাঘুট-এর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি।" শুনতে পাচ্ছেন, সকলে "এংকোর" ধ্বনি দিয়ে তাকে আবার গাইতে বলছে ?—তিনিও আবার গান ধরেছেন। হিপোড্রামে পেঁছিলেই আসন্ন অলিম্পিকে তার প্রত্যাশিত জয়লাভের জন্য তাকে কবির বরমাল্যে ভূষিত করা হবে।

"কিন্তু জুপিটারের দোহাই ! আমাদের পিছনের ওই ভিড়ের মধ্যে কি হচ্ছে।"

পিছনের কথা বলছেন ?—ওঃ হো !—বুঝতে পেরেছি। বন্ধু হে, বড় ঠিক সময়েই আপনি কথাটা বলেছেন। চলুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, একটা নিরাপদ স্থানে চলে যাই। এখানে !—আসুন এই ফোয়ারার খিলানটার নীচেই লুকিয়ে পড়ি। এবার শুনুন, ওখানকার গোলমালের গোড়ার কথা। আমি যেমনটা আশা করেছিলাম তাই ঘটেছে। মানুষের মাথাওয়ালা এই বাঘুটের আবির্ভাব এই শহরের গৃহপালিত জন্তুদের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে। ফলে একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে ; এবং এরকম ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়ে থাকে বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে মানুষের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। কিছু মানব-সন্তান ইতিমধ্যেই তাদের পেটে গেছে ; কিন্তু চতুষ্পদ দেশ-প্রেমিকরা একবাক্যে বলছে, ওই বাঘুটটাকে খেয়ে ফেলতে হবে। অতএব "কবিদের রাজা" এখন দুই পা তুলে প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছেন। সভাসদরা সংকট বুঝে সরে পড়েছে। কিন্তু উপপত্নীরা এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। "বিশ্বের হৃদয়রঞ্জন", আপনি বিপন্ন ! "প্রাচ্যের গৌরব", এবার আপনাকে চিবিয়ে খাবে ! সুতরাং করুণ দৃষ্টিতে লেজের দিকে তাকাবেন না ; ওটা মাটিতে হেঁচড়ে গেলেও কিছু করার নেই। মনে সাহস আনুন, পায়ে জোর আনুন, ছুটে যান হিপোড্রোমে ! স্মরণ করুন আপনি এন্টিয়োকাস এপিফেনিস। বিখ্যাত এন্টিয়োকাস !—তাছাড়া, "কবিদের রাজা", "প্রাচ্যের গৌরব", "বিশ্ব হৃদয়রঞ্জন", "মহামান্য বাঘুট !" ঈশ্বরের দোহাই ! কী প্রচণ্ড আপনার গতি ! আর লেজের কী কেরামতি ! ছুটে চলুন রাজা !—সাবাস এপিফোনিস !—চমৎকার বাঘুট !—গৌরবময় এন্টিয়োকাস ! তিনি ছুটছেন !—লাফাচ্ছেন !—উড়ছেন ! তীরের গতিতে চলেছেন হিপোড্রোমের দিকে ! তিনি লাফ দিলেন !—আর্তনাদ করলেন !—পেঁছে গেলেন ! খুব বেঁচে গেছেন ; হে প্রাচ্যের গৌরব, বৃত্তাকার রঙ্গমঞ্চে পেঁছিতে আপনার যদি আর আধ সেকেন্ড বিলম্ব হত তাহলে এপিডাফনে এমন একটি ভালুকের বাচ্চাও খুঁজে পাওয়া যেত না যে আপনার মৃতদেহে দাঁত বসায় নি। এবার ফেরা যাক—এখানে থেকেই আমরা বিদায় হই !—কারণ রাজার পলায়ন উপলক্ষ্যে একটু পরেই যে প্রচণ্ড জয়োল্লাস শুরু হয়ে যাবে আমাদের আধুনিক কর্ণযুগল তা সহ্য

করতে পারবে না! ওই শুনুন! শুরু হয়ে গেছে। দেখুন!—সারা শহর কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেছে।

"নিশ্চয় এটাই প্রাচ্য দেশের সব চাইতে জনবহুল শহর! কী এক জনারণ্য! নানা মর্যাদার, নানা বয়সের কী বিচিত্র সমাবেশ! কত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী ও জাতি! কত বিচিত্র সাজ-পোশাক! ভাষা-বৈচিত্র্যের কী এক "ব্যাবেল"! পশুদের কী চীৎকার! কত বাদ্যযন্ত্র! কত গাদা গাদা দার্শনিক!"

চলে আসুন, এবার কেটে পড়া যাক!

"একটু দাঁড়ান! দেখছি, হিপোড্রোমে একটা বিরাট হৈ-চৈ পড়ে গেছে; এর অর্থ কী আমাকে বলুন!"

"ওটা?—ও কিছু না! এপিডাফনের মহান ও স্বাধীন নাগরিকরা তাদের রাজার বিশ্বাস, জ্ঞান, ও দেবত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে, এবং তার এই সর্বশেষ অতি-মানবিক সঞ্চরণশীলতার চাক্ষুস সাক্ষী হয়ে এ বিষয়ে একমত হয়েছে যে দৌড়-প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করায় রাজার কপালে জয়মালা দুলিয়ে দেওয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য—আসন্ন অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠানের সময় এ জয়মালা তিনি যখন পাবেনই তখন তারা অবশ্যই সে মালাটা তাকে আগেই পরিয়ে দিতে পারে।

চোরাই চিঠি

Purloined Letter

প্যারিস শহর। ১৮—সালের শরৎকালের একটি ঝড়ো সন্ধ্যা। বন্ধুবর সি. অগস্ত দুপেঁর ৩৩নং রু দুনো ফবুর্গ স্যাঁৎ জারমেন ঠিকানার ছোট্ট লাইব্রেরি ঘরে দুই বন্ধু বসে একই সঙ্গে গভীর চিন্তা ও পাইপের আরামের মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। অন্তত প্রথম একটি ঘণ্টা দুজনই ছিলাম একেবারে চুপচাপ। তখন যে কেউ আমাদের দেখলেই মনে করত আমরা দুজনই ঘরের মধ্যে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ার রাশির মধ্যেই সম্পূর্ণ ডুবেছিলাম। অবশ্য নিজের সম্পর্কে আমি এটুকু বলতে পারি যে সন্ধ্যার গোড়ার দিকে যে সব বিষয় নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল মনে মনে আমি সেইগুলিরই পর্যালোচনা করছিলাম; আমি বলতে চাইছি, রু মর্গের ঘটনা এবং মারি বোগেত-এর হত্যা-রহস্যই ছিল আমার স্মৃতি-চারণের বিষয়। এমন সময় দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন আমাদের পুরনো বন্ধু প্যারিস-পুলিসের বড় কর্তা মঁসিয় জি—।

আমরা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালাম। অনেকদিন পরে তার সঙ্গে দেখা হল। আমরা অন্ধকারেই বসেছিলাম। দুপেঁ বাতিটা জ্বালাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়ল, কারণ জি. জানালেন, একটা গোলমেলে সরকারি ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে, বরং বলতে পারি বন্ধুটির মতামত জানতেই তিনি এসেছেন।

দুপেঁ বলল, "এটা যদি এমন ব্যাপার হয় যাতে খুবই মনঃসংযোগ দরকার তাহলে আলোচনাটা অন্ধকারে হওয়াই ভাল।"

"এই তোমার আর এক অদ্ভুত খেয়াল", বড় কর্তাটি বললেন। যা কিছু নিজের বুদ্ধির অতীত তাকেই "অদ্ভুত" বলাটা তার একটা স্বভাব; ফলে এমনি অনেক অদ্ভুতের পাহাড়ের মধ্যেই তাকে বাস করতে হত।

আগন্তুককে একটি পাইপ সরবরাহ করে এবং একটা আরাম-কেদারা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে দুপেঁ বলল, "খুব খাঁটি কথা।"

আমি প্রশ্ন করলাম, "আবার কি সমস্যা দেখা দিল ? আশা করি নতুন কোন খুনের ব্যাপার নয় ?"

"না। না ; মোটেই তা নয়। ব্যাপারটা খুবই সরল, আর আমরা নিজেরাই যে বেশ ভালভাবেই তার মোকাবিলা করতে পারি তাতেও কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু মনে হল, দুপেঁ হয় তো সব কথা শুনলে খুশি হবেন, কারণ পুরো ব্যাপারটাই অতিমাত্রায় অদ্ভুত।"

"সরল এবং অদ্ভুত", দুপেঁ যোগ করল।

"তা বটে ; আবার ঠিক-ঠিক ও দুটোর একটাও নয়। আসলে কি জানেন, ব্যাপারটা এত সরল হওয়া সত্ত্বেও আমরা কেউ কিছু বুঝতে পারছি না বলেই কেমন যেন ধাঁধায় পড়ে গেছি।"

"হয় তো ব্যাপারটা অতি সরল বলেই আপনারা ঠিক ধরতে পারছেন না", আমার বন্ধুটি বলল।

বড় কর্তা হো-হো করে হেসে বললেন, "কী যে বাজে কথা বলেন আপনি !"

"হয় তো রহস্যটা বড় বেশী সরল," দুপেঁ বলল।

"হা ভগবান ! এ আবার কেমন ধারা কথা ?"

"একটু বেশী স্পষ্ট, এই আর কি।"

"হা ! হা ! হা !—হা ! হা ! হা !—হো ! হো ! হো !" আগন্তুক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ; "ওঃ দুপেঁ, হাসিয়ে হাসিয়েই আপনি আমাকে মেরে ফেলবেন দেখছি !"

"আসলে ব্যাপারটা তাহলে কি ?" আমি জানতে চাইলাম।

একটা লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে আরাম করে চেয়ারে বসে বড় কর্তা বললেন, "বলব—সব বলব। তবে সংক্ষেপে বলব। কিন্তু তার আগে আপনাদের সাবধান করে দিতে চাই যে, ব্যাপারটা সাতিশয় গোপনীয় ; ব্যাপারটা আমি কাউকে বলেছি এটা জানাজানি হয়ে গেলে আমার চাকরীটাই চলে যেতে পারে।"

"বলে যান," আমি বললাম।

"নাও বলতে পারেন," দুপেঁ বলল।

"তাহলে শুনুন ; বিশেষ উপর মহল থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানতে পেরেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিশেষ দলিল রাজপ্রাসাদ থেকে চুরি হয়েছে। কে চুরি

করেছে তাও জানা গেছে; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; তাকে চুরি করতে দেখাও গেছে। আরও জানা গেছে যে, দলিলটা এখনও তার হেপাজতেই আছে।"

"সেটা কি করে জানা গেল?" দুপেঁ প্রশ্ন করল।

বড় কর্তা জবাব দিলেন, "দলিলটার প্রকৃতি এবং সেটা চোরের হাত-ছাড়া হয়ে গেলে যা কিছু ঘটতে পারত সেগুলি যে ঘটে নি তার থেকেই পরিষ্কারভাবে এটা অনুমান করা যায়।"

"আরও একটু বিশদ করে বলুন" আমি বললাম।

"দেখুন, আমি এ পর্যন্ত বলতে পারি যে সেই দলিল যার কাছে থাকবে সে একটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হবে এমন একটি বিশেষ মহলে যেখানে ঐ ক্ষমতাটি অত্যন্ত মূল্যবান।" কূটনীতির চাল দেওয়াটা বড় কর্তার বড় প্রিয়।

দুপেঁ বলল, "আমি কিন্তু এখনও কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

"পারলেন না? তাহলে শুনুনঃ এই দলিলটা কোন অজানা তৃতীয় ব্যক্তির হাতে পড়লে একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সম্মান বিপন্ন হয়ে পড়বে; অতএব যে খ্যাতনামা ব্যক্তিটির সম্মান ও মানসিক শান্তি এই ভাবে বিপন্ন হতে বসেছে তিনি সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির একেবারে হাতের মুঠোয় চলে গেছেন।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু যার দলিল চুরি হয়েছে তিনি যে চোরের পরিচয়টা জেনে ফেলেছেন সেটা যদি চোর নিজে জানতে পারে, তবেই তো সে এই সুবিধাটা আদায় করতে পারবে। এমন সাহস কোন্ চোরের আছে যে—"

জি. বললেন, "চোরটি হচ্ছেন মন্ত্রী ডি—, মানুষের পক্ষে সম্ভব বা অসম্ভব এমন কোন কাজ নেই যা তিনি করতে পারেন না। চুরির পদ্ধতিটাও কৌশল ও বুদ্ধির পরিচায়ক। আলোচ্য দলিলটি—খোলাখুলি বলাই ভাল যে সেটা একটা চিঠি—যার কাছ থেকে চুরি গেছে সেটা তিনি যখন পেয়েছিলেন তখন তিনিও একাই ছিলেন তার শয়ন-কক্ষে। মহিলাটি যখন সেই চিঠি পড়ছিলেন তখনই অপর মাননীয় ব্যক্তিটি সেই ঘরে ঢুকে পড়েন, অথচ তার কাছে চিঠির ব্যাপারটা গোপন রাখতেই মহিলাটি চেয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি চিঠিটাকে একটা দেরাজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে তিনি চিঠিটাকে টেবিলের উপর মেলে ধরতে বাধ্য হন। অবশ্য ঠিকানাটাই উপরে থাকায় ভিতরের লেখাটা গোপনই থেকে যায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢোকেন মন্ত্রী ডি—। সঙ্গে সঙ্গেই তার শ্যেন দৃষ্টি কাগজটার উপর গিয়ে পড়ে, ঠিকানার হস্তাক্ষর তিনি চিনতে পারেন, এবং মহিলার চোখ-মুখের ভাব দেখেই চিঠির গোপনীয়তার গভীরতাটা পরিমাপ করতে সক্ষম হন। স্বভাবসুলভ দ্রুততার সঙ্গে কিছু কাজের কথা সেরে তিনি আলোচ্য চিঠির অনুরূপ অপর একখানি চিঠি বের করে সেটা পড়ার ভান করেন এবং চিঠিটাকে অপর চিঠির ঠিক পাশেই রেখে দেন। তারপর প্রায় মিনিট পনেরো ধরে আরও কিছু সরকারি কাজকর্মের কথা বলে বিদায় নেবার সময় তিনি টেবিল থেকে সেই চিঠিটাই তুলে নিলেন যেটা তার নিজের চিঠি নয়। চিঠিটার আসল মালিক ঘটনাটা দেখলেন, কিন্তু তারই পাশে দাঁড়ানো তৃতীয় ব্যক্তিটির

উপস্থিতিতে কিছুই বলতে সাহস করলেন না। মন্ত্রীমশায় নিজের চিঠিটা—একটা ফালতু চিঠি—টেবিলে রেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।”

এবার দুপেঁ আমাকে বলল, “তুমি যা জানতে চেয়েছিলে সেটা তো পুরোটাই জানলে—যার চিঠি চুরি গেল তিনি যে চোরকে চিনলেন সেটা চোরও ঠিকই জানল। অতএব খেলাটা চোরের হাতেই গেল।”

বড়কর্তা বললেন, “ঠিক; আর এই সুযোগে যে ক্ষমতাটা তার হস্তগত হল গত কয়েক মাস ধরে সেই ক্ষমতার জোরে তিনি বড় রকমের রাজনৈতিক ফায়দা লুটে চলেছেন। আর যার চিঠি চুরি গেছে তিনি প্রতিটি দিনই চিঠিটা ফিরে পাবার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন। কিন্তু কাজটা তো প্রকাশ্যে করা যাবে না। তাই একেবারে হতাশ হয়েই তিনি সে কাজের ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন।”

ধোঁয়ার ঘূর্ণিবাতাসের মধ্যে বসেই দুপেঁ বলল, “আপনার চাইতে অধিকতর বুদ্ধিমান লোক আর কেই বা আছেন, বা হতে পারেন।”

বড়কর্তা বললেন, “আপনি আমাকে হাওয়া দিচ্ছেন; কিন্তু অনেকেই এই মতটা পোষণ করতেও তো পারেন।”

আমি বললাম, “আপনার কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে চিঠিটা মন্ত্রীমশায়ের হাতেই আছে। আর যেহেতু এই চিঠির দখলই তার ক্ষমতার উৎস, চিঠিটা ব্যবহার নয়, অতএব চিঠিটা কাজে লাগানো মাত্রই ক্ষমতাটাও বিদায় নেবে।”

জি. বললেন, “ঠিক কথা; আমিও এই ধারণা নিয়েই কাজ করছি। আমার প্রথম কাজই ছিল মন্ত্রীর হোটেলটাকে ভালভাবে তল্লাসী চালানো, আর সেখানেও আমার প্রথম অসুবিধাই দাঁড়াল তার অজ্ঞাতে তল্লাসীটা চালানো। তিনি যদি কোনভাবে এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন তাহলে আমার যে সমূহ বিপদ ঘটতে পারে সে বিষয়ে অনেকেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে।”

আমি বললাম, “কিন্তু এ ধরনের তদন্ত করার অধিকার তো আপনার অবশ্যই আছে। প্যারিসের পুলিশ তো আগেও অনেকবার এ কাজ করেছে।”

“তা তো বটেই; আর সেইজন্যই তো আমি হাল ছাড়ি নি। মন্ত্রীমশায়ের কতকগুলি অভ্যাসও আমাকে বেশ বড়রকমের কিছু সুবিধা করে দিয়েছে। মাঝে মাঝেই সারারাত তিনি বাড়ির বাইরে কাটান। তার চাকরের সংখ্যাও খুব বেশী নয়। তারা ঘুমোয় মালিকের শোবার ঘর থেকে বেশ কিছুটা দূরে, আর নেপল্‌সের লোক হওয়ায় নেশাও করে প্রচুর। আপনি তো জানেন, আমার কাছে এমন চাবি আছে যা দিয়ে প্যারিসের যে কোন ঘর বা আলমারি খোলা যায়। গত তিন মাসে এমন একটি রাতও যায় নি যার অধিকাংশ সময়টা আমি ডি—হোটেলটি তচনচ করার কাজে কাটাই নি। আমার সম্মান এর সঙ্গে জড়িত, আর—গোপন কথাটাও বলেই ফেলি—পুরস্কারের অংশটাও বেশ মোটা রকমের। তাই চোর আমার চাইতেও তীক্ষ্ণবুদ্ধি এটা না বোঝা পর্যন্ত আমি তল্লাসীর কাজ বন্ধ করি নি। আমার তো ধারণা বাড়িটার

আনাচে-কানাচে যেখানেই কাগজটা লুকিয়ে রাখা সম্ভব তেমন সব জায়গায়ই আমি খোঁজ করেছি।”

আমি বললাম, “কিন্তু এটাও কি হতে পারে না, চিঠিটা যে মন্ত্রীর কাছেই আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ না থাকলেও তিনি সেটাকে নিজের বাড়িতে না রেখে অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন?”

দুপেঁ বলল, “হতে তো পারেই। তবে আদালতে ব্যাপারটা যা দাঁড়িয়েছে, বিশেষ করে ডি—যে সব ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছেন বলে জানা গেছে, তাতে এই মুহূর্তেই দলিলটা পাওয়া—এক মিনিটের নোটিসেই সেটাকে বের করে দেওয়া—দলিলটাকে হাতের মুঠোয় রাখার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।”

“বের করে দেওয়া মানে?” আমি বললাম।

“মানে—চিঠিটাকে নষ্ট করে ফেলার সম্ভাবনা,” দুপেঁ বলল।

আমি বললাম, “ঠিক কথা; চিঠিটা তাহলে ঐ বাড়িতেই আছে। তবে সেটা মন্ত্রীর কাছেই আছে, এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই।”

বড়কর্তা বললেন, “একেবারেই নেই। দুবার তাকে পথের মাঝখানে ধরে আমার চোখের সামনে তার সারা দেহ তল্লাসী করা হয়েছে।”

দুপেঁ বলল, “আপনি নিজে অতটা কষ্ট না করলেই পারতেন। আমার বিশ্বাস ডি—মোটেই বোকা লোক নন; আর তাই তাকে যে পথের মাঝখানে আটক করা হতে পারে সেটা তিনি আগে থেকেই জানতেন।”

জি. বললেন, “না, ঠিক বোকা তিনি নন; তবে তিনি একজন কবিও বটে, তাই আমার হিসাবে তিনি বোকার চাইতে এক ধাপ উপরের মানুষ।”

পাইপে একটা লম্বা টান দিয়ে দুপেঁ বলল, “ঠিক কথা, কারণ কিছু ওছা কবিতা আমি নিজেও লিখেছি।”

আমি বললাম, “তল্লাসীর ফলাফলটা যদি একটু বিস্তারিতভাবে বলেন—”

“আরে—আসল ঘটনা হল, আমরা যথেষ্ট সময় দিয়ে সর্বত্র তল্লাসী চালিয়েছি। এ সব ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের। বাড়ির এক একটা ঘর এক এক দিন হাতে নিয়েছি, প্রতিটা ঘরের পিছনে একটা পুরো সপ্তাহের সারাটা রাত ব্যয় করেছি। প্রথমে প্রতিটা ঘরের আসবাবপত্র তল্লাস করেছি। যতদূর সম্ভব প্রতিটা দেরাজ খুলে দেখেছি; আর আপনি তো জানেন, একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীর কাছে গোপন দেরাজ বলে কিছু থাকতে পারে না। এ ধরনের তল্লাসীর ব্যাপারে কোন “গোপন” দেরাজ যার দৃষ্টি এড়িয়ে যায় সে তো একটা হাঁদারাম। ব্যাপারটা তো খুব পরিষ্কার। আলমারির পরে আমরা চেয়ারে হাত লাগাই। লম্বা-লম্বা সূঁচ দিয়ে কুশনগুলিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে পরীক্ষা করি। টেবিলের উপরকার ঢাকাটা খুলে ফেলি।”

“কেন?”

“অনেক সময় কোন কিছু লুকিয়ে রাখতে হলে টেবিলের ঢাকনা বা অন্য কোন

অংশকে সরিয়ে ফেলা হয়। তারপর পায়ার ভিতরটা খুঁড়ে ফেলে দিয়ে জিনিসটা তার মধ্যে ভরে দিয়ে ঢাকনাটা বসিয়ে দেওয়া হয়। খাটের ছত্রীকেও ঠিক একই ভাবে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।"

"কিন্তু শব্দ শুনে কি খোঁড়লের অস্তিত্বটা ধরা যায় না ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"মোটেই যায় না যদি জিনিসটি ভরে দেবার পরে তার চারদিকে পুরু করে তুলো জড়িয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া, এ ক্ষেত্রে আমাদের তো কাজ করতে হয়েছে কোন রকম শব্দ না করে।"

"কিন্তু যে ভাবে কোন জিনিস ভরে দেবার কথা আপনি বললেন সে রকম সব আসবাবকে তো আপনি ভেঙে টুকরো-টুকরো করতে পারেন না। একখানা চিঠিকে তো একটা বড় বারসুঁইয়ের মত আকার ও প্রকারের মত করে দলা পাকিয়ে একটা চেয়ারের পাটাতনের কাঠের মধ্যেও ভরে দেওয়া যেতে পারে। সব চেয়ারকে তো আপনারা ভেঙে ভেঙে দেখেন নি ?"

"নিশ্চয়ই দেখি নি ; কিন্তু আমরা দেখেছি আরও ভালভাবে—হোটেলের প্রতিটি চেয়ারের কাঠকে, প্রতিটি আসবাবের জোড়কে আমরা শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি। কোথাও নতুন কোন জোড়া-তালির চিহ্নমাত্র থাকলে সেটা কখনই আমাদের নজরকে এড়াতে পারত না। একটা অতি ক্ষুদ্র কাঠের গুঁড়োও সে যন্ত্রে আপেলের মত বড় হয়ে দেখা দিত। আঠা লাগাবার সামান্যমাত্র ত্রুটি—দুটো কাঠ জুড়ে দেবার সময় এতটুকু অসাধারণ ফাঁক দেখলেই আমরা সেটাকে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করেছি।"

"তাহলে তো আপনারা আয়না ও তার ফ্রেম, বিছানা ও বিছানার চাদর, মশারি এবং কার্পেট—সবকিছুই পরীক্ষা করেছেন।"

"অবশ্যই করেছি ; প্রতিটি আসবাবকে এই ভাবে পরীক্ষা করে তারপর বাড়িটাকে ধরেছি। পুরো বাড়িটাকে নানা অংশে ভাগ করে তাদের একটা করে সংখ্যা দিয়েছি, যাতে কোন একটা অংশ বাদ না পড়ে ; তারপর প্রতি বর্গ-ইঞ্চি করে পুরো বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেছি ; এমন কি সংলগ্ন দুটি বাড়িকেও বাদ দেই নি।"

"সংলগ্ন বাড়ি দুটোও !" আমি সবিস্ময়ে বললাম ; "তাহলে তো আপনাদের অনেক ঝামেলা পোয়াতে হয়েছে।"

"তা তো হয়েছেই ; কিন্তু পুরস্কারটিও তো বেশ বড়-সড় !"

"বাড়ির চারদিককার জমিও পরীক্ষা করেছেন না কি ?"

"সব জমিই তো ইঁট দিয়ে বাঁধানো। তাতেই আমাদের পরিশ্রম অনেক লাঘব হয়েছে। আমরা কেবল দুই ইঁটের মাঝখানের শ্যাওলাটা পরীক্ষা করেছি ; কোথাও সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে নি।"

"ডি—র কাগজপত্র, আর লাইব্রেরির বইগুলিও তো দেখেছেন ?"

"নিশ্চয় ; প্রতিটি কাগজের বস্তা ও পুলিন্দা খুলে দেখেছি ; প্রতিটি বই খুলেছি,

এমন কি প্রতিটি পাতা উল্টে দেখেছি ; অন্য পুলিশ-অফিসারদের মত কেবল নেড়েচেড়ে ঝাঁকি দিয়ে দেখি নি। প্রতিটি বইয়ের মলাট কতটা পুরু সেটাও মেপেছি। মূল বাঁধাইয়ের পরে কোনরকম মেরামত বা তাপ্পি মারার চিহ্ন চোখে পড়লেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছি।"

"কার্পেটের নীচেকার মেঝেতেও অভিযান চালিয়েছেন না কি ?"

"নিঃসন্দেহে। প্রতিটি কার্পেট তুলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করেছি।"

"আর দেওয়ালে লাগানো কাগজ ?"

"তাও।"

"ভূগর্ভ-কক্ষগুলিও দেখেছেন ?"

"দেখেছি।"

আমি বললাম, "তাহলে তো আপনাদের হিসাবেই ভুল হয়েছিল ; চিঠিটা তো বাড়ির কোথাও আদপেই ছিল না।"

বড়কর্তা বললেন, "এটা কিন্তু আপনি ঠিকই ধরেছেন। মঁসিয় দুপেঁ, এবার বলুন, এ ক্ষেত্রে আপনি আমাকে কি করতে বলেন ?"

"বাড়িটাতেই আরও ভাল করে খোঁজ করুন।"

জি—উত্তর দিলেন, "তাতে কোনই কাজ হবে না। আমি বেঁচে আছি এটা যেমন সত্যি, চিঠিটা হোটেলে নেই সেটাও ততখানি সত্যি।"

দুপেঁ বলল, "এর চাইতে ভাল পরামর্শ আমি দিতে পারছি না। অবশ্য চিঠির একটা সঠিক বিবরণ নিশ্চয় আপনি পেয়েছেন ?"

"অবশ্যই পেয়েছি!" —কথাটা বলেই বড়কর্তা একখানা দিন-পঞ্জী খুলে হারানো চিঠির ভিতরকার কথা এবং বিশেষ করে বাইরের চেহারার একটি বিস্তারিত বিবরণ আমাদের পড়ে শোনালেন। চিঠি পড়া শেষ করেই তিনি ভগ্নমনরথ হয়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

প্রায় মাসখানেক পরে তিনি আবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সেদিনও আমরা আগের দিনের মতই নিজেদের আলোচনায় মগ্ন ছিলাম। একটা পাইপ হাতে নিয়ে চেয়ারে বসে তিনি কিছু প্রাথমিক কথা-বার্তা শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত আমিই কথাটা তুললাম,

"আচ্ছা জি—, সেই চোরাই চিঠিটার কি হল ? আশা করি শেষ পর্যন্ত আপনি স্থির করেছেন যে মন্ত্রীকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করে কোন লাভ নেই ; তাই কি ?"

"তা বলতে পারেন ; তবে দুপেঁর কথামত আর একবার তল্লাসীটা চালিয়েছিলাম—কিন্তু সবটাই পণ্ডশ্রম ; আমি জানতাম তাতে কোন লাভ হবে না।"

"কত টাকার পুরস্কার ঘোষণার কথা যেন আপনি সেদিন বলেছিলেন ?" দুপেঁ প্রশ্ন করল।

"কেন, লেন-দেনটা বেশ বড় রকমেরই ছিল—খুব বড় পুরস্কার; ঠিক কত সেটা বলতে চাই না; তবে একটা কথা বলতে পারি, কেউ যদি আমাকে চিঠিটা এনে দিতে পারে তো তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর চেক লিখে দিতে রাজী আছি। কি জানেন, ব্যাপারটার গুরুত্ব প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে; সম্প্রতি পুরস্কারের অংকটাও দ্বিগুণ করা হয়েছে। অবশ্য তিন গুণ করা হলেও আমি যা করেছি তার বেশী কিছু করতে পারতাম না।"

তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে দুপেঁ টেনে টেনে বলল, "তা তো বটেই; তবে—আমার কি মনে হয়—জানেন জি—, এ ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি সচেষ্ট হন নি; আমি তো মনে করি—মানে—আপনি আরও অনেক কিছু করতে পারতেন।"

"সে কি? কেমন করে?"

"কেন—ফু, ফু—এ ব্যাপারে আপনি—ফু, ফু—কৌঁসুলি নিয়োগ করতে পারতেন; না কি? —ফু, ফু, ফু। এবারনেটির গপ্পোটা মনে আছে তো?"

"না; রেখে দিন আপনার এবারনেটি!"

"তাতো বটেই! তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন। কিন্তু কোন এক সময়ে জনৈক ধনী কৃপণ লোক এই এবারনেটির কাছে গিয়ে একটা ডাক্তারি পরামর্শের জন্য তার মন ভেজাবার চেষ্টা করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে গিয়ে নানারকম কথাপ্রসঙ্গে এক সময় তার নিজের অসুখের কথাটাই অন্য এক কাল্পনিক লোকের অসুখ বলে বর্ণনা করেছিল। কৃপণ লোকটি বলেছিল, 'ধরুন, তার এই-এই লক্ষণ দেখা দিয়েছে; এ অবস্থায় ডাক্তার হিসাবে আপনি তাকে কি ওষুধ খেতে বলবেন?' উত্তরে এবারনেটি বললেন, 'ওষুধ। সে কি? আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন, তবে তো ওষুধের কথা।"

কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে বড়কর্তা বললেন, "কিন্তু আমি তো পরামর্শ নিতে এবং তার দাম দিতে সম্পূর্ণ রাজী। যিনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন তাকে আমি পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ দিতে রাজী আছি।"

তখন দুপেঁ একটা দেরাজ খুলে চেক-বই বের করে বলল, "তাহলে ঐ টাকার একটা চেক আমাকে লিখে দিন। সেটাতে স্বাক্ষর করা হলেই আমি চিঠিটা আপনার হাতে তুলে দেব।"

আমি তো স্তম্ভিত। বড়কর্তা বজ্রাহত। কিছুক্ষণ তিনি একেবারে নির্বাক, নিশ্চল; অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে হা করে আমার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন; মনে হল চোখ দুটি বুঝি কোটর থেকে বেরিয়ে আসবে; তারপর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে কলমটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁর একটা চেক লিখে তাতে সই করে টেবিলের উপর দিয়ে সেটা দুপেঁর হাতে এগিয়ে দিলেন। বন্ধুবর চেকটাকে ভাল করে দেখে নিয়ে পকেট-বইতে রেখে দিল; তারপর দেরাজের তালা খুলে চিঠিটা বের করে বড়কর্তাকে দিল। তিনিও অতি-আনন্দের যাতনায় চিঠিটাকে চেপে ধরে কাঁপা হাতে সেটাকে খুলে অতি দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে অতি কষ্টে দরজা

www.boighar.blogspot.com

পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে হঠাৎ এক ছুটে ঘর থেকে এবং বাড়ি থেকেও বেরিয়ে গেলেন ; বিদায়ের আগে আমাদের সঙ্গে একটা কথাও বললেন না।

তিনি চলে যাবার পরে বন্ধুবর ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

“তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্যারিসের পুলিশরা খুবই দক্ষ। তারা অধ্যবসায়ী, কৌশলী, ধূর্ত, এবং নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। তাই জি—যখন হোটেল ডি—তে তার তদন্তকার্যের বিস্তারিত বিবরণ শোনালেন, তখনই আমার দৃঢ় ধারণা হল যে তার তদন্তের কাজটা নিশ্চয়ই সন্তোষজনক হয়েছে—অবশ্য তার পরিশ্রমের ফলে যতটা হওয়া সম্ভব।”

“তার অর্থ কি?” আমি জানতে চাইলাম।

“যে সব পদ্ধতি তারা অবলম্বন করেছিল সেগুলি যেমন সঠিক ছিল, তেমনি সুষ্ঠুভাবে রূপায়িতও হয়েছিল। অতএব চিঠিটা যদি তাদের আওতার মধ্যে থাকত তাহলে চিঠিটা ওরা নির্ঘাৎ পেয়ে যেত।”

তার কথা শুনে আমি শুধু হাসলাম, কিন্তু তার কথাগুলি ছিল খুবই গুরুগম্ভীর।

বন্ধু বলতে লাগল, “তাদের অবলম্বিত পদ্ধতি ও তার রূপায়ণ দুইই ভাল ছিল ; ত্রুটি ছিল এই ব্যাপারে এবং লোকটি সম্পর্কে তার অপপ্রয়োগে বড়কর্তা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা যে প্রায়ই বোকা বনে যায় তার প্রধান কারণই হল যাকে নিয়ে সমস্যা তার বুদ্ধি বা মনের কোন খোঁজই এরা রাখে না। কেবল নিজেদের বুদ্ধি আর কৌশলটাই দেখে ; কোন গোপন জিনিস খুঁজতে গিয়ে শুধু ভাবে, তারা নিজেরা কেমন করে জিনিসটা লুকিয়ে রাখত। অর্থাৎ তারা সাধারণ মানুষের মত করেই ভাবনা-চিন্তা করে। কিন্তু যদি কোন অপরাধীর বুদ্ধি বা মানসিক গঠন তাদের বুদ্ধি বা চরিত্র থেকে আলাদা হয়, তাহলে তাদের কাছেই তারা হেরে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ডি—র ব্যাপারটাই দেখ। বড়কর্তারা সব কিছু নেড়েছে, খুঁজেছে, ফুটো করেছে, অনুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহার করেছে, সারা বাড়ি বর্গ-ইঞ্চি মেপে পরীক্ষা করেছে। আসলে এ সব কি? বড়কর্তা বছরের পর বছর ধরে নানা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে কতকগুলি রুটিন-মাপা ধরাবাঁধা কাজের ছকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন, আর সব তল্লাসীর ক্ষেত্রে সেই একই ছকে কাজ করে থাকেন। আসলে, এই বড় কর্তাটি গোড়া থেকেই একটা গোলকধাঁধায় ঘুরে মরেছেন। তার ব্যর্থতার মূল কারণ রয়েছে তার এই ধারণার মধ্যে যে মন্ত্রীমশায় একটি বোকা সোকা মানুষ, কারণ কবি হিসাবে তার একটা খ্যাতি আছে। আর তার মতে, সব নির্বোধরাই কবি, অতএব সব কবিরাই নির্বোধ। কিন্তু এই অনুমানের মধ্যে যে ন্যায়শাস্ত্রের মস্ত বড় একটা হেতোভাষ রয়েছে সেটা হয় তো তিনি জানেনই না।”

আমি প্রশ্ন করলাম, “কিন্তু ইনি কি সত্যি সত্যি কবি? আমি তো জানি তারা দুই ভাই ; দুজনই পণ্ডিত মানুষ। আমার বিশ্বাস মন্ত্রীমশায় অনেক লেখালেখি করেছেন “ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস” নিয়ে। তিনি একজন গণিতজ্ঞ, কবি নন।”

"তোমার জানাটা ভুল; আমি তাকে ভালভাবেই জানি; তিনি দুইই। কবি এবং গণিতজ্ঞ বলেই তার বিচার-শক্তিও প্রখর; শুধু গণিতজ্ঞ হলে সেটা হত না; আর সে ক্ষেত্রে তিনি বড় কর্তাটির হাতে ধরা পড়তেন।"

আমি বললাম, "এ ধরনের কথা বলে তুমি যে আমাকে অবাক করলে হে। তোমার কথাগুলি যে বিশ্বের সকলে যা বলে তার উল্টো। শতাব্দীব্যাপী প্রচলিত ধারণাকে তো তুমি নস্যাৎ করে দিতে পার না। সকলেই তো জানে এবং মানে যে, গণিতিক বুদ্ধিই আসল বুদ্ধি।"

দুপেঁ বাধা দিয়ে বলল, "ও সব তাত্ত্বিক আলোচনা এখন তোলা থাক। যা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেই কথায়ই ফিরে যাই। শোন, আমি বলতে চাইছি, মন্ত্রীমশায় যদি শুধুই গণিতজ্ঞ হতেন তাহলে বড়কর্তাকে এই চেকটা আমাকে দিতে হত না। আমি জানতাম তিনি গণিতজ্ঞ ও কবি দুই-ই, আর সেই দৃষ্টি-কোণ থেকেই আমি তার বিচার করেছি। আমি আরও জানতাম যে তিনি একজন মন্ত্রী এবং সাহসী চক্রান্তকারী। তাই আমার বিশ্বাস ছিল, এ রকম একটি তুখোর মানুষ কখনও পুলিশের সাধারণ কর্ম-কাণ্ড সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন না। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, পুলিশ তাকে পথের মাঝখানে অতর্কিত আক্রমণ করবে—বাস্তবেও তাই ঘটেছে; তিনি আগেই বুঝতে পেরেছিলেন, তার বাড়িটা গোপনে খানাতল্লাসী করা হবে—বাস্তবেও তাই হয়েছে। আসলে পুলিশী কাজ-কর্মের যে চিরাচরিত পদ্ধতির কথাগুলি এতক্ষণ তোমাকে শোনালাম, একজন তুখোর বুদ্ধিমান মানুষ হিসাবে মন্ত্রীমশায়ও সেই একই চিন্তাধারায় শরিক হতে পেরেছিলেন। অতএব কোন জিনিস লুকিয়ে রাখার সাধারণ জায়গাগুলি যে তিনি ঝেড়ে বাতিল করবেন এটা তো প্রায় অবধারিতই ছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তার বিচার-বুদ্ধি এত দুর্বল ও পলকা হতে পারে না যে, হোটেলের যে কোন জটিল ও অনধিগম্য স্থানেই বড়কর্তার শ্যেন-দৃষ্টি ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের কাছে ধরা পড়বেই সেটা তিনি বুঝতেই পারবেন না। আমি আরও বুঝতে পেরেছিলাম, যে ভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তিনি একটা অতি-সরল পথেই হাঁটবেন। কিন্তু আমাদের বড় কর্তাটির বুদ্ধির ছুরিটা অপেক্ষাকৃত মোটা ও ভোঁতা; তাই এমন একটা সম্ভাবনার কথা তার মাথায়ই আসে নি যে মন্ত্রীমশায় আলোচ্য চিঠিটাকে সকলের একেবারে নাকের ডগায়ই রেখে দিতে পারেন। জিনিসটাকে বিশ্বজগতের সকল মানুষের দৃষ্টির আড়ালে রাখার সেটাই তো সব সেরা পথ।

"ডি—র সাহসিকতা, কর্ম-ক্ষমতা ও ক্ষুরধার বুদ্ধির কথা যত ভাবতে লাগলাম, যতই ভাবতে লাগলাম যে দলিলটাকে তিনি সব সময়ই হাতের কাছেই রাখবেন, যতই ভাবতে লাগলাম, বড়কর্তাটির আপ্রাণ চেষ্টাই প্রমাণ করেছে চিঠিটা তার তল্লাসীর আওতার মধ্যে কোথাও নেই—ততই আমার বিশ্বাস দৃঢ়তর হতে লাগল যে মন্ত্রীমশায় চিঠিটাকে কোনরকম লুকিয়ে রাখার চেষ্টামাত্রও করেন নি।

“এই সব ভাবনা-চিন্তা মাথায় নিয়ে, একজোড়া সবুজ চশমা চোখে এঁটে, একদা সকলে হঠাৎই গিয়ে হাজির হলাম মন্ত্রীমশায়ের হোটেলে। ডি—কে ঘরেই পেলাম; যথারীতি হাই তুলছেন, হাত-পা ছড়াচ্ছেন, আর এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন ক্লান্তিতে শরীরটা একেবারে ভেঙে পড়ছে। পৃথিবীর জীবিত মানুষদের মধ্যে তিনি হয় তো সব চাইতে কর্মক্ষম লোক—কিন্তু সেটা ঠিক ততক্ষণ যতক্ষণ তিনি সকলের দৃষ্টির আড়ালে থাকেন।

“আমিই বা কম যাই কিসে! তাই খারাপ চোখের নালিশ জানিয়ে চশমা নেওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম; আর গৃহস্বামীর সঙ্গে কথাবার্তার ফাঁকে সতর্ক চোখে সমস্ত কামরাটাকে ভাল করে দেখতে লাগলাম।

“বিশেষ মনোযোগ দিলাম তার পার্শ্ববর্তী বড় লেখার টেবিলটার দিকে। তার উপরে ইতস্তত ছড়ানো ছিল কিছু চিঠি ও কাগজপত্র; দু'একটা বাদ্যযন্ত্র ও কয়েকটা বইও ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও সন্দেহজনক কিছু দেখতে পেলাম না।

“শেষ পর্যন্ত ঘরের চারদিকে তাকাতেই চোখ পড়ল পিচবোর্ডের উপর নকল বিদরির কাজ-করা একটা তাস-রাখার তাকের উপর। ম্যাণ্টেল-পিসের মাঝবরাবর একটা পিতলের ছোট নবের সঙ্গে নোংরা নীল ফিতে দিয়ে সেটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাকটার তিন-চারটে খোপের মধ্যে দেখতে পেলাম পাঁচ-ছটা ভিজিটিং-কার্ড আর একটি মাত্র চিঠি। চিঠিটা খুবই নোংরা ও দুমড়ানো অবস্থায় রয়েছে। সেটা প্রায় দু'টুকরো করে ছেঁড়া। দেখলেই মনে হয়, যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই প্রথমে চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেলে দেবার ইচ্ছাই ছিল, কিন্তু পরে মত বদলে বাকিটা আর ছেঁড়া হয় নি। চিঠির উপরে বড় কালো মোহরে ডি—অক্ষরটি বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ে, আর ছোট ছোট মেয়েলি হাতের অক্ষরে ঠিকানা লেখা ডি—র নামে, অর্থাৎ স্বয়ং মন্ত্রীর নামে। যেন ইচ্ছা করেই তুচ্ছ ভেবে চিঠিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে তাকের একেবারে উপরের খোপে।

চিঠিটা দেখামাত্রই বুঝতে পারলাম, এই রত্নের খোঁজেই তো এসেছি। একটা কথা কিন্তু নিশ্চিত—যে চিঠিটা বড়কর্তা আমাকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, এই চিঠিটা চেহারা-ছবিতে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে মোহরটা বড় ও কালো, তাতে ডি—অক্ষর আঁকা; সেখানে মোহরটা ছিল ছোট ও লাল, তাতে এস—পরিবারের হাত আঁকা। এখানে লেখা হয়েছে মন্ত্রীকে, ছোট ছোট মেয়েলি অক্ষরে; সেখানে লেখা হয়েছে কোন রাজ-পুরুষকে, স্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে। দুটো চিঠির মধ্যে একমাত্র মিল আকারে। কিন্তু অমিলগুলো এত বেশী প্রত্যক্ষ; চিঠিটার ময়লা, নোংরা, ছেঁড়া-খোঁড়া অবস্থানটা ডি—র গুছানো স্বভাবের এতই বিরোধী; আর চিঠিটা যে একেবারেই অকেজো সেটা দর্শককে বোঝাবার এই সযত্ন প্রয়াস—এসব তো আছেই, তার উপর চিঠিটাকে এমন খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে যে কেউ ঘরে ঢুকলেই তার চোখে পড়বেই যেটা আমার পূর্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে হুবহু মিলে গেছে।

সব কিছু মিলে গোড়ায় যে সন্দেহকে মনের মধ্যে নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম তাকে আরও ঘনীভূত করে তুলল।

“সেখানে যতটা পারি সময় কাটাতে লাগলাম, আর মন্ত্রীমশায়ের অতি প্রিয় একটি বিষয় নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে আমার একাগ্র দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখলাম চিঠির উপরে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা জিনিস নজরে পড়ল যার ফলে যে-টুকু সন্দেহ মনের মধ্যে ছিল তাও দূর হয়ে গেল। দেখলাম, চিঠির কোণগুলি বড় বেশী ঘস্টে গেছে; একটা শক্ত কাগজকে একবার ভাঁজ করে ভাল করে চেপে দিয়ে যদি আবার ঠিক করে চেপে দিয়ে যদি আবার ঠিক একইভাবে উল্টোদিকে ভাঁজ করা হয় তাহলে কোণগুলির যে ভাঙা-ভাঙা চেহারা হয়, এটাও অনেকটা সেই রকম দেখাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, চিঠিটাকে একেবারে উল্টে নিয়ে নতুন করে ঠিকানা লিখে মোহর করে দেওয়া হয়েছে। শুভদিন জানিয়ে তখনই মন্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে বিদায় নিলাম; অবশ্য সোনার নস্য-দানিটাকে টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে এলাম।

“নস্য-দানিটা আনতে পরদিন সকালে আবার গেলাম, এবং সাগ্রহে গত দিনের আলোচনাটা শুরু করে দিলাম। আলোচনা চলতে চলতেই হোটেলের জানালার ঠিক নীচ থেকে পিস্তলের শব্দের মত একটা জোরালো শব্দ আমাদের কানে এল, আর তারপরেই শুনতে পেলাম একটানা ভয়ার্ত চীৎকার আর আতংকিত জনতার চেঁচামেচি। ডি—ছুটে জানালার কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে নীচে তাকালেন। সেই ফাঁকে আমি তাসের তাকটার কাছে এগিয়ে গিয়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে অনুরূপ আর একটা চিঠি—ডি—অক্ষরটি নকল করে চিঠিটা আমি বাড়ি থেকেই লিখে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেখানে রেখে দিলাম।

“গাদা বন্দুকধারী একটা লোকের পাগলামির ফলেই রাজপথে গন্ডগোলটা দেখা দিয়েছিল। একদল নারী ও শিশুকে লক্ষ্য করে সে গুলি ছুঁড়েছিল। পরে দেখা গেল, বন্দুকে কোন গুলিই ছিল না; অতএব লোকটিকে পাগল বা মাতাল মনে করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। ডি—জানালা থেকে ফিরে এল। আমি তার আগেই নিজের জায়গায় বসে পড়েছি। কিছুক্ষণ পরেই তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। পাগলের ভান-করা লোকটিকে আমিই টাকা দিয়ে ঐ কাজে লাগিয়েছিলাম।”

আমি প্রশ্ন করলাম, “কিন্তু অনুরূপ আর একটা চিঠি সেখানে রেখে আসার কি দরকার ছিল? প্রথম দিকেই সকলের সামনে চিঠিটা তুলে নিয়ে এলেই কি যথেষ্ট হত না?”

দুপেঁ বলল, “ডি—খুব বেপরোয়া স্বভাবের মানুষ, আর তার গায়ে জোরও যথেষ্ট। তাছাড়া, হোটেলে তার অনুরাগীর সংখ্যাও অল্প ছিল না। তুমি যেরকম বলছ সেরকম একটা বেপরোয়া চেষ্টা করলে আমাকে আর মন্ত্রীর কাছ থেকে জীবন্ত ফিরে আসতে হত না। প্যারিসের মানুষরা হয় তো আর কোন দিন আমার নামটাও শুনতে পেত না। কিন্তু এ ছাড়া অন্য আর একটা উদ্দেশ্যও আমার ছিল। আমার

রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা তুমি জান। সেদিক থেকে আমি ঐ মহিলাটির দলের লোক। গত আঠারো মাস ধরে মন্ত্রীমশায় মহিলাটিকে কব্জা করে রেখেছিলেন। এবার মহিলাটিই তাকে কব্জা করেছেন—কারণ চিঠিটা যে তার হাতে নেই এ কথাটা না জানা থাকায় তিনি তো এমন চাল-চলনেই চলবেন যেন চিঠিটা তার হেফাজতেই আছে। আর এই ভাবে তিনি নিজেই নিজের রাজনৈতিক পতনকে ডেকে আনবেন। অবশ্য তার এই পতন যত না আকস্মিক হবে তার চাইতেও বেশী হবে বিসদৃশ। কাতালানি সঙ্গীত সম্পর্কে যা বলেছেন, যে কোন আরোহণের ব্যাপারেই সেটা সত্যি; কথাটা হল—উপরে ওঠা যত সহজ নামাটা তত সহজ নয়। অন্তত এ ক্ষেত্রে যিনি নামবেন তার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই, অন্তত করুণা তো নয়ই। লোকটি তো বিবেকবর্জিত এক প্রতিভা। আমি স্বীকার করছি, তাসের তাকের উপর যে চিঠিটা আমি তার জন্য রেখে এসেছি সেটা খুলে পড়ার পরে তার মুখের ভাবটা দেখতে আমার বড়ই ইচ্ছা করছে।"

"কেন? সে চিঠিতে তুমি এমন কি লিখেছ?"

"আরে—চিঠির ভিতরটা একেবারে ফাঁকা রাখাটা কি ভাল হত? সেটা যে অপমানের সামিল হত। একদা ভিয়েনাতে ডি—আমার একটা ক্ষতি করেছিলেন; তখনই আমি তাকে ঠাট্টার সুরে বলেছিলাম, এটা আমার মনে থাকবে। তাই যেহেতু আমি জানতাম কে তাকে বুদ্ধির খেলায় এ ভাবে হারিয়ে দিয়েছে সেটা জানবার কৌতূহল তার হবেই; তাই ভাবলাম, একটা সন্ধান-সূত্র (ক্লু) না দিলে সেটা বড়ই করুণ ব্যাপার হবে। আমার হাতের লেখা তিনি খুব ভালই চেনেন; অতএব চিঠির ভিতরকার ফাঁকা পাতায় এই কথাগুলি লিখে দিয়েছি—

"—**Uu dessein si friends be S'il n'est digue d' Atvee, est digue de Tlyeste,** কথাগুলি ক্রেবিলন-এর "আত্রি"-তে পাবে।"

লিজিয়া

Ligeia

সত্যি বলছি, কি ভাবে, কখন, বা ঠিক কোথায় লেডি লিজিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল তা আমি মনে করতে পারি না। তার পর অনেক বছর কেটে গেছে, অনেক দুঃখ-কষ্টে আমার স্মৃতিশক্তিও দুর্বল হয়েছে। অথবা হয় তো এসব কথা যে আমার মনে পড়ে না তার আসল কারণ আমার প্রিয়তমার চরিত্র, তার বিরল পাণ্ডিত্য, তার শান্ত, সুন্দর রূপ, আর তার নিম্ন, সুরেলা কন্ঠের ভাষার যাদু এত ধীর স্থির পদক্ষেপে আমার অন্তরে প্রবেশ করেছিল যে সে সব কিছুই অলক্ষিত ও

অজানাই থেকে গেছে। তথাপি আমার বিশ্বাস তার সঙ্গে আমার প্রথম এবং তার পর প্রায়ই দেখা হত রাইন নদীর কাছাকাছি একটা বড়, প্রাচীন ও ক্ষয়িষ্ণু শহরে। তার পরিবারের কথা কখনও তার মুখ থেকে শুনি নি। তবে পরিবারটি যে বহু প্রাচীন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লিজিয়া! লিজিয়া! পড়াশুনার মধ্যে ডুবে থাকার ফলে বাইরের জগৎটাকে প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। "লিজিয়া"—এই মধুর নামটির জনাই যে আজ আর এ জগতে নেই তারই ছবিটি কল্পনায় আমার চোখে ফুটিয়ে তুলি। আর আজ, তার কথা লিখতে বসে—একটি কথাই মনে পড়ছে, যে ছিল আমার বন্ধু ও বাগ্দত্তা, যে ছিল আমার নিত্যদিনের পাঠ-সঙ্গিনী, আর শেষ পর্যন্ত আমার অন্তরতমা পত্নী তার পৈত্রিক নামটাই আমি কোন দিন জানতে পারি নি। এটা কি আমার লিজিয়ার একটা খেয়ালমাত্র? অথবা এ বিষয়ে আমি তাকে কোন প্রশ্ন করি কি না, আমার ভালবাসার সেই পরীক্ষাটাই সে করতে চেয়েছিল? অথবা এটা আমারও একটা খেয়ালমাত্র—প্রেমের পূজা-বেদীতে আমার এক বেপরোয়া রোম্যান্টিক আত্মনিবেদন? কেবল ঘটনাটাই অস্পষ্টভাবে আমার মনে আছে—কখন, কি ভাবে তার প্রথম সূচনা হয়েছিল সেটা যে আমি সম্পূর্ণ ভুলে গেছি তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে?

অবশ্য একটি প্রিয় বিষয়ে আমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটে নি। সেটা লিজিয়ার চেহারা। সে ছিল দীর্ঘ, একহারা, এবং শেষের দিকে কিছুটা ক্ষীণকায়া। তার আচরণের মাহাত্ম ও শান্ত সরলতার, অথবা তার লঘু ও নমনীয় পদসঞ্চারের ছবি আঁকার ব্যর্থ চেষ্টা আমি করব না। তার আসা ও যাওয়া যেন একটা ছায়ামাত্র। যতক্ষণ সে শ্বেতমর্মরোপম হাতখানি আমার কাঁধে রেখে মধুর সুরে আমার নাম ধরে না ডাকত ততক্ষণ পর্যন্ত সে যে আমার ঘরে ঢুকেছে তা আমি বুঝতেই পারতাম না। তার মুখের রূপ-লাবণ্য অতুলনীয়। সে যেন আফিম ফুলের স্বপ্নে ভরা একটা উজ্জ্বলতা, এক বায়বীয় আত্মিক সৌন্দর্য যা দেবত্বের মহিমায় মহিমান্বিত। তার সমুন্নত ম্লান ললাটের দিকে তাকিয়ে মনে হত—একেবারে নিখুঁত—এমন দেবসুলভ মহত্বকে এই ভাষায়ও বুঝি যথাযথভাবে প্রকাশ করা যায় না! —তার ত্বকের সৌন্দর্য নিষ্কলুষ হস্তীদন্তের শুভ্রতাকেও হার মানায়; তারপর সেই স্বভাব-কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি—যাকে হোমারের ভাষায় বলা যায় "হায়াসিন্হসম!" তার সুডৌল নাসিকার দিকে তাকালে মনে হত একমাত্র হিব্রুদের পদক ছাড়া অন্য কোথাও বুঝি এমন পরিপূর্ণ সুন্দর নাক দেখি নি। তার মিষ্টি মুখখানির দিকে তাকালে মনে হত যা কিছু স্বর্গীয় সব যেন এখানে এসে মিলেছে—উপরের ঠোঁটের সেই অপরূপ বাঁকটি—নীচের ঠোঁটের সেই গভীর সুষুপ্তি—সেই তিলের লীলা আর বর্ণের ভাষা—পবিত্র উজ্জ্বলতা-মাখা দাঁতের পাটি, আর গম্ভীর, প্রশান্ত হাসি! আর তারপরেই চোখকে টানত লিজিয়ার দুটি আয়ত চক্ষু।

রূপের কথা রেখে এবার লিজিয়ার জ্ঞানের কথায় আসি। অগাধ পাণ্ডিত্য—কোন নারীর মধ্যে এমনটি আমি দেখি নি। প্রাচীন ভাষায় তার দক্ষতা সুগভীর।

আর ইওরোপের আধুনিক ভাষাসমূহ আমি যতদূর জানি তাতে কখনও কোথাও তাকে ভুল করতে দেখি নি। যত দিন কেটেছে, ততই স্ত্রীর বিদ্যা-বৈদগ্ধে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

হায়রে! কয়েক বছর পরেই যেদিন দেখলাম আমার সেই আশা-লতা পাখা মেলে উড়ে চলে গেল জীবনের ওপারে, তখন সে কী একবুক-ভাঙা তীব্র দুঃখ আমাকে জর্জরিত করে ফেলল! লিজিয়া বিহনে আমি হলাম যেন অন্ধকারে এক পথহারা শিশু। তার উপস্থিতি, তার কণ্ঠস্বর নতুন করে অনুভব করতে লাগলাম। পুঁথি পড়তে বসলে প্রতি ছত্রে ছত্রে তার মুখখানিই ভেসে ওঠে। লিজিয়া অসুখে পড়ল। চোখ দুটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বিবর্ণ আঙুলগুলিতে নেমে এল কবরের মোম-রং। উন্নত ললাটের নীল শিরাগুলি প্রতিটি আবেগের সঙ্গে অবিরাম ওঠে আর নামে। বুঝতে পারলাম, তার মৃত্যু আসন্ন। তার স্বভাবকে যতটুকু জেনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল মৃত্যুকে সে ভয় করে না। কিন্তু দেখলাম, তা নয়। মৃত্যুর ছায়ার সঙ্গে যে সুতীব্র সংগ্রামে সে লিপ্ত হল ভাষায় তাকে বর্ণনা করা যায় না। সে করুণ দৃশ্য দেখে যন্ত্রণায় আমি আর্তনাদ করে উঠতাম। হয়তো তাকে সান্ত্বনা দিতাম—বোঝাতে চেষ্টা করতাম; কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য—জীবনের জন্য তার সেই তীব্র বাসনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সান্ত্বনা ও যুক্তির বাণী দুইই সমান মূর্খতা বলে মনে হত। তথাপি এত বেদনা—এত যন্ত্রণার মধ্যেও একেবারে অন্তিম মুহূর্তটির আগে পর্যন্ত তার মনের শক্তি একেবারে ভেঙে পড়ে নি। তার কন্ঠস্বর আরও শান্ত হয়ে উঠল—আরও খাদে নামল—তবু তার মুখে উচ্চারিত শব্দগুলির কথা আমি কিছুতেই বলতে পারব না। মরণাতীত সেই সুরেলা কণ্ঠস্বর যত শুনেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি।

সে যে আমাকে ভালবাসত সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়; খুব সহজেই আমি বুঝতে পারতাম তার মত মানুষের বুকে যে ভালবাসা জন্মে তা কখনও একটা সাধারণ অনুভূতিমাত্র হতে পারে না। তবু তার ভালবাসা যে কত শক্তি ধরে সেটা আমি পুরোপুরি বুঝলাম একমাত্র তার মৃত্যুর পরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার হাতটি ধরে অনর্গল ভাষায় যে ভাবে সে তার মনের কথাগুলি বলে যেত তা যে কোন পৌত্তলিকের দেবানুরাগকেও হার মানায়। এত সুখও কি আমার কপালে ছিল? আবার সেই পরম সুখের মুহূর্তেই কেন আমার প্রিয়তমাকে হারাবার অভিশাপ নামল আমার মাথায়? কিন্তু এ আলোচনা আমি সইতে পারি না। শুধু এইটুকু বলতে পারি, প্রেমের বেদীতে লিজিয়ার এই আত্মনিবেদন, হায়! সবই তো সে অপাত্রে দান করে গেছে! আমার চোখে সে ধরা দিল এক উগ্র জীবন-তৃষ্ণার রূপে—যে জীবন দ্রুত পক্ষসঞ্চালনে উড়ে চলে যাচ্ছে তার কাছ থেকে তাকেই ধরে রাখার এক পরম আকুতি, এক মহাতৃষ্ণা জন্ম নিয়েছে তার বুকে। তার সে অনুভূতিকে আঁকার ক্ষমতা আমার নেই—বুঝিয়ে বলার ভাষা আমার জানা নেই।

যে রাতে সে চলে গেল সেদিন হঠাৎই সে আমাকে ডাকল তার পাশে; অনুরোধ

জানাল তারই সম্প্রতি রচিত কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে। তার অনুরোধ আমি মাথা পেতে নিলাম। কবিতার পংক্তিগুলি এই রকম ঃ

দেখ! কী সুন্দর রাত
নেমে এসেছে জীবনের শেষ-লগ্নে!
অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে পাখা মেলে
নেমে এসেছে দেবদূত;
তার দুই চোখে অশ্রুর ধারা।
রঙ্গমঞ্চে সে বসেছে
আশা-নিরাশার এক নাটক দেখতে,
অর্কেস্ট্রায় বাজছে মহাশূন্যের সুর।
নির্বাক অভিনেতারা স্বর্গের দেবতার রূপ ধরে
নিম্নস্বরে সংলাপ বলছে,
আর ইতস্তত উড়ে বেড়াচ্ছে;
তারা যেন পুতুল—কেবলই পুতুল,
আসে আর যায় এক বিদেহী
মঞ্চ-অধিকর্তার নির্দেশে;
তাদের শকুন-পাখার আন্দোলনে
ধ্বনিত হচ্ছে এক অদৃশ্য বিষাদ!
কী এক বিচিত্র নাটক! —স্থির জেনো,
তাকে আমি কোন দিন ভুলব না!
জনতা তাড়া করছে এক ছায়ামূর্তিকে,
কিন্তু তাকে ধরতে পারছে না;
ঘুরে ঘুরে সে ফিরে আসছে
সেই একই জায়গায়;
আর কত উন্মত্ততা, কত পাপ,
আর আতংক; কী কাহিনী!
কিন্তু দেখ, সেই ছায়ামূর্তির ভিড়ে
কে যেন ঢুকল হামাগুড়ি দিয়ে!
স্তব্ধতার ভিতর থেকে এঁকে বেঁকে বেরিয়ে এল
এক রক্ত-লাল প্রাণী!
যন্ত্রণায় সে কুঁকড়ে যাচ্ছে! কুঁকড়ে যাচ্ছে!
মৃত্যু-যন্ত্রণায় পুতুলগুলি হল তার শিকার।
মানুষের রক্তে ভেজা তার লাল ফণা দেখে
দেবদূতরাও কেঁদে উঠল

নিভে গেল—নিভে গেল বাতি—সব নিভে গেল !
আর প্রতিটি কল্পিত মূর্তির উপর
নেমে এল যবনিকা, মৃত্যুর আবরণ
নেমে এল ঝড়ের গতিতে—
আর বিবর্ণ, বিমর্ষ যত দেবদূত
উঠে দাঁড়াল ; অবগুণ্ঠন খুলে বলে উঠল,
অভিনীত হল বিয়োগান্ত নাটক—"মানুষ,"
আর তার নায়ক এক বিজয়ী কীট।

লিজিয়া উঠে দাঁড়াল ; স্বতস্ফূর্তভাবে দুই বাহু উর্ধ্বে তুলে আর্তকণ্ঠে বলল, "হে ঈশ্বর !" আমার মুখে তখন উচ্চারিত হচ্ছে এই শেষ কথাগুলি—"হে ঈশ্বর ! হে পরম পিতা ! —এই একই দৃশ্যের পুনরাভিনয় কি চলতে থাকবে ? —এ বিজয়ীকে কি জয় করা হবে না ? আমরা কি তোমারই সন্তান নই ? —কে জানে মানুষের বাসনার রহস্য ? কে জানে তার কত তেজ ? মানুষ দেবদূতের কাছে পরাজয় মানে না—মৃত্যুর কাছেও না ; দুর্বল বাসনাই তার একমাত্র দুর্বলতা।"

আর তখনই—বুঝিবা গভীর আবেগের চাপে হৃতশক্তি হয়ে—সে অনেক কষ্টে তার ছাইয়ের মত সাদা হাত দুটি নামিয়ে নিল ; ধীরে ধীরে আশ্রয় নিল মৃত্যুশয্যায়। শেষ দীর্ঘশ্বাস পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট থেকে বেরিয়ে এল একটি অস্পষ্ট গুঞ্জন। আমি নীচু হয়ে কান পাতলাম ; শুনতে পেলাম "গ্ল্যানভিল"-এর শেষের কথাগুলি :— "মানুষ দেবদূতের কাছে পরাজয় মানে না—মৃত্যুর কাছেও না ; দুর্বল বাসনাই তার একমাত্র দুর্বলতা।"

সে মারা গেল : দুঃখে আমি একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেলাম। রাইন নদীর তীরবর্তী সেই ক্ষয়িষ্ণু শহরের নির্জন বাড়িটাকে বেশী দিন সহ্য করতে পারলাম না। যাকে ধন-সম্পত্তি বলে তার অভাব আমার ছিল না। সাধারণ মানুষের ভাগ্যে যা জোটে তার চাইতে অনেক—অনেক বেশী আমাকে দিয়েছিল লিজিয়া। সুতরাং কয়েক মাস উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে একদা ইংলণ্ডের এক জনহীন বনাঞ্চলের একটি মঠকে কিনে তার কিছু কিছু সংস্কার করে নিলাম। বাড়িটার বিষণ্ণ ও ভয়াবহ গাম্ভীর্য, তার বন্য পরিবেশ, তাদের সঙ্গে জড়িত অনেক দুঃখময় প্রাচীন স্মৃতি যেন আমার মনের পূর্ণ সন্ন্যাসীসুলভ ভাবের সঙ্গে পুরোপুরি মিলে গেল। একটা শিশুসুলভ উন্মাদনায় মঠটাকে আমি নানা বিচিত্র সম্ভারে সাজিয়ে তুললাম। কী এক পাগলামি যেন আমাকে পেয়ে বসল। আশ্চর্য রকমের জমকালো সব পর্দা, মিশরের ক্ষোদাই-করা মূর্তি, উদ্ভট কার্নিস আর আসবাব, জরির কাজ-করা গালিচা। কিন্তু সে সব বিবরণ আপাতত তোলা থাক। আমি শুধু একটি অভিশপ্ত কক্ষের কথাই বলব। এক সাময়িক উন্মাদনার মুহূর্তে ত্রেসাঁ-র সুকুন্তলা ও নীলনয়না লেডি রোয়েনা ত্রিভোনিয়নকে বিয়ে করে চিরস্মরণীয়া লিজিয়ার উত্তরাধিকারিণীরূপে গির্জা থেকে সরাসরি এনে তুলেছিলাম সেই কক্ষে।

নবদম্পতির সেই বিলাস-কক্ষটি আজও আমার স্মৃতিতে পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় বিরাজ করছে। দুর্গতুল্য সেই মঠের একটা উঁচু গম্বুজের মধ্যে অবস্থিত কক্ষটি ছিল পঞ্চভুজাকৃতি ; তার আয়তনও ছিল বিশাল। পঞ্চভুজের দক্ষিণ ভূজ জুড়ে ছিল ঘরের একটিমাত্র জানালা ; তাতে ভেনিস থেকে আনা একখানিমাত্র অখণ্ড কাঁচ বসানো ; কাঁচের রং সীসের মত হওয়ায় সূর্য বা চাঁদের আলো তার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের সব কিছুর উপর ছড়িয়ে পড়ত এক ভৌতিক দ্যুতিতে। প্রকাণ্ড জানালার উপরের অংশটা গম্বুজের শ্যাওলা-ধরা দেওয়াল বেয়ে ওঠা একটা প্রাচীন দ্রাক্ষালতার আলপনায় ঢাকা ! বিষণ্ণদর্শন ওক কাঠের সিলিংটা অত্যন্ত উঁচু, গোলাকার, এবং আধা-গথিক ও আধা-ড্রুইডীয় অদ্ভুত সব কারুকর্মে ভরা। সেই গোলাকৃতি সিলিং-এর ঠিক মাঝখান থেকে নেমে-আসা একটি সোনার শিকলের সঙ্গে ঝুলছে একটি সোনার ধূপদানি ; সারাসেনিক শিল্পকর্মের আদলে তাতে এত বেশী ছিদ্রের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে যে তার ভিতর দিয়ে সর্পিল গতিতে অবিরাম বিচ্ছুরিত হচ্ছে নানা বর্ণের অগ্নিশিখা।

প্রাচ্য শিল্প-শৈলীর কয়েকটি পালংক ও সোনার শামাদান এখানে-ওখানে ছড়ানো ; ভারতীয় শিল্পরীতির একটি কেদারা—বিয়ের কেদারাও সেখানে ছিল ; নিরেট আবলুস কাঠের তৈরী, মাথার উপরে শবাচ্ছাদনের মত চন্দ্রাতপ। কিন্তু—হায় রে ! —ঘরের পর্দাগুলিই তো ছিল বেহিসেবী কল্পনার চরম নিদর্শন। ঘরের উঁচু দেওয়াল, বিশাল উচ্চতা—এমন কি বেমানানও—পা থেকে মাথা পর্যন্ত অত্যন্ত ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকা ; যে মাল-মশলা দিয়ে সে পর্দা তৈরী ঠিক তাই দিয়ে বসানো হয়েছে মেঝের গালিচা, অটোমান ও আবলুস কাঠের পালংকের আচ্ছাদন, বিছানার চন্দ্রাতপ এবং জানালার পর্দার কুঁচি। আর সে মাল-মশলা অত্যন্ত দামী জরির কাপড়। তার উপর মাঝে মাঝেই ঘন কালো রং দিয়ে আঁকা হয়েছে আরবি ঢঙের নানা ফুল-পাতার নকসা। নকসাগুলি আবার কিছুটা অদ্ভুত ধরনের—নানাদিক থেকে দেখলে নানারকম দেখায়। ঘরে ঢুকলেই সেগুলি অদ্ভুত সব জীবজন্তুর রূপ নেয় ; কিন্তু যতই এগিয়ে যাবে ততই তাদের রূপও পাল্টে যাবে ; পায়ে পায়ে এগিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়ালে দেখা যাবে নানারকম ভৌতিক মূর্তি চারদিক থেকে তোমাকে ঘিরে ধরেছে। এই ভৌতিক আবহাওয়াটা আরও বাড়ানো হয়েছে কৃত্রিম উপায়ে ঘরের মধ্যে একটা ঝড়ো হাওয়া বইয়ে দেবার ব্যবস্থা করে ; পর্দার পিছন থেকে সেই হাওয়া পর্দাগুলিকে অনবরত দোলাতে থাকে, আর পর্দার উপরে আঁকা সব কিছু যেন বীভৎস ও অস্বস্তিকর এক জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

এই রকম হলে—এই রকম এক বাসর ঘরে ত্রেসাঁ-র লেডিকে নিয়ে কাটল আমাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম ম্যাসের অপবিত্র ঘণ্টাগুলি—কিছুটা অস্বস্তিতেই কাটল। স্ত্রী যে আমার মেজাজের হিংস্রতাকে ভয় করে—আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আমাকে মোটেই ভালবাসে না—ক্রমেই সেটা বুঝতে পারলাম ; কিন্তু তাতে আমি দুঃখের বদলে সুখই অনুভব করলাম। তার প্রতি আমার মনে যে ঘৃণা জাগল তা মানবসুলভ নয়, অসুরসুলভ। আমার স্মৃতি পাখা মেলে উড়ে গেল লিজিয়ার কাছে

(আহা, কী তীব্র সে অনুশোচনা !) —সেই লিজিয়া যে আমার প্রিয়তমা, আদরণীয়া, সুন্দরী, কবরে শায়িতা। তার পবিত্রতা, তার জ্ঞান, তার মহৎ স্বর্গীয় প্রকৃতি, তার একান্ত গভীর ভালবাসা—সব কিছু আমাকে নতুন করে মাতিয়ে তুলল। আফিমের ঘোরে তাকেই স্বপ্ন দেখতাম (ওই নেশাটির শিকলে আমি তখন একেবারেই বাঁধা পড়ে গেছি), উচ্চৈঃস্বরে তার নাম ধরে ডাকতাম—কখনও রাত্রির নিস্তব্ধতায়, কখনওবা দিনের আলোয় কোন সংকীর্ণ উপত্যকার ছায়ায়; মনে হত, পরলোকগতার প্রতি এই তীব্র অনুরাগ, এই একাগ্র বাসনার টানেই তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারব সেই পৃথিবীর পথে—হায়, তা কি কোন দিন ঘটবে ? যেখান থেকে সে চিরদিনের মত চলে গেছে।

বিয়ের দ্বিতীয় মাসের শুরুতেই লেডি রোয়েনা হঠাৎ অসুখে পড়ল। জ্বরের ঘোরে তার রাতগুলি ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠল; আধো ঘুমন্ত অবস্থায় সে এমন সব শব্দ আর লোকজনের আসাযাওয়ার কথা বলত যার অস্তিত্ব একমাত্র তার বিকৃত কল্পনা অথবা কক্ষটির ভৌতিক পরিবেশ ভিন্ন অন্য কোথাও থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে সে ভাল হতে লাগল; শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই দ্বিতীয়বার সে কঠিনতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হল। তীব্র যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সে বিছানা নিল। তার শরীর আগাগোড়াই দুর্বল ছিল; এবারের রোগের আক্রমণে তা একেবারেই ভেঙে পড়ল। চিকিৎসকরাও ভয় পেলেন; তারাও রোগের স্বরূপ ধরতে পারলেন না। রোগ বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে বাড়তে লাগল তার মেজাজের স্নায়বিক বিকার; অতি তুচ্ছ ভয়ের কারণ ঘটলেই সে অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ত। বার বার সেই একই কথা বলতে শুরু করল—একটা চাপা শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে; পর্দার ভিতর থেকে তার কানে আসছে মানুষের চলাফেরার আওয়াজ।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে একদিন রাতে সে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে এই অস্বস্তিকর বিষয়টি আমার কাছে তুলল। একটা অস্বস্তিকর তন্দ্রা ভেঙে সবে সে জেগে উঠেছে; কিছুটা উৎকন্ঠা, কিছুটা ভয় মনের মধ্যে নিয়ে আমি তার শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তার আবলুস কাঠের পালংকের পাশে একটা ভারতীয় অটোম্যানের উপর আমি বসেছিলাম। কিছুটা উঠে বসে সে ফিস্‌ ফিস্‌ করে জানাল, এইমাত্র সে শব্দটা শুনেছে, অথচ আমি কিছুই শুনতে পাই নি; এইমাত্র সে কাউকে চলাফেরা করতে দেখেছে, অথচ আমি কিছুই দেখতে পাই নি। ঝড়ো হাওয়া পিছন থেকে এসে পর্দার উপর আছড়ে পড়ছিল; একবার ভাবলাম, তাকে দেখাই যে সেই সব প্রায় অস্ফুট নিঃশ্বাসের শব্দ, এবং দেওয়ালের গায়ে মূর্তিগুলোর দোল খাওয়া ঝড়ো হাওয়ার স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তার সারা মুখে তখন নেমে এসেছে এক মারাত্মক পান্ডুরতা; তা দেখেই বুঝলাম তাকে এ-সব কথা বোঝাবার চেষ্টা একেবারেই পন্ডশ্রম হবে। মনে হল, সে তখনই মূর্ছা যাবে। ডাকলেও কারও সাড়া মিলবে না। তখনই মনে পড়ল, চিকিৎসকের পরামর্শে তার জন্য এক পাত্র হাল্কা মদ আনা হয়েছিল। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে আমি সেটা আনতে গেলাম। কিন্তু সেই জ্বলন্ত শামাদানের নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই দুটি বিস্ময়কর ঘটনা আমার মনোযোগ

আকর্ষণ করল। আমার মনে হল, অদৃশ্য হলেও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেউ যেন হালকা পায়ে আমার পাশ দিয়েই চলে গেল ; আরও দেখলাম, শামাদান থেকে বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল আলোর ঠিক মাঝখানে সোনালী গালিচার উপর একটি ছায়া পড়েছে—দেবদূতের আকৃতির অনুরূপ একটা আবছা, অনির্দিষ্ট ছায়া—যাকে একটা আলো-ছায়ার ছায়া বলে কল্পনা করা যেতে পারে। কিন্তু আফিমের মাত্রাটা একটু বেশী হওয়ায় আমি তখন নেশায় বুঁদ হয়েছিলাম ; তাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামালাম না, আর রোয়েনাকেও কিছু বললাম না। মদটা নিয়ে এসে একটা পাত্র পূর্ণ করে মূর্ছিতা মহিলার ঠোঁটের কাছে ধরলাম। সে তখন অনেকটা সামলে উঠেছে ; নিজেই হাত বাড়িয়ে পাত্রটা নিল, আর আমিও একটা অটোমানে বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর তখনই আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম গালিচার উপর একটা মৃদু পায়ের শব্দ। এক সেকেন্ড পরেই রোয়েনা সবে মদের পাত্রটা ঠোঁটের কাছে তুলেছে তখনই আমি দেখলাম, অথবা হয় তো স্বপ্ন দেখলাম, যেন ঘরের বাতাসের ভিতরকার কোন অদৃশ্য ঝর্ণা থেকে চুণি-রংয়ের তিন-চারটি বড় বড় তরল পদার্থের ফোঁটা সেই পাত্রের মধ্যে পড়ল। দৃশ্যটা আমি দেখলাম, কিন্তু রোয়েনা দেখতে পেল না। সে অসংকোচে মদটা খেল ; আমি কিন্তু কোন কথাই তাকে বললাম না।

তথাপি নিজের কাছ থেকে আমি তো এই সত্যটাকে গোপন রাখতে পারি না যে ঐ চুণি-রং ফোটাগুলি পড়বার পর মুহূর্ত থেকেই আমার স্ত্রীর অবস্থা অতি দ্রুত খারাপের দিকে মোড় নিল। ফলে পরবর্তী তৃতীয় রাতেই পরিচারিকারা নিজেদের হাতেই তার কবর তৈরী করে দিল, এবং চতুর্থ রাতে তার আচ্ছাদিত মৃতদেহ নিয়ে আমি একাকি বসেছিলাম সেই ভৌতিক কক্ষে যেখানে সে একদিন প্রবেশ করেছিল বধূরূপে। আফিমের নেশার ঘোরে দেখলাম, অকল্পিত সব দৃশ্য ছায়ার মত আমার চোখের সম্মুখ দিয়ে দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলেছে। তখনই মনে পড়ে গেল আর একটি রাতের ঘটনা ; সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ পড়ল শামাদানের নীচেকার সেই আলোর বৃত্তের উপর যেখানে আমি সেদিন দেখেছিলাম একটি আবছা ছায়ামূর্তি ঃ অবশ্য তখন সে মূর্তি সেখানে ছিল না ; তাই স্বচ্ছন্দে শ্বাস টেনে আমি দৃষ্টি ফেরালাম শয্যায় শায়িত বিবর্ণ কঠিন দেহটির দিকে। তখনই লিজিয়ার হাজার স্মৃতি এসে ভিড় করে দাঁড়াল—প্রবল বন্যাস্রোতের মত আমার অন্তরকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই অবর্ণনীয় দুঃখ যা আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম তার আচ্ছাদিত শবদেহের পাশে বসে থেকে। রাত শেষ হয়ে এল ; তখনও আমার সেই একমাত্র প্রিয়তমার তিক্ত চিন্তাকে বুকের মধ্যে ভরে নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম রোয়েনার মৃতদেহের দিকে।

হয়তো তখন মধ্যরাত, হয়তো তার আগে অথবা পরে ; সময়ের খেয়াল আমার ছিল না ; একটি অনুচ্চ, শান্ত, অথচ অতিশয় স্পষ্ট চাপা কান্না শুনে আমার স্বপ্ন ভেঙে গেল। মনে হল, সে কান্না আসছে আবলুস কাঠের পালংক থেকে—মৃত্যুর শয্যা থেকে। সভয়ে আবার কান পাতলাম—কিন্তু সে শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটল না। সতর্ক দৃষ্টিতে দেখতে চেষ্টা করলাম মৃতদেহে কোন গতির সঞ্চার হয়েছে কি না—

কিন্তু সেরকম কিছুই চোখে পড়ল না। অথচ আমি তো ভুল শুনি নি। যত অস্পষ্টই হোক সে শব্দ তো আমি শুনেছি—তা শুনে আমার মধ্যে জেগে উঠেছিল আমার অন্তরাত্মা। একান্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে আমার মনোযোগকে নিবিষ্ট করে রাখলাম শবদেহের উপর। অনেক সময় পার হয়ে গেল, তবু এই রহস্যের উপর কোনরকম আলোকপাত হল না। শেষ পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পেলাম, একটি ক্ষীণ, অত্যন্ত নরম, প্রায় অলক্ষণীয় রংয়ের ছোপ যেন লেগেছে তার গালে, আর চোখের পাতার ছোট শিরাগুলিতে। এক ধরনের অনুচ্চারিত আতংকে ও ভয়ে—মানুষের কোন ভাষায় তাকে প্রকাশ করা যায় না—আমার বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেল, নিশ্চল স্থানুর মত যেখানে ছিলাম সেখানেই আমি বসে রইলাম। তথাপি কর্তব্যবোধই শেষ পর্যন্ত আমাকে ফিরিয়ে দিল নিজেকে সংযত রাখার ক্ষমতা। আর কোনরকম সন্দেহই রইল না যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনটা আমরা একটু আগেই করে ফেলেছি—রোয়েনা তখনও জীবিতই আছে। অবিলম্বে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু গম্বুজটা চাকরদের বাসস্থান থেকে বেশ কিছুটা দূরে—ডাকলেও কারও সাড়া পাওয়া যাবে না—বেশ কয়েক মিনিটের জন্য ঘর ছেড়ে যেতে না পারলে সাহায্যের জন্য কাউকে ডেকে আনারও কোন উপায় নেই; কিন্তু সেই কাজটা করার সাহস আমার হল না। অতএব যে আত্মাটি এখনও এখানেই ঘুরছে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমি একাই করতে লাগলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য বুঝতে পারলাম, রোগ আবার খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে; চোখের পাতা ও গাল থেকে রংয়ের আভা মিলিয়ে গেছে; তার বদলে সেখানে নেমে এসেছে শ্বেত মর্মরেরও অধিক শুভ্রতা; চেপে-ধরা দ্বিগুণ কুঞ্চিত ওষ্ঠে দেখা দিয়েছে মৃত্যুর বীভৎস প্রকাশ; সারা দেহ হিমশীতল হয়ে যাচ্ছে; ঋজু কাঠিন্য ছড়িয়ে পড়ছে অতি দ্রুত। সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার আমি আসনেই বসে পড়লাম। পুনরায় চোখের সামনে ভেসে উঠল লিজিয়ার জাগ্রত ছবির মিছিল।

এক ঘন্টা কেটে গেল। তখনই দ্বিতীয় রায় শুনতে পেলাম (এও কি সম্ভব?) শয্যার দিক থেকে ভেসে-আসা সেই একই অস্পষ্ট শব্দ। কান পেতে শুনতে শুনতে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। আবার সেই শব্দ—এবার একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস। মৃতদেহের পাশে ছুটে গিয়ে দেখলাম—স্পষ্ট দেখলাম—ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে। এক মিনিট পরেই ঠোঁট দুটি ঈষৎ ফাঁক হতেই মুক্তোর মত দাঁতের পাটি ঝকঝক করে উঠল। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা উথাল-পাতাল হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম, আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, যুক্তি-বুদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে; শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টায় কর্তব্য-কর্মে আত্মনিয়োগ করতে সমর্থ হলাম। কপালে, গালে ও গলায় আবার কিছুটা আলোর আভা ফিরে এসেছে; সারা দেহ ঈষদুষ্ণ; বুকটাও সামান্য ধুক-ধুক করছে। মহিলা বেঁচে উঠেছে; দ্বিগুণ উৎসাহে তাকে বাঁচিয়ে তোলার কাজে হাত লাগালাম। কপাল ও হাত দুটি ভাল করে জল দিয়ে মুছিয়ে দিলাম; অভিজ্ঞতালব্ধ এমন সব রকম প্রক্রিয়া চালাতে লাগলাম যা কোন ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে না। কিন্তু সব বৃথা

হঠাৎই আবার রং মুছে গেল, নাড়ি থেমে গেল, ঠোঁটে নামল মৃত্যুর আভাষ, আর মুহূর্তকাল পরে সারা দেহে নেমে এল সেই হিম-শীতলতা, পাণ্ডুর ছায়া, তীব্র কাঠিন্য, বিধ্বস্ত দেহ-রেখা, আর সেই সব ঘৃণার বৈশিষ্ট্য যা সাধারণত দেখা যায় একজন দীর্ঘ দিনের কবরবাসীর দেহে।

আবার আমি ডুবে গেলাম লিজিয়ার স্বপ্ন-দৃশ্যের মধ্যে—আবারও (কী আশ্চর্য লিখতে গিয়ে আমি কেঁপে উঠছি কেন ?) শুনতে পেলাম আবলুস কাঠের পালংক থেকে ভেসে-আসা চাপা কান্নার আওয়াজ। কিন্তু সে রাতের আতংকের বিস্তারিত বিবরণ দেবার কি কোন দরকার আছে ? আর কেনই বা আমি বলব কেমন করে ভোর হবার আগে পর্যন্ত বার বার এই একই জীবন-মৃত্যুর বীভৎস নাটকের অভিনয় চলেছিল ; কেমন করে প্রতিবারেই মৃত্যু ফিরে এসেছিল এক কঠিনতর অনিবার্য রূপ ধরে ; কেমন করে প্রতিবারেই আমাকে যন্ত্রণাদীর্ণ সংগ্রাম করতে হয়েছিল এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে ; আর আমি নিজেও জানি না কেমন করে প্রতিটি সংগ্রামের পরিণতিতে শবের চেহারায় ঘটেছিল এক আশ্চর্য পরিবর্তন ? এবার দ্রুত উপসংহারে যাওয়া যাক।

ভয়ংকর রাতটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে ; যে মহিলাটি মারা গিয়েছিল সে আবার নড়েচড়ে উঠল—যদিও সেবারকার মৃত্যু ছিল পূর্বেকার সব মৃত্যু অপেক্ষা তীব্র নৈরাশ্যে ভয়ংকরতর, তথাপি এবার সে নড়ে উঠল অধিকতর তেজে। ভয়ে একেবারে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি হাত-পা ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ সেই অটোমানে বসে রইলাম উপর্যুপরি নানা ভয়ংকর অনুভূতির শিকার হয়ে। অপ্রত্যাশিত তেজে তার সারা মুখে ঝিলিক দিয়ে উঠল জীবনের রং—হাত-পা শিথিল হয়ে এল, আর আমি হয় তো স্বপ্ন দেখেছিলাম—শেষপর্যন্ত রোয়েনা বুঝি ভেঙে ফেলেছে মৃত্যুর শৃংখল। সেটা সত্যি স্বপ্নই দেখেছিলাম কি না বলতে পারব না, তবে সেবিষয়ে আমার মনে আর কোন সন্দেহই রইল না যখন বিছানা থেকে উঠে দুর্বল কম্পিত পা ফেলে, দুই চোখ বন্ধ রেখে, স্বপ্নগ্রস্ত মানুষের মতই সেই আচ্ছাদিত মৃতদেহটি সাহসে ভর করে ঘরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

আমি কাঁপলাম না—নড়লাম না—কারণ সেই মূর্তিটির আচার-আচরণ দেখে বর্ণনাতীত হাজার কল্পনা এসে ভিড় করল আমার মাথার মধ্যে—আমার সব ইন্দ্রিয়কে পঙ্গু করে দিয়ে আমাকে পাথরে পরিণত করে দিল। চুপচাপ বসে আমি সেই ছায়ামূর্তির দিকেই তাকিয়ে রইলাম। মাথার ভিতরে সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল—শুরু হল একটা অশান্ত কোলাহল। আমার সমুখে কি দাঁড়িয়ে আছে জীবিত রোয়েনা ? আসলে সে রোয়েনাই তো—ত্রেমাঁ-র সেই সুকুন্তলা, নীলনয়না লেডি রোয়েনা ত্রিভানিয়ন ? কেন—কেন এই সন্দেহ ? তার জীবনমধ্যাহ্নের সেই দুটি গোলাপি কপোলই তো দেখছি—হ্যাঁ, ঠিক জীবিত লেডি রোয়েনার কপোল দুটি। সেই চিবুক, সেই তিল—এ কি তারই নয় ? কিন্তু অসুখের পর থেকে সে কি আরও একটু লম্বা হয়েছে ? এই চিন্তাই আমাকে পাগল করে তুলল। এক লাফে তার

একেবারে পায়ের কাছে পৌঁছে গেলাম। আমার স্পর্শেই সে কুঁকড়ে সরে গেল, মাথা থেকে খুলে ফেলল শবাচ্ছাদন-বস্ত্রের বাঁধন, ঝড়ের হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল তার দীর্ঘ অবিন্যস্ত কেশরাশি ; মধ্যরাতের কালো ডানার চাইতেও ঘোর কালো সেই চুল! এবার আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান সেই মূর্তির চোখ দুটি ধীরে ধীরে খুলে গেল। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, "সেই তো—শেষ পর্যন্ত সেই তো তুমি এলে—না—আমার ভুল হতে পারে না—এই টানা-টানা, কালো-কালো দুটি উন্মনা চোখ তো আমার হারানো প্রিয়া—আমার লেডি লিজিয়ারই চোখ।"

আর্নহিমের স্বপ্ন-রাজ্য

(The Domain of Arnheim)

দোলনা থেকে কবরখানা—সারাটা পথ সমৃদ্ধির ঝড় যেন বয়ে নিয়ে এল আমার বন্ধু এলিসনকে। সমৃদ্ধি কথাটাকে আমি কেবলমাত্র জাগতিক অর্থেই ব্যবহার করছি না। সুখের সমার্থক শব্দ হিসাবেই ব্যবহার করছি। যার কথা আমি বলছি তার জন্মটাই যেন তুর্গো, প্রাইস, প্রিস্টলি, এবং কন্ডর্সেট-এর প্রচারিত মতবাদের পূর্বাভাষ—পূর্ণতাবাদীদের অলীক কল্পনার একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তস্বরূপ। কিন্তু সুখের উপর একটি প্রবন্ধ লিখতে আমি বসি নি। অল্পকথায় বন্ধুর একটি ধারণা দেওয়া যেতে পারে। সুখের চারটি মৌলিক নীতি, অথবা, সঠিকভাবে বললে, শর্তকে সে মানত। তার মধ্যে আবার সেরা শর্তটি হল (শুনতে আশ্চর্য লাগে!) একটি সরল দৈহিক কাজ—কোনরকম যন্ত্র ছাড়া খোলা বাতাসে কিছু ব্যায়ামের অনুশীলন। সে বলত, "অন্য কোন উপায়ে যে স্বাস্থ্য লাভ করা যায় তাকে স্বাস্থ্যই বলে না।" শ্রেণীগতভাবে যাদের অপরের তুলনায় অধিকতর সুখী বলা যায় তাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে সে শেয়াল-শিকারীদের উল্লাস আর যারা জমি চাষ করে তাদের কথাই বলত। দ্বিতীয় শর্ত হল, নারীর ভালবাসা। তৃতীয়—সেটা অর্জন করাই কঠিন—উচ্চাকাংখার প্রতি ঘৃণা। চতুর্থ শর্ত হল, অবিরাম অনুসরণযোগ্য কোন বিষয় ; সে বলত, অন্য সব কিছু সমতুল্য হলে লব্ধ সুখের পরিমাণ হবে বিষয়টির আধ্যাত্মিকতার সমানুপাতিক।

সৌভাগ্য যেন দুই হাত ভরে এলিসনের মাথায় ঢেলে দিয়েছিল তার উপহারের ডালি। দেহ-লাবণ্যে ও সৌন্দর্যে সে ছিল সব মানুষের সেরা। বুদ্ধির দিক থেকে সে ছিল সেই দলের মানুষদের একজন যাদের কাছে জ্ঞানার্জনটা পরিশ্রমসাপেক্ষ নয়, বোধির এক অনিবার্য রূপ। তাদের পরিবার ছিল সাম্রাজ্যের ভিতর সর্বাপেক্ষা

বিখ্যাত। তার বৌ ছিল পরম রমণীয়া এবং সদাবিশ্বস্ত। তার বিষয়-সম্পত্তি আগাগোড়াই ছিল প্রচুর; সাবালক হবার পরে সে জানতে পারল, নিয়তি আরও একবার তাকে নিয়ে এক অসাধারণ খেয়ালি খেলা খেলেছে। মিঃ এলিসনের সাবালক হবার প্রায় একশ' বছর আগে দেশের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিঃ সিব্রাইট এলিসন নামে এক ভদ্রলোক মারা যান। সেই ভদ্রলোক ছিলেন এক রাজার মত ঐশ্বর্যের মালিক, আর তার কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি এমন ব্যবস্থা করে মারা যান যাতে তার মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি একশ' বছর ধরে নানাবিধ লগ্নীর মারফৎ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং তার পরে সব কিছুর মালিকানা বর্তাবে রক্তের সম্পর্কে তার এমন এক আত্মীয়ের উপর যে একশ' বছর পরেও জীবিত থাকবে। তার ফলে যুবক এলিসন তার একুশতম জন্মদিনে সিব্রাইটের উত্তরাধিকারী হিসাবে পঁয়তাল্লিশ কোটি ডলার মূল্যের এক বিরাট সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল।

এ কথা জানাজানি হবার পরে সকলেই নানারকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল—হঠাৎ এত টাকা হাতে পেলে নতুন মালিক কি কি ভাবে তা খরচ করতে পারে তার হাজার একটা ফর্দ লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। এত বিপুল পরিমাণ ঐশ্বর্য যে কোন মানুষেরই মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। তার উপর হিসাব কষে দেখা গেল, শতকরা তিন ভাগ সুদেও প্রাপ্ত সম্পত্তির আয় দাঁড়াবে বার্ষিক এক কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ ডলার; তার অর্থ প্রতি মাসে এগারো লক্ষ পঁচিশ হাজার ডলার; অথবা প্রতিদিন ছত্রিশ হাজার ন'শ ছিয়াশি ডলার; অথবা প্রতি ঘণ্টায় এক হাজার পাঁচশ' একচল্লিশ ডলার; অথবা প্রতি মিনিটে ছ'শ' বিশ ডলার। অতএব মানুষের কল্পনার দৌড় হোঁচট খেতে খেতে মুখ থুবড়ে পড়ল। কেউ কেউ একথাও ভাবল যে, মিঃ এলিসন তার পুরো সম্পত্তির অন্তত অর্ধেকটা দূর ও নিকট সব আত্মীয়ের মধ্যে ভাগাভাগি করে বিলিয়ে দেবে, এবং বাকিটা রেখে দেবে নিজের ভোগ-বিলাসের জন্য। কিন্তু যখন জানতে পারলাম যে বন্ধুটি অনেক কাল আগেই এ বিষয়ে মনস্থির করেই রেখেছিল, তখন আমি খুব অবাক হই নি। আবার যে ভাবে সে টাকাটার ভাগ-বাঁটোয়ারা করল তাতেও আমি অবাক হই নি। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সুখেই হোক আর দুঃখেই হোক, সে অনেকাংশেই তার পূর্ব অবস্থাতেই ফিরে গেল।

আসলে সে ছিল একজন কবি মানুষ। কাব্যিক মনোভাবের আসল চরিত্র, তার উদার আদর্শ, ও মহান মর্যাদা বলতে কি বোঝায় তা সে জানত। সে বুঝত, এই মনোভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ একমাত্র নতুন নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই সম্ভব। ফলে বাস্তবে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াল যে সে সুরশিল্পী বা কবি কোনটাই হল না—অন্তত সাধারণ অর্থে তো নয়ই। অথবা এমনও হতে পারে যে এর কোনটা হবার ইচ্ছাই তার ছিল না। হয় তো সে ধরেই নিয়েছিল যে উচ্চাকাংখার প্রতি বিরাগই এ জগতে সুখী হবার একমাত্র পথ। এটা কি সত্যি সম্ভব নয় যে একজন উঁচুদরের প্রতিভাকে যদিও উচ্চাকাংখী হতেই হবে, একজন সর্বোচ্চ প্রতিভা উচ্চাকাংখার অতীত?

আর এ রকম কি হতে পারে না যে মিলটন অপেক্ষাও অনেক বড় কবি-প্রতিভা "মূক এবং অখ্যাতই" থেকে গেছে ?

এলিসন সুরশিল্পী হল না, কবিও হল না ; যদিও সঙ্গীত ও কবিতার এমন গভীর অনুরাগীও আগে কেউ কখনও দেখে নি। অন্যরকম পরিবেশে সে হয়তো একজন চিত্রকরই হত। কিন্তু এলিসন বলত, শিল্পকর্মের সব চাইতে মূল্যবান, সব চাইতে আসল, এবং সব চাইতে স্বাভাবিক বিভাগটিকেই অকারণে অবহেলা করা হয়েছে। একজন কবির সংজ্ঞা সকলেই জানে, কিন্তু একজন প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধ্যমে উদ্যান-রচয়িতাকে কি বলে ডাকা হবে তা কেউ জানে না। অথচ আমার বন্ধুটির মতে, প্রাকৃতিক দৃশ্য দিয়ে উদ্যান-রচনার মধ্যেই রয়েছে একজন শিল্পীর শিল্প-বিকাশের সত্যিকারের ক্ষেত্র। এখানেই রয়েছে নানা প্রাকৃতিক দৃশ্যকে কল্পনার সাহায্যে নানা বিচিত্র ভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে নতুন নতুন দৃশ্য-রচনার এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র। তাই প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাধ্যমে উদ্যান রচনার কাজেই সে আত্মনিয়োগ করল।

শিল্প-সৃষ্টির এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমার বন্ধুটি যে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করলেন তার একটা পরিষ্কার ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরা আমার সাধ্যাতীত। তার বর্ণনা করতে বসলেই আমার অক্ষমতা আমাকে হতাশ করে। অতএব সে চেষ্টা না করে তার কাজের একটা নমুনা দিয়েই শুরু করা যাক।

এই কাজে মিঃ এলিসনের প্রথম পদক্ষেপই হল প্রস্তাবিত উদ্যানের জন্য স্থান নির্বাচন। আর তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু করতেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অবশ্য-প্রকৃতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। বস্তুত, সে অবিলম্বে দক্ষিণ সমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করবে বলে মনস্থির করে ফেলল ; আবার কি ভেবে রাতারাতি সে পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। বলল, "আমি যদি মানববিদ্বেষী হতাম. তাহলে সে স্থানটা আমার পক্ষে খুবই উপযোগী হত। সে জায়গাটার পরিপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও নির্জনতা, প্রবেশ ও নির্গমনের অসুবিধাই আমার মনকে সজোরে টানত। কিন্তু আমি তো "টাইমন" নই। আমি নির্জনতার শান্তিটুকু চাই, তার বিহ্বলতাকে চাই না। অতএব এমন একটি স্থান আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যেটা জনাকীর্ণ শহর থেকে খুব বেশী দূরে হবে না—যেখানে আমি নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতে পারব।"

তেমনি একটি উপযুক্ত স্থানের সন্ধানে এলিসন কয়েক বছর ধরে অনেক জায়গায় ঘুরল। আমাকে তার সঙ্গে নিল। হাজার হাজার জায়গা দেখে আমি মোহিত হলেও সে নির্দ্বিধায় তাকে বাতিল করে দিল, এবং নিজের কাজের স্বপক্ষে যে সব যুক্তি সে দেখাত শেষ পর্যন্ত আমিও সেগুলিকে ঠিক বলেই মেনে নিতাম। শেষ পর্যন্ত আমরা হাজির হলাম আশ্চর্য রকমের উর্বর ও সৌন্দর্য মণ্ডিত এমন একটি উচ্চ মালভূমিতে যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশ এটনার পরিবেশ থেকে কোন অংশে কম নয় ; বরং—এলিসনের মতে এবং আমার মতেও—সেখান থেকে যে প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ে তা এটনার পর্বত-শিখর থেকে দেখা বহু-খ্যাত দৃশ্যাবলীকেও হার মানায়।

পর্যটক-বন্ধুটি ঘন্টাখানেক ধরে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে

গভীর আনন্দের একটি দীর্ঘশ্বাস টেনে বলল, "আমি বুঝি, আমি জানি যে এখানে আমার মত অবস্থায় পড়লে অতিশয় খুঁতখুঁতে স্বভাবের দশজন লোকের মধ্যে নয়জনই এই স্থানটিকে নিয়ে সন্তুষ্ট হত। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যি অপূর্ব; এই জায়গাটার ব্যাপারে আমারও উল্লসিত হওয়া উচিত, তবে জায়গাটা বড় বেশীমাত্রায় মহিমামণ্ডিত। এত বেশী মহিমান্বিত দৃশ্য প্রথমে চমকিত করে, উত্তেজিত করে, —আর তারপরেই আনে ক্লান্তি, আনে বিষণ্ণতা। অতএব—"

এই ভাবে চার বছর ধরে ঘুরতে ঘুরতে এমন একটা জায়গা আমরা পেয়ে গেলাম যাকে দেখে এলিসনও খুশি হল। জায়গাটা কোথায় সেটা বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি আমার বন্ধুর মৃত্যু হওয়ায় তার সেই জমিদারি কয়েকটি বিশেষ শ্রেণীর পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। তার ফলে আর্নহিমকে ঘিরে গড়ে উঠেছে একটা গোপন ও চাপা সুখ্যাতি।

সাধারণত নদীপথেই আর্নহিমে ঢুকতে হয়। পর্যটক বন্ধুটি খুব সকালেই শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। দুপুর পর্যন্ত পথের দুই পাশে দেখতে পেল শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মেলা। অসংখ্য ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে; তাদের সাদা লোম ঢেউ-খেলানো সবুজ প্রান্তরের বুকে অসংখ্য ফুটকির মত দেখাচ্ছে। ক্রমেই চাষ-আবাদের চিন্তা মিলিয়ে গিয়ে দেখা দিল পশু-পালনের বাসনা। তাও এক সময় মিলিয়ে গেল নির্জনতার চেতনায়। সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে এল ততই নদীটা সংকীর্ণ হতে লাগল; দুই তীর তত খাড়া হতে থাকল; তীরবর্তী মাঠ-ঘাট ততই ঘন সবুজে, লতায় পাতায় বেশী করে ঢাকা পড়তে লাগল। জলের স্বচ্ছতা ক্রমেই বাড়ছে। নদী চলেছে বাঁকের পর বাঁক ঘুরে; ফলে কোন স্থানেই সূর্যকরোজ্জ্বল স্রোতধারা এক ফার্লং-এর বেশী দূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। ক্রমে ছোট নদীটা গিরি-নালার রূপ নিল—শব্দটা সুপ্রযুক্ত হল না, কিন্তু দৃশ্যটিকে সঠিকভাবে বোঝাবার মত অন্য কোন ভাষা আমার জানা নেই বলেই এই শব্দটা ব্যবহার করলাম। গিরি-নালার দু'দিকের দেওয়াল খাড়া উঠে গেছে একশ' থেকে দেড় শ' ফুট পর্যন্ত; যত উঁচুতে উঠেছে দেওয়াল দুটি ততই পরস্পরের দিকে এত বেশী ঝুঁকে পড়েছে যে দিনের আলো প্রবেশের পথ প্রায় অবরুদ্ধ; তার সঙ্গে লম্বা লতাপাতাসমন্বিত শ্যাওলা ও পাহাড়ের ঝোপঝাড় মিলে গোটা সুড়ঙ্গটাকেই যেন একধরনের মৃত্যুর বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

গিরি-নালার গোলকধাঁধায় কয়েক ঘণ্টা ঘুরপাক খাবার পরে হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত বাঁক ঘুরতেই আমাদের জাহাজটার সামনে যেন আকাশ থেকে নেমে এসে দাঁড়াল বেশ বড় মাপের একটি বৃত্তাকার অববাহিকা। তার ব্যাস প্রায় দু' শ' মিটার; একটিমাত্র বিন্দু ছাড়া আর সব দিকেই সুড়ঙ্গের সমান উঁচু পাহাড়ে ঘেরা। সমস্ত পাহাড়টা পাদদেশ থেকে শিখর পর্যন্ত যেন উজ্জ্বল বর্ণের নানা ফুলের অলংকারে সাজানো—কচিৎ কোথাও একটা সবুজ পাতা চোখে পড়ে কি পড়ে না। অববাহিকাটি বেশ গভীর; জল এত স্বচ্ছ যে নীচেকার সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়—দেখা যায় আকাশটা যেন উল্টো করে বসানো, আর ফুলে সাজানো একটি দ্বিতীয় পর্বতমালা।

www.boighar.blogspot.com

সুড়ঙ্গের বিষণ্ণতা থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে অস্তসূর্যের পূর্ণ বৃত্তটিকে চোখের সামনে দেখে পর্যটক বন্ধুটি যত না খুশি হল তার চাইতে বেশী অবাক হয়ে গেল। সে ভেবেছিল সূর্য এতক্ষণে দিগন্ত-রেখার নীচে নেমে গেছে, অথচ সেই সূর্যই এখন তার সামনে মেলে ধরেছে একটা সীমাহীন দৃশ্য।

এখানে পেঁছেই সে জাহাজটাকে ছেড়ে দিয়ে হাতির দাঁতে তৈরী কারুকার্য করা একটা ছোট নৌকোতে উঠে বসল। নৌকোটার সামনের ও পিছনের গলুই জল থেকে এত উঁচু যে সেটা দেখতে বাঁকা চাঁদের মত। উপসাগরের জলে সেটা ভাসছে এক গর্বিত রাজহাঁসের মত। তার পালক-ঢাকা মেঝের এক পাশে পড়ে আছে একটি মাত্র হাল্কা দাঁড়; কোন মাঝি বা অনুচর নেই। অতিথিকে ফূর্তিতে থাকতে বলে দেওয়া হয়েছে—নিয়তিই তাকে দেখবে। বড় জাহাজটা অদৃশ্য হয়ে গেল; ছোট নৌকোটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে হ্রদের মাঝখানে; সে একা যাত্রী। কোন্ দিকে যাবে এ-কথা ভাবতেই পরীসুলভ নৌকোটা ঈষৎ দুলে উঠল। ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়ে নৌকোটা সূর্যের দিকে মুখ করে চলতে শুরু করল। নৌকোর গতি ক্রমেই বাড়ছে—কুলু-কুলু তানে ছোট ছোট ঢেউ তুলে নৌকো এগিয়ে চলল। পাহাড়ি ফটকটা আর বেশী দূরে নয়।

ফটকের কাছে পেঁছতেই গিরি-নালার সুড়ঙ্গের মত চেহারাটা উধাও হয়ে গেল; উপসাগরের বাঁ দিক থেকে বেরিয়ে একটা নতুন স্রোতস্বিনী বয়ে চলেছে পাহাড়ের সঙ্গে সমান্তরালভাবে। এইভাবে চলতে চলতে অনেকগুলি ছোট বাঁক পেরিয়ে হঠাৎ যাত্রীর চোখে পড়ল যেন তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিরাট ফটক অথবা সোনালী বার্ণিশ-করা দরজা; তার বিচিত্র সব কারু-কার্যের উপর অস্তায়মান সূর্যের রশ্মি প্রতিফলিত হওয়ায় মনে হল বুঝি গোটা অরণ্যই আগুনের শিখায় জ্বলছে। একটা উঁচু দেওয়ালের গায়ে ফটকটা বসানো। দেখলে মনে হয়, ফটকটা নদীকে সমকোণে দ্বিখণ্ডিত করেছে। অবশ্য কয়েক মুহূর্ত পরেই বোঝা গেল, জলের মূল ধারাটা আগের মতই বাঁদিকে বাঁক নিয়ে বয়ে চলেছে; দেওয়ালটা ত আগের মতই তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। এদিকে বেশ বড় একটা স্রোতধারা মূল নদী থেকে বেরিয়ে ছোট ছোট ঢেউ তুলে ফটকের তলা দিয়ে বইছে। নৌকোটা সেই ছোট খালে পড়ে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল। ফটকের ভারী পাল্লা দুটো ধীরে ধীরে সরে গেল, তার ভিতর দিয়ে গলে গিয়ে সবেগে পড়ল একটা প্রকাণ্ড খোলা রঙ্গমঞ্চের ভিতরে। তার চারদিকই রক্তবর্ণ পাহাড় দিয়ে ঘেরা, আর তার চারপাশ দিয়ে চক্রাকারে বয়ে যাচ্ছে একটা ঝিলিমিলি নদী। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে খুলে গেল আর্নহিমের স্বর্গরাজ্য। কোথা থেকে ভেসে এল মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত; নাকের ভিতর প্রবেশ করল এক মধুর সুগন্ধ; চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রাচ্যদেশীয় অরণ্যের এক বিচিত্র সমাবেশ—ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে সোনালী ও রক্তিম পাখির দল—পদ্ম-ঢাকা হ্রদ—ভায়োলেট, টিউলিপ, আফিম-ফুল, হায়াসিন্থ, ও টিউবরোজে ভরা প্রান্তর—অনেক রূপালি নদীর দীর্ঘ প্রসারিত দেহ—আর সেই সবকিছুর ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আধা-

গথিক এবং আধা—সারাসেনীয় স্থাপত্য-রীতির অনেক নিদর্শন; শত শত বাতায়ণ, মিনার ও গম্বুজ সূর্যের রাঙা আলোয় ঝলমল করছে; দেখে মনে হল, এ সব কিছুই সুন্দরী নারী, স্বর্গের পরী, জিন ও পাতালবাসী ভূতদের মিলিত প্রচেষ্টার এক ভৌতিক সৃষ্টি।

উইলিয়াম উইলসন

(William Wilson)

আপাতত আমার নাম—ধরা যাক উইলিয়াম উইলসন। আমার সামনে যে সাদা পাতাটা খোলা রয়েছে আমার আসল নাম লিখে সেটাকে কলংকিত করতে চাই না। নামটা তো ইতিমধ্যে পরিবারের লোকদের কাছে অনেক ঘৃণা—অনেক আতংক—অনেক অবজ্ঞার কারণ হয়েছে। ক্ষুব্ধ বাতাস কি এই অদ্বিতীয় অপযশকে পৃথিবীর দূরতম কোণ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় নি? হায়, জঘন্যতম জাতিভ্রষ্ট—সর্বজনপরিত্যক্ত! —পৃথিবীর মানুষদের কাছে কি তুমি চিরদিনের মত মৃত নও? পৃথিবীর সম্মান, তার ফুলের মেলা, তার সোনালী স্বপ্ন—সে সবকিছু থেকে কি তুমি চির-নির্বাসিত নও? —একখানি মেঘ, ঘণ, কালো সীমাহীন একখানি মেঘ কি অনন্ত কাল ধরে তোমার আশা-আকাংখা ও স্বর্গের মধ্যে ব্যবধান রচনা করবে না?

যদি পারতাম তাহলে আমার জীবনের শেষের কয়েক বছরের অকথ্য দুঃখ ও ক্ষমতার অযোগ্য অপরাধের বিবরণ এখানে বা আজই আমি লিপিবদ্ধ করতাম না। জীবনের এই অধ্যায়টি—এই শেষের বছরগুলি—আমার নীতিভ্রষ্টতাকে হঠাৎ যেন বড় বেশী উপরে ঠেলে তুলেছিল; এখানে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই নীতিভ্রষ্টতার গোড়ার কথাগুলিকে তুলে ধরা। মানুষ সাধারণত একটু একটু করে নীচে নামে। আমার বেলায় সব সংগুণগুলি যেন এক মুহূর্তের মধ্যে ঢোলা আলখাল্লার মত শরীর থেকে খসে পড়ল। তুচ্ছ এক দুষ্টুমি থেকে আমি যেন দানবসুলভ এক বিরাট লাফে পৌঁছে গেলাম ইলাহু-গাবালুসের চরম পাপাশয়তায়। হঠাৎ কেমন করে—একটিমাত্র ঘটনা থেকে এই মহাপাতকের জন্ম হল, আমার কথা থেকেই তা জানা যাবে। মৃত্যু আসন্ন; যে ছায়া মৃত্যুর পূর্বগামী তার প্রভাব ছেয়েছে আমার আত্মাকে। এই অজানা পথে যাত্রা শুরু করার আগে আমি চাই আমার বন্ধুজনের সহানুভূতি—তাদের করুণা বলতেও আমার আপত্তি নেই। আমি চাই তারা বিশ্বাস করুক যে সেদিন আমি মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত এক ঘটনা-চক্রের দাসে পরিণত হয়েছিলাম। আমি চাই যে বিবরণ আমি লিখতে বসেছি তার বহুবিধ ভ্রান্তির মরুভূমিতে নিয়তির অলংঘ

বিধানের একটি ছোট মরুদ্যান তারা আমার জন্য খুঁজে পাক। তারা যেন বুঝতে পারে—তাদের অবশ্যই বুঝতে হবে—যে, ইতিপূর্বে মানুষ যত বড় প্রলোভনেরই শিকার হোক না কেন, মানুষ আগে কখনও এভাবে প্রলুব্ধ হয় নি—কখনও এমন পতন কারও জীবনে ঘটে নি। আর সেই জন্যই কি মানুষ আগে কখনও আমার মত এত যন্ত্রণা ভোগ করে নি? আমি কি সত্যি সত্যি এক স্বপ্নের জগতে বাস করি নি? পার্থিব জীবনে উদ্‌ভ্রান্ততম সব দৃশ্য দেখতে পাবার আতংক ও রহস্যের শিকার হয়েই কি আমি আজ মরতে বসি নি?

যে বংশে আমার জন্ম তাদের অনেকেরই কল্পনাপ্রবণ ও উত্তেজনাপ্রবণ হিসাবে খ্যাতি ছিল। বালক বয়সেই সেই পারিবারিক বৈশিষ্ট্যের অনেক প্রমাণ আমি রেখেছি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবণতাও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং নানাদিক থেকেই সেটা বন্ধুবান্ধবদের অশান্তি এবং আমার নিজের সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছে। আমি হয়ে উঠলাম স্বেচ্ছাচারী, অতিমাত্রায় খেয়ালি, এবং অসংযত বাসনার শিকার। আমার মতই দুর্বলচিত্ত এবং শারীরিক অক্ষমতার দরুন বাবা-মাও চরিত্রের এই পাপ-প্রবণতাকে সংযত করতে পারেন নি। যখনই তারা সেরকম কোন চেষ্টা করেছেন তখনই তাদের পরাজয় ঘটেছে, আর আমি বিজয়ী হয়েছি। সেই থেকে আমার মুখের কথাই পরিবারের সকলের পক্ষে আইন হয়ে উঠল। আর সেই বয়স থেকে আমিই হয়ে উঠলাম আমার নিজের হর্তা-কর্তা-বিধাতা।

আমার বিদ্যালয়—জীবনের প্রথম স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইংলণ্ডের এক কুয়াসা-ঢাকা গ্রামের একটা মস্ত বড় এলিজাবেথীয় যুগের প্রাচীন বাড়ির ছবি। সত্যি কথা বলতে কি, সেই প্রাচীন শহরটি আমার কাছে ছিল একটি স্বপ্ন, একটি শান্তির পীঠস্থান। বাড়িটার কথা তো আগেই বললাম। সেটা ছিল যেমন প্রাচীন, তেমনই অপরিকল্পিত ও অগোছালো। সারা বাড়িতে পড়ার ঘরটাই ছিল সব চাইতে বড়। সেটাই ছিল আমাদের পাঠশালা—বাড়ি। ঘরটা লম্বা, সরু, অত্যন্ত নীচু, গথিক ঢঙের ছুঁচলো জানালা, আর ওক কাঠের সিলিং। সেই বড় বাড়িটার একটি দূরতম ভূতুড়ে কোণে ছিল আমাদের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ড. ব্র্যানস্‌বির ঘর। এ ছাড়া স্কুল-জীবনের মধ্যে স্মরণীয় আর কিই বা আছে! সেই ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, আর রাত হলে ঘন্টার শব্দ শুনে ঘুমতে যাওয়া; সেই পড়া মুখস্থ করা, আবৃত্তি করা; সেই সাময়িক অর্ধ-ছুটি আর ঘুরে বেড়ানো; খেলার মাঠের হৈ-হুল্লোড় আর রেশারেশি। সে সব কথা স্মৃতির পাতা থেকে কবে মুছে গেছে।

তবে একটা কথা স্পষ্ট মনে আছে। আমার আবেগপ্রবণ, উৎসাহী ও প্রভুত্বব্যঞ্জক প্রকৃতির জন্য অচিরেই আমি স্কুলের বন্ধুদের নজরে পড়ে গেলাম এবং ধীরে ধীরে সমবয়সী বন্ধুদের সর্দার হয়ে উঠলাম। অবশ্য মাত্র একজন বাদে। সেই ছাত্রটি আমার কোন আত্মীয় নয়, অথচ তার নাম ও পদবী ছিল ঠিক আমার নাম ও পদবী। তাই এই আখ্যায়িকায় আমার নিজের নাম দিয়েছি উইলিয়াম উইলসন—পদবীটা কাল্পনিক হলেও আসল পদবী থেকে খুব তফাৎ নয়। স্কুলের পরিভাষায় যাকে বলা হয় "আমাদের

দল" তাদের মধ্যে একমাত্র এই ছেলেটিই—নামের দিক থেকে যে আমার মিতে—পড়াশুনার ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খেলার মাঠেও—আমার সব হুকুম মেনে নিত না এবং আমার ইচ্ছার কাছেও মাথা নোয়াত না—বস্তুত, সব ব্যাপারেই আমার স্বেচ্ছাচারী নির্দেশের বিরোধিতা করত। পৃথিবীতে কোথাও যদি চরম ও নিঃশর্ত স্বেচ্ছাচার চলিত থাকে তো সেটা কিশোরদের পাণ্ডার স্বেচ্ছাচার।

উইলসনের এই বিদ্রোহই আমার সব চাইতে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। বাইরে যতই হাক-ডাক করি, মনে মনে তাকে আমি ভয় করতাম, এমন কি তাকে আমার সমকক্ষ বলে মনে করতাম—হয়তো বা বড়ও। অথচ এই সমকক্ষ হওয়া বা বড় হওয়ার ব্যাপারটা একমাত্র আমি ছাড়া দলের আর কেউ স্বীকার করত না। সে নিজেও যে খুব একটা উচ্চাকাংখী বা উৎসাহী ছিল তাও নয়। তাছাড়া, বাইরে সে যাই বলুক আর যাই করুক, ভিতরে ভিতরে আমার প্রতি তার একটা মনের টানও ছিল। উইলসনের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য, দুজনের একই নামকরণ, এবং একই দিনে দুজনেরই স্কুলে ভর্তি হবার ঘটনা—সব মিলিয়ে স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মেছিল যে আমরা দুই ভাই। ধারণাটা সত্যি নয়, কিন্তু আমরা যদি ভাই হতাম তাহলে অবশ্যই হতাম যমজ ভাই; কারণ ড. ব্র্যান্স্বির স্কুল ছেড়ে দেবার পরে ঘটনাক্রমে আমি জেনেছিলাম যে, আমার এক নামের মিতেটির জন্ম হয়েছিল ১৮১৩ সালের উনিশে জানুয়ারি, আর আমিও জন্মেছিলাম ঠিক ঐ তারিখে।

উইলসনের অবিরাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধিতার ফলে আমাকে যথেষ্ট উদ্বেগে দিন কাটাতে হলেও কিছুতেই তাকে আমি পুরোপুরি ঘৃণা করতে পারতাম না। বিস্ময়কর শোনালেও এটাই ঘটনা। প্রায় প্রতিদিনই তার সঙ্গে একটা না একটা ঝগড়া হতেই; তবু শেষপর্যন্ত কখনও আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হত না—আড়ি হত না। লড়াই হত সমানে সমানে; তবে একটা জায়গায় তার একটা দুর্বলতা ছিল। হয় তো কোন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ফলেই তার কণ্ঠনালির এমন একটা ক্ষতি হয়েছিল যে সে কোন সময়ই তার কন্ঠস্বরকে ফিস্ফিসানির উপরে তুলতে পারত না। আমি তার সেই দৈহিক দুর্বলতার পুরো সুযোগ নিতাম।

প্রতিশোধ নিতে উইলসন নানারকম উপায় অবলম্বন করত; কিন্তু তার মধ্যে একটা কার্যকরী রসিকতা আমাকে বড়ই বিব্রত করত। একটা তুচ্ছ কারণে আমি এত বেশী বিরক্ত হব এটা সে কেমন করে আবিষ্কার করেছিল সে প্রশ্নের মীমাংসা আমি আজও করতে পারি নি। পৈত্রিক নামটার প্রতি আগাগোড়াই আমার একটা বিতৃষ্ণা ছিল, বিশেষ করে নামের আগে ব্যবহৃত বংশগত পদবীটার প্রতি। সে শব্দগুলি যেন আমার কানে বিষ ঢেলে দিত। তাই আমি যেদিন প্রথম স্কুলে গেলাম সেই দিনই এক দ্বিতীয় উইলিয়াম উইলসনও সেখানে এসে হাজির হল দেখে আমার খুব রাগ হল। একে তো নামটাই আমার কাছে বিরক্তিকর, তার উপর অনুমান করতে অসুবিধা হল না যে এই নাম-বিভ্রাটের দরুন অনেক ক্ষেত্রেই রামের বোঝা শ্যামের ঘাড়ে এসে চাপবে। তখনও আমি খেয়াল করে দেখিনি যে আমাদের দুজনের একই বয়স, একই উচ্চতা, এবং চোখ-

মুখ-নাক ও শারীরিক গঠনের দিক থেকেও দুজন হুবহু এক। কিন্তু এই নামের ও চেহারার মিলটাকে যে সে আমাকে বিব্রত ও বিরক্ত করার একটা সার্থক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারে এ আশংকা তখনও আমার কল্পনাতেই আসে নি।

হুবহু একটি "দ্বিতীয় আমি" হওয়াই ছিল তার মূল অস্ত্র—শুধু নামে এবং পদবীতেই নয়, কথায় এবং কাজেও। আর দুটি অভিনয়ই সে আশ্চর্য সফলতার সঙ্গে আয়ত্ত করে নিল। আমার পোশাকের মত পোশাক পরাটা অতি সহজ; চাল-চলনও সে সহজেই রপ্ত করে নিল; শারীরিক ত্রুটি সত্ত্বেও আমার কণ্ঠস্বরকেও সে বাদ দিল না। আমার উচ্চগ্রামের স্বরকে আয়ত্ত করার চেষ্টাই সে করল না; কিন্তু আসল কাজটা ঠিকই সমাধা করল; তার এক বিশেষ ধরনের ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ হুবহু আমার আওয়াজেরই প্রতিধ্বনি হয়ে উঠল।

আমাকে হুবহু নকল করে আমাকেই ব্যঙ্গ করার অভিনয়টি সে এত সুন্দরভাবে করত যে তা দেখে আমার বিরক্তির সীমা-পরিসীমা থাকত না। তবে আমার একটা সান্ত্বনা ছিল—এই অভিনয়টি কেবল আমিই বুঝতে পারতাম, এবং নিজের সাফল্যে তার ঠোঁটে ব্যঙ্গের যে তীক্ষ্ণ হাসিটি ফুটে উঠত কেবল আমিই নীরবে তা সহ্য করতাম। অথচ স্কুলের অন্য কেউ তার এই বিদ্রূপকে ধরতে পারত না, তার কুটিল হাসির অংশীদার হত না। দীর্ঘকাল ধরে এই সমস্যার কোন সমাধান আমি খুঁজে পাই নি।

যতদূর মনে পড়ে এই সময়ে একবার তার সঙ্গে তুমুল তর্ক-যুদ্ধ বেধে গেলে আমি তাকে আঘাত করি। তাতে সে ভীষণ চটে গিয়ে এমন সব কথা বলল, আর এমন সব কাজ করল যা একান্তভাবেই তার স্বভাববিরুদ্ধ। অবশ্য এই ঘটনার কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি। যাই হোক, আমাদের মস্ত বড় পুরনো বাড়িটাতে অসংখ্য ঘর ছিল। তারই একটা বড় হল-ঘরে বেশীর ভাগ ছাত্রের শোবার ব্যবস্থা ছিল। হল-ঘর সংলগ্ন কতকগুলি ছোট ছোট খুপড়ি-ঘরকেও ডা. ব্র্যান্‌স্‌বি কিছু ছাত্রের একক শোবার ঘরে পরিবর্তিত করেছিলেন। তেমনি একটা ছোট ঘরে উইলসন থাকত। উপরে উল্লেখিত সংঘর্ষের ঠিক পরেই—আমার স্কুলে আসার পঞ্চম বছরের শেষ দিকে—অন্য সবাইকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে আমি বিছানা থেকে উঠে একটা বাতি হাতে নিয়ে চুপি চুপি আমার শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে উইলসনের শোবার ঘরে ঢুকলাম। অনেক দিন ধরেই বুদ্ধির খেলায় তাকে নাকাল করে দেবার একটা সুযোগের অপেক্ষায় আমি ছিলাম। এতদিনে সেই সুযোগটা হাতে এসে গেল। তার ঘরে পৌঁছে বাতিটাকে ঢাকা দিয়ে বাইরে রেখে নিঃশব্দে তার ঘরে ঢুকলাম। এক পা বাড়িয়ে কান পেতে তার শান্ত নিঃশ্বাসের শব্দ শুনলাম। বুঝলাম সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ফিরে গিয়ে বাতিটা হাতে নিয়ে আবার তার ঘরে ঢুকলাম। মশারিটা ফেলাই ছিল। ধীরে ধীরে সেটাকে তুলে ধরতেই উজ্জ্বল আলো পড়ল ঘুমন্ত ছেলেটির উপর, আর আমার দুই চোখ নিবদ্ধ হল তার মুখের উপর। তাকিয়েই আছি; —সঙ্গে সঙ্গে একটা অসারতা,

একটা বরফ-শীতলতা যেন আমার শরীরকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার বুকটা ওঠা-নামা করছে, হাঁটু দুটো কাঁপছে,—একটা অহেতুক অসহ্য আতংক আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। হাঁপাতে হাঁপাতে বাতিটাকে তার মুখের আরও কাছে নামিয়ে ধরলাম। এই কি—এই কি উইলিয়াম উইলসনের মুখ? দেখলাম—ঠিক তাই, কিন্তু কেন জানি না আমার মন বলল এটা তার মুখ নয়; তীব্র যন্ত্রণায় আমি কাঁপতে লাগলাম। কি ছিল সেই মুখে যা আমাকে এতখানি বিচলিত করল? আবার তাকালাম;—অসংখ্য এলোমেলো চিন্তায় মাথাটা ঘুরতে লাগল। জাগ্রত অবস্থায় সে তো এ রকম দেখতে নয়—নিশ্চয় নয়। একই নাম! একই দেহের গঠন! তারপর দীর্ঘদিন ধরে তার দ্বারা আমার চলন, আমার কণ্ঠস্বর, আমার স্বভাব ও আমার আচরণের এই অবিরাম অনুকরণ। এ কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? এইমাত্র যা দেখলাম সে কি তবে এই ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণের অবিরাম অনুশীলনের ফল মাত্র? ভয়ে শিউরে উঠে বাতিটা নিভিয়ে দিলাম; নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে সেই মুহূর্তেই পাঠশালা-বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আর কোন দিন সেখানে ঢুকি নি।

শুধুই আলসেমি করে আরও কয়েকটা মাস বাড়িতে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত ইটন-এর ছাত্র হয়ে পড়লাম। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের ফাঁকেই ডা. ব্র্যান্‌সবি-র পাঠশালার ঘটনাটির স্মৃতি ম্লান হয়ে গেল। সেই শোকার্ত নাটকের কোন চিহ্নই রইল না। সমস্ত ব্যাপারটাকেই সাময়িক দৃষ্টিভ্রম বলে ধরে নিলাম।

তারপর থেকে সেখানে যে শোচনীয় স্বেচ্ছাচারকে জীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুললাম—স্কুলের কড়া দৃষ্টিকে এড়িয়ে যে স্বেচ্ছাচার তার সব বিধি-নিষেধকে উপেক্ষা করে চলল—তার বিশদ বিবরণ নাই বা দিলাম। তিন বছরের মূঢ়তায় লাভ কিছুই হল না, শুধু পেলাম কতকগুলি পাপাচারের দৃঢ়মূল অভ্যাস। সপ্তাহকাল দৈহিক ভ্রষ্টাচারের পরে একদা অত্যন্ত উচ্ছৃংখল একদল ছাত্রকে আমার ঘরে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলাম গোপনে কিছু আমোদ-ফূর্তি করার উদ্দেশ্যে। অনেক রাতে আমরা জমায়েত হলাম; আগেই ঠিক ছিল, হুল্লোড় চলবে ভোর পর্যন্ত। মদের ফোয়ারা ছুটল; আরও অনেক রকম বিপজ্জনক প্রলোভনের অভাব ছিল না; ফলে পূবের আকাশে যখন ভোরের আলো দেখা দিল তখন আমাদের ফূর্তির বহর সবে চরমে উঠেছে। তাসের ও মদের নেশায় আমি তখন উন্মাদ; মুখে খিস্তির খৈ ফুটছে; হঠাৎ ঘরের দরজাটা সশব্দে একটু ফাঁক হয়ে গেল; কানে এল চাকরের ব্যগ্র কণ্ঠস্বর। বাইরে থেকেই সে জানাল, একটি লোক অবিলম্বে হল-ঘরে আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

মদের অধীর উত্তেজনায় এবং আকস্মিক বাধায় বিস্মিত না হয়ে খুশিই হলাম। তখনই টলতে টলতে এগিয়ে গেলাম। কয়েক পা চলেই বাড়ির অলিন্দ-কক্ষে পৌঁছে গেলাম। ঘরটা ছোট, নীচু; কোন বাতি নেই; ফলে অর্ধবৃত্তাকার জানালা দিয়ে আসা ভোরের মৃদু আলো ছাড়া ঘরে আর কোন আলো ছিল না। চৌকাঠে পা ফেলেই দেখতে পেলাম আমার মতই উঁচু একটি যুবকের মূর্তি; সেই মুহূর্তে আমার গায়ে যে ধরনের

জামা ছিল ঠিক সেই রকম একটি সাদা ভোরের ফ্রক ছিল তার গায়। ম্লান আলোতেও সেটা দেখতে পেলাম, কিন্তু তার মুখটাকে ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। আমি ঘরে ঢুকতেই সে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে অত্যন্ত অধৈর্যভাবে আমার হাতটা চেপে ধরে আমার কানে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "উইলিয়াম উইলসন!"

মুহূর্তের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠলাম।

অপরিচিত লোকটির হাবভাব দেখে, এবং যেভাবে আমার চোখ এবং আলোর মাঝখানে একটি আঙুল তুলে সে নাচাতে লাগল তা দেখে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম! কিন্তু শুধু এইটুকুই আমাকে এত বেশী বিচলিত করে নি। তার সেই অদ্ভুত, চাপা, হিস্‌হিসিয়ে উচ্চারিত কথাগুলির মধ্যে এক গম্ভীর ভর্ৎসনা লুকিয়ে ছিল; সর্বোপরি, ঐ ক'টি সরল, পরিচিত, অথচ অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত কথার বৈশিষ্ট্য, তার সুর, তার মূল বক্তব্য আমার মনে জাগিয়ে তুলল অতীত দিনের হাজার স্মৃতিকে —আমার অন্তরাত্মাকে আঘাত করল বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত। চোখ ও কানকে নতুন করে সজাগ করে দেখি, সে চলে গেছে।

কয়েক সপ্তাহ ধরে এ নিয়ে অনেক ভাবলাম, অনেক উদ্ভট কল্পনা মাথায় এল। এইযে লোকটি আমার কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটাল, অভিযোগের ভঙ্গীতে আমাকে পরামর্শ দিল, তাকে চিনতে পারি নি তা তো নয়। তবু প্রশ্ন জাগেঃ কে এই উইলসন? কি তার পরিচয়? কোথা হতে সে এল? আর কেনই বা এল? কোন প্রশ্নেরই সন্তোষজনক উত্তর পেলাম না। শুধু এইটুকু জানতে পারলাম, আমি যেদিন ডঃ ব্যান্‌সবি-র পাঠশালা থেকে পালাই সেই দিন বিকেলেই তার পরিবারের একটি আকস্মিক দুর্ঘটনার দরুন তাকে পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেই আমার আসন্ন অক্সফোর্ড সফরের উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় এ নিয়ে আর বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করি নি। অচিরেই সেখানে পাড়ি দিলাম, এবং বাবা-মার আর্থিক কৌলীন্যের জোরে বিলাস-ব্যসনে মত্ত হয়ে উঠলাম। ক্রমে সেখানে আমার এতদূর অধঃপতন ঘটল যে জুয়ারীর ঘৃণ্যতম কলা-কৌশল আয়ত্ত করার প্রচেষ্টাও আমার রুচিতে বাধল না। সেই ন্যাক্কারজনক বিদ্যায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিয়মিতভাবে জুয়া খেলে কলেজের কতকগুলি বোকা-পাঠা সহপাঠীর পকেট ফাঁক করে নিজের প্রচুর আয়কে আরও অনেক বাড়িয়ে ফেললাম।

এইভাবে দুটো বছর বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। তার পরেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে জুটল এক হঠাৎ বড়লোক যুবক—নাম গ্লেন্ডিনিং; লোকমুখে শুনলাম, যুবকটি হেরোডেস এটিকাসের মত ধনী, আর সেটা আমার মতই সোজা পথে অর্জিত। শীঘ্র বুঝতে পারলাম, তার মাথায় ঘিলুর পরিমাণ খুব কম; তাই তাকেই আমার হাত সাফাইয়ের উপযুক্ত শিকার বলে ধরে নিলাম। প্রায়ই তাকে নিয়ে জুয়া খেলতে বসতাম, এবং জুয়ারীর চিরাচরিত রীতি অনুসারে গোড়ায় তাকে অনেক টাকা জিতিয়ে দিতাম। একেই বলে জুয়াড়ীর ফাঁদ। বাছাধন শেষ পর্যন্ত সেই ফাঁদেই পা বাড়িয়ে দিল। সুযোগমত একদিন উভয়েরই বন্ধু এক সহপাঠীর (মিঃ প্রেস্টন) ঘরে আট-দশ জনের

একটি আড্ডার আয়োজন করা হল। এখানে বলে রাখা ভাল যে সেই বন্ধুটি আমার বদ মতলবের বিন্দুবিসর্গও জানত না। যাই হোক, অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডার পরে শুরু হল জুয়ার আসর। একে একে অন্য সব বন্ধুরা খেলা ছেড়ে আমাদের দুজনকে ঘিরে বসল। হঠাৎ বড়লোক বাবুটি মদের নেশায় টং হয়ে মুখ লাল করে বার বার বাজী ধরল আর হেরে গেল। যত হারে ততই তার জিদ বাড়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার কাছে তার বেশ মোটা রকমের ধার হয়ে গেল। তবু আর এক পাত্র মদ গলায় ঢেলে—ঠিক যে রকমটা আমি ঠাণ্ডা মাথায় আশা করেছিলাম—সে হঠাৎ প্রস্তাব করে বসল, এবার দানের অংকটা দ্বিগুণ করা হোক। বারকয়েক অনিচ্ছার ভান করে শেষ পর্যন্ত আমি তার প্রস্তাবে সায় দিলাম। ফলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তার ধারের পরিমাণটা চারগুণ বেড়ে গেল। কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিলাম, তার মুখের রক্তিম আভাটা ক্রমেই কমে আসছিল; কিন্তু এবার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, তার মুখটা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে। খোঁজ-খবর নিয়ে যতদূর জেনেছিলাম, গ্লেন্ডিনিং প্রচুর টাকা-পয়সার মালিক। তাই এতক্ষণে যে টাকাটা সে হেরেছে পরিমাণে বিরাট হলেও তার মত একজন ধনী লোকের তাতে এতটা বিপর্যস্ত হবার কথা নয়। তার এই অবস্থাটাকে প্রচুর মদ খাওয়ার প্রতিক্রিয়া বলে ধরে নিয়ে সকলের চোখে নিজের উদারতাকে আরও বেশী করে ফুটিয়ে তুলতে কয়েকবার খেলা বন্ধ করে দেবার কথাও বললাম। তা শুনে আশপাশের বন্ধুরা হৈ-হৈ করে উঠল, আর গ্লেণ্ডিনিংও হতাশায় আঁতকে উঠল।

এই পরিস্থিতিতে আমি সত্যি সত্যি কি করতাম বলতে পারব না। বন্ধুটির করুণ অবস্থা সকলকেই বিষণ্ণ করে তুলল; কয়েক মিনিটের জন্য ঘরের ভিতর নেমে এল গভীর নিস্তব্ধতা। দলের অনেকেরই ঘৃণা বা ভর্ৎসনার অগ্নি-দৃষ্টি পড়ল আমার মুখের উপর। কিন্তু একটি আকস্মিক ও অসাধারণ ঘটনায় আমার বুকের দুঃসহ ভারটা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য নেমে গেল। হঠাৎ ঘরের ভারী চওড়া দরজাটা সপাটে খুলে গেল, আর এক যাদুমন্ত্রে ঘরের সবগুলি মোমবাতি নিভে গেল। নিভন্ত আলোয় আমরা শুধু এইটুকু বুঝতে পারলাম যে প্রায় আমার মত লম্বা একটি অপরিচিত লোক আলখাল্লায় শরীরটা ঢেকে ঘরে ঢুকল। তারপরেই সব কিছু অন্ধকারে ঢেকে গেল; আমরা শুধু বুঝলাম সে আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার আগেই শুনতে পেলাম সেই অনধিকার প্রবেশকারীর কণ্ঠস্বর।

তার সেই চাপা, স্পষ্ট, ফিস্‌ফিস্ করে উচ্চারিত কথাগুলি আমার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল; সে কণ্ঠস্বর আমি কোনদিন ভুলব না। সে বলতে লাগল, "মশাইরা, আমার এই আচরণের জন্য আমি ক্ষমা চাইব না, কারণ আমি আমার কর্তব্য পালন করছি মাত্র। আজ রাতের জুয়া খেলায় যে লোকটি লর্ড গ্লেন্ডিনিং-এর কাছ থেকে বিরাট অংকের টাকা জিতে নিয়েছে তার আসল চরিত্রের কথা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন না। অতএব, এই অতি-প্রয়োজনীয় তথ্যটি জানবার উপায় আপনাদের বাতলে দিচ্ছি। দয়া করে অবসর সময়ে তার জামার বাঁ হাতের আস্তিনের ভিতরকার লাইনিং

এবং তার নকশি-করা প্রাতঃকালীনের চাদরের ভিতরকার বড় বড় পকেটগুলি ভাল করে পরীক্ষা করবেন।”

সকলেই নিশ্চুপ। গভীর স্তব্ধতা। মেঝেতে একটা পিন পড়লেও তার শব্দ শোনা যায়। কথা শেষ করেই যেমন অকস্মাৎ সে এসেছিল তেমনই অকস্মাৎ সে চলে গেল। আমার মনের অবস্থার বর্ণনা কি দেব? —দিতে পারব? আমাকে কি বলতেই হবে যে এক অভিশপ্ত জীবনের হাহাকারে ভরে গেল আমার বুক? কোন কিছু ভাববার সময় নেই। অনেকগুলি হাত এসে সেখানেই আমাকে চেপে ধরল। ঘরে আবার আলো জ্বলে উঠল। শুরু হল তল্লাসী। আমার আস্তিনের লাইনিং-এর ভিতর থেকে, চাদরের পকেট থেকে বেরিয়ে পড়ল জুয়া খেলার জুয়াচুরির সব নকল তাস, নানারকম মার্কা-মারা। ঘরের মালিক বন্ধুটি নীচু হয়ে পায়ের তলা থেকে দুষ্প্রাপ্য লোমের তৈরী একটা অত্যন্ত দামী আলখাল্লা তুলে নিয়ে বলল, “মিঃ উইলসন, এটা আপনার সম্পত্তি। (শীতকাল; নিজের ঘর থেকে বের হবার সময় চাদরের উপর সেটা গায়ে দিয়ে এসেছিলাম এবং এখানে পেঁছে খুলে রেখেছিলাম।) ধরেই নিচ্ছি, আপনার হাত-সাফাইয়ের আরও প্রমাণ খোঁজা বাহুল্যমাত্র। সে প্রমাণ আমরা যথেষ্ট পেয়েছি। আমি আশা করব, আপনি অক্সফোর্ড ছেড়ে চলে যাবেন—আর এক্ষুণিই চলে যাবেন আমার ঘর থেকে।”

লজ্জায়, অপমানে আমি তখন একেবারে মাটিতে মিশে গিয়েছি; হয় তো তার এই উদ্ধত ভাষার প্রতিবাদে দু' এক ঘা মেরেই বসতাম, যদি না সেই মুহূর্তে আর একটি অধিকতর বিস্ময়কর ঘটনা আমার সমস্ত মনযোগকে আকৃষ্ট করত। মিঃ প্রেস্টন যখন মেঝের উপরে দরজার কাছে পড়ে-থাকা দামী আলখাল্লাটা আমার হাতে তুলে দিল তখন আমি সভয়ে, সবিনয়ে লক্ষ্য করলাম আমার নিজের আলখাল্লাটা তখনও আমার হাতেই রয়েছে, আর যেটা সে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছে সেটা সব দিক থেকেই আমার আলখাল্লাটির অনুরূপ। মনে পড়ে গেল, যে বিশেষ লোকটি এমন নিষ্ঠুর-ভাবে আমার মুখোশটা খুলে দিয়ে গেল তারও শরীর একটা আলখাল্লায় জড়ানো ছিল; তাছাড়া, একমাত্র আমি ছাড়া এখানকার আর কারও গায়েই আলখাল্লা ছিল না। যাই হোক, কিছুটা উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে প্রেস্টনের দেওয়া আলখাল্লাটা নিয়ে সকলের অলক্ষ্যে আমার নিজেরটার উপরেই রেখে সদর্পে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পর দিন ভোর হবার আগেই আতংকে ও লজ্জায় মাথা নীচু করে সাততাড়াতাড়ি অক্সফোর্ড ছেড়ে মহাদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম।

কিন্তু বৃথা এ পলায়ন। আমার অশুভ নিয়তি বুঝি দ্বিগুণ উল্লাসে আমাকে তাড়া করল; আমাকে বুঝিয়ে দিতে চাইল-যে তার রহস্যময় পলায়নের এই তো সবে শুরু। প্যারিসে পা দেওয়া মাত্রই আমার ব্যাপারে উইলসনের অবাঞ্ছিত আগ্রহের নতুন প্রমাণ পেলাম। বছরের পর বছর কেটে গেল; দুঃখের অবসান হল না। শয়তান! —রোমে কত অসময়ে, কী এক ভৌতিক পরিবেশে সে আবার এসে দাঁড়াল আমার

এবং আমার উচ্চাকাংখার মাঝখানে! ভিয়েনাতেও তাই—বার্লিনে—মস্কোতে! এমন কোন্ জায়গা আছে যেখান থেকে আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে অভিশাপ দেবার মত যথেষ্ট তিক্ত কারণ ছিল না? তার দুর্বোধ্য অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শেষ পর্যন্ত আমি পালিয়েছি, যন্ত্রণাকাতর মানুষ যে ভাবে পালায় মহামারীর কবল থেকে; পালিয়েছি পৃথিবীর শেষ প্রান্তে—কিন্তু বৃথাই সে পলায়ন!

নিজের মনকেই বার বার প্রশ্ন করেছি, "কে সে? —কোথা থেকে আসে? —কি তার উদ্দেশ্য?" কোন উত্তর পাই না। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছি, যতবার সে এসেছে, যখনই সে আমার ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেছে, কোন সময়ই মুহূর্তের জন্যও তার মুখ আমি দেখতে পাই নি। উইলসন যেই হোক না কেন, এই লোকটি কি মুহূর্তের জন্যও ভেবেছে, ইটন-এ যে আমাকে তিরস্কার করেছিল—অক্সফোর্ডে যে আমার সম্মানকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল—যে আমার উচ্চাকাংখাকে ব্যর্থ করেছিল রোমে, আমার প্রতিহিংসাকে প্যারিসে, আমার উদগ্র ভালবাসাকে নেপল্‌সে,—যে আমার চিরশত্রু ও অশুভ নিয়তি, তার মধ্যে আমি দেখতে পাইনি আমার স্কুল-জীবনের উইলিয়াম উইলসনকে—আমার একই নামের সেই সাথী ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডঃ ব্রান্‌স্‌বি-র পাঠশালার সেই ঘৃণিত ভয়াবহ প্রতিদ্বন্দ্বীকে? অসম্ভব! কিন্তু আর নয়, এবার ফিরে যাই এ নাটকের শেষ ঘটনাবহুল দৃশ্যে।

রোমে, ১৮—সালের উৎসবের সময় নেপল্‌সের ডিউক ডি ব্রগ্‌লিও-র পালাজ্জোতে অনুষ্ঠিত মুখোশনৃত্যে আমি উপস্থিত ছিলাম। মদের টেবিলে বেশ বাড়াবাড়ি রকমের হৈ-হুল্লোড়ে মেতে উঠেছিলাম। প্রচণ্ড ভিড়ে ঘরের দম-বন্ধকরা আবহাওয়া অসহ্য বোধ হওয়ায় আমি সাগ্রহে খুঁজতে লাগলাম ভীমরতি-ধরা বৃদ্ধ ডি ব্রগ্‌লিও-র সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে। তার পোশাকের গোপন কথাটি সে আগেই আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল। খুঁজতে খুঁজতে এক পলকের জন্য তাকে দেখতে পেয়েই আমি ভিড় ঠেলে দ্রুত তার দিকে এগিয়ে চললাম। ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন আমার কাঁধে তার হাতখানি রাখল; কানে এল সেই চিরস্মরণীয়, চাপা অভিশপ্ত মৃদু কণ্ঠস্বর।

মেজাজটা এমনিতেই খারাপ ছিল; এভাবে বাধা পেয়ে চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সজোরে তার কলার চেপে ধরলাম। যেমন আশা করেছিলাম, তার পরিধানে ঠিক আমার মতই পোশাক; নীল ভেলভেটের স্পেনীয় আলখাল্লা গায়ে, কোমরের লাল কোমরবন্ধে ঝুলছে তীক্ষ্মমুখ তরবারি। কালো রেশমী মুখোশে মুখটা সম্পূর্ণ ঢাকা।

চীৎকার করে বললাম, "পাজী! ভণ্ড! অভিশপ্ত শয়তান! এ ভাবে মৃত্যু পর্যন্ত আমার পায়ে পায়ে ফিরতে তোমাকে দেব না! আমার সঙ্গে এস, নইলে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেখানেই তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেব!" —টানতে টানতে নাচ-ঘর থেকে তাকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরটাতে ঢুকলাম। সেও বিনা বাধায় আমাকে অনুসরণ করল।

ঘরে ঢুকে একধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিলাম। সে টলতে টলতে দেওয়ালের উপর গিয়ে পড়ল। দরজাটা বন্ধ করে তাকে তরবারি বের করতে বললাম। এক মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সে নিঃশব্দে তরবারি বের করল। নিজেকে রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।

খুবই সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হল। আমি তখন উত্তেজনায় উন্মাদপ্রায়; এক বাহুতে সহস্র বাহুর উদ্দীপনা ও শক্তি অনুভব করলাম। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই নিছক গায়ের জোরে তাকে দেওয়ালের কাঠের আচ্ছাদনের উপর চেপে ধরলাম। এইভাবে তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে পাশবিক হিংস্রতায় আমার তরবারিকে বার বার বসিয়ে দিলাম তার বুকে।

সেই মুহূর্তে কে যেন দরজা খুলতে চেষ্টা করল। পাছে কেউ ঢুকে পড়ে তাই ছুটে গিয়ে খিলটাকে ভাল করে আটকে দিয়ে তখনই ফিরে গেলাম আমার মুমূর্ষু শত্রুর কাছে। কিন্তু যে দৃশ্য চোখে দেখলাম তার ফলে যে বিস্ময়, যে আতংক আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল তাকে আমি বর্ণনা করব কোন্ ভাষায়? যে মুহূর্ত সময় আমি চোখ ফিরিয়েছিলাম তারই মধ্যে ঘরের সব ব্যবস্থা আমূল পাল্টে গেছে। আগে যেখানে কিছুই দেখি নি এখন সেখানে চোখে পড়ল—অন্তত সেই সময় তাই মনে হয়েছিল—একটা বড় আয়না; চরম আতংক নিয়ে যখন সেই আয়নার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমার নিজের মূর্তিই টলতে টলতে এগিয়ে এল আমার মুখোমুখি হতে, কিন্তু সে মূর্তি তখন পাংশু, বিবর্ণ, রক্তাক্ত।

বলছি বটে এই রকম দেখলাম, কিন্তু আসলে তা নয়। মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর হয়ে যে আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে উইলসন। মেঝের উপর যেখানে সে ছুঁড়ে ফেলেছিল তার মুখোশ ও আলখাল্লা, সে দুটো সেখানেই পড়ে আছে। তার পোশাকের এমন সুতোও নেই—তার মুখের গড়ণের কোথাও এমন একটি রেখাও নেই যা হুবহু ঠিক আমার মত নয়।

সত্যি সে উইল্‌সনই ছিল; কিন্তু এবার সে ফিসফিস করে কথা বলল না; তার মুখের কথা শুনে আমি সহজেই কল্পনা করতে পারতাম যে কথাগুলি আমিই বলছি। সে বলল ঃ

"তুমি বিজয়ী হয়েছ, আমি আত্মসমর্পণ করলাম। তথাপি আজ থেকে তুমিও মৃত—জগতের কাছে, ঈশ্বরের কাছে, আমার কাছে তুমি মৃত! আমার মধ্যেই তুমি বেঁচে ছিলে—আর আমার মৃত্যুতে, এই মূর্তি যা তোমারই মূর্তি তার দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে কী চূড়ান্তভাবে তুমি নিজেকেই হত্যা করেছ।"

ডাক্তার টার ও অধ্যাপক ফেদারের চিকিৎসা-পদ্ধতি

The System of Doctor Tarr and Professor Fether

১৮—র হেমন্তকালে ফ্রান্সের প্রত্যন্ত দক্ষিণাঞ্চলে ভ্রমণের সময় আমার যাত্রা-পথের কয়েক মাইলের মধ্যেই একটি বেসরকারী পাগলা-গারদ পড়ে। প্যারিসে থাকতেই ডাক্তার বন্ধুদের মুখে ঐ পাগলা-গারদের কথা অনেক শুনেছিলাম। এ রকম ধরনের কোন বাড়ি আমি আগে দেখি নি; তাই মনে হল এ সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না। আমার যাত্রা-সঙ্গী ছিলেন মাত্র অল্প কয়েক দিনের পরিচিত একটি ভদ্রলোক। তার কাছে প্রস্তাব করলাম, ঘণ্টখানেকের জন্য একটু ঘুরে গিয়ে পাগলা-গারদটা দেখে আসা যাক। কিন্তু সময়ের অভাব এবং একটি পাগলের সঙ্গে মোলাকাতের স্বাভাবিক ত্রাসের অজুহাতে তিনি আমার প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। অবশ্য আমার কৌতূহল নিবৃত্তিতে কোনরকম বাধা না দিয়ে তিনি বললেন, তিনি একাকী ধীরে সুস্থে এগিয়ে যাবেন, যাতে সেই দিন অথবা তার পরের দিনই আমি তাকে ধরে ফেলতে পারি। তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার আগেই তাকে বললাম যে, সেই বাড়িটাতে ঢোকার ব্যাপারে কিছু অসুবিধা দেখা দিতে পারে বলে আমার ভয় হচ্ছে। তার উত্তরে তিনি বললেন, সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মঁসিয়ে মেলার্ড-এর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলে, কিম্বা কোন পরিচয়-পত্র সঙ্গে না থাকলে সেখানে ঢুকতে অসুবিধা তো হতেই পারে, কারণ এই সব বেসরকারী পাগলা-গারদের আইন-কানুন সরকারী হাসপাতালের আইনের চাইতে অনেক বেশী কড়া। সেই সঙ্গে তিনি আরও বললেন, মেলার্ডের সঙ্গে তার পরিচয় আছে, আর তিনি সেখানকার ফটক পর্যন্ত আমার সঙ্গে গিয়ে তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিতে রাজী আছেন; কিন্তু উন্মাদ রোগের ব্যাপারে ব্যক্তিগত ভয়ের দরুন তিনি সে বাড়িতে ঢুকবেন না।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বড় রাস্তা থেকে মোড় ঘুরে একটা পায়ে-চলা পথ ধরে চলতে চলতে আধা ঘণ্টার মধ্যেই পর্বত সানুদেশের একটা গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাইল দুয়েক চলার পরেই অদূরে ''মাইসঁ দ' সাঁতে'' পাগলা গারদ আমাদের দৃষ্টিগোচর হল। একটা অদ্ভুত পল্লী-ভবন—ভগ্নপ্রায়, বহু বছরের অবহেলায় বাসের অযোগ্য। বাড়িটার চেহারা দেখেই ভয়ে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরলাম, ভাবলাম ফিরে যাই। অবশ্য পরমুহূর্তেই নিজের এই দুর্বলতায় নিজেই লজ্জাবোধ করলাম। দুজনই এগিয়ে চললাম।

ফটকের কাছে পৌঁছেই দেখলাম সেটা ঈষৎ খোলা, আর একটি লোক সেই খোলা-পথে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে। পরক্ষণেই সেই লোকটি এগিয়ে এসে আমার বন্ধুর নাম ধরে ডেকে সমাদরে তার সঙ্গে করমর্দন করে তাকে ঘোড়া থেকে নামতে অনুরোধ করল। লোকটি মঁসিয় মেলার্ড স্বয়ং। সৌম্য, সুদৃশ্য চেহারার সেকেলে ভদ্রলোক,

আচার-আচরণে রুচিবান, গম্ভীর, মর্যাদাসম্পন্ন, কর্তৃত্বপরায়ণ।

বন্ধুটি আমার পরিচয় দিয়ে তাকে আমার মনোবাসনার কথা জানালেন। মঁসিয়ে মেলার্ড ভালভাবে আমার দেখাশোনা করবেন এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে তবে তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আর কোনদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

তিনি চলে গেলে সুপারিন্টেন্ডেণ্ট আমাকে নিয়ে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট বৈঠকখানায় ঢুকলেন। সেখানে সুরুচির পরিচায়ক অন্য অনেক কিছুর মধ্যে ছিল অনেক বই, ছবি, ফুলভর্তি ফুলদানি ও বাদ্যযন্ত্র। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। একটি অতি সুন্দরী যুবতী পিয়ানোতে বসে বেলিনির একটা গান গাইছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই সে গান থামিয়ে আমাকে সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল। তার কণ্ঠস্বর চাপা, চালচলনেও একটা চাপা ভাব। আমারও মনে হল, তার সারা মুখে বুঝি দুঃখের ছায়া পড়েছে। তার পরিধানে শোকের পোশাক; তাকে দেখে শ্রদ্ধা, আগ্রহ, ও প্রশংসার একটা মিশ্র অনুভূতি আমার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল।

প্যারিসে থাকতেই আমি শুনেছিলাম মঁসিয় মেলার্ডের এই প্রতিষ্ঠানে "প্রশমন পদ্ধতি"র সাহায্যেই চিকিৎসা করা হয়—কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা নেই—ঘরে বন্ধ করে রাখার ঘটনাও কদাচিৎ ঘটে—গোপনে নজর রেখে রোগীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দেওয়া হয়,—আর সুস্থ মানুষের মত পোশাকই তাদের পরানো হয়।

এই কথাগুলি মনে রেখেই আমি বেশ সতর্ক হয়ে যুবতীটির সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম; কারণ সে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত ছিলাম না; আসলে তার দুই চোখে এমন একটা অশান্ত উজ্জ্বলতা ছিল যা দেখে আমি প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম যে তার মাথার ঠিক নেই। অতএব মোটামুটিভাবে সাধারণ বিষয় নিয়েই আমি কথা বলতে লাগলাম। সেও বেশ সুস্থ মানুষের মতই সব কথার জবাব দিল। কিন্তু বিকৃত মস্তিষ্কের তত্ত্বগত দিক সম্পর্কে দীর্ঘ পরিচয়ের দরুন সুস্থ মস্তিষ্কের এই সব প্রমাণের উপর আমার খুব বেশী ভরসা ছিল না; অতএব যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই তার সঙ্গে আলাপ করলাম।

ইতিমধ্যে তকমাধারী একটি পরিচায়ক ফল, মদ, অন্যান্য খাবার জিনিসে ভর্তি একটি ট্রে এনে হাজির করল। আমি তার থেকে কিছু তুলে নিলাম। তারপরেই যুবতীটি ঘর থেকে চলে গেল। তখনই আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে গৃহকর্তার দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, "না, না,—ও আমার পরিবারের একজন—আমার ভাই-ঝি; খুব গুণী মেয়ে।"

আমি বললাম, "আমার সন্দেহের জন্য হাজার বার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখানে আপনার পরিচালনা ব্যবস্থার খুব সুনাম প্যারিসে বসেই শুনেছি। তাই আমি ভেবেছিলাম হয়তো—বুঝতেই তো পারছেন—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ—আর বলতে হবে না—বরং যে প্রশংসনীয় বিবেচনার পরিচয় আপনি

দিয়েছেন তাতে আপনাকেই আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। যুবকদের মধ্যে এতটা সুবিবেচনা বড় একটা দেখা যায় না ; আমাদের দর্শকদের চিন্তাহীনতার ফলে একাধিক অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতেও তো দেখেছি। আমার পূর্বেকার পদ্ধতি যখন প্রচলিত ছিল এবং রোগীদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতাম, তখন এই আশ্রম দেখতে যারা আসতেন তাদের কিছু লোকের অপব্যবহারের ফলে প্রায়ই রোগীরা ভয়ংকরভাবে উত্তেজিত হয়ে পড়ত। তাই তো বাধ্য হয়ে এখানে প্রবেশের ব্যাপারে যথেষ্ট কড়াকড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে ; যাদের বিবেচনার উপর ভরসা করতে পারি না তাদের এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।"

"আপনার পূর্বেকার পদ্ধতি যখন প্রচলিত ছিল।" কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে আমি শুধালাম, "তাহলে কি আপনি বলতে চান যে "প্রশমন পদ্ধতি" টা এখন আর চালু নেই ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "বেশ কয়েক সপ্তাহ হল সে পদ্ধতিটাকে আমরা চিরদিনের মত বাতিল করেছি।"

"সত্যি ! আপনি আমাকে অবাক করলেন !"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "কি জানেন স্যার, পুরনো পদ্ধতিতে ফিরে যাওয়াটা আমাদের কাছে একান্ত দরকারী বলে মনে হয়েছে। প্রশমন পদ্ধতির বিপদগুলি সর্বকালেই ছিল ; আর তার সুবিধাগুলির কথা বড় বেশী করেই বলা হত। আমি বিশ্বাস করি স্যার, আমার এই আশ্রমে সে পদ্ধতির পরীক্ষার যথেষ্ট সুযোগ আমরা দিয়েছি। মানবিকতাবোধপ্রসূত সব কিছুই আমরা করেছি। কিছুদিন আগে এলে আপনিও সেটা নিজের চোখেই দেখতে পেতেন এবং বিচার করতে পারতেন। আমার ধারণা, প্রশমন পদ্ধতির সব খুঁটিনাটি বিষয়ই অবগত আছেন।"

"সব নয়। আমি যা কিছু শুনেছি সবই তৃতীয় পক্ষ বা চতুর্থ পক্ষের মুখ থেকে।"

"মোটামুটিভাবে সে পদ্ধতির কথা আপনাকে বলছি। রোগীর পাগলামীতে সায় দিয়েই আমরা তার চিকিৎসা করতাম। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে অনেকে আসত যারা নিজেদের মুরগির বাচ্চা মনে করত। আমাদের চিকিৎসাই ছিল তাকে পুরোপুরি মুরগির বাচ্চা বলে ধরে নেওয়া। যেমন এক সপ্তাহ ধরে আমরা তাকে মুরগির খাদ্য ছাড়া আর কিছুই খেতে দিতাম না। এই ভাবে কিছু শস্য-কণা ও কাঁকর দিয়ে আমরা বিস্ময়কর সুফল পেয়েছি।"

"কিন্তু এই কি সব ?"

"মোটেই না। সহজ সরল আমোদ-প্রমোদ, যেমন গান-বাজনা, নাচ, শারীরিক কলাকৌশল, তাসখেলা, কতকগুলি বিশেষ ধরনের বই—এই সবের উপর আমরা খুব নির্ভর করতাম। সকলকেই সাধারণ রোগী হিসাবে দেখতাম, কখনও "পাগল" শব্দটাই ব্যবহার করা হত না। আমাদের চিকিৎসার একটা বড় কথা ছিল—এক পাগলকে দিয়ে অপর পাগলকে পাহারা দেওয়ানো। একটি পাগলের বিচার বিবেচনার উপর ভরসা করা মানেই তার দেহ ও মনকে জয় করা। এ ভাবে চলার ফলে অনেক-

গুলি পাহারার লোক রাখার খরচও বেঁচে যেত।”

“কোনরকম শাস্তিই আপনারা দিতেন না ?”

“একেবারে না।”

“রোগীদের ঘরে বন্দী করে রাখতেন না ?”

“কদাচিৎ রাখতাম। মাঝে মাঝে কারও পাগলামী যখন চরমে উঠত, রোগী যখন অতিমাত্রায় বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ত, তখনই তাকে গুপ্ত কক্ষে পাঠান হত অন্য রোগীর ভালর জন্য, আর দরকার হলে সেখান থেকেই তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হত কোন সরকারী হাসপাতালে।”

“আর এখন আপনারা এ সবই বদলে ফেলেছেন—আপনারা কি মনে করেন যে সেটা ভালর জন্যই করেছেন ?’

“নিশ্চয়। আগেকার পদ্ধতির অনেক অসুবিধা ছিল, কিছু বিপদও ছিল। সুখের কথা এই যে এখন ফ্রান্সের সব উন্মাদ আশ্রমেই সে পদ্ধতিকে বাতিল করা হয়েছে।”

আমি বললাম, “আপনার কথা শুনে আমি কিন্তু খুব অবাক হচ্ছি; কারণ আমার ধারণা ছিল এই মুহূর্তে দেশের কোথাও পাগলামীর চিকিৎসার অন্য কোন পদ্ধতি চালু নেই।”

গৃহকর্তা উত্তরে বললেন, “হে বন্ধু, আপনি এখনও যুবক, কিন্তু এমন দিন আসবে যখন অপরের গাল-গল্পে বিশ্বাস না করে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আজকের পৃথিবীর কোথায় কি ঘটছে। শোনা কথাকে মোটেই বিশ্বাস করবেন না; যা চোখে দেখবেন তারও মাত্র অর্ধেক বিশ্বাস করবেন। এখন স্পষ্টই বুঝতে পারছি যে আমাদের উন্মাদ আশ্রম সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা নিয়ে আপনি এসেছেন। আপাতত আহারাদি করে দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি দূর করুন, তারপর গোটা আশ্রম আপনাকে ঘুরিয়ে দেখাব। সেখানে এমন একটা পদ্ধতি আপনাকে দেখাতে পারব যেটা আমার মতে, এবং অন্য যারাই এর কার্যকারিতা দেখেছেন তাদের প্রত্যেকেরই মতে আজ পর্যন্ত উদ্ভাবিত সব পদ্ধতির চাইতে অধিকতর কার্যকরী।”

আমি জানতে চাইলাম, “এটা কি আপনার নিজের উদ্ভাবন ?—আপনার নিজের আবিষ্কার ?”

তিনি উত্তর দিলেন, “স্বীকার করছি সত্যি তাই—অন্তত অনেকাংশে তো বটেই; আর এটা স্বীকার করতে আমি গর্ববোধ করি।”

এই ভাবে একটি বা দুটি ঘণ্টা ধরে আমি মঁসিয়ে মেলার্ডের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম, আর সেই ফাঁকে তিনি দেখালেন সেখানকার বাগান ও কাঁচের ঘর।

তারপর তিনি বললেন, “ঠিক এখনই আপনাকে রোগীদের দেখাতে পারছি না। আগে ডিনার সারা হোক, গায়ে জোর করুন, তারপর সে সব হবে।”

ডিনারের ডাক পড়ল ছ’টার সময়; আমাকে সঙ্গে নিয়ে গৃহস্বামী একটা বড় ঘরে ঢুকলেন; সেখানে তখন আরও অনেকে হাজির—মোট পঁচিশ-ত্রিশ জন হবে। দেখে মনেহল তারা সকলেই বড় ঘরের মানুষ। খেয়াল করে দেখলাম, অতিথিদের অন্তত

দুই-তৃতীয়াংশই মহিলা ; তাদের মধ্যে অনেকের বেশভূষাই এমন যাকে আজকের প্যারিসের লোকরা কোনমতেই রুচিসম্মত বলবে না। যেমন, সত্তর বছরের কম বয়স নয় এমন অনেক মহিলারই গায়ে প্রচুর গয়না—আংটি, ব্রেস্‌লেট, মাকড়ি সব, আর সকলেরই বুক ও বাহু বে-আব্রু রকমের খোলা। কারও জামাই ঠিক মাপমত তৈরী নয়। এক কথায়, সকলেরই পোশাক-পরিচ্ছদ কিছুটা অদ্ভুত ধরনের।

খাবার ঘরটাও যথেষ্ট আরামদায়ক এবং বড় মাপের হলেও কেমন যেন ছিমছাম নয়। যেমন, মেঝেতে কার্পেট নেই ; অবশ্য ফ্রান্সে কার্পেটের চলনটা কম। জানালায় পর্দা নেই ; শার্সিগুলো লোহার হুড়কো দিয়ে শক্ত করে আঁটা। মোট জানালার সংখ্যা দশটির কম নয়।

টেবিলগুলো বেশ ভাল রকমের সাজানো। প্রচুর প্লেট, অধিকতর প্রচুর খাদ্য-সামগ্রিতে ঠাসা। সে প্রাচুর্য ভব্যতাবিবর্জিত। জীবনে কখনও এত ব্যয়বাহুল্য ও অপচয় আমি দেখি নি। ব্যবস্থাপনাতেও কোনরকম সুরুচির পরিচয় নেই। আমার চোখ মৃদু আলোতেই অভ্যস্ত, কিন্তু এখানকার অসংখ্য মোমবাতি ও ঝাড়-লণ্ঠনের উজ্জ্বলতায় আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। কিছু পরিচারক কাজকর্মে ব্যস্ত ; আর এক কোণে একটা টেবিলে বসে সাত-আটটি লোক নানারকম বাদ্যযন্ত্রে মাঝে মাঝেই যে উৎকট সুর-লহরী সৃষ্টি করছে তাতে একমাত্র আমি ছাড়া অন্য সকলেই চিত্ত-বিনোদনের যথেষ্ট খোরাক পেয়েছে বলে মনে হল।

শান্তভাবে গৃহস্বামীর ডান দিকে আসন গ্রহণ করলাম। বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল ; তাই খাবারের যথোচিত সদ্ব্যবহার করলাম। ইতিমধ্যে সকলের আলাপচারি বেশ জমে উঠল। মহিলারাই প্রধান বক্তা। অচিরেই বুঝতে পারলাম, সমবেত প্রায় সকলেই উচ্চশিক্ষিত ; গৃহস্বামী নিজেও চুটকি সরস গল্পের একজন রাজাবিশেষ। তিনি প্রধানত "মাইসঁ দ সাঁতে"-র সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসাবেই কথা বললেন ; আমি আরও অবাক হলাম যে সকলেরই কথার মূল বিষয় পাগলামি। সকলেই বললেন, রোগীদের নানারকম খেয়ালের মজাদার সব গল্প।

আমার ডান দিকে বসেছিলেন এক পেট-মোটা ছোটখাট ভদ্রলোক। তিনি বলে উঠলেন, "এক সময় আমাদের এখানে একজন ছিল যে নিজেকে মনে করত একটা চায়ের পাত্র। এই অদ্ভুত কল্পনাটা যে কেমন করে সব পাগলের মাথায়ই বাসা বাঁধে সেটা কি খুবই আশ্চর্য নয়? সারা ফ্রান্সে এমন একটি পাগলা গারদও নেই যেখানে এমন একটি মানব চা-পাত্র পাওয়া না যাবে। আমাদের ভদ্রলোকটি ছিল একটি ব্রিটানিয়া-মার্কা চা-পাত্র ; প্রতিদিন সকালে সে হরিণের চামড়া ও সাদা রং দিয়ে নিজেকে সযত্নে পালিশ করত।"

বিপরীত দিকে বসা ঢ্যাঙা লোকটি বলে উঠলেন, "এই তো কিছুদিন আগেই এখানে একটি লোক ছিল যে নিজেকে গাধা মনে করত—অবশ্য রূপক অর্থে ধরলে আপনারাও নিশ্চয় বলবেন যে সে তো সত্যি কথাই বলত। লোকটা খুবই বেয়াড়া ছিল ; তাকে বাগে রাখতে আমাদের হিমসিম খেতে হত। অনেক দিন যাবৎ সে ঘাস ছাড়া অন্য কিছুই খেত না ; কিন্তু আমরাও তাকে ওই বস্তু ছাড়া অন্য কিছু খেতে না দেওয়ার

www.boighar.blogspot.com

ফলে তার সেই গাধা-রোগ সেরে গিয়েছিল। অবশ্য সেই সময় সে অনবরত লাথি চালাত —এইভাবে—এইভাবে—"

তার ঠিক পাশেই উপবিষ্ট এক বৃদ্ধ মহিলা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "মিঃ ডি কক, দয়া করে ভাল ব্যবহার করতে শিখুন। আপনার পাকে সংযত করুন। আমার ব্রোকেডটাই আপনি মাটি করে দিলেন। আচ্ছা, মুখের কথাকে এভাবে বাস্তব-ভঙ্গীতে দেখানোটা কি একান্তই দরকার? এ সব ছাড়াই আপনার কথা সকলে বুঝতে পারবেন। আমি বলছি, সেই হতভাগ্য লোকটি নিজেকে যে রকম গাধা মনে করত আপনি তো তার চাইতেও বড় গাধা। অবশ্য আপনার অভিনয় খুবই স্বাভাবিক হয়েছে।"

মঁসিয় ডি কক উত্তরে বললেন, "মিলে পারদোঁ। মাদময়জেল! এক হাজার বার ক্ষমা চাই। আপনাকে আঘাত দেবার বাসনা আমার ছিল না। মাদময়জেল লাপ্লাস—আপনার সঙ্গে মদে চুমুক দিতে পারলে মঁসিয় ডি কক নিজেকে সম্মানিত মনে করবে।"

তখন মঁসিয় ডি কক নীচু হয়ে মাদময়জেল লাপ্লাসের সঙ্গে করমর্দন করে দুজন এক সঙ্গে মদ্যপান করলেন।

এবার মঁসিয় মেলার্ড আমাকে সম্বোধন করে বললেন, "মন আমি, অনুমতি করেন তো এই বাছুরের মাংসের একটা টুকরো আপনাকে পরিবেশন করি—এটা আপনার খুবই ভাল লাগবে।"

ঠিক তখনই তিনটি জোয়ান পরিবেশক গোটা সেদ্ধ একটা ছোট বাছুরকে হাঁটুর উপর বসানো অবস্থায় একটা বড় থালায়-করে এনে টেবিলে রাখল।

আমি বললাম, "না, না, আপনাকে ধন্যবাদ; সত্যি কথা বলতে কি, বাছুরের মাংসের প্রতি আমার কোনরকম পক্ষপাতিত্ব নেই। আমি বরং ওটার বদলে খরগোসের কিছুটা নিচ্ছি।"

গৃহকর্তা চেঁচিয়ে বললেন, "পিয়ের, এই ভদ্রলোকের প্লেটটা পাল্টে দাও; ওকে বরং এই খরগোসের 'অ-চাৎ' থেকে কিছুটা কেটে দাও।"

"এটা কি?" আমি বললাম।

"এটা খরগোসের 'অ-চাৎ'।"

"ধন্যবাদ। ওটাও চাই না। আমি নিজেই কিছুটা শুয়োর-মাংস নিয়ে নেব।"

আমি ভাবতে লাগলাম, এ অঞ্চলের লোকদের সঙ্গে টেবিলে বসে অন্যরা যে কি খায় কে জানে। আমার তো এর কোনটাই চাই না।

টেবিলের পায়ের দিক থেকে একটি কদাকার দেখতে লোক পূর্ব-আলোচনার সূত্র ধরে বললেন, "এক সময় এখানে একটি রোগী ছিল যে নিজেকে ভাবত কর্ডোভা পনির; সব সময়ই হাতে একটা ছুরি নিয়ে ঘুরত, আর বন্ধুদের দেখলেই তার পা থেকে খানিকটা কেটে নিতে অনুরোধ করত।"

আর একজন বলে উঠলেন, "সে তো একটা মহামূর্খই ছিল; কিন্তু আমি যার কথা বলছি তার তুলনা মেলা ভার। সে লোকটি নিজেকে ভাবত এক বোতল শ্যাম্পেন, আর সব সময় এই রকমভাবে হুস্—হুস্—ফস্—ফস্ করতে করতে পথ চলত।"

এখানে বক্তা করলেন কি—ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে বাঁ গালের উপর রেখে

কর্ক খোলার মত শব্দ করে আঙুলটাকে তুলে নিলেন, আর তারপরেই দাঁতের উপরে জিভটাকে ঘসে ঘসে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে শ্যাম্পেনের বোতল থেকে ফেনা উদ্গীরণের নকল করে কয়েক মিনিটব্যাপী একটা হুস্—হুস্ ফস্—ফস্ আওয়াজ করতে লাগলেন। পরিষ্কার বুঝলাম, লোকটির এই আচরণ মঁসিয় মেলার্ডের ভাল লাগে নি; তিনি কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। আলোচনার সূত্র ধরে এবার কথা বললেন মস্ত বড় পরচুলা মাথায় একটি শুট্‌কো বেটে লোক।

তিনি বললেন, “আর একটি মুখ্খু ছিল যে নিজেকে ভাবত ব্যাং; অবশ্য সে দেখতেও অনেকটা ব্যাং-এর মতই ছিল। আহা, তাকে যদি আপনি দেখতেন স্যার,”—কথাটা আমাকে বলা হল—“তাহলে আপনি তাজ্জব হয়ে যেতেন। স্যার, সে লোকটি যে আসলে ব্যাং ছিল সেটা খুবই দুঃখের কথা। সে এই ভাবে ডাকত—গ্যাঙড়-গ্যাং—গ্যাঙড়-গ্যাং। আর সে যখন দু'এক বোতল মদ নিয়ে দুই কনুইতে ভর দিয়ে এইভাবে টেবিলের উপর বসত—এইভাবে মুখটা হাঁ করত, এইভাবে চোখ ঘোরাত, এইভাবে অতিদ্রুত চোখ পিট্‌-পিট্ করত, তখন—আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলছি স্যার—তখন লোকটির প্রতিভা দেখে আপনিও মুগ্ধ হয়ে যেতেন।”

“সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই,” আমি বললাম।

কে যেন বলে উঠল “আর ছিল পেতিত গেলার্ড যে নিজেকে মনে করত একটিপ নস্যি; তার মনে বড় দুঃখ ছিল নিজের একটা আঙুলের মাঝখানে সে নিজেকে ধরতে পারত না বলে।”

“আর ছিল জুলেস দেসুলিয়েরেস, যার মত প্রতিভা সত্যি হয় না; সে নিজেই একটা কুমড়ো এই ধারণাতেই সে বুঁদ হয়ে থাকত। তাকে কেটে টুকরো টুকরো করার জন্য সে রাঁধুনিকে কত জ্বালাতন করত, কিন্তু রাঁধুনি ঘৃণাভরে তাকে প্রত্যাখ্যান করত।”

“আপনি আমাকে অবাক করে দিলেন,” আমি বললাম; তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মঁসিয় মেলার্ডের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন, “হা! হা! হা!—হে! হে! হে!—হি! হি! হি!—হো! হো! হো!—হু! হু! হু!—খুব ভাল কথা! আপনি অবাক হবেন না মন আমি; আমাদের বন্ধুটি রসিক মানুষ—একটি ভাঁড়—তার কথাগুলিকে আক্ষরিক অর্থে নেবেন না।”

দলের অন্য একজন বললেন, “আর ছিল বুফোঁ লি গ্রাঁদ—এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ভালবাসার ফলেই তার মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল—সে কল্পনা করত তার দুটো মাথা আছে। তার মতে, একটি মাথা সিসেরোর; অপর মাথাটি মিশ্র—কপালের উপর থেকে মুখ পর্যন্ত ডেমোস্থিনিসের মাথা, আর মুখ থেকে থুতনি পর্যন্ত লর্ড ব্রুহামের মাথা। তার ধারণাটা যে ভুল ছিল সেটা অসম্ভব নয়; কিন্তু সে আপনাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ত যে তার ধারণাটাই ঠিক; কারণ সে ছিল একজন তুখোর বক্তা। যেমন, বক্তৃতা দিতে দিতে সে এইভাবে খাবার টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে পড়ত, আর—আর—’

এখানে বক্তার পাশের বন্ধুটি তার কাঁধে হাত রেখে কানে কানে কি যেন বললেন;

সঙ্গে সঙ্গে তিনি কথা বন্ধ করে ধপ্‌ করে আসনে বসে পড়লেন।

তখনই সেই বন্ধুটি বলতে শুরু করলেন, "আর ছিল বুলার্ড, একটা লাট্টু। তাকে লাট্টু বললাম, কারণ তার ছিল ঘোরা-রোগ। তাকে ঘুরতে দেখলে আপনি হো—হো করে হেসে উঠতেন। একটা গোড়ালির উপর ভর দিয়ে সে এক ঘণ্টা ঘুরতে পারত এই ভাবে—অত—"

এইখানে যে বন্ধুটি একটু আগে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলে তাকে বাধা দিয়েছিলেন তিনিও তারই মত খেল্‌ দেখাতে শুরু করলেন।

একটি বৃদ্ধ মহিলা এবার তারস্বরে চীৎকার করে বলে উঠলেন, "আপনার সেই মঁসিয় বুলার্ড তো ছিলেন একটা পাগল, খুবই বোকা পাগল ; কিন্তু আমি আপনাকে শুধাই কে কবে মানুষ লাট্টুর কথা শুনেছে ? ব্যাপারটাই তো অবাস্তব। আপনি তো জানেন, মাদাম জয়েউস ছিলেন তার চাইতে সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ। তারও একটা উদ্ভট ধারণা ছিল, কিন্তু সেটা ছিল সহজবোধ্য। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, একটা দুর্ঘটনার ফলে তিনি একটা বাচ্চা মোরগে পরিণত হয়েছিলেন ; কিন্তু তার আচরণ ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ ; তিনি পাখা ঝাপটাতেন প্রবল বেগে—এইভাবে—এইভাবে—এইভাবে—আর, তার ডাক ছিল কী মিষ্টি ! কক—এ-ডুডুল-ডু ! কক-এ-ডুডুল-ডু ! কক-এ-ডুডুল-ডি-ডু-ডু-ডু-উ-উ-উ !"

এবার আমাদের গৃহস্বামী খুব রেগে গিয়ে বললেন, "মাদাম জয়েয়ুস, আপনার, আচরণ শুধরে নিলেই আমি খুশি হব। হয় একটি মহিলার উপযুক্ত আচরণ করুন নয় তো এখনই টেবিল থেকে উঠে যান—আপনার যেটা খুশি করতে পারেন।"

মহিলাটি (তাকে মাদাম জয়েউস বলে সম্বোধন করায় আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম) ভুরু পর্যন্ত লাল হয়ে উঠলেন ; মনে হল এভাবে তিরস্কৃত হওয়ায় তিনি খুব মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন। তিনি মাথা নীচু করলেন, একটা কথাও বললেন না। কিন্তু অপর একটি তরুণী আলোচনার সূত্রটি ধরে নিল। আমার পূর্ব-পরিচিত সেই সুন্দরী মেয়েটি।

সে সোচ্চারে বলে উঠল, "ওঃ, মাদাম জয়েয়ুস একটি বোকা। কিন্তু ইউজেনি সাল্‌সাফেত্তের বক্তব্যের মধ্যে সত্যি কিছু সারবত্তা ছিল। সে ছিল খুব সুন্দরী আর অতি-বিনয়ী এক তরুণী ; সে মনে করত আমরা যে ভাবে পোশাক পরি সেটা অশোভন, আর তাই সে সব সময় পোশাক পরতে চাইত নিজেকে পোশাকের ভিতরে না রেখে তার বাইরে রেখে। কাজটা তো খুব সহজেই করা যায়। আপনাদের কেবল এই রকম করতে হবে—তারপর এই রকম—এই রকম—এই রকম—আর তারপর—"

"হা ঈশ্বর ! মাদ্‌ময়জেল সাল্‌সাফেত্তে !" একডজন কণ্ঠস্বর একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল। "আপনি কী করছেন ? থামুন !—যথেষ্ট হয়েছে !—আমরা সব বুঝতে পেরেছি !—থামুন ! থামুন !" কথা শেষ হবার আগেই কয়েকজন লোক আসন থেকে লাফ দিয়ে উঠে মাদ্‌ময়জেল সাল্‌সাফেত্তে মেডিসির ভেনাস-মূর্তির সমপর্যায়ে পৌঁছবার আগেই তাকে থামিয়ে দিল। ওদিকে ঘরের অন্য অনেকের আর্তনাদ ও চীৎকারে জায়গাটা যেন একটা নরক হয়ে উঠল।

www.boierpathsala.blogspot.com

এত সব চীৎকার-চেঁচামেচিতে আমার স্নায়ুর উপর খুবই চাপ পড়ল ; অন্য সকলের জন্য আমার করুণা হল তারও বেশী। এতগুলি বিবেচক মানুষকে এত বেশী ভয়ার্ত হতে আমি কখনও দেখি নি। সকলেই মরার মত সাদা হয়ে গেছে ; আসনে কুঁকড়ে বসে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে। ধীরে ধীরে হৈ-হট্টগোল থেমে গেল। সকলেই আবার আগেকার মত সহজ হয়ে উঠল। তখন আমি সাহস করে এই গোলযোগের কারণ জানতে চাইলাম।

মঁসিয় মেলার্ড বললেন, "নিছক বাগাটেলি খেলা আর কি! আমরা এতে অভ্যস্ত, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাই না। পাগলেরা মাঝে মাঝেই দল বেঁধে এ রকম হুজ্জুত বাধায় ; রাতের বেলায় কুকুরের ডাকের মতই একজন আর একজনকে ক্ষেপিয়ে তোলে ; তার থেকে আর একজন ; এই রকম আর কি। অবশ্য মাঝে মাঝে এই চীৎকারের কনসার্টের পরে দেখা দেয় সমবেতভাবে এখান থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা ; তখন অবশ্য কিছুটা বিপদের আশংকা দেখা দেয়।"

"আপনার হেপাজতে কতজন এখানে আছেন?"

"বর্তমানে জন দশেকের বেশী নয়।"

"বেশীর ভাগই বোধ হয় মহিলা?"

"ওঃ, না—প্রত্যেকেই পুরুষ, শক্ত-সমর্থ মানুষ। আমি বলছি।"

"বটে! আমি জানতাম পাগলরা অধিকাংশই মেয়ে হয়।"

"সাধারণত তাই বটে, তবে সব সময় নয়। কিছুদিন আগে আমাদের এখানে প্রায় সাতাশটি রোগী ছিল ; তার মধ্যে আঠারো জনই ছিল স্ত্রীলোক ; কিন্তু ইদানীং কালে অবস্থা যে অনেক বদলেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, অনেক বদলেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন," যে ভদ্রলোক মাদময়জেল লাপ্লাসকে লাথি মেরেছিলেন তিনিই হঠাৎ কথাটা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেই একযোগে বলে উঠল, "হ্যাঁ, অনেক বদলেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছেন।"

খুব রেগে আমার গৃহকর্তা বললেন, "জিভ্‌টা টেনে ধরুন, আপনারা প্রত্যেকে!" মিনিটখানেক সকলেই চুপ। একেবারে মৃত্যু-নীরবতা। কিন্তু একটি মহিলা মঁসিয় মেলার্ডের নির্দেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন ; লম্বা জিভটাকে বের করে দুই হাতে সেটাকে টেনে ধরলেন।

আমি মঁসিয় মেলার্ডকে ফিস্‌ ফিস্‌ করে বললাম, "এই যে ভদ্রমহিলা যিনি এইমাত্র কথা বললেন এবং আমাদের কক-এ-ডুড্‌ল্‌-ডি-ডু শোনালেন, তিনি নিশ্চয়ই নিরীহ—একেবারে নিরীহ, কি বলেন?"

সবিস্ময়ে তিনি বলে উঠলেন, "নিরীহ! কেন? কেন? আপনি কি বলতে চান?"

আমার মাথাটা ছুঁয়ে বললাম, "খুবই সামান্য লেগেছে? ধরেই নিচ্ছি যে তিনি বিশেষ—মানে, বিপজ্জনকভাবে আহত হন নি, কি বলেন?"

"হা ঈশ্বর! এ সব কী ভাবছেন আপনি? এই মহিলা, আমার বিশেষ পুরনো মাদাম জয়েয়ুস আমার মতই সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ। অবশ্য ছোটখাট কিছু বাতিক

তার আছে—কিন্তু আপনি তো জানেন, সব বৃদ্ধ স্ত্রীলোক—অতি বৃদ্ধ স্ত্রীলোকই কম-বেশী বাতিকগ্রস্ত হয়ে থাকেন !"

আমি বললাম, "নিশ্চয়—নিশ্চয়—আর অন্য সব ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ—"

বাধা দিয়ে মঁসিয় গেলার্ড বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন, "আমার বন্ধু—আমার খুবই সৎ বন্ধু ও সহকারী ।"

"কী ? সকলেই ? এইসব মহিলা এবং অন্য সবাই ?"

তিনি বললেন, "নিশ্চয় ; মেয়েরা না হলে তো এসব কাজই চলে না ; তারাই তো পৃথিবীর সব সেরা পাগলের নার্স ; তাদের নিজস্ব কতকগুলি সুবিধা আছে যে তাদের উজ্জ্বল দুটি চোখ আশ্চর্য রকমের কাজ করে ; ঠিক যে রকম কাজ করে সাপের উপরে ; বুঝলেন তো ?"

আমি বললাম, "নিশ্চয়—নিশ্চয় ! তবে—তাদের ব্যবহারটা যেন একটু কেমনতর, তাই না ? কিছুটা অদ্ভুত—আপনি কি তা মনে করেন না ?"

"কেমনতর ? অদ্ভুত ? কেন ? আপনার তা মনে হচ্ছে কেন ? এই দক্ষিণের মানুষ আমরা খুব একটা সাবধানী নই—যেমন খুশি চলি-ফিরি—জীবনকে উপভোগ করি—এই আর কি ।"

আমি বললাম, "নিশ্চয়—নিশ্চয় । ভাল কথা মঁসিয়, বিখ্যাত প্রশমন পদ্ধতির পরিবর্তে যে পদ্ধতিটা আপনারা নিয়েছেন সেটা কি খুবই কঠোর ?"

"মোটেই না । অবশ্য আমাদের আটক রাখার ব্যবস্থাটা একটু কঠোর ; কিন্তু চিকিৎসাটা—ডাক্তারী চিকিৎসার কথাই বলছি—রোগীদের খুবই পছন্দসই ।"

"আর এই নতুন পদ্ধতিটা কি আপনার নিজের আবিষ্কার ?"

"পুরোপুরি নয় । এর কিছু অংশ অধ্যাপক টারের আবিষ্কার ; তার কথা আপনি নিশ্চয় শুনেছেন ; তাছাড়া, আমার পরিকল্পনার কিছু কিছু সংশোধন করা হয়েছে ; আমি সানন্দে স্বীকার করছি, সেগুলি করেছেন খ্যাতনামা ফেদার ; তার সঙ্গে তো আপনার পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ ।"

আমি জবাব দিলাম, "খুবই লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি, এই দুই ভদ্রলোকের নামও আমি আগে কখনও শুনি নি ।"

আমার গৃহকর্তা হঠাৎ চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে দুই হাত তুলে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, "হা ঈশ্বর ! নিশ্চয় আপনার কথাগুলি আমি ঠিকমত শুনতে পাই নি ! নিশ্চয়ই আপনিও বলতে চান নি যে পণ্ডিত ডাক্তার টার অথবা খ্যাতনামা অধ্যাপক ফেদারের কথা আপনি কখনও শোনেন নি ?"

আমি বললাম, "আমার এই অজ্ঞানতাকে স্বীকার করতে আমি বাধ্য ; কিন্তু সব কিছুর উপরে তো সত্যের আসন ; তাকে তো অক্ষুণ্ণ রাখতেই হবে । তথাপি, এই দুই অসাধারণ ব্যক্তির ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে পরিচয় না থাকার জন্য লজ্জায় আমি বুঝি মাটিতে মিশে যাচ্ছি । অবিলম্বেই তাদের পুঁথিগুলি সংগ্রহ করে বিশেষ যত্নসহকারে পড়ে ফেলব । মঁসিয় মেলার্ড, সত্যি—আমি স্বীকার করতে বাধ্য—আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিয়েছেন ।"

তিনি দয়াপরবশ হয়ে বললেন, “আর ও-কথা বলবেন না বন্ধু। আসুন এক গ্লাস “সতার্গে” পান করা যাক।”

পান শেষ হল। পুরো দলটাই আমাদের অনুসরণ করল। তারা গল্প-গুজব করল—তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল—তারা হাসল—হাজার রকম উদ্ভট কান্ড-কারখানা করল—বেহালা আর্তস্বরে বাজল—ঢাক দমাদ্দম বাজল—শিঙা বাজল ষণ্ড-গর্জনে—মদের পিপে যত খালি হতে লাগল ততই অবস্থা শোচনীয়তর হল—আর একসময় নরক গুলজার হল। এদিকে মঁসিয় মেলার্ড ও আমি দুই বোতল মদ সামনে নিয়ে তারস্বরে কথাবার্তা চালিয়ে গেলাম। সাধারণ স্বরগ্রামে কথা বললে তা তো শোনাই যাবে না, ঠিক যে রকম শোনা যায় না নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নীচ থেকে একটা মাছের শব্দ।

তার কানের কাছে মুখ নিয়ে আমি চীৎকার করে বললাম, “আচ্ছা স্যার, ডিনারের আগে আপনি প্রশমন পদ্ধতির বিপদের কথা বলছিলেন। সেটা কি রকম?”

তিনি জবাব দিলেন, “হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বেশ বড় ধরনের বিপদ দেখা দিত। পাগলের পাগলামির তো কোন লেখা-জোখা থাকে না; তাই আমার মতে ডাক্তার টার ও অধ্যাপক ফেদারের মতেও তাদের বিনা পাহারায় স্বাধীনভাবে চলতে দেওয়াটা কখনই নিরাপদ নয়। একটি পাগলকে তখনকার মত “প্রশমিত” করা গেলেও শেষ পর্যন্ত সে ভয়ংকর গোলমেলে হয়ে ওঠে। তার চালাকিও তো প্রবাদ স্বরূপ; তার তো কোন শেষ নেই। সাধারণত সে নকল সুস্থতার ভান করেই চলে। কাজেই একটি পাগলকে যখন পুরোপুরি সুস্থ বলে মনে হয়, আসলে তখনই তাকে বস্তাবন্দী করা উচিত।”

“আচ্ছা, এই আশ্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা থেকে বলুন তো একটি পাগলকে স্বাধীনতা দেওয়া যে বিপজ্জনক সে কথা মনে করবার মত কোন বাস্তব ঘটনা কি কখনও ঘটেছে?”

“এখানে?—আমার অভিজ্ঞতায়?—সে কি, আমি তো বলবই—হ্যাঁ। ধরুন ঃ—খুব বেশীদিন আগের কথা নয়, এই আশ্রমেই একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। আপনি জানেন, তখন এখানে প্রশমন পদ্ধতি চালু ছিল, আর রোগীদের ছেড়েই রাখা হত। একদিন সকালে দেখা গেল এখানকার রক্ষীদেরই হাত-পা বেঁধে পাগলদের থাকার কুঠুরিগুলিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, যেন তারাই পাগল, আর সে কাজটা সেরে পাগলরাই রক্ষীদের জায়গাগুলি দখল করে বসেছে।”

“কী বলছেন আপনি! এ রকম উদ্ভট কথা তো আমি জীবনে শুনি নি!”

“আসল ঘটনা—এ সবই ছিল একটি বুদ্ধিভ্রষ্ট পাগলের কাণ্ড। যেমন করেই হোক তার মাথায় ঢুকেছিল যে সে নিজে এমন একটা শাসন-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে যার কথা আগে কখনও শোনাই যায় নি—মানে পাগলের শাসন আর কি। মনে হয় তার বাসনা হয়েছিল নিজের আবিষ্কারকে একবার পরীক্ষা করে দেখবে—আর তাই বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে যোগ দেবার জন্য সে অন্য সব রোগীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রাজী করেছিল।”

“আর তাতে সে সফলও হয়েছিল ?”

“তাতে আর সন্দেহ আছে। রক্ষী এবং রক্ষিত দু দলই অচিরে জায়গা বদল করে নিল। অবশ্য পুরোপুরি বদল নয়—কারণ পাগলরা ছাড়া পেয়ে গেল, আর রক্ষীরা বন্দী হয়ে থাকল তাদেরই কুঠুরিতে, আর তাদের চিকিৎসা শুরু হল অহেতুক কঠোরতার সঙ্গে।”

“কিন্তু আমার তো মনে হয় অচিরেই একটা প্রতিবিপ্লব দেখা দিয়েছিল। এ অবস্থা তো বেশীদিন চলতে পারে না। কাছেপিঠের গ্রামের লোকজন—এখানে যারা দর্শনার্থী হিসাবে আসেন—তারা নিশ্চয় এ নিয়ে হৈ-চৈ তুলেছিলেন।”

“এইখানেই আপনি ভুল করলেন। বিদ্রোহের পাণ্ডাটি ছিল অতিশয় ধূর্ত। সে ও পথেই হাঁটল না। কোন দর্শনার্থীকেই সে এখানে ঢুকতে দিত না। তবে একদিন তার ব্যতিক্রম ঘটল। একটি খুব বোকা-সোকা দেখতে ভদ্র যুবক এখানে এল; তার হাবভাব দেখে পাণ্ডাটির মনে হল তাকে ভয় করবার কোন কারণ নেই। সে তাকে ভিতরে ঢুকতে দিল—একটু বৈচিত্র্যের আশায়—তাকে নিয়ে একটু মজাও তো করা যাবে! আর তাকে নিয়ে প্রচুর মজা করার পরে তাকেও আশ্রম থেকে বের করে দিল।”

“তাহলে এই পাগলের রাজত্ব কতদিন চলেছিল ?”

“তা বেশ কিছুদিন—একমাস তো নিশ্চয়ই—সঠিক সময়টা বলতে পারব না। এদিকে পাগলরা বেশ মজাতেই দিন কাটাতে লাগল। নিজেদের নোংরা পোশাক ফেলে দিয়ে আমাদের পরিবারের লোকদের পোশাক ও অলংকারপত্র ইচ্ছামত ব্যবহার করতে লাগল। ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রচুর মদ জমা করে রাখা থাকত; আর পাগলরাও যদৃচ্ছা তার সদ্ব্যবহার করে চলল। তাদের দিন বেশ ভালই কাটতে লাগল।”

“আর চিকিৎসা—বিদ্রোহীদের পাণ্ডাটি কী ধরনের চিকিৎসা শুরু করেছিল ?”

“কেন ? আগেই তো বলেছি, পাগল হলেই যে তাকে বোকা হতে হবে এমন তো কোন কথা নেই; আর আমার সত্যিকার অভিমত, যে প্রচলিত চিকিৎসাকে সে বাতিল করে দিয়েছিল, তার নিজের চিকিৎসা তার চাইতে অনেক ভাল ছিল। সত্যি, খুবই চমৎকার চিকিৎসা-পদ্ধতি—সরল—পরিচ্ছন্ন—কোন ঝামেলা নেই—খুবই স্বাদু—খুবই—”

এই সময় গৃহকর্তার বক্তব্যে বাধা পড়ল আর এক প্রস্থ কলকণ্ঠের চীৎকারে—ঠিক আগেকার মত। অবশ্য, মনে হল এবার হট্টগোলকারীরা অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

“হা ঈশ্বর!” আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—“নির্ঘাৎ সব পাগল অবরোধ ভেঙে ফেলেছে।”

মঁসিয় মেলার্ড বড় বেশী বিবর্ণ হয়ে পড়লেন; বললেন, “সেই ভয় তো আমিও করছি।” তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড চীৎকার ও হু-হুংকার শোনা গেল জানালার একেবারে নীচে; আর পরমুহূর্তেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে বাইরের কিছু লোক ঘরের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। একটা বড় হাতুড়ি দিয়ে দরজায় ঘা মারছে, আর প্রচণ্ড জোরে জানালার শার্সি ধরে নাড়া দিচ্ছে।

শুরু হয়ে গেল ভয়ংকর গণ্ডগোলের এক দৃশ্য। আমাকে অবাক করে দিয়ে মঁসিয় মেলার্ড পাশ-দেরাজের নীচে লুকিয়ে পড়লেন। তার কাছ থেকে অধিকতর দৃঢ়তাই আমি আশা করেছিলাম। অর্কেস্ট্রা-বাদকের দল গত পনেরো মিনিট যাবৎ অত্যধিক নেশাগ্রস্ত হবার ফলে নিজেদের আসল কাজটাই ভুলে গিয়েছিল; এবার তারা সহসা একযোগে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, আর যার যার বাদ্য-যন্ত্র হাতে নিয়ে এক সুরে শুরু করে দিল "ইয়াংকি ডুড্‌ল"; বাজনা সঠিক সুরে না হলেও তাদের প্রচেষ্টা ছিল অতিমানবিক।

ইতিমধ্যে বড় খাবার টেবিলের বোতল ও গ্লাসের মধ্যে লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন সেই ভদ্রলোকটি যাকে এতক্ষণ অনেক কষ্টে লাফ দেওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। মোটামুটিভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই তিনি এমন একটি চমৎকার ভাষণ দিয়ে ফেললেন যা কেউই শুনতে পেল না। ঠিক সেই মুহূর্তে লাট্টুরোগগ্রস্ত লোকটি দুই বাহুকে শরীরের সঙ্গে সমকোণে দুই দিকে ছড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড বেগে এমনভাবে ঘরময় ঘুরতে লাগলেন যে যারা তার গতি-পথে এসে পড়ল তারাই ধাক্কা খেয়ে ধরাশায়ী হল। আবার ওদিকে শ্যাম্পেনের অবিশ্বাস্য হুস্‌-হুস্‌ ও ফস্‌-ফস্‌ শব্দ শুনে শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলাম, যে লোকটি ডিনারের সময় ঐ ভাল মদের বোতলের অনুকরণ করছিল তার মুখ থেকেই ওই শব্দটা আসছে। আর এ সব কিছুকে ছাপিয়ে শোনা যেতে লাগল একটা একটানা গাধার ডাক। আর আমার বৃদ্ধা বন্ধু মাদাম জয়েয়ুস? সে বেচারির জন্য আমার কান্না পেল—তিনি তো ভয়ংকরভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তার একমাত্র কাজ তখন ঘরের এক কোণে অগ্নিকুন্ডের পাশে দাঁড়িয়ে তারস্বরে একটানা গেয়ে যাওয়া একটিমাত্র গান—"কক্‌-এ-ডুড্‌ল্‌-ডি-ডু-উ-উ-হু!"

এবার নাটকের পরিণতি একেবারে চরমে উঠল। যেহেতু বাইরে জমায়েত হওয়া দলটাকে কেবলমাত্র লাফ-ঝাঁপ হৈ-হল্লা ও "কক-এ-ডুড্‌ল" গাওয়া ছাড়া আর কোন ভাবে বাধা দেবার চেষ্টাই করা হল না, তাই অচিরেই তারা ঘরের দশটি জানালা ভেঙে ফেলল। তারপর যা ঘটল সে দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না। অবাক বিস্ময়ে ও আতংকে হা করে আমি কেবল দেখলাম, হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, খামচা-খামচি, ও হৈ-হল্লা করতে করতে জানালার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে ছুটে এল একটা গোটা সৈন্যদল যার সৈনিকরা সব শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং, অথবা উত্তমাশা অন্তরীপের কালো বেবুন ছাড়া অন্য কিছু হতেই পারে না।

আমি স্বয়ং প্রচণ্ড পিটুনি খেয়ে একটা সোফার তলায় ঢুকে চুপ করে পড়ে রইলাম। প্রায় পনেরো মিনিট সেখানে শুয়ে থেকে কান পেতে শুনতে লাগলাম ঘরময় এক হট্টমালার নাটক—আর তারপর দেখলাম এই বিয়োগান্ত নাটকের এক সন্তোষজনক পরিণতি। মঁসিয় মেলার্ড এই বিদ্রোহের পাণ্ডাস্বরূপ যে পাগলটির কাহিনী আমাকে শোনালেন, মনে হল সেগুলি তার নিজেরই কাণ্ডকারখানা। এই ভদ্রলোক সত্যি দু'তিন বছর আগে এই প্রতিষ্ঠানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন; কিন্তু তারপর নিজেই পাগল হয়ে এখানে রোগী বনে যান। যে ভ্রমণসঙ্গীটি তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ব্যাপারটা জানতেন না। দশজন রক্ষীকে হঠাৎ কব্জা করে ফেলে প্রথমে তাদের

www.boighar.blogspot.com

সকলের গায়ে আলকাতরা ঢেলে দেওয়া হয় এবং তার পরে তাতে পাখির পালক আটকে দিয়ে দশজনকেই ভূগর্ভস্থ কুঠুরিতে বন্দী করে রাখা হয়। এইভাবে তাদের একমাসের বেশী সময় আটকে রাখা হয়। অবশ্য সেই সময় মঁসিয় মেলার্ড তাদের যথেষ্ট পরিমাণ আলকাতরা ও পালক তো সরবরাহ করেছিলেনই (সেটাই তো তার চিকিৎসা পদ্ধতি), উপরন্তু তাদের কিছু রুটি ও প্রচুর জলও দিয়েছিলেন। জলটা প্রতিদিনই পাম্প করে তাদের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হত। শেষ পর্যন্ত তাদেরই একজন নর্দমা দিয়ে পালিয়ে এসে বাকি সকলকে মুক্ত করে দেয়।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করে "প্রশমন পদ্ধতি"টিই পুনরায় সেই আশ্রমে প্রচলন করা হয়েছে; তবু মঁসিয় মেলার্ডের সঙ্গে আমি একমত না হয়ে পারি না যে তার নিজস্ব "পদ্ধতি"টিই ছিল একেবারে খাসা চিকিৎসা। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন, পদ্ধতিটি "সরল—পরিচ্ছন্ন—কোন ঝামেলা নেই—একেবারেই না।"

আর মাত্র একটি কথা আমি যোগ করতে চাই। ডাক্তার টার এবং অধ্যাপক ফেদার-এর বইগুলির খোঁজে আমি ইউরোপের সব লাইব্রেরিতে ঘুরেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বইও সংগ্রহ করতে পারি নি।

কিম্ভুত দেবদূত

(একটি উৎকট রচনা)

The Angel of the Odd

(An Extravagenza)

নভেম্বরের এক শীতার্ত অপরাহ্ন। সবেমাত্র পরিতোষ-সহকারে ডিনার সেরেছি ঃ ভোজ্যবস্তুর মধ্যে অন্যতম ছিল ত্রুফে (পেট-রোগাদের খাদ্য ছত্রাকের তরকারি)। আহার শেষ করে খাবার ঘরে একাকি বসেছিলাম চুল্লীর ঢাকনার উপর পা রেখে। পাশেই ছোট টেবিলে সাজানো ছিল নানারকমের মদ। সকাল থেকে পড়েছি গ্লোভার-এর "লিওনিডাস", উইল্কির "এপিগোনিয়াড", টাকারম্যান-এর "সিসিলি", আর গ্রিসওল্ড-এর "পুরাবস্তু"। অতএব স্বীকার করছি, এখন নিজেকে কিছুটা বোকা-বোকা মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে এক পাত্র "লাফিত্তে" খেয়ে নিজেকে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করছি। তাতেও কিছু ফল না হওয়ায় হতাশ হয়ে একখানা খবরের কাগজ হাতে নিলাম। "ঘর ভাড়া", "কুকুর হারানো", "পত্নী ও শিক্ষানবীশদের পলায়ন" প্রভৃতি কলমগুলি ভালভাবে পড়ে ঢুঁ মারলাম সম্পাদকীয় পাতায়। আদ্যোন্ত পড়ে একটা শব্দও বোধগম্য না হওয়ায় লেখাটা চীনা ভাষায় হতে পারে মনে করে আবার শেষ থেকে আদি পর্যন্ত পড়েও বিশেষ সুবিধা হল না; বিরক্ত হয়ে কাগজটা ছুঁড়ে ফেলতেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় নীচের অনুচ্ছেদটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ঃ

"মৃত্যুর পথ অসংখ্য ও বিচিত্র। লণ্ডন-এর একটি পত্রিকায় একটি অদ্ভুত মৃত্যুর উল্লেখ করা হয়েছে। লোকটি "ফুঁ দিয়ে তীর ছোঁড়া" খেলছিল। খেলাটা হল ঃ একটা লম্বা সূঁচে পশমি সুতো পরিয়ে সূঁচটাকে একটা টিনের নলের ভিতর দিয়ে ফুঁ দিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে বিঁধতে হবে। লোকটি ভুল করে সূঁচটাকে নলের ভুল দিকে রেখে সূঁচটাকে সজোরে ছুঁড়বার জন্য বড় করে শ্বাস টানতেই সূঁচটা তার গলার ভিতর ঢুকে যায়। সেখান থেকে ফুসফুসে ঢোকে, এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।"

লেখাটা পড়েই আমার খুব রাগ হল। কেন হল তা জানি না। চেঁচিয়ে বললাম, "এটা তো ডাহা মিথ্যে কথা—একটা বোকা ধাপ্পা। অন্য সব বোকা পাঠকদের এ খবর দিয়ে চমকে দিতে পারলেও আমার মত বুদ্ধিমান পাঠকদের এই সব অবাস্তব কাহিনী দিয়ে ভোলানো যাবে না। এখন থেকে "অদ্ভুত" আখ্যা দিয়ে পরিবেশিত কোন সংবাদকেই আমি আর বিশ্বাস করব না।"

"মেইন গট, ডেন, ভাট এ ভুল্ হউ বিজ ফর ড্যাট্!" (হা ঈশ্বর), তাহলে, কী বোকার মত কথাই না তুমি বললে!) এমন এক অপূর্ব কণ্ঠস্বরে কথাগুলি উচ্চারিত হল যেমনটি আমি আগে কখনও শুনি নি। প্রথমে মনে হল, আমার কানের ভিতরটাই বুঝি ভোঁ-ভোঁ করে উঠেছিল। পরক্ষণেই ভাবলাম, না, তাতে তো এরকম অর্থ-সমন্বিত শব্দ হতে পারে না। অতএব ঘরে কে ঢুকেছে দেখার জন্য চারদিক ভাল করে তাকালাম। কাউকেই দেখতে পেলাম না।

"হুম!" সেই একই কণ্ঠস্বর। সেই একই অদ্ভুত উচ্চারণে কে যেন বলল, "তুমি দেখছি শুয়োরের মত মদে একেবারে ডুবে গেছ। আমি তোমার পাশেই বসে আছি, অথচ আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না।"

সঙ্গে সঙ্গে আমি নাক বরাবর তাকালাম। সত্যি তো, টেবিলে যে লোকটি আমার মুখোমুখি বসে আছে তাকে দেখতে ছন্নছাড়া ও অদ্ভুত হলেও একেবারে বর্ণনাতীত নয়। তার শরীর একটা মদের নল, বা মদের পিপে, বা ঐ রকম একটা কিছু; বেশ একটা ফল্‌স্টাফ-সুলভ চেহারা। নীচের দিকে তাতে দুটো কীলক বসানো, তাতেই পায়ের কাজ চলে। হাত বলতে দুটো লম্বা বোতল কাঠামোর উপর দিক থেকে ঝোলানো। সেই রাক্ষস-মূর্তির মাথা বলতে দেখলাম একটা চটে-মোড়া পান-পাত্র যেটা দেখতে মাঝখানে ফুঁটো-করা একটা বড় নস্যির ডিবের মত। সেই পান-পাত্রটাকে বসানো হয়েছে পিপেটার উপরে, আর তার ছিদ্রটা রয়েছে আমার দিকে মুখ করে। যা কিছু শব্দ শুনতে পাচ্ছি সবই উৎসারিত হচ্ছে সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে। আর সেই শব্দগুলোকেই সে বোধগম্য কথা বলে ধরে নিয়েছে।

মূর্তিটি সেই একই দুর্বোধ্য ভাষায় আবার বলে উঠল, "তুমি দেখছি একটা হাঁসের চাইতেও বেশী বোকা, নইলে কাগজে যা ছাপা হয়েছে তাকে তুমি অবিশ্বাস কর। সব সত্যি—এর প্রতিটি শব্দ সত্যি।"

কিছুটা বিচলিত হলেও আমি গম্ভীরভাবে বললাম, "তুমি কে? এখানে ঢুকলে কেমন করে? আর তুমি বলছই বা কি?"

মূর্তি আগের মত দুর্বোধ্য উচ্চারণেই উত্তর দিল, "এখানে কেমন করে ঢুকলাম সেটা

www.boipoi.blogspot.com

তোমার কোন ব্যাপারই নয় ; আর আমি কি বলব না বলব সেটাও আমার ব্যাপার—আমার যা ইচ্ছা তাই বলতে পারি ; আর আমি কে সেটা যাতে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পার সেইজন্যই তো আমি এখানে এসেছি ।”

আমি বললাম, “তুমি একটি ভবঘুরে মাতাল ; এখনই আমি ঘণ্টা বাজিয়ে আমার লোককে বলব, লাথি মেরে তোমাকে রাস্তায় বের করে দিক ।”

লোকটি বলল, “হে ! হে ! হে ! হু ! হু ! হু ! তা তুমি পারবে না ।”

“পারব না !” আমি বললাম, “কি বলতে চাও তুমি ?—আমি কি পারব না ?”

ছোট শয়তানী মুখে মুচকি হেসে সে বলল, “ঘণ্টা বাজাতে ।”

এ কথা শুনে আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঠিক তখনই বদমাসটা তার লম্বা বোতলের হাত বাড়িয়ে আমার কপালে একটা আঘাত করতেই যে আরাম-কেদারা থেকে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম তাতেই আবার বসে পড়লাম । আমি অবাক হয়ে গেলাম ; হঠাৎ বুঝতেই পারলাম না কি করব । ইতিমধ্যে সে আবার বলে উঠল, “দেখলে তো ; চুপ করে বসে থাক । এবার জানতে পারবে আমি কে । আমার দিকে তাকাও ! দেখ ! আমি কিম্ভুত দেবদূত ।”

আমি সাহস করে বললাম, “যথেষ্ট কিম্ভুতই বটে ! কিন্তু আমি তো জানতাম দেবদূতের ডানা থাকে ।”

অত্যন্ত রেগে সে চেঁচিয়ে বলল, “ডানা ! আমার ডানার কি দরকার ? হা আমার ঈশ্বর ! তুমি কি আমাকে একটা মুরগির ছানা পেয়েছ না কি ?”

আমি সভয়ে উত্তর দিলাম, “না, না, তুমি মুরগির ছানা নও—নিশ্চয় নও ।”

“ঠিক আছে ; তাহলে চুপ করে বসে থাক, বুঝে শুনে কথা বল, নইলে লাগাব আর এক রদ্দা । মুরগির ডানা লাগে, পেঁচার ডানা লাগে, ক্ষুদে শয়তানের ডানা লাগে । দেবদূতের ডানা থাকে না, আর আমি তো কিম্ভুত দেবদূত ।”

“তাহলে এখন তুমি আমার কাছে এসেছ কি কাজ—”

মূর্তি চটে গিয়ে বলল, “কাজ ! আমার কাজ ! তুমি কি রকম নীচ বংশের লোক হে যে একজন ভদ্রলোক তথা দেবদূতকে তার কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছ ?”

দেবদূত হলেও তার কথাগুলি আমার সহ্য হল না ; হাতের কাছে যে নুনের পাত্রটা ছিল সেটা তুলে ছুঁড়ে মারলাম তার কপাল লক্ষ্য করে । হয় সে একটু সরে গিয়েছিল, নয় তো আমারই লক্ষ্য ঠিক ছিল না ; কারণ নুনের পাত্রের আঘাতে ম্যাণ্টেল-পিসের উপরে রাখা ঘড়ির ডায়ালটাই কেবল ভেঙে গেল । আর তার পাল্টা হিসাবে দেবদূত আমার কপালে বসিয়ে দিল আরও দুই-তিন ঘা । আমি রণে ভঙ্গ দিলাম, আর বলতে লজ্জা হচ্ছে যে যন্ত্রণাতেই হোক আর বিরক্তিতেই হোক আমার দুই চোখ কয়েক ফোঁটা জলে ভরে গেল ।

আমার অবস্থা দেখে কিম্ভুত দেবদূত কিছুটা নরম হয়ে বলল, “হা আমার ঈশ্বর ! লোকটা হয় অনেক মাল খেয়েছে নয় তো অনেক দুঃখ পেয়েছে । অত কড়া মদ খেয়ো না, ওতে জল ঢেলে নাও । এই নাও । লক্ষ্মী ছেলের মত এটা খেয়ে নাও ; আর কেঁদো না—কেঁদো না !”

তখন কিম্ভুত দেবদূত তার বোতলের হাত থেকে আমার পানপাত্রে কিছুটা বর্ণহীন তরল পদার্থ ঢেলে দিল। আমি লক্ষ্য করলাম, বোতলগুলির গায়ে লেবেল মারা রয়েছে, তার সেই লেবেলে লেখা আছে "কার্থওয়াসার"।

দেবদূতের এই দয়া আমাকে অনেকটা শান্ত করল ; তাছাড়া, আমার মদে যে জল সে একাধিকবার মিশিয়ে দিল তাতেও আমার মেজাজ অনেকটা ফিরে এল। ফলে তখন যে অসাধারণ বক্তৃতাটি সে দিল তা আমি মন দিয়ে শুনলাম। তার সব কথা আমি বলতে পারব না, তবে তার কথা থেকে এটা বুঝতে পারলাম যে সে হচ্ছে মানুষের অশুভ নিয়তির নিয়ন্তা ; তার কাজই হচ্ছে এমন সব অদ্ভুত দুর্ঘটনা ঘটানো যা নাস্তিকদের বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে। দু' একবার তার কথায় অবিশ্বাস করে বাধা দেওয়ায় সে এমন ভয়ানক চটে গেল যে শেষ পর্যন্ত আমি চুপ করে থাকাই ভাল মনে করলাম, আর সেও অনর্গল বকে যেতে লাগল। তার বক্তৃতা চলতেই থাকল ; আমিও কেদারায় হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে আরাম করে মনাক্কা চিবুতে লাগলাম, আর ঘরময় তার খোসা ছড়াতে থাকলাম। কিন্তু আমার এই আচরণে দেবদূত হঠাৎ খুব খেপে গেল। চোখ দুটো ঢেকে একটা বিরাট অভিশাপ দিল, এমন ভাষায় আমাকে ভয় দেখাল যে আমি তার মানেই বুঝতে পারলাম না, এবং শেষ পর্যন্ত নত হয়ে একটা সেলাম করে আর্কবিশপ জিল-ব্লাসের ভাষায় আমাকে শুভ-কামনা জানিয়ে সে বিদায় নিল।

তার প্রস্থানে আমি বড়ই আরাম বোধ করলাম। বেশ কয়েক গ্লাস লাফিতের গুণে চোখেও ঘুম এল, আর আমিও মিনিট পনেরো-বিশের জন্য একটু ঘুমিয়ে নিলাম। ঠিক ছ'টার সময় এক জায়গায় যাবার কথা ছিল। সেখানে অবশ্যই যেতে হবে। আমার বসত বাড়ির বীমার পলিসির মেয়াদ গতকাল শেষ হয়ে গেছে ; এ নিয়ে কিছু গোলমাল দেখা দেওয়ায় স্থির হয়েছে যে ছ'টার সময় আমি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেকটারের সঙ্গে দেখা করে পলিসি নবীকরণের ব্যবস্থা করব। ম্যান্টেল-পিসের উপরকার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তখনও আমার হাতে পঁচিশ মিনিট সময় আছে। তখন বাজে সাড়ে পাঁচটা ; পাঁচ মিনিট হাঁটলেই বীমার আপিসে পৌঁছে যাব ; আর আমার দুপুরের ঘুম কখনও পঁচিশ মিনিটের বেশী হয় না। অতএব যথেষ্ট নিরাপদেই আমি একটু ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে উঠে টাইম-পিসের দিকে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়ে গেলাম ; পনেরো-বিশ মিনিটের পরিবর্তে আমি ঘুমিয়েছি মাত্র তিন মিনিট, কারণ নির্ধারিত সময় হতে তখনও সাতাশ মিনিট বাকি। আবার চোখ বুজলাম, এবং দ্বিতীয়বার জেগে মহাবিস্ময়ে দেখলাম, ছটা বাজতে তখনও সেই সাতাশ মিনিট বাকি। লাফ দিয়ে উঠে ঘড়িটা বের করে দেখলাম, সাড়ে সাতটা বেজেছে। দুই ঘণ্টা ঘুমবার ফলে নির্ধারিত সময় রাখা সম্ভব হল না। নিজের মনেই বললাম, "এখন যাওয়ার চাইতে কাল সকালে আপিসে গিয়ে বিলম্বের জন্য ক্ষমা চাইলেই হবে। কিন্তু ঘড়িটার কি হল ?" ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, মেওয়ার যে বোঁটাগুলো ঘরময় ছড়িয়েছিলাম তারই একটা ভাঙা কাঁচের ভিতর দিয়ে উড়ে গিয়ে ছবির ছিদ্রপথে ঘড়ির ভিতর ঢুকে মিনিটের কাঁটাটাকে আটকে দিয়েছে।

বললাম, "ওঃ, এই ব্যাপার। একটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনামাত্র। এ রকম তো আকছাড়ই হতে পারে।"

এ নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে যথাসময়ে শয্যায় আশ্রয় নিলাম। এবার শিয়রের কাছে ছোট পড়ার টেবিলে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে "ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান" বইখানির কয়েকটি পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে মোমবাতিটাকে জ্বালিয়ে রেখেই বিশ সেকেন্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লাম।

স্বপ্নের মধ্যে কিম্ভুত দেবদূত বার বার এসে দেখা দিল। মনে হল, সে যেন কোচের নীচে দাঁড়িয়ে মশারিটা সরিয়ে দিল, এবং মদের বোতলের মত ফাঁকা ও বিরক্তিকর শব্দ করে তার প্রতি আমি যে ঘৃণ্য ব্যবহার করেছিলাম তার উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে লাগল। শেষ পর্যন্ত মাথার ফোঁদল-টুপিটা খুলে আমার খাদ্যনালীর ভিতরে একটা নল ঢুকিয়ে দিয়ে তার বগলের নীচে রাখা একটা লম্বা-গলা বোতল থেকে এক-সাগর "কার্থওয়াসার" ঢেলে ঢেলে আমাকে একেবারে ডুবিয়ে দিল। যন্ত্রণা যখন অসহ্য হয়ে উঠল তখন জেগে দেখলাম, একটা ইঁদুর জ্বলন্ত মোমবাতিটাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে এক অপকাণ্ড ঘটিয়ে বসেছে। অচিরেই একটা প্রচণ্ড দম-বন্ধকরা গন্ধ আমার নাকে ঢুকল ; পরিষ্কার দেখলাম, বাড়িতে আগুন লেগেছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল, আর অবিশ্বাস্য রকমের অল্প সময়েই গোটা বাড়িটাই জ্বলতে লাগল। জানালা ছাড়া আমার ঘর থেকে বের হবার আর সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। অবশ্য বাইরের জনতা তাড়াতাড়ি একটা লম্বা মই এনে তুলে ধরল। সেটার সাহায্যে আমি নিরাপদেই দ্রুত নেমে যাচ্ছি, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড শুয়োর—সেটার বর্তুলাকার পেট ও দেহের গঠনে এমন কিছু ছিল যা দেখে প্রথমেই আমার মনে পড়ল কিম্ভুত দেব-দূতের কথা—প্রকাণ্ড শুয়োরটা কাদার ভিতর থেকে উঠে এসে হঠাৎই কি খেয়াল হল আমার মইটার সঙ্গে গা ঘসতে শুরু করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে আমি ছিটকে মাটিতে পড়ে একটা হাত ভেঙে বসলাম।

বীমার দরুন ক্ষতি, এবং আগুনে পুড়ে যাবার দরুন মাথার সব চুল হারানোর ক্ষতি—সব মিলিয়ে এই দুর্ঘটনাটি আমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলল, আর শেষ পর্যন্ত স্থির করলাম এবার একটি স্ত্রী-রত্ন সংগ্রহ করব। এক ধনবতী বিধবা সপ্তম স্বামীটিকে হারিয়ে খুবই মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। আমার প্রতিজ্ঞা তার আহত মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। কৃতজ্ঞতায় ও স্তুতিতে আমি তার পায়ের কাছে নত হলাম। লজ্জায় লাল হয়ে তিনি তার একঢাল কালো চুল দিয়ে আমার ধার-করা পরচুলাকে ঢেকে দিলেন। কী করে কী ঘটেছিল আমি জানি না ; যখন উঠে দাঁড়ালাম তখন আমার মাথার পরচুলা উধাও, তার জায়গায় চক্‌চক্ করছে একরাশ কালো চুল। আর অন্যের চুলে অর্ধেক ঢাকা মাথা নিয়ে ভদ্রমহিলাটি ঘৃণায় ও ক্রোধে কম্পমান। এইভাবে সেই বিধবাকে পাবার আশা নির্মূল হয়ে গেল এমন একটি দুর্ঘটনার ফলে যেটা মোটেই প্রত্যাশিত ছিল না, অথচ ঘটেছিল স্বাভাবিক কার্য-কারণের সূত্র ধরেই।

তাতেও হতাশ না হয়ে অপেক্ষাকৃত কম নির্দয় এক রমণীকে বাগাবার চেষ্টা

করলাম। এবারও প্রথমে ভাগ্য প্রসন্ন হয়েই দেখা দিল ; কিন্তু বাধার সৃষ্টি করল একটি তুচ্ছ দুর্ঘটনা। শহরের গণ্যমান্য লোকদের ভিড়ে-ঠাসা রাজপথে আমার বাগদত্তাকে দেখতে পেয়ে দ্রুত ছুটে গেলাম তাকে অভিবাদন জানাতে, এমন সময় কোথা থেকে কী একটা এসে আমার চোখের মধ্যে ঢুকে পড়ল, আর মুহূর্তকালের জন্য আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলাম। আবার চোখের দৃষ্টি ফিরে পাবার আগেই আমার ভালবাসার মানুষটি অদৃশ্য হয়ে গেল—আমার ক্ষণিক অন্ধত্বকে পূর্বপরিকল্পিত দুর্ব্যবহার বলে ধরে নিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়ে। এই দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ; তখনও চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ; এমন সময় দেখা দিল সেই কিম্ভুত দেবদূত। এত ভদ্রভাবে সে আমাকে সাহায্য করতে চাইল যা আমি আশাই করি নি। খুব যত্ন করে আমার চোখটা পরীক্ষা করে তার ভিতর থেকে কি একটা তুলে নিল, আর আমিও আরাম বোধ করলাম।

এবার ভাবলাম, ভাগ্য যখন এতই বিরূপ তখন আর কেন, এবার মরাই ভাল। সেই মতে নিকটবর্তী নদীটার দিকে এগিয়ে চললাম। সেখানে পৌঁছে সব জামা-কাপড় খুলে দিলাম নদীতে এক ঝাঁপ ; তখন আমার এই পরিণামের একমাত্র সাক্ষী ছিল একটি মাত্র কাক, মদে ভেজানো শস্যকণা খেয়ে নেশার ঘোরে সে তখন একলা ছিটকে পড়েছিল দল-ছাড়া হয়ে। আমি জলে ঝাঁপ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পাখিটা কি মনে করে আমার পোশাকপত্রের সবচাইতে অপরিহার্য অংশটাকে নিয়ে উড়াল দিল। অতএব আপাতত আত্মহত্যার ব্যাপারটা স্থগিত রেখে আমার কোটের হাতার মধ্যে শরীরের নিম্নাংশকে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই অবস্থায় যতটা দ্রুত সম্ভব দুষ্টু পাখিটার পিছু নিলাম। কিন্তু অশুভ নিয়তি আমাকে ছাড়ল না। নাকটাকে আকাশের দিকে উঁচু করে রেখে ডানাওয়ালা চোরের পিছনে পুরোদমে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ বুঝতে পারলাম, আমার পা দুটো আর মাটিতে নেই ; আসলে ব্যাপার হল, আমি একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে গিয়েছিলাম, আর এতক্ষণ নীচে পড়ে টুকরা-টুকরো হয়েই যেতাম যদি না সৌভাগ্যক্রমে একটা উড়ন্ত বেলুন থেকে ঝোলানো পথপ্রদর্শক দড়িটা ধরে ঝুলে না পড়তাম।

সেই পরিস্থিতির বিপদটা সম্যক উপলব্ধি করামাত্রই আমি ফুসফুস-ফাটানো উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে মাথার উপরে উপবিষ্ট বিমান-চালককে আমার ভয়ংকর অবস্থার কথাটা জানাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ যাবৎ তাতে কোনই ফল হল না। হয় সে বোকাটা আমার ডাক শুনতে পেল না, অথবা সে বদমাসটা আমার দিকে নজর দিতে চাইল না। ইতিমধ্যে যন্ত্রটা অতিদ্রুত উপরে উঠতে লাগল, আর আমার শক্তিটা সেই অনুপাতে কমতে লাগল। অচিরেই আমি হয়তো ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিঃশব্দে সমুদ্রে তলিয়ে যেতাম, কিন্তু এমন সময় উপর থেকে একটা ফাঁকা আওয়াজ শুনে আমার মনের জোর অনেক বেড়ে গেল। উপরে তাকিয়ে দেখতে পেলাম কিম্ভুত দেবদূতকে। সে বিমানের উপরে দুই হাত ভাঁজ করে ঝুঁকে বসেছিল ; তার মুখের পাইপ থেকে প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করছিল ; মনে হল, এই পৃথিবীতে সে বেশ মজায়ই আছে। আমার তখন কথা বলার শক্তি ছিল না ; কেবল মিনতির ভঙ্গীতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে শুধাল, “তুমি কে, আর এ ভাবে চলার সাহসই বা তোমার হল কেন ?”

তার এই বে-আদপি, নিষ্ঠুরতা ও ভনিতার জবাবে একটিমাত্র শব্দই আমার মুখে উচ্চারিত হল—“বাঁচাও !”

বদমাসটা উত্তর দিল, “বাঁচাব ! আমি পারব না। এই বোতলটা নাও—নিজেকে নিজে বাঁচাও !”

এই বলে সে “কার্থওয়াসারের” একটা ভারি বোতল ছুঁড়ে দিল ঠিক আমার মাথার উপরে। মনে হল, আমার মাথাটা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে গেল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি দড়িটা ছেড়ে দিতেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় দেবদূতের চীৎকার শুনে থেমে গেলাম।

সে বলল, “ধরে থাক ! তাড়াহুড়া করো না—না ! তোমার কি আরেকটা বোতল চাই, না কি একটাতেই কাজ হয়েছে—বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে পেয়েছ ?”

তাড়াতাড়ি আমি দু'বার মাথা নাড়লাম—একবার না-সূচক, অর্থাৎ এখনই আর একটা বোতল চাই না,—আর একবার হ্যাঁ-সূচক অর্থাৎ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে এসেছে। তাতেই দেবদূত অনেকটা নরম হল।

সে শুধাল, “তাহলে শেষ পর্যন্ত তুমি বিশ্বাস করছ ? বিশ্বাস করছ যে অদ্ভুত কান্ডও ঘটে ?”

আবার সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম।

“আর তুমি আমাকে—মানে কিম্ভুত দেবদূতকেও বিশ্বাস করছ ?”

আবার মাথা নাড়লাম।

“কিম্ভুত দেবদূতের কাছে পুরোপুরি আত্ম-সমর্পণের চিহ্ন হিসাবে তোমার ডান হাতটাকে বাঁদিকের ব্রীচেসের পকেটে ঢোকাও।”

স্বাভাবিকভাবেই সে কাজটা করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। প্রথমত, মই থেকে পড়ে আমার ডান হাতটা ভেঙে গিয়েছিল, আর তাই ডান হাতটা ছেড়ে দিলে আমি তো শেষ হয়েই যাব। দ্বিতীয়ত, কাকের দেখা না পাওয়া পর্যন্ত আমি ব্রীচেস কোথায় পাব। অতএব বাধ্য হয়েই আমি না-সূচক মাথা নাড়লাম—আমি চেয়েছিলাম দেবদূতকে বোঝাতে যে এই মুহূর্তে তার কথামত কাজ করা আমার পক্ষে অসুবিধাজনক। কী ভুলই যে করেছিলাম !

আমার মাথা নাড়া থামতেই কিম্ভুত দেবদূত গর্জন করে উঠল, “তাহলে জাহান্নামে যাও !”

এই কথা বলে একটা ধারালো ছুরি দিয়ে সে বেলুনের দড়িটা কেটে দিল, আর যেহেতু তখন আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম আমার নিজের বাড়ির ঠিক উপরে (আমার এই ভ্রমণ-কালে বাড়িটাকে নতুন করে সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছিল), তাই হল কি বড় চিমনিটার ভিতর দিয়ে গলে আমি নামলাম একেবারে খাবার ঘরের মেঝেতে।

জ্ঞান ফিরে এলে (মেঝেতে পড়ার ফলে আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম) বুঝলাম তখন ভোর চারটে বাজে। বেলুন থেকে যেখানে পড়েছিলাম সেখানেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিলাম। তখন আমার মাথা ভর্তি নেভা-চুল্লীর ছাই, পা দুটো রয়েছে একটা ওল্টানো ভাঙা টেবিলের উপর ; চারদিকে ছড়ানো রয়েছে নানারকম খাবারের টুকরো-

টাকরা, একখানা সংবাদপত্র, কিছু ভাঙা গ্লাস ও বোতল ও "সিডাম কার্থওয়াসের" একটা খালি জগ, কিন্তুত দেবদূত এই ভাবেই তার প্রতিশোধ নিয়েছিল।

স্বর্ণ-পতঙ্গ

The Gold-Bug

অনেক বছর আগে জনৈক মিঃ উইলিয়াম লিগ্র্যাণ্ডের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রাচীন হুগেনট বংশের মানুষ; একসময় ধনবান ছিলেন; কিন্তু পর পর দুর্ভাগ্যের ফলে অভাবে পড়েছিলেন। তজ্জনিত মনস্তাপ এড়াবার জন্য তিনি পূর্বপুরুষের শহর নিউ অর্লিয়েন্স ছেড়ে দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ার চার্লসটনের নিকটবর্তী সুলিভান দ্বীপে বাসা বেঁধেছিলেন।

দ্বীপটি খুবই অদ্ভুত। প্রায় তিন মাইল লম্বা দ্বীপে সমুদ্রের বালি ছাড়া বিশেষ কিছু নেই। চওড়ায় কোথাও সিকি মাইলের বেশী নয়। একটা ছোট খাঁড়ি দ্বীপটাকে মূল ভূখণ্ড থেকে পৃথক করে রেখেছে। খাঁড়িটাতে যেমন বুনো নল-খাগড়া ও কাদা ছাড়া আর কিছু ছিল না, তেমনি দ্বীপেও ছিল কেবল অল্প কিছু ছোটখাট গাছপালা। একটা বড় গাছও চোখে পড়ে না। একেবারে পশ্চিম সীমান্তে মুলট্রি দুর্গের আশেপাশে কয়েকটি ভাঙা-চোরা বাড়ি আছে; ধুলো ও জ্বরের তাড়নায় চার্লস্টন থেকে পালিয়ে-আসা কিছু লোক গ্রীষ্মকালে সেই বাড়িগুলি ভাড়া নিয়ে বাস করে; আর চোখে পড়ে কিছু বেঁটে তালগাছ; এ ছাড়া গোটা দ্বীপই ইংলণ্ডের ফুল-চাষীদের অতি প্রিয় মনোরম মার্টল্ ফুলের ঝোঁপ-ঝাড়ে ভর্তি। এই ঝোঁপগুলি পনেরো-বিশ ফুট উঁচু আর দুর্ভেদ্য জঙ্গল হয়ে যায়; মার্টল্ ফুলের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে।

নেহাৎ আকস্মিকভাবেই লিগ্র্যাণ্ডের সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি এই দ্বীপেরই পূর্বাঞ্চলে একটি ছোট কুটির বানিয়ে বাস করছিলেন। প্রথম পরিচয় ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হল—কারণ এই নিভৃতবাসী লোকটির মধ্যে এমন কিছু ছিল যা মানুষের মনে আগ্রহ ও শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। আমি দেখলাম, লোকটি সুশিক্ষিত, তার মনের জোর অসাধারণ, কিন্তু সে মন মানববিদ্বেষে আক্রান্ত—কখনও উৎসাহশীল, আবার পরক্ষণেই বিষণ্ণ। তার সঙ্গে অনেক বই ছিল, কিন্তু তিনি কদাচিৎ সেগুলি পড়তেন। তার প্রধান বিনোদন ছিল শিকার করা এবং মাছ ধরা, অথবা সমুদ্র সৈকতে মার্টলবনের ভিতর দিয়ে ঝিনুক বা কীট-পতঙ্গের খোঁজে ঘুরে বেড়ানো—তার কীটতত্ত্বের নমুনা-সংগ্রহটি ছিল দেখবার মত। এইসব অভিযানে তার সঙ্গে থাকত একটি বৃদ্ধ নিগ্রো, নাম জুপিটার। লিগ্র্যাণ্ডের পারিবারিক দুর্দিন শুরু হবার আগেই লোকটিকে ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; যুবক "মাসা উইল"-এর পদাংক অনুসরণ করাটাকে সে তার অধিকার বলে মনে করত;

www.boighar.blogspot.com

কোন ভয় বা প্রলোভনই এই অধিকার থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে নি। হয়তো এমনও হতে পারে যে লোকটিকে বোকা-সোকা দেখে লিগ্র্যাণ্ডের আত্মীয়-জনরাই এই অনড় ধারণাটাকে জুপিটারের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে এই বাউণ্ডুলে ছেলেটার দেখাশুনা সে ভালভাবে করে।

সুলিভান দ্বীপে কড়া শীত বড় একটা পড়ে না; বছরের শেষের দিকেও ঘরে আগুন জ্বালাবার প্রয়োজনটা কদাচিৎ অনুভূত হয়। অবশ্য ১৮—র অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি একদিন বেশ শীত পড়ল। সূর্যাস্তের ঠিক আগে সবুজ গাছপালার ভিতর দিয়ে কোনরকমে বন্ধুর কুটিরে পৌঁছে গেলাম। বেশ কয়েক সপ্তাহ তার সঙ্গে দেখা হয় নি—কারণ সেই সময় আমি থাকতাম চার্লস্‌টনে, দ্বীপ থেকে নয় মাইল দূরে, আর সেকালে সেখান থেকে যাতায়াতের ব্যবস্থাও আজকের দিনের মত ভাল ছিল না। অভ্যাসমতই দরজায় টোকা দিলাম, কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে গোপন জায়গা থেকে চাবিটা বের করে দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে। ঘটনাটি অভিনব, কিন্তু সেদিনের পক্ষে স্বাগতই বটে। ওভারকোটটা খুলে চেয়ারটাকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছে টেনে নিয়ে গৃহস্বামীর আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অন্ধকার হবার একটু পরেই দু'জন হাজির হয়ে আমাকে পরম সমাদরে স্বাগত জানালেন। দাঁত বের করে হাসতে হাসতে জুপিটার রাতের খাবারের জন্য মুরগির মাংস রাঁধতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। লিগ্র্যাণ্ডের মনে তখন চলছিল উৎসাহের হাওয়া—এ ছাড়া অন্য কি ভাবেই বা তার মানসিকতাকে বর্ণনা করব? তিনি একটা নতুন প্রজাতির অজ্ঞাত ঝিনুক পেয়েছেন, আর জুপিটারের সহায়তায় এমন একটা সম্পূর্ণ নতুন ঝিঁঝিঁ পোকা ধরতে পেরেছেন যার সম্পর্কে পরদিন সকালে আমার মতামত জানতে চাইলেন।

আগুনের উপর হাত ঘসতে ঘসতে আমি বললাম, "তা—আজ রাতেই নয় কেন?"

লিগ্র্যান্ড বললেন, "আহা, আমি কি জানতাম যে আপনি আজ এখানে হাজির হবেন? আপনি তো অনেক দিন এখানে আসেন নি; আমি কেমন করে জানব যে আজ রাতেই আপনি এখানে আসবেন? বাড়ি ফিরবার পথেই দুর্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট জে-র সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, আর আমিও বোকার মত তাকেই পোকাটা দিয়ে দিলাম; কাজেই কাল সকালের আগে তো আপনি সেটা দেখতে পাচ্ছেন না। আজ রাতটা এখানে থেকে যান, সূর্য উঠলেই জুপিটারকে পাঠিয়ে সেটা নিয়ে আসব। এত সুন্দর পোকা আগে দেখি নি।"

"কি বললেন? সূর্য উঠলে?"

"দূর মশায়! তা নয়! পোকাটার কথা বলছি। উজ্জ্বল সোনালী রং—একটা বড় বাদামের মত আকার—পিঠের এক প্রান্তে দুটো ঘন কালো বিন্দু, আর অন্য প্রান্তে আর একটা লম্বাটে দাগ। শুঁয়া দুটো—"

জুপিটার বাধা দিয়ে তার নিজস্ব ভাষায় বলে উঠল, "মাসা উইল, তোমাকে কতবার বলব ওটা একটা সোনার ঝিঁঝিঁ পোকা—নিরেট সোনা, ভিতর-বাহির সবটাই সোনা—জীবনে আমি এত ভারি ঝিঁঝিঁ পোকা দেখি নি।"

লিগ্র্যাণ্ড বললেন, “বেশ তো, তাই না হয় হল জুপ ; তাই বলে কি সেটাকে পুড়িয়ে মারতে হবে?” তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, “রংটা সত্যি এমন যে জুপিটারের পক্ষে ওটাকে সোনার তৈরী মনে করাই স্বাভাবিক। ওটার গা থেকে যে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছিল তার চাইতে উজ্জ্বলতর কোন ধাতব আলো আপনিও আগে কখনও দেখেন নি—কিন্তু সকালের আগে তো এ বিষয়ে আপনি কিছুই বলতে পারছেন না। আপাতত সেটার আকৃতি সম্পর্কে কিছু ধারণা আপনাকে দিতে পারি।” এই কথা বলে তিনি একটা ছোট টেবিলে বসলেন ; সেখানে কালি-কলম ছিল, কিন্তু কাগজ ছিল না। দেরাজ খুলে দেখলেন, সেখানেও কাগজ নেই।

অবশেষে তিনি বললেন, “ঠিক আছে ; এতেই হবে!” এই বলে ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটুকরো নোংরা ফুলস্কেপ কাগজ বের করে তার উপরে কলম দিয়ে একটা মোটামুটি রেখাচিত্র আঁকলেন। খুব শীত করছিল বলে আমি তখনও আগুনের পাশেই বসেছিলাম। আঁকা শেষ হলে তিনি আসনে বসেই সেটা আমার হাতে দিলেন। হাত বাড়িয়ে সেটা নেওয়ামাত্রই একটা প্রবল গর্জন কানে এল ; তারপরেই দরজায় আঁচড়ের শব্দ শুনতে পেলাম। জুপিটার দরজা খুলে দিল ; সঙ্গে সঙ্গে লিগ্র্যাণ্ডের মস্তবড় নিউফাউন্ডল্যাণ্ড কুকুরটা ছুটে এসে আমার কাঁধে লাফিয়ে উঠে আমাকে আদর করতে শুরু করল। আগে যখনই এ বাড়িতে এসেছি তখনই কুকুরটাকে যথেষ্ট আদর করেছি। তার আদর-আপ্যায়ন শেষ হতেই কাগজটার দিকে তাকালাম, এবং সত্যি কথা বলতে কি, বন্ধুটি যা এঁকেছেন সেটা দেখে খুবই বিস্মিত হলাম।

কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে বললাম, “দেখুন, এটা যে একটা বিচিত্র ঝিঁঝিঁ পোকা সে কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। এ রকমটা এই আমি নতুন দেখছি—আগে কখনও এমনটি দেখি নি—এটা যদি কোন করোটি বা মরার মাথা হয় সেটা স্বতন্ত্র কথা—এই বস্তুটি আমার দেখা অন্য যে কোন জিনিস অপেক্ষা ঐ দুটি জিনিসেরই অনুরূপ।”

লিগ্র্যাণ্ড আমার কথারই প্রতিধ্বনি করে বললেন, “মড়ার মাথা! ঠিক কথা, কাগজের আঁকাটা দেখতে সেইরকমই হয়েছে বটে। উপরের দুটো কালো বিন্দু দেখতে দুটো চোখের মত, তাই না? আর নীচের লম্বা দাগটা দেখতে ঠিক মুখের মত—আর সবটাই দেখাচ্ছে অণ্ডাকৃতি।”

আমি বললাম, “হয় তো তাই, কিন্তু লিগ্র্যাণ্ড, আমার আশংকা হচ্ছে যে আপনি ভাল শিল্পী নন। ঝিঁঝিঁ পোকাটার আকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে হলে আগে আমি নিজে সেটা দেখতে চাই।”

কিছুটা বিরক্ত হয়ে তিনি বললেন, “দেখুন, আমি ঠিক জানি না, তবে আমি মোটামুটি আঁকতে পারি—অন্তত চলনসই তো বটেই—আমার ভাল ভাল শিক্ষক ছিলেন, আর আমার ধারণা আমি খুব মাথা-মোটা নই।”

আমি বললাম, “প্রিয় বন্ধু আমার, তাহলে আমি বলব যে আপনি একটু রসিকতা করেছেন ; এটাকে একটা মড়ার খুলি বলে সহজেই চালানো যেতে পারে—বস্তুত, আমি বলতে চাই যে শারীরবিদ্যার সাধারণ ধারণা অনুসারে এটা মাথার খুলির একটা

খুব ভাল ছবিই হয়েছে। কিন্তু আপনার এই ঝিঁঝিঁ পোকাটি যদি এই ছবির মতই দেখতে হয় তাহলে বলতেই হবে যে সেটি পৃথিবীর সব চাইতে আজব ঝিঁঝিঁ পোকা। কিন্তু আপনি যে শুঁড়ের কথা বললেন তা কোথায়?”

লিগ্র্যাণ্ড খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলল, ‘শুঁড়া! আমি নিশ্চিত জানি, আপনি শুঁড়াগুলি দেখতে পাচ্ছেন মূল পতঙ্গে যেমনটি আছে আমি তো ঠিক সেইরকমই এঁকেছি। আমার তো ধারণা, এতে সব কিছুই স্পষ্ট করে আঁকা হয়েছে।”

আমি বললাম, “ঠিক আছে—ঠিক আছে; আপনি হয় তো ঠিকই এঁকেছেন, তবু আমি সেগুলি দেখতে পাচ্ছি না।” আর কোন কথা না বলে কাগজটা তার হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। কিন্তু ঘটনাটা যেভাবে মোড় নিল তাতে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার বিরূপ ভাব-ভঙ্গী আমাকে খুবই বিচলিত করে তুলল। ঝিঁঝিঁ পোকার ছবির প্রসঙ্গে শুধু এই কথাই বলতে পারি যে ছবিতে কোনরকম শুঁয়াই দেখানো হয় নি, আর যে বস্তুটির সঙ্গে সমগ্র ছবিটার খুব বেশী মিল চোখে পড়ে সেটা একটা সাধারণ মড়ার খুলির আকৃতি।”

খুব বিরক্তির সঙ্গেই তিনি কাগজখানা হাতে নিলেন; সেটাকে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলার জন্য দলাও পাকালেন, কিন্তু হঠাৎই ছবিটার উপর চোখ পড়ায় তার সমস্ত মনোযোগ যেন তার উপরেই কেন্দ্রীভূত হল। মুহূর্তের মধ্যে তার মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল—আবার পরমুহূর্তেই হয়ে গেল অস্বাভাবিক ম্লান। সেখানে বসেই কয়েক মিনিট ধরে ছবিটাকে খুঁটিয়ে দেখলেন। শেষ পর্যন্ত উঠে টেবিল থেকে একটা মোমবাতি নিয়ে ঘরের এক কোণে একটা তোরঙ্গের উপর বসলেন। সেখানে আবার কাগজটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। মুখে কিছু না বললেও তার আচরণে আমি খুবই বিস্মিত হলাম। তবু পাছে তার মেজাজ আরও খিঁচড়ে যায় তাই কোন কথাই বললাম না। এদিকে পকেট থেকে একটা থলি বের করে তিনি কাগজখানাকে সযত্নে তার মধ্যে ভরে লেখার টেবিলের দেরাজের মধ্যে থলেটাকে রেখে তালাবন্ধ করে দিলেন। এবার তার আচরণ অনেকটা সংযত হল; কিন্তু আগেকার সেই উৎসাহ ফিরে এল না। যত রাত বাড়তে লাগল ততই তিনি যেন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলেন; আমার হাসি-তামাসা তার সেই মগ্ন ভাবটাকে কিছুতেই কাটাতে পারল না। ভেবেছিলাম রাতটা এই বাড়িতেই কাটিয়ে দেব, কিন্তু বন্ধুটির হাবভাব দেখে স্থির করলাম, এবার বিদায় নেওয়াই ভাল। তিনিও আমাকে থাকতে বললেন না, কিন্তু বিদায় নেবার সময় আমার হাতটাকে অতিরিক্ত সমাদরের সঙ্গে চেপে ধরলেন।

এর প্রায় এক মাস পরে (এর মধ্যে লিগ্র্যাণ্ডের সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি) তার সহচর জুপিটার চার্লসটনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। ভাল মানুষ বুড়ো নিগ্রোটিকে আগে কখনও এত মন-মরা দেখি নি। তাই আমার ভয় হলো আমার বন্ধুটির হয় তো গুরুতর কোন বিপদ ঘটেছে।

বললাম, “আচ্ছা জুপ, খবর কি? তোমার মনিব কেমন আছেন?”

“সত্যি কথা বলতে কি মাসা, তিনি খুব ভাল নেই।”

“ভাল নেই!” কথাটা শুনে সত্যি দুঃখ পেলাম। “তার কি হয়েছে?”

“সেটাই তো কথা ; তিনি তো কোনদিনই কিছু বলেন না ; কিন্তু আসলে তিনি খুবই অসুস্থ।”

“খুব অসুস্থ জুপিটার ! —এতক্ষণ সে কথা বল নি কেন ? তিনি কি শয্যাশায়ী ?”

“না, তা নন ; তাকে তো বোঝাই যায় না—সেটাই তো আসল বিপদ—বেচারা মাসা উইলের কথা ভেবে আমার বড় কষ্ট হয়।”

“জুপিটার, তুমি যা বলতে চাইছ সেটা স্পষ্ট করে বল। তুমি বলছ তোমার মনিব অসুস্থ। তার কি অসুখ তা কি তিনি বলেন নি ?”

“দেখুন মাসা, এই জন্যই তো আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে—মাসা উইলের যে কি হয়েছে সে সম্পর্কে তিনি তো কিছুই বলবেন না—কিন্তু তাহলে তিনি সারাক্ষণ কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন ? কেনই বা মাথা নীচু করে থাকেন ? কেনই বা এত সাদাটে হয়ে যাচ্ছেন ? সব সময় হাতে একটা বক-যন্ত্র নিয়ে—”

“কি হাতে নিয়ে বললে জুপিটার ?”

“স্লেটের মূর্তিগুলোর উপর একটা বক-যন্ত্র ধরে থাকেন—অমন অদ্ভুত সব মূর্তি বাপের জন্মে দেখি নি। আমি বলছি, তিনি পাগল হয়ে যাবেন। সারাক্ষণ তার উপর কড়া নজর রাখতে হয়। আজ তো আমাকে লুকিয়ে সারাটা দিন কোথায় কাটিয়ে এলেন। ফিরে এলে একটা বড় লাঠি দিয়ে আচ্ছা করে মারতে গিয়েছিলাম—কিন্তু মারতে পারি নি—এমন অসহায়ভাবে তিনি তাকিয়ে থাকলেন—”

“এ্যাঁ ! —বল কি ? দেখ—বেচারির উপর এতটা কঠোর হয়ো না—তাকে মেরো না জুপিটার—এতটা তিনি সইতে পারবেন না—কিন্তু তার এই অসুখের—বরং বলা যায় এই আচরণ বদলের কারণ সম্পর্কে কি কোন ধারণা তোমার আছে ? তোমাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হবার পরে কোন অপ্রিয় ঘটনা কি ঘটেছে ?”

“না মাসা, তার পরে কোন অপ্রিয় কিছুই ঘটে নি—আমি তো মনে করি তার ঠিক আগেই—আপনি যেদিন সেখানে ছিলেন সেই দিনই—”

“সে কি ? কি বলছ তুমি ?”

“কেন মাসা, আমি ঝিঁঝিঁ পোকাটার কথাই বলছি—সেটা এখনও সেখানে আছে।”

“কি আছে বললে ?”

“ঝিঁঝিঁ পোকা—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে ওই সোনালী পোকাটা মাসা উইলের মাথার কোন জায়গায় কামড় বসিয়েছে। মাসা উইলই প্রথমে সেটাকে ধরেছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গেই সেটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন—আর ঠিক তখনই মাসাকে সে কামড়ে দিয়েছিল।”

“তাহলে—তোমার কি ধারণা সেই ঝিঁঝিঁ পোকাটা তোমার মাসাকে কামড়েছে, আর তার ফলেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ?”

“ঠিক ধারণা নয়—এটা আমার সন্দেহ। ওই সোনার পোকাটার কামড়ই যদি কারণ না হয় তাহলে তিনি দিন-রাত সোনার স্বপ্ন দেখেন কেন ?”

“কিন্তু তুমি কি করে জানলে যে তিনি সোনার স্বপ্ন দেখেন ?”

"কি করে জানলাম? কারণ তিনি ঘুমের মধ্যেও সোনার কথাই বলেন, তাই জানলাম।"

"দেখ জুপ, হয়তো তোমার কথাই ঠিক; কিন্তু কোন্ সৌভাগ্যের ফলে আজ তুমি দর্শন দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলে?"

"ব্যাপার কি মাসা?"

"তুমি কি মিঃ লিগ্র্যাণ্ডের কাছ থেকে কোন খবর এনেছ?"

"না মাসা, তার কাছ থেকে শুধু এই চিঠিটা এনেছি; এই কথা বলে সে আমাকে এই চিঠিটা দিল।

"প্রিয়—

এত দীর্ঘ কাল আপনার দেখা নেই কেন? আশা করি আপনি এত বোকা নন যে আমার কিঞ্চিৎ রূঢ় আচরণেই আপনি অসন্তুষ্ট হবেন; কিন্তু না, সেটা সম্ভবই নয়।

আপনার সঙ্গে দেখা হবার পরে আমার উদ্বিগ্ন হবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আপনাকে কিছু বলার আছে, কিন্তু কেমন করে সেটা বলব, বা মোটেও বলা উচিত হবে কি না ঠিক বুঝতে পারছি না।

গত কয়েকদিন যাবৎ আমি মোটেই সুস্থ নই, আর বেচারি বুড়ো জুপও আমার ভালর জন্যই আমাকে এত বেশী বিরক্ত করছে যা আমি সহ্য করতেও পারছি না। তুমি কি বিশ্বাস করবে? —আমি তাকে লুকিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছি এবং একেবারে একা সারাটা দিন মূল ভূখণ্ডের পাহাড়ে কাটিয়েছি সেই অপরাধে আমাকে প্রহার করার জন্য সে একটা বড় লাঠি বানিয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমার অসহায় দৃষ্টিই আমাকে মারের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার সংসারে আর কোন পরিবর্তন হয় নি।

যেমন করে পারেন জুপিটারের সঙ্গেই চলে আসুন। অতি অবশ্য আসুন। আজ রাতেই আপনার দেখা পেতে চাই। গুরুতর কাজ আছে। আপনাকে নিশ্চিত করেই জানাচ্ছি, কাজটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

একান্ত আপনার, উইলিয়াম লিগ্র্যাণ্ড।

চিঠিটার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যা আমার মনে গভীর অস্বস্তি জাগিয়ে তুলল। লেখাটা যেন লিগ্র্যাণ্ডের লিখন-শৈলীর সঙ্গে একেবারেই মেলে না। কিসের স্বপ্ন তিনি দেখছেন? কোন্ নতুন কল্পনা তার মাথায় ভর করেছে? কোন্ "সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ" কাজ তিনি করতে চান? জুপিটারের বিবরণ মোটেই ভাল নয়। ভয় হচ্ছে, অবিরাম দুর্ভাগ্যের চাপ হয় তো বন্ধুটির মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়েছে। সুতরাং কোনরকম দ্বিধা না করে নিগ্রোটির সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম।

জাহাজ-ঘাটে পৌঁছে দেখলাম একটা কাস্তে ও তিনটে কোদাল—দেখতে সবগুলিই নতুন—আমাদের নৌকোর খোলের ভিতর রাখা আছে।

"এ সবের অর্থ কি জুপ?" আমি শুধালাম।

"তারই জন্যে এই কাস্তে ও কোদাল মাসা।"

"তা তো বুঝলাম; কিন্তু এগুলি এখানে কেন?"

www.banglabooks.blogspot.com

“কাস্তে আর কোদাল মাসা উইলই শহর থেকে কিনে নিতে বলেছেন, আর এর জন্য আমাকে অনেকগুলি টাকা ব্যাটাদের দিতে হয়েছে।”

“কিন্তু এই কাস্তে-কোদাল দিয়ে তোমার “মাসা উইল” করবেনটা কি ?”

“অত কথা আমি জানি না, আর তিনিও জানেন না। কিন্তু এ সবই ওই পোকাটার কাণ্ড।”

বুঝলাম, জুপিটারের কাছ থেকে কিছুই জানা যাবে না ; তার মাথায় এখন ঘুরছে ওই পোকাটি। অতএব নৌকোতে চড়ে পাল তুলে দিলাম। অনুকুল জোরালো বাতাসে অচিরেই মুলট্রি দুর্গের উত্তরে পৌঁছে গেলাম, এবং দুই মাইল হেঁটে কুটিরে হাজির হলাম। তখন বিকেল তিনটে। লিগ্র্যাণ্ড সাগ্রহে আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। এমন স্নায়বিক বিহ্বলতায় তিনি আমার হাতটা চেপে ধরলেন যাতে আমি ভয় পেয়ে গেলাম ; আমার পূর্বের সন্দেহ দৃঢ়তর হল। তার মুখখানি ভয়ানক রকমের পাণ্ডুর দেখাচ্ছে ; গর্তে-বসা চোখ দুটিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। কুশল-প্রশ্নাদির পরে আর কিছু বলার না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লেফ্‌টেন্যান্ট জি-র কাছ থেকে ঝিঁঝিঁ পোকাটা ফেরৎ পেয়েছেন কি না।

তিনি উত্তেজনার সঙ্গে জবাব দিলেন, “নিশ্চয়ই, পরদিন সকালেই তিনি সেটা ফেরৎ দিয়েছেন। কোন প্রলোভনেই আমি সেটাকে হাতছাড়া করতে রাজী নই। আপনি কি জানেন, ওটার ব্যাপারে জুপিটারের ধারণাই ঠিক ?”

মনে মনে বিপদের আশংকা করেই বললাম, “কি রকম ?”

“সেই তো বলেছে ঝিঁঝিঁ পোকাটা খাঁটি সোনার তৈরী।” তিনি কথাগুলি বললেন খুবই গম্ভীরভাবে, আর আমি মর্মাহত হলাম বর্ণনাতীতরূপে।

মুখে বিজয়ীর হাসি ফুটিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, “এই ঝিঁঝিঁ পোকাই আমার ভাগ্য ফিরিয়ে আনবে, আমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে আমার পারিবারিক ঐশ্বর্যের আসনে। তাই তো একে আমি এত দাম দিচ্ছি, এতে অবাক হবার কি আছে ? যেহেতু ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে এই সম্পদের উপযুক্ত বলে মনে করেছেন, তাই তো আমি একে যথাযথভাবে ব্যবহার করে সেই স্বর্ণ-সম্পদের অধিকারী হব এই পোকাটি যার সূচক মাত্র। জুপিটার, ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে নিয়ে এস !”

“কি ? সেই পোকা ? আমি আর ওই ঝামেলায় নেই,—তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে এস।” এ কথা শুনে লিগ্র্যাণ্ড গম্ভীর রাজকীয় ভঙ্গীতে নিজেই উঠে গেলেন এবং একটা কাঁচের পাত্রের ভিতর থেকে ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে নিয়ে এলেন। ঝিঁঝিঁ পোকাটি সত্যি সুন্দর, আর সেই সময় প্রকৃতি-বিজ্ঞানীরা এর খবর জানত না বলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা ছিল খুবই মূল্যবান। পিঠের এক প্রান্তে দুটো কালো বিন্দু আর কাছেই আর একটা লম্বা দাগ। আঁশগুলো অসম্ভব শক্ত আর ঝকঝকে—ঠিক বার্নিসকরা সোনার মতই দেখতে। পোকাটার ওজনও যথেষ্ট। সব কিছু বিবেচনা করে জুপিটারের অভিমতকে দোষ দিতে পারি না। কিন্তু লিগ্র্যাণ্ড কি করে তার মতে সায় দিলেন সেটাই আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না।

তিনি গদগদস্বরে বললেন, “ভাগ্যলক্ষ্মী আর এই পোকাটির নির্দেশকে কার্যকর

করতে আপনার পরামর্শ ও সহায়তা পাবার আশায়ই আপনাকে ডেকে এনেছি ।”

তাকে বাধা দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলাম, “প্রিয় লিগ্র্যান্ড, আপনি নির্ঘাৎ অসুস্থ, এখনও সাবধান হোন । বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন, আপনি সেরে না ওঠা পর্যন্ত কয়েকটা দিন আমি আপনার কাছেই থাকব । আপনার জ্বর হয়েছে, আর—”

তিনি বললেন, “আমার নাড়িটা দেখুন ।”

নাড়ি দেখলাম । সত্যি কথা বলতে কি জ্বরের সামান্যমাত্র ইঙ্গিতও পেলাম না ।

“কিন্তু জ্বর না হলেও তো আপনি অসুস্থ হতে পারেন । আমাকেই সব ব্যবস্থা করতে দিন । প্রথমত, বিছানায় চলে যান । তার পরে—”

তিনি বাধা দিলেন, “আপনি ভুল করছেন ; যে উত্তেজনার ভিতর দিয়ে আমার দিন কাটছে সে অবস্থায় আমি যথাসম্ভব সুস্থই আছি । আপনি যদি আমার ভালই চান তো এই উত্তেজনা থেকে আমাকে মুক্ত করুন ।”

“সেটা কি করে করা যাবে ?”

“খুব সহজে । জুপিটার ও আমি মূল ভূখণ্ডের পাহাড়ে একটা অভিযানে যাচ্ছি, আর এই অভিযানে এমন একজন মানুষের সহায়তা আমাদের দরকার যার উপর আমরা ভরসা করতে পারি । আমাদের বিশ্বাসযোগ্য একমাত্র লোক আপনি । আমরা সফল হই আর বিফল হই, উভয় ক্ষেত্রেই আপনি আমাকে যে উত্তেজনার মধ্যে দেখছেন সেটা সমানভাবে প্রশমিত হবে ।”

আমি জবাব দিলাম, “যেকোনভাবে আপনার কাজে লাগতে আমি আগ্রহী ; কিন্তু আপনি কি বলতে চান যে আপনাদের এই পর্বত অভিযানের সঙ্গে এই নারকীয় ঝিঁঝিঁ পোকাটির কোন সম্পর্ক আছে ?”

“তা আছে ।”

“তাহলে লিগ্র্যান্ড, এ রকম একটি যুক্তিবিরুদ্ধ কাজের অংশীদার হতে আমি পারব না ।”

“আমি দুঃখিত—খুবই দুঃখিত—কারণ এ কাজ আমরা করবই ।”

“নিজেরাই চেষ্টা করে দেখুন । লোকটা নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে ! —কিন্তু দাঁড়ান ! —আপনারা কত সময় এখানে অনুপস্থিত থাকবেন বলে মনে করছেন ?”

“হয় তো সারা রাত । আমরা এখনই যাত্রা করব, আর যে কোন অবস্থাতেই ফিরব সূর্যোদয়ের আগে ।”

“আর—আপনার সম্মানের খাতিরে—আপনি কি আমাকে কথা দেবেন যে আপনার এই খেয়াল যখন কেটে যাবে, এই পোকার ব্যাপারটা (হা ঈশ্বর !) ভালভাবে মিটে যাবে, তখন আপনি বাড়ি ফিরে আসবেন এবং আপনার চিকিৎসকের পরামর্শের মতই আমার সব কথা সর্বতোভাবে মেনে চলবেন ?”

“হ্যাঁ, কথা দিলাম ; এবার তাহলে আমরা যাত্রা করি, কারণ নষ্ট করবার মত সময় আমাদের হাতে নেই ।”

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বন্ধুর সঙ্গী হলাম । চারটের সময় আমরা যাত্রা শুরু করলাম—লিগ্র্যান্ড, জুপিটার, কুকুরটা ও আমি । জুপিটারের কাছে থাকল কাস্তে ও কোদাল

ক'টা—এগুলি সে জোর করেই নিজের হেপাজতে রাখল, কোনটাকেই মনিবের হাতে তুলে দিতে রাজী হল না। তার আচরণ খুবই একগুঁয়ে মনে হল ; সারা পথ তার মুখ থেকে কেবল একটা কথাই শোনা গেল—"ব্যাটা শয়তান পোকা।" আমার হাতে কেবল দুটো কালিমাখা লণ্ঠন, আর লিগ্র্যান্ডের হাতে সেই ঝিঁঝিঁ পোকা ; একটা চাবুকের মাথায় সেটাকে ঝুলিয়ে এদিক-ওদিক দোলাতে দোলাতে সে হাঁটতে লাগল যাদুকরের ভঙ্গীতে।

দ্বীপের শেষ প্রান্তের খাঁড়িটা পার হলাম একটা ছোট নৌকোর সাহায্যে ; মূল ভূখণ্ডের উঁচু জমি বেয়ে উপরে উঠে আমরা উত্তর-পশ্চিম দিকে হাঁটতে লাগলাম। সমস্ত অঞ্চলটাই ঝোপঝাড়ে ভর্তি, নির্জন ; কোন মানুষের পায়ের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ে না। লিগ্র্যাণ্ড নিঃসংশয়ে চলল সকলের আগে।

এই ভাবে প্রায় দুই ঘন্টা চলার পরে সূর্য যখন অস্তোন্মুখ তখন আমরা এমন একটা অঞ্চলে পৌঁছলাম যেটা আরও বেশী নির্জন ও ভয়াবহ। প্রায় দুরারোহ একটা পাহাড়ের চূড়ার কাছাকাছি একটা সমতলভূমি। নীচ থেকে শিখর পর্যন্ত ঘন গাছপালায় ঠাসা। চারদিকে ছড়িয়ে গেছে অনেক গভীর গিরি-খাত। সমস্ত দৃশ্যটাতেই যেন লেগে আছে আরও গাম্ভীর্য, আরও কঠিন রুক্ষতার স্পর্শ। অনেক কষ্টে চলতে চলতে পৌঁছে গেলাম একটা প্রকান্ড লম্বা টিউলিপ গাছের নীচে ; তার পাশে আরও আট-দশটা ওক-গাছ। সেখানে পৌঁছে লিগ্র্যান্ড জুপিটারের দিকে মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইলেন সে ওই বড় গাছটাতে চড়তে পারবে কি না। প্রশ্নটা শুনে বুড়ো মানুষটা প্রথমে কিছুটা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল ; কোন জবাব দিল না। শেষ পর্যন্ত সে গাছটার গুঁড়ির কাছে গেল, ধীরে ধীরে চারদিক ঘুরে হাঁটল, গভীর মনোযোগ দিয়ে গাছটাকে পরীক্ষা করল, তারপর শুধু বলল,

"হ্যাঁ মাসা, জুপ জীবনে যত গাছ দেখেছে তার সবগুলিতেই চড়তে পারে।"

"তাহলে যত তাড়াতাড়ি পার কাজে লেগে যাও, কারণ অচিরেই এত অন্ধকার হবে যে আমরা যা খুঁজতে এসেছি তা চোখেই দেখা যাবে না।"

জুপিটার শুধাল, "কতদূর উঠতে হবে মাসা ?"

"প্রথমে মূল কান্ডটা বেয়ে উঠে যাও, তারপর কোন্ দিকে যেতে হবে আমি বলে দেব—আর—থাম। এই ঝিঁঝিঁপোকাটাকে সঙ্গে নিয়ে যাও।"

সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে নিগ্রোটি চেঁচিয়ে বলল, "ওই পোকাটা মাসা উইল ! সোনার পোকা ! ওই পোকাটাকে নিয়ে গাছে উঠতে হবে কেন ? মানে—ওটাকে নিতেই হবে ?"

"দেখ জুপ, তোমার মত বিশাল বপু একটা নিগ্রো যদি এই নিরীহ মরা ঝিঁঝিঁ-পোকাটাকে হাতে নিতে ভয় পায় তাহলে ওটাকে এই ভাবে দড়িতে ঝুলিয়ে নিতে পার—কিন্তু তুমি যদি কিছুতেই ওটাকে তোমার সঙ্গে নিতে না চাও তাহলে আমি বাধ্য হয়ে এই বেলচা দিয়ে তোমার মাথাটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।"

জুপ বলে উঠল, "হল কি মাসা ? বুড়ো মানুষটার সঙ্গে সব সময়ই এমন লাগ কেন বল তো ? আরে আমি তো তামাসা করছিলাম। আমি ভয় করব ওই পোকা-

টাকে ? ওটাকে আমি থোরাই তোয়াক্কা করি !” কোনমতে দড়ির একেবারে শেষ প্রান্তটা হাতে ধরে পোকাটাকে যতদূর সম্ভব নিজের শরীর থেকে দূরে রেখে জুপিটার গাছে চড়ার জন্য প্রস্তুত হল। তারপর অনেক কষ্ট করে দু’একবার পড়তে পড়তেও বেঁচে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত প্রথম দো-ডালা পর্যন্ত উঠে জুপিটার যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। অবশ্য গাছে ওঠার ঝুঁকিটা শেষ হলেও আরোহী তখন উঠে গেছে মাটি থেকে মাত্র ষাট কি সত্তর ফুট উপরে।

“এবার কোন্ দিকে যাব মাসা উইল ?” সে জানতে চাইল।

“এবার বড় ডালটা ধর—এদিককার ডালটা,” লিগ্র্যাণ্ড বললেন। তার কথামত জুপিটার বেশ তাড়াতাড়িই উপরে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে একসময়ে আর তাকে দেখাই গেল না। উপর থেকে কেবল ভেসে এল তার কন্ঠস্বর।

“আর কতদূর যাব ?”

“তুমি কতটা উঠেছ ?” লিগ্র্যাণ্ড শুধাল।

“অনেক উপরে ; গাছের উপর থেকে আকাশটা দেখতে পাচ্ছি।”

“আকাশের কথা থাক, আমার কথা শোন। গাছের নীচের দিকে তাকিয়ে এই দিকে যতগুলি দো-ডালা দেখতে পাও গুণে ফেল। তুমি কতগুলি দো-ডালা পার হয়েছ ?”

“এক, দুই, তিন, চার, পাঁচটা পার হয়েছি মাসা।”

“আরও একটা দো-ডালা উঠে যাও।”

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শোনা গেল, সে সপ্তম দো-ডালাতে উঠে গেছে।

“শোন জুপ,” লিগ্র্যাণ্ড চেঁচিয়ে বললেন ; এবার সে যথেষ্ট উত্তেজিত, “আমি চাই ওই ডালটা ধরে যতটা পার এগিয়ে যাও। যদি অদ্ভুত কিছু দেখ, আমাকে জানিও।”

বন্ধুটির মস্তিষ্কের অসুস্থতা সম্পর্কে যতটুকু সন্দেহ অবশিষ্ট ছিল এতক্ষণে তাও মিলিয়ে গেল। তাকে পুরোপুরি পাগল ভাবা ছাড়া কোন পথই আর রইল না। আমি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়লাম—কী ভাবে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেব। কি উপায় করব ভাবছি এমন সময় আবার জুপিটারের গলা শোনা গেল।

“এই ডালটা ধরে আর বেশী এগুতে ভয় করছে—ডালটা একেবারে মরা।”

“কি বললে জুপিটার, ডালটা মরা ?” লিগ্র্যান্ড কাঁপা গলায় প্রশ্ন করলেন।

“হ্যাঁ মাসা—দরজার পেরেকের মতই মরা—নির্ঘাৎ মরা—ডালটার ভবলীলা একেবারে শেষ।”

যেন অত্যন্ত দুঃখে লিগ্র্যাণ্ড হায়-হায় করে উঠল, “হা ঈশ্বর, এখন আমি কি করব ?”

সুযোগ পেয়ে আমি বলে উঠলাম, “কি করবেন ? বাড়ি ফিরে চলুন, গিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ুন। চলুন।—এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। দেরী হয়ে যাচ্ছে ; তাছাড়া আপনি কথা দিয়েছেন।”

আমার কথায় কান না দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে বললেন, “জুপিটার, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?”

‘হ্যাঁ মাসা, বেশ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।”

“তাহলে তোমার ছুরি দিয়ে কাঠটাকে পরীক্ষা কর; দেখ, ওটা খুব পচা কি না।”

একটু পরেই নিগ্রো উত্তর দিল, “পচা তো বটেই, তবে ততটা পচা নয়। আমি একা হলে হয় তো আরও একটু এগোতে পারতাম—’

“একা হলে!— কি বলতে চাও তুমি?”

“কেন? আমি পোকাটার কথাই বলছি। ওটা তো খুব ভারী। ধর, আমি যদি ওটাকে নীচে ফেলে দেই, এবং তারপর ডালটা বেয়ে এগিয়ে যাই, তাহলে শুধুমাত্র একটা নিগারের ভারে ডালটা ভাঙবে না।”

যেন কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে লিগ্র্যান্ড বলে উঠলেন, “ওরে নরকের পিশাচ! কি সব যা তা বকছিস! ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে আমিও তোর ঘাড় ভাঙব। জুপিটার, তুমি আমার কথাগুলি শুনতে পাচ্ছ তো?”

“হ্যাঁ মাসা; একটা নিগারের উপর এ রকম হম্বিতম্বি করার কোন দরকার ছিল না।”

“ঠিক আছে! এবার শোন!—তুমি যদি যতদূর নিরাপদ বোধ কর ততদূর পর্যন্ত ডালটা বেয়ে এগিয়ে যাও, আর ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে ফেলে না দাও, তাহলে নীচে নেমে আসা মাত্রই আমি তোমাকে একটা রুপোর ডলার পুরস্কার দেব।”

নিগ্রোটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, “আমি এখুনি যাচ্ছি মাসা উইল—ও-ও-ও-ওঃ! ঈশ্বর—আমাকে বাঁচাও! গাছের উপরে ওটা কি?”

লিগ্র্যাণ্ড খুব খুশি হয়ে বললেন, “বটে! ওটা কি?”

“আরে, এ যে একটা মাথার খুলি—হয়তো কেউ গাছের উপর ফেলে গেছে, আর কাকগুলো এসে ঠুকরে ঠুকরে সব মাংস খেয়ে ফেলেছে।”

“কি বললে? একটা খুলি!—খুব ভাল কথা!—ওটা কেমন করে ডালের সঙ্গে আটকানো আছে?—মানে, কি দিয়ে আটকানো হয়েছে?”

“ঠিক আছে মাসা, দেখছি। আরে, তাজ্জব ব্যাপার—সত্যি বলছি,—একটা খুব বড় পেরেক দিয়ে খুলিটাকে ডালের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছে।”

“ঠিক আছে জুপিটার। এবার আমি যেমন যেমন বলব ঠিক তেমনটি করবে। শুনছ?”

“হ্যাঁ মাসা।”

“তাহলে মন দিয়ে শোন।—খুলির বাঁ চোখটার দিকে তাকাও।”

“হুম্! হু! ঠিক আছে। কিন্তু কোন চোখই তো দেখতে পাচ্ছি না।”

“কি বোকার ডিম! তুমি কি ডান হাত বাঁ হাত বোঝ?”

“হ্যাঁ বুঝি—সব বুঝি—এটা আমার বাঁ হাত, যে হাত দিয়ে কাঠ কাটি।”

“ঠিক বলেছ! তুমি তো ন্যাটা। যেদিকে তোমার বাঁ হাতটা আছে সেই দিকেই আছে তোমার বাঁ চোখ। আশা করি এবার তুমি খুলির বাঁ চোখটা খুঁজে পাবে, অথবা বাঁ চোখের জায়গাটা। পেয়েছ কি?”

অনেকক্ষণ চুপচাপ। শেষ পর্যন্ত নিগ্রো শুধাল, “খুলির বাঁ চোখটা কি তাহলে খুলিটারও বাঁ হাতের দিকেই হবে? কারণ খুলিটার তো কোন হাতেই নেই—ঘাবড়াবেন না! বাঁ চোখটা পেয়েছি—এই তো বাঁ চোখ! এখন কি করব?”

“ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে ওর ভিতর দিকে গলিয়ে দাও যতদূর পর্যন্ত দড়িটা যায় কিন্তু খুব সাবধান, দড়িটাকে যেন ছেড়ে দিও না।”

“সব করেছি মাসা উইল; গর্তের ভিতর দিয়ে পোকাটাকে ঢুকিয়ে দেওয়া তো অতি সোজা কাজ—নীচ থেকেই তাকিয়ে দেখ না।”

এই সংলাপ বিনিময়ের সময়ে জুপিটারের দেহের কোন অংশই দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু তার নামিয়ে দেওয়া দড়ির প্রান্তে ঝুলে থাকা পোকাটাকে এবার দেখা গেল; অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো পড়ে পোকাটা জ্বলজ্বল করছে বার্নিস করা সোনার তালের মত। ঝিঁঝিঁ পোকাটা কোন পাতার আড়ালে ঢাকা না পড়ায় নীচে ফেলে দিলে পড়বে ঠিক আমাদের পায়ের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে লিগ্র্যান্ড কাস্তেটা হাতে নিয়ে পোকাটার ঠিক নীচে তিন-চার গজ ব্যাসের একটি গোলাকার জায়গা ভাল করে পরিস্কার করে ফেললেন; তারপর জুপিটারকে হুকুম করলেন, এবার দড়িটা ছেড়ে দিয়ে গাছ থেকে নেমে এস।

ঝিঁঝিঁ পোকাটা ঠিক যেখানে এসে মাটিতে পড়ল সেইখানে একটা খোঁটা পুঁতে দিয়ে বন্ধুটি এবার পকেট থেকে একটা মাপের ফিতে বের করলো। গাছ থেকে খোঁটার দূরত্বটাকে ভালভাবে মেপে নিয়ে চার ফুট ব্যাসের একটি বৃত্ত মাটিতে এঁকে দিলেন। তারপর নিজে একটা কোদাল হাতে নিলেন, আর বাকি দুটো কোদাল জুপিটার ও আমার হাতে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা গর্ত খুঁড়তে বললেন।

সত্যি কথা বলতে কি, এ ধরনের মজার খেলা আমার কোন কালেই ভাল লাগে না; বিশেষ করে এই বিশেষ মুহূর্তে আমি হয় তো ইচ্ছা করেই আপত্তি করতাম। রাত আসন্ন, দীর্ঘ পরিশ্রমে আমিও ক্লান্ত; কিন্তু এড়িয়ে যাবার পথ নেই, কারণ বন্ধুর ইচ্ছার বিরোধিতা করে বেচারির মানসিক সাম্যকে বিঘ্নিত করারও অনেক বিপদ। তাছাড়া, জোর করে তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবার প্রচেষ্টায় যে জুপিটারের কাছ থেকে কোনরকম সহায়তা পাব সেটা আশা করাও দুরাশা মাত্র। বুড়ো নিগ্রোকে আমি ভাল করেই চিনি, তার মনিবের সঙ্গে লড়াই বাঁধলে সে যে কোন অবস্থাতেই আমার পক্ষ নেবে না সেটা আমি ভালই বুঝি। অতএব যতই বিরক্ত হই, যতই বিচলিত বোধ করি না কেন, শেষ পর্যন্ত তার কথামতই মাটি খোঁড়ার কাজে লেগে গেলাম। তখনও মনে আশা—যত তাড়াতাড়ি মাটি খোঁড়ার কাজ শেষ হবে ততই এই স্বপ্নচারী বন্ধুটি নিজের চোখে দেখতে পাবে তার সব স্বপ্নের ব্যর্থ পরিণতি।

দু'ঘণ্টা ধরে একটানা কাজ চলল। কারও মুখে কথা নেই; কুকুরটাই বুঝি আমাদের কাণ্ড-কারখানা দেখে অবিরাম ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে চলেছে। তবু শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জুপিটার গর্তের ভিতর থেকে উঠে গিয়ে কুকুরের মুখটাকে শক্ত করে বেঁধে রেখে আবার এসে কাজে হাত দিল।

ক্রমে গর্তটা পাঁচ ফুট গভীর করে কাটা হয়ে গেল, তখনও গুপ্তধনের কোন চিহ্নই

চোখে পড়ল না। সকলেরই হাত থেমে গেল ; আশা হল, এবার হয়তো প্রহসনও শেষ হল। কিন্তু যতই বিচলিত দেখাক, লিগ্র্যান্ড কিন্তু হাল ছাড়লেন না। ভুরুর ঘাম মুছে ফেলে আবার কাজ শুরু করে দিলেন। চারফুট ব্যাসের গর্তটাকে আরও একটু বড় করে আরও দুই ফুট গভীর পর্যন্ত মাটি কাটা হল। তবু প্রার্থিত মানিকের দেখা মিলল না। স্বর্ণ-সন্ধানী নিজেও শেষ পর্যন্ত গর্ত বেয়ে উপরে উঠে এলেন। তার চোখে-মুখে তীব্র হতাশার ছাপ। ধীরে ধীরে যেন একান্ত অনিচ্ছায় কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে চড়ালেন। আমি একেবারে চুপ। মনিবের নির্দেশে জুপিটার যন্ত্রপাতিগুলো হাতে নিল। কুকুরের মুখের বাঁধনও খুলে দিল। নিঃশব্দে আমরা বাড়ির পথ ধরলাম।

হয়তো ডজনখানেক পা এগিয়েছি এমন সময় জোর গলায় একটা শপথ উচ্চারণ করে লিগ্র্যান্ড ছুটে গিয়ে জুপিটারের কলারটা চেপে ধরল। বিস্মিত জুপিটার হাঁ করে তাকিয়ে রইল ; হাত থেকে কোদালগুলি পড়ে গেল ; সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল।

দাঁতে দাঁত চেপে লিগ্র্যান্ড হিস্ হিস্ করে বলে উঠলেন, "ওরে পাজি, নরকের কালো শয়তান,—বল্! এই মুহূর্তে আমার কথার উত্তর দে! কোন্‌টা তোর বাঁ চোখ?"

"হা আমার কপাল, মাসা উইল! এটাই কি আমার বাঁ চোখ নয়?" ভয়ার্ত জুপিটার দক্ষিণ দর্শন-ইন্দ্রিয়ের উপর নিজের হাতটা রেখে হাঁক দিয়ে বলে উঠল।

"আমি তাই ভেবেছিলাম! —আমি এটা জানতাম! হুর্-র্-রা!" জোর গলায় কথাগুলি বলতে বলতে লিগ্র্যান্ড নিগ্রোকে ছেড়ে দিয়ে চাকরের সামনেই অদ্ভুত সব অঙ্গভঙ্গী করতে লাগলেন। চাকরটি নীরবে একবার মনিবের দিকে, একবার আমার দিকে তাকাতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত মনিব বলে উঠলেন, "চলে এস। আবার ফিরে যেতে হবে। খেলা এখনও শেষ হয় নি।" তিনিই পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে গেলেন সেই টিউলিপ-গাছের তলায়। তারপর বললেন, "জুপিটার, এখানে এস! খুলিটা পেরেক দিয়ে ডালের সঙ্গে আটকানো ছিল মুখটাকে বাইরের দিকে রেখে না গাছের দিকে রেখে?"

"মুখটা বাইরের দিকে ছিল মাসা, যাতে কাকগুলো বিনা বাধায় চোখ দুটো ভাল-ভাবে দেখতে পায়।"

"বেশ কথা ; এবার বল—এই চোখ না ওই চোখ কোন্‌টার ভিতর দিয়ে তুমি ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে নামিয়ে দিয়েছিলে?" —এই কথা বলার সময় লিগ্র্যান্ড পর পর জুপিটারের দুটো চোখে আঙুল ছোঁয়ালেন।

"এই চোখটা মাসা—এই বাঁ চোখটা—তুমি তো তাই বলেছিলে ;" এই কথা বলার সময় নিগ্রোটি তার ডান চোখই দেখাল।

"ওতেই হবে—আমরা আবার চেষ্টা করে দেখব।"

বন্ধুবর জায়গাটাকে নতুন করে মাপ-জোপ করলেন। আগের জায়গা থেকে বেশ কয়েক গজ দূরে একটা নতুন জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে আগের চাইতে কিছু বড় একটা

বৃত্ত এঁকে দিলেন। আবার আমরা কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। আমি তখন অত্যন্ত ক্লান্ত, তবু কেন জানি না কাজটার প্রতি এবার আমার আগ্রহ বেড়ে গেল। হয় তো লিগ্র্যাণ্ডের নানাবিধ হটকারী চাল-চলনের মধ্যেও এবার কিছুটা চিন্তা-ভাবনা ও বিচার-বিবেচনার ছাপ আমি ধরতে পেরেছিলাম। আগ্রহ সহকারে মাটি কোপাতে লাগলাম; কেন জানি না, তখন আমার মনেও যেন একটা আশার সঞ্চার হতে শুরু করেছে। এইভাবে ঘণ্টা দেড়েক কাজ করার পরে কুকুরটা আবার গর্জাতে শুরু করল। ভিতরের কি একটা আক্রোশে সে যেন ফুলছে। জুপিটার তার মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করলে কুকুরটা ভীষণভাবে তাকে বাধা দিল, এবং এক লাফে গর্তের মধ্যে পড়ে দুই থাবা দিয়ে পাগলের মত মাটি খুঁড়তে লাগল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সে বের করে ফেলল মানুষের হাড়ের এমন একটা স্তূপ যা দিয়ে দুটো সম্পূর্ণ নর-কংকাল গড়ে তোলা যায়; তার সঙ্গে বের হল কয়েকটা ধাতুর বোতাম, এবং জীর্ণ পশমের কিছু ধুলো। কোদালের আরও দু'একটা কোপের সঙ্গেই উঠে এল একটা মস্ত বড় স্পেনীয় ছুরির ফলা। আরও কিছুটা খুঁড়ে দেখতে পেলাম তিন-চারটে সোনার ও রুপোর মুদ্রা।

এই সব দেখে জুপিটারের মনে আনন্দ আর ধরে না, কিন্তু তার মনিবের মুখে নেমে এল গভীর অসন্তোষের কালো ছায়া। তবু তিনি আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কিসে যেন পা ঠুকে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম—আল্‌গা মাটিতে অর্ধ-প্রোথিত একটা বড় লোহার আংটায় আমার জুতোর আগাটা ঢুকে যাওয়ার ফলেই এই বিপত্তি ঘটল।

আমরা নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করলাম। এত তীব্র উত্তেজনার মধ্যে দশ মিনিট সময় আগে কখনও কাটাই নি। এই সময়টুকুর মধ্যেই আমরা মাটি খুঁড়ে বের করলাম একটা আয়তাকার কাঠের সিন্দুক। বাক্সটা সাড়ে তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া, এবং আড়াই ফুট গভীর। পেটা লোহার পেটি দিয়ে খুব ভাল করে বাঁধা। সিন্দুকের দুই পাশেই তিনটে করে লোহার আংটা—মোট ছ'টা—এমন ভাবে আটকানো যাতে দু'জন মানুষ শক্ত মুঠিতে সিন্দুকটাকে ধরতে পারে। আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সিন্দুকটা সামান্য একটু নড়ল মাত্র। তাতেই বুঝলাম, এত ভারী সিন্দুককে এখান থেকে তুলে নেওয়া অসম্ভব। সৌভাগ্যবশত সিন্দুকের ডালার পেটিগুলি দুটো হুড়কোর সঙ্গে আটকানো ছিল। উদ্বেগে কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে আমরা হুড়কো দুটো টেনে খুলে ফেললাম। মুহূর্তের মধ্যে অপরিমিত মূল্যের এক বিপুল ধন-ভাণ্ডার আমাদের সামনে ঝলমল করে উঠল। লণ্ঠনের শিখাগুলি গর্তের মধ্যে পড়ে তাল তাল সোনা ও হীরা—মুক্তার বিচ্ছুরিত উজ্জ্বল আলো আমাদের চোখগুলিকে সম্পূর্ণ ধাঁধিয়ে দিল।

আমরা সকলেই হতচকিত। লিগ্র্যান্ড উত্তেজনায় একেবারে ভেঙে পড়লেন; তার মুখ থেকে একটা কথাও বের হল না। কয়েক মিনিটের জন্য জুপিটারের মুখে কে যেন কালি ঢেলে দিল। দেখে মনে হল—সে যেন আতংকে অনড়—বজ্রাহত। গর্তের মধ্যেই হাঁটু ভেঙে বসে দুই হাতের কনুই পর্যন্ত সোনার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে চুপ করে

রইল—যেন মনে মনে স্বর্ণ-স্নানের অপূর্ব সুখ ভোগ করছে। শেষ পর্যন্ত একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বগত-উক্তির মতই বলে উঠল ঃ

"এ সব কিছুই এই সোনার পোকাটির দান! আমার আদরের সোনার ঝিঁঝিঁ! এই ছোট্ট সোনামণিকে আমি কত না অশ্রদ্ধা করেছি! ওরে নিগার, তোর লজ্জা হচ্ছে না? —আমার প্রশ্নের জবাব দে!"

শেষ পর্যন্ত চিন্তাটা আমার মাথায়ই এল যে প্রভু-ভৃত্য দুজনকেই এখন বোঝাতে হবে যে এই বিপুল পরিমাণ সম্পদকে অবিলম্বে এখান থেকে সরিয়ে নেওয়া দরকার। অনেক দেরী হয়ে গেছে; দিনের আলো ফুটবার আগেই সব কিছু বাড়িতে নিয়ে তুলতে হবে। কি ভাবে সেটা করা হবে সেই আলোচনাতেই অনেক সময় কেটে গেল। শেষ পর্যন্ত সিন্দুকের ভিতরকার তিনভাগের দুই ভাগ মাল বের করে সিন্দুকটাকে হাল্কা করে নিয়ে তারপর অনেক কষ্টে সেটাকে গর্তের ভিতর থেকে তুললাম। সেই সব মাল ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে কুকুরটাকে পাহারায় বসিয়ে আমরা সিন্দুক নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। যথেষ্ট পরিশ্রম করে সকাল একটা নাগাদ নিরাপদে বাড়ি পেঁছে গেলাম। দুটো পর্যন্ত বিশ্রাম করে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনটে বড় বস্তা সঙ্গে নিয়ে আবার ছুটলাম পাহাড়ে। চারটের একটু আগে গর্তের কাছে পেঁছে গুপ্তধনের বাকি মাল সমান তিনভাগে ভাগ করে গর্তটা না বুজিয়েই সোনাভর্তি বোঝা নিয়ে যখন দ্বিতীয়বার বাড়ি এলাম তখন পূব আকাশের গাছের মাথায় ভোরের প্রথম আলোর রেখা সবে ফুটে উঠছে।

তখন আমরা ক্লান্তিতে একেবারেই ভেঙে পড়েছি; কিন্তু যে তীব্র উত্তেজনা তখন আমাদের মনে বাসা বেঁধেছে তা নিয়ে বুঝি নির্বিঘ্নে বিশ্রাম করাও সম্ভব নয়। কোন রকমে দুই-চার ঘণ্টার জন্য অশান্ত ঘুমে কাটিয়ে সকলে একসঙ্গে জেগে উঠে রত্ন-ভাণ্ডারের হিসাব করতে বসে গেলাম।

সিন্দুকটা কানায়-কানায় ভর্তি; সব মাল খুটিয়ে দেখতে পুরো দিন এবং রাতেরও অনেকটা সময় কেটে গেল। মালগুলি মোটেই সাজানো-গোছানো ছিল না। কোন-রকমে স্তূপ করে রাখা হয়েছিল। সেগুলিকে যত্ন করে ভাগ-ভাগ করে রেখে বুঝতে পারলাম, যে সম্পদ আমরা পেয়েছি সেটা আমাদের প্রত্যাশার চাইতেও অনেক বেশী, সবই নানা রকমের বিচিত্র সব সেকেলে মুদ্রা—ফরাসী, স্পেনীয়, জার্মান; কিছু বৃটিশ গিনি, আর কিছু এমন সব মুদ্রা যা আমরা আগে কখনও দেখি নি। তবে কোন মার্কিন মুদ্রা ছিল না। হীরে-জহরত যা পেলাম তার মূল্যের কোন পরিমাপ করা আমাদের সাধ্যাতীত। তাছাড়া, নিরেট সোনার গহনাও ছিল প্রচুর—দুটো মোটা-মোটা আঙুলের ও কানের আংটি; খুব দামী অন্তত ত্রিশটা গলার হার; আরও যে কত রকমের গয়না ও টুকি-টাকি জিনিস—সব মনেও নেই।

শেষ পর্যন্ত ভুল-ভাল সব হিসেবপত্র শেষ করবার পরে আমাদের উত্তেজনার তাপমাত্রা যখন কিছুটা কমে এল তখন আমার দিকে ভাল করে তাকিয়েই লিগ্র্যাণ্ড বুঝতে পারলেন যে এই রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কারের অসাধারণ রহস্যের সমাধান কি করে সম্ভব হল সেটা জানবার কৌতূহল বুকের মধ্যে চেপে আমি আর স্থির থাকতে

পারছি না। তাই তিনি ধীরে ধীরে এই রহস্যের একটা আনুপূর্বিক বিবরণ আমাকে শোনালেন।

তিনি বলতে শুরু করলেন, "সে রাতটার কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে যখন ঝিঁঝিঁপোকার একটা মোটামুটি রেখাচিত্র আমি আপনার হাতে দিয়েছিলাম। আপনার আরও মনে থাকার কথা যে আপনি যখন বার বার বললেন যে আঁকাটা দেখতে একটা মরার মাথার মত তখন আমি খুবই বিরক্ত হয়েছিলাম। আপনি যখন প্রথম ও কথা বললেন তখন আমি ভেবেছিলাম আপনি তামাসা করছেন; কিন্তু পরে যখন পোকাটার পিঠের উপরকার দুটো বিশেষ বিন্দুর কথা মনে পড়ে গেল তখন আমার নিজেরই মনে হয়েছিল যে আপনার কথার মধ্যে কিছুটা সত্য ছিল। তথাপি আমার শিল্পকৃতি নিয়ে ঠাট্টা করায় আমি বিরক্ত হয়েছিলাম—কারণ সকলেই আমাকে একজন ভাল শিল্পী বলে মনে করে—অতএব আপনি যখন সেই কাগজখানা আমার হাতে দিলেন তখন আমি রাগে সেখানাকে দলা পাকিয়ে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছিলাম।"

"আপনি বোধ হয় সেই ছেঁড়া কাগজের টুকরোটার কথা বলছেন" আমি বললাম।

"না; সেখানা দেখতে বাজে কাগজের মতই বটে; প্রথমে আমিও তাই মনে করেছিলাম, কিন্তু তার উপরে ছবি আঁকতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম সেখানা খুব পাতলা পার্চমেন্ট কাগজ। আপনার নিশ্চয় মনে আছে, কাগজটা খুব নোংরা ছিল। কাগজটাকে দলা পাকাতে গিয়েই আমার চোখ পড়ল যে আঁকাটা আপনি দেখেছিলেন তার উপর, আর যেখানে আমি ঝিঁঝিঁপোকাটা এঁকেছিলাম ঠিক সেখানেই একটা মড়ার মাথা দেখে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। আমি তো ভাল করেই জানতাম যে আমার আঁকাটা এটার চাইতে অন্যরকম ছিল; —যদিও দুটোর মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্যও ছিল। তখন একটা মোমবাতি হাতে নিয়ে ঘরের আরেক কোণে বসে কাগজটাকে আরও ভাল করে পরীক্ষা করলাম। কাগজটাকে ওল্টাতেই উল্টো দিকে আমার নিজের আঁকা রেখাচিত্রটা দেখতে পেলাম। এখন, আমার অজান্তে পার্চমেণ্টের উল্টো দিকে যে একটা মড়ার মাথা আঁকা ছিল আমার আঁকা ঝিঁঝিঁপোকাটার ঠিক নীচে, আর সেই মড়ার খুলির রেখাচিত্র এবং আকার ছিল আমার আঁকা ছবিরই অনুরূপ, তাতে প্রথমটা আমি অবাক হয়েছিলাম। দুটো ছবির এই বিচিত্র মিল আমাকে যেন হতবুদ্ধি করে তুলেছিল। কিন্তু সেই ঘোর কাটার পরে আমার খুব স্পষ্ট করেই মনে পড়ল, আমি যখন ঝিঁঝিঁপোকার রেখাচিত্রটা এঁকেছিলাম তখন সেই পার্চমেণ্টের উপর কোন কিছুই আঁকা ছিল না। এ বিষয়ে আমি একেবারে স্থিরনিশ্চিত ছিলাম, কারণ আমার বেশ মনে ছিল যে একটা পরিষ্কার জায়গা খুঁজতে গিয়ে নোংরা পার্চমেণ্টখানার দুই পিঠই আমি উল্টে-পাল্টে দেখেছিলাম। মড়ার খুলিটা যদি সেখানে থাকত তাহলে অবশ্যই আমার চোখে পড়ত। এত বড় একটা রহস্যের কোন ব্যাখ্যাই আমি খুঁজে পেলাম না। যাই হোক, তখনই আসন ছেড়ে উঠে পার্চমেণ্টখানাকে নিরাপদে সরিয়ে রেখে সম্পূর্ণ একা না হওয়া পর্যন্ত সব চিন্তা-ভাবনা বন্ধ করলাম।

"তার পর আপনি চলে গেলেন; জুপিটারও ঘুমিয়ে পড়ল; তখন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বসলাম। প্রথমেই চিন্তা করলাম, পার্চমেণ্ট কাগজটা কিভাবে

আমার হাতে এসেছিল। দ্বীপের মাইলখানেক পূবে মূল ভূখণ্ডের সমুদ্রতীরে জলরেখা থেকে কিছুটা উপরে প্রথম আমরা ঝিঁঝিঁপোকাটাকে আবিষ্কার করি। সেটাকে ধরতেই আমাকে শক্ত একটা কামড় দিয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি সেটাকে ফেলে দিয়েছিলাম। জুপিটার সতর্ক মানুষ; পোকাটাকে হাত দিয়ে ধরবার আগে গাছের পাতা বা ঐ জাতীয় এমন কোন জিনিসের খোঁজে চারদিকে চোখ ফেলল যা দিয়ে পোকাটাকে চেপে ধরা যায়। ঠিক তখনই তার ও আমার চোখ পড়েছিল পার্চমেণ্টের টুকরোটার উপর; সেটাকে তখন সাধারণ কাগজ বলেই মনে করেছিলাম। পার্চমেণ্টখানা অর্ধেক মাটিতে পোতা ছিল; কেবল একটা কোণ বাইরে বেরিয়ে ছিল। যেখানে সেটা ছিল তার কাছেই দেখেছিলাম কোন জাহাজের "লংবোট"-এর খোলের কিছু ভাঙা অংশ। দেখে মনে হয়েছিল, সেটা দীর্ঘকাল ধরে সেখানে পড়ে আছে। কারণ দেখে সেটাকে নৌকোর কাঠ বলে বোঝাই যাচ্ছিল না।

"তখন জুপিটার সেই পার্চমেন্টখানা দিয়ে ঝিঁঝিঁপোকাটাকে মুড়ে আমার হাতে তুলে দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরেই আমরা বাড়ির পথ ধরলাম, এবং পথে লেফটেন্যাণ্ট জি—র সঙ্গে দেখা হলে পোকাটাকে আমার হাতে দেখে তিনি সেটাকে দুর্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তার কথায় সম্মত হলে তিনি সেটাকে হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার ওয়েস্টকোটের পকেটে রেখে দিলেন; পার্চমেণ্টখানা আমার হাতেই রয়ে গেল। হয়তো কোন কিছু না ভেবেই সেটাকে আমি নিজের পকেটেই রেখে দিয়েছিলাম।

"আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ঝিঁঝিঁ পোকাটার রেখাচিত্র আঁকবার জন্য টেবিলে গিয়ে বসার পরে সেখানে কোন কাগজ না থাকায় দেরাজের ভিতর খুঁজেও কোন কাগজ পেলাম না। তারপর যেকোন একটা পুরনো চিঠির খোঁজে পকেটে হাত দিয়ে পেয়ে গেলাম পার্চমেণ্টের টুকরোটা।

"আমার এই সব কথা শুনে আপনি হয়তো আমাকে অতিমাত্রায় কল্পনাপ্রবণ ভাবছেন। কিন্তু আসলে কি জানেন, তখনই আমি এই সব ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পেয়েছিলাম। মনে মনে একটা বড় চিন্তা-শৃংখলের দুটো গাঁটকে একত্র জুড়ে নিয়েছিলাম। সমুদ্রের উপকূলে একটা ভাঙা নৌকো পড়েছিল; তার অনতিদূরেই পড়েছিল একখানা পার্চমেন্ট—সাধারণ কাগজ নয়—আর তার উপরে আঁকা ছিল একটা মড়ার খুলি। আপনি হয় তো প্রশ্ন করবেন, 'যোগসূত্রটা কোথায়?' আমার জবাব, খুলি বা মড়ার মাথা জলদস্যুদের অতি-পরিচিত প্রতীক-চিহ্ন। তাদের সব জাহাজেই মড়ার মাথা আঁকা পতাকা ওড়ে।

"আগেই বলেছি, টুকরোটা পার্চমেণ্ট, সাধারণ কাগজ নয়। পার্চমেণ্ট খুব টেকসই—প্রায় অক্ষয়। তুচ্ছ প্রয়োজনে কেউ পার্চমেণ্ট ব্যবহার করে না, কারণ ছবি আঁকা বা লেখার পক্ষে পার্চমেণ্ট অপেক্ষা সাধারণ কাগজই অধিক উপযোগী। এই চিন্তা থেকেই মড়ার খুলির ব্যাপারটা আমার কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "কিন্তু আপনিই বলেছেন ঝিঁঝিঁপোকা আঁকার সময় মড়ার খুলিটা পার্চমেণ্টে আঁকা ছিল না। তাহলে নৌকো ও মড়ার খুলির যোগসূত্রের

ব্যাপারটা আপনি পেলেন কোথায়—কারণ আপনার নিজের কথা অনুসারেই মড়ার খুলিটা আঁকা হয়েছিল (কি ভাবে এবং কার হাতে তা ঈশ্বরই জানেন) আপনার ঝিঁঝিঁপোকা আঁকার পরবর্তী কোন সময়ে ?"

"আহা, আসল রহস্যটা তো সেখানেই ; অবশ্য সে রহস্যের সমাধানটা আমি সহজেই করতে পেরেছিলাম। আমার চিন্তার ধাপগুলি ছিল নিশ্চিত, আর তা থেকে একটিমাত্র সিদ্ধান্তই হতে পারত। যেমন, আমি এই ভাবে চিন্তা করেছিলাম ঃ আমি যখন ঝিঁঝিঁ-পোকাটা আঁকি তখন পার্চমেণ্টের উপর কোন মড়ার খুলি দেখা যায় নি। আঁকা শেষ করে আমি সেটা আপনার হাতে দিলাম, আর আপনি সেটা ফিরিয়ে দেওয়া পর্যন্ত আমার দৃষ্টি আপনার উপরেই পুরোপুরি ছিল। সুতরাং মড়ার খুলির ছবি আপনি আঁকেন নি, আর সেখানে কোন তৃতীয় লোকও উপস্থিত ছিল না। তাহলে এ কাজটা কোন মানুষ করে নি। অথচ কাজটা ঠিকই করা হয়েছিল।

"আমার চিন্তাধারার এই স্তরে পৌঁছে আলোচ্য সময়ের প্রত্যেকটি ঘটনাকে স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম এবং খুব স্পষ্টভাবেই স্মরণ করতে পেরেছিলামও। আবহাওয়া ছিল খুব ঠাণ্ডা (আহা, এমন আকস্মিক যোগাযোগ কত বিরল অথচ কত সুখের !) আর চুল্লীতেও জ্বলছিল গনগনে আগুন। আমার শরীরটা পরিশ্রমের ফলেই গরম ছিল বলে টেবিলে বসেছিলাম, আর আপনি চেয়ারটাকে টেনে নিয়েছিলেন চিমনির কাছে। পার্চমেণ্টখানা আপনার হাতে দিলাম ; আপনি সেটা ভাল করে দেখতে লাগলেন ; আর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ঘরে ঢুকে লাফিয়ে উঠল আপনার কাঁধে। আপনি বাঁ হাত দিয়ে তাকে আদর করে সরিয়ে দিলেন, আর আপনার ডান হাতটি (যাতে পার্চমেণ্টখানা ধরা ছিল) অজান্তেই দুই হাঁটুর ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়ল আগুনের খুব কাছে। এক সময় মনে হল, পার্চমেণ্টে বুঝি আগুন ধরে যাবে ; আপনাকে সতর্ক করে দিতেও যাচ্ছিলাম ; কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই আপনি নিজে থেকেই হাতটা তুলে নিয়ে পার্চমেণ্টটাকে দেখতে লাগলেন। এই সব ঘটনার সময় কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আমার মনে এ সন্দেহটা উঁকি মারে নি যে 'তাপই' হচ্ছে সেই শক্তি যার ফলে পার্চমেণ্টের উপর মড়ার খুলির ছবিটা ফুটে উঠেছিল। আপনি তো ভালই জানেন এমন রাসায়নিক মিশ্রণ আছে—স্মরণাতীত কাল থেকেই আছে—যার সাহায্যে কাগজ বা ভেলামের উপরে এমনভাবে লেখা বা আঁকা সম্ভব যা একমাত্র আগুনের তাপেই চোখে দেখা যায়। যার উপর লেখা হয় সেটা ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই লেখাটাও অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং আবার তাপের সামনে রাখলেই লেখা ফুটে ওঠে।

"এবার আমি খুব যত্ন সহকারে মড়ার খুলিটাকে পরীক্ষা করতে লাগলাম। ভেলাম-এর প্রান্তবর্তী রেখাগুলি অন্য জায়গার তুলনায় অনেক বেশী স্পষ্ট। তাতেই বুঝতে পারলাম, রাসায়নিক দ্রবণের উপর তাপের ক্রিয়া সব জায়গায় সমানভাবে পড়ে নি। সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুন জ্বালিয়ে পার্চমেণ্টের সবগুলি জায়গা জ্বলন্ত তাপের উপর সমানভাবে মেলে ধরলাম। প্রথমে কেবলমাত্র মড়ার খুলির অস্পষ্ট রেখাগুলি জোরালো হয়ে উঠল ; ক্রমে বার বার সেই পরীক্ষাটা চালাবার পরে পার্চমেণ্টের উপরে মড়ার খুলির ঠিক বিপরীত কোণে ফুটে উঠল এমন একটা মূর্তি যাকে প্রথমে আমি

একটা ছাগলই মনে করেছিলাম। অবশ্য আরও খুঁটিয়ে দেখার পরে বুঝতে পারলাম যে ওটা আঁকা হয়েছিল কোন এক Kid-এর জন্য।"

আমি হো-হো করে হেসে বললাম, "আপনাকে দেখে হাসবার অধিকার আমার নেই—পনেরো কোটি টাকা তো আর হাসির ব্যাপার নয়—নিশ্চয়ই এবার আপনি জলদস্যু আর ছাগলের মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজবেন না। আপনি নিশ্চয় জানেন জলদস্যুদের সঙ্গে ছাগলের কোন সম্পর্ক নেই।"

"কিন্তু আমি তো এইমাত্র বলেছি যে মূর্তিটা ছাগলের নয়।"

"তাহলেও—ছাগল-ছানা আর ছাগল তো অনেকটা একই বস্তু।"

"অনেকটা এক, কিন্তু পুরোপুরি এক নয়," লিগ্র্যান্ড বললেন, "জনৈক ক্যাপ্টেন কিড-এর নাম আপনি হয়তো শুনে থাকবেন। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অংকিত জন্তুটিকে এক ধরনের দ্ব্যর্থবোধক চিহ্ন বা কোন স্বাক্ষরের চিত্রলিপি বলে ধরে নিলাম। আমি স্বাক্ষর বলছি, কারণ ভেলামের উপর ছবিটির অবস্থানই আমার মনে ধারণাটার সৃষ্টি করেছিল। ঐ একই কারণে ঠিক কোণাকুণি বিপরীতে অবস্থিত মড়ার খুলিটাকেও আমি ধরে নিয়েছিলাম একটা প্রতীক বা মোহর বলে। কিন্তু আমার কল্পিত চিঠির বাকি অংশটা পার্চমেন্টের উপর দেখতে না পেয়ে আমি বড়ই দমে গেলাম।"

"আমার মনে হচ্ছে, মোহর ও স্বাক্ষরের মাঝখানে আপনি একটা চিঠি দেখতে পাবেন বলে আশা করেছিলেন।"

"অনেকটা সেই রকমই। আসলে একটা বিরাট সম্পত্তি লাভের আসন্ন সম্ভাবনা তখন আমাকে একেবারে পেয়ে বসেছিল। কেন তা আমি বলতে পারব না। হয় তো বাস্তব বিশ্বাস না হয়ে এটা একটা বাসনামাত্র ; —কিন্তু আপনি কি জানেন যে "ঝিঁঝি পোকাটা নিরেট সোনার" জুপিটারের এই অর্থহীন কথাগুলি আমার কল্পনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল ? তার উপর পর পর এতগুলি আকস্মিক ঘটনা এবং ঐক্য —এও তো একান্তই অসাধারণ। আপনি কি আরও লক্ষ্য করেছেন যে এতগুলি ঘটনাও নেহাৎ আকস্মিকভাবেই ঘটল সারা বছরের মধ্যে এমন একটা দিনে যেটা ছিল এতবেশী ঠান্ডা যে ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাবার দরকার হয়েছিল আর ঘরে আগুন না থাকলে, অথবা ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরটা ঘরে না ঢুকলে আমি মড়ার খুলির কথাও জানতে প্যারতাম না, আর এই বিপুল সম্পত্তির মালিকও হতাম না ?"

"বলে যান—আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।"

"ঠিক আছে ; কিড ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অতলাতিক মহাসাগরের উপকূলে কোন এক জায়গায় অনেক ধন-রত্ন মাটির নীচে চাপা দিয়ে রেখেছে—এই মর্মে প্রচলিত নানা গল্প আর হাজার গুজব আপনি অবশ্যই শুনেছেন। এই সব গুজবের নিশ্চয় কোন বাস্তব ভিত্তি আছে এবং ছিল। যে কোন কারণেই হোক সেই গুপ্তধন আজও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি ; অন্তত আবিষ্কৃত হবার কোন বিবরণ আজ পর্যন্তও পাওয়া যায় নি। উপকূলবর্তী কোন স্থানে বড় রকমের কোন গুপ্তধন আবিষ্কারের কথা আপনি কি কখনও শুনেছেন ?"

"কখনও শুনি নি।"

"কিন্তু কিড-এর সেই সঞ্চিত ধন-রত্ন যে পরিমাণে বিপুল ছিল সেটা সকলেই জানে। সুতরাং আমিও ধরেই নিয়েছিলাম যে সেই বিপুল সম্পদ এখনও ধরণীর গর্ভেই রক্ষিত আছে। আপনি যেন শুনে অবাক হবেন না যদি আমি বলি যে আমার মনে একটা আশা জেগেছিল—প্রায় নিশ্চিত আশা—যে বিচিত্র পরিস্থিতিতে পাওয়া এই পার্চমেন্টখানা সেই গুপ্ত স্থানেরই হারানো দলিল।

"তারপর আপনি কি করলেন?"

"আগুনের তাপ বাড়িয়ে দিয়ে ভেলামখানাকে আবার আগুনের উপর ধরলাম; কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। ভাবলাম, হয়তো ময়লার আস্তরণ পড়ার জন্যই এটা হয়েছে; অতএব পার্চমেন্টের উপর গরম জল ঢেলে মুছে নিয়ে মড়ার খুলিটাকে নীচের দিকে করে সেটাকে একটা টিনের পাত্রের উপর রেখে জ্বলন্ত কয়লার উনুনের উপর ধরলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পাত্রটা যথেষ্ট গরম হলে পার্চমেন্টটাকে তুলে নিলাম। তখন আমার আনন্দ কে দেখে! পার্চমেন্টটার জায়গায় এমন কতকগুলি বিন্দু ফুটে উঠেছে যা দেখলে সারিবদ্ধভাবে সাজানো কতকগুলি সংখ্যা বলেই মনে হয়। আবার সেটাকে পাত্রের উপর ফেলে আরও এক মিনিট রেখে দিলাম। তারপর তুলে নিতেই সমস্তটা দেখতে হল ঠিক যেমনটি আপনি এখন দেখছেন।"

এইখানে লিগ্র্যান্ড পার্চমেন্টখানাকে আবার গরম করে আমার সামনে মেলে ধরলেন। দেখলাম, মড়ার খুলি এবং ছাগ-মূর্তির মাঝখানে লাল রং-এ ফুটে উঠেছে নিম্ন-প্রদর্শিত সংখ্যাগুলি ঃ

53‡‡†305))6*;4826)4‡.)4‡);806*;48†8¶60))85;1‡(;:‡*8†83(88)
5*†;46(;88*96*?;8)*‡(;485);5*†2:*‡(;4956*2(5*—4)8¶8*;406
9285);)6†8)4‡‡;1(‡9;48081;8:8‡1;48†85;4)485†528806*81(‡9;
48;(88;4(‡?34;48)4‡;161;:188;‡?;

কাগজের টুকরোটা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, "কিন্তু আমি তো আগের মত অন্ধকারেই থেকে গেলাম। এই ধাঁধার সমাধান করতে পারলে যদি গোলকুন্ডার সমস্ত মণি-মাণিক্য আমার হাতে এসে যেত তাহলেও তো আমি তা অর্জন করতে পারতাম না সে কথা তো নিশ্চয় করেই বলতে পারি।"

লিগ্র্যান্ড বললেন, "অথচ সংখ্যাগুলোর উপর একবারমাত্র চোখ বুলিয়েই ব্যাপারটাকে আপনি যত কঠিন ভাবছেন, আসলে তার সমাধানটা মোটেই তত কঠিন নয়। যে কোন লোক সহজেই অনুমান করতে পারে যে এই সংখ্যাগুলি সাধারণের দুর্জ্ঞেয় একধরনের সাংকেতিক লিখন—অর্থাৎ সংখ্যাগুলি একটা অর্থ বহন করে। কিন্তু কিড সম্বন্ধে যতদূর জানা যায় তাতে সে লোকটা যে খুব একটা শক্ত গাণিতিক ধাঁধা তৈরী করতে পারত তা আমি মনে করি না। সঙ্গে সঙ্গেই আমি ধরে নিলাম যে এটা সরল ধাঁধা—অবশ্য এমন একটা ধাঁধা একজন মোটাবুদ্ধির নাবিকের পক্ষে সূত্রটি জানা না থাকলে যার সমাধান করা অসম্ভব।"

"আপনি কি সত্যি তার সমাধান করেছিলেন?"

"সঙ্গে সঙ্গে; এর চাইতে দশ হাজার গুণ বেশী শক্ত অনেক ধাঁধার সমাধান আমি

আগেও করেছি। আসলে কি জানেন, মানুষের বুদ্ধি যে ধাঁধা তৈরী করতে পারে, ঠিক পথটা ধরতে পারলে মানুষের বুদ্ধি তার সমাধানও অবশ্যই করতে পারবে।

“এই ধাঁধাটির ক্ষেত্রে—বস্তুত সব রকম সাংকেতিক লিপির ক্ষেত্রেই—সাংকেতিক লিখনের ভাষার প্রশ্নটাই প্রথম ও প্রধান, কারণ সমাধানের ব্যাপারে সেটা স্থির করাই প্রধান বাধা। কিন্তু আমাদের সামনে যে সাংকেতিক লিখনটি রয়েছে তার বেলায় স্বাক্ষরটিই সব বাধা-বিঘ্ন দূর করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে “Kidd” শব্দটার মধ্যে যে দ্ব্যর্থবোধকতা রয়েছে তা একমাত্র ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন ভাষায় বোধগম্যই হত না। এই সত্যটা মাথায় না এলে আমাকে অবশ্যই প্রথমে ভাবতে হত স্পেনীয় বা ফরাসী ভাষার কথা, কারণ স্পেনদেশীয় জলদস্যুদের পক্ষে এ ধরনের সাংকেতিক লিখন ঐ দুটি ভাষার ভিত্তিতে লেখাটাই অধিক বলে মনে হত। কার্যক্ষেত্রে আমি কিন্তু ইংরেজি ভাষাকেই বেছে নিয়েছিলাম।”

[এরপর বন্ধুবর লিগ্র্যাণ্ড সাংকেতিক লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে এবং এ ক্ষেত্রে তার সমাধানের যথাযথ বিশ্লেষণের ব্যাপারে দীর্ঘ এক বক্তৃতা ঝাড়লেন, এবং নানাবিধ বিচার-বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা আমাকেও বুঝিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন। আত্মতৃপ্তির আনন্দে বক্তৃতার উপসংহারে বললেন, “কিন্তু নিশ্চিত জেনে রাখুন, ধাঁধার যে দৃষ্টান্তটি আমাদের সামনে রয়েছে সেটা সাংকেতিক লিখনের একটি অতি সরল নমুনামাত্র। এখন আমার একটি মাত্র কাজ বাকি আছে ঃ সমাধানের পরে পার্চমেণ্টে লিখিত সংখ্যাগুলির একটি পূর্ণাঙ্গ তর্জমা আপনাকে দিচ্ছি। —ভাষান্তরিক-কর্তৃক সংক্ষেপিত।]

তর্জমাটি এই রকম ঃ

“শয়তানের আসনস্থ বিশপের হস্টেলের একটি ভাল কাঁচ একচল্লিশ ডিগ্রি ও ত্রিশ মিনিট উত্তর-পূর্বে এবং উত্তরে মূল শাখার সপ্তম প্রশাখার পূব দিকে মড়ার খুলির বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে গুলি কর গাছ থেকে মৌমাছি-রেখায় পঞ্চাশ ফুট বাইরে।’

আমি বললাম, “কিন্তু ধাঁধা তো এখনও আগেকার মত শোচনীয় অবস্থাতেই থাকল। ‘শয়তানের আসন,’ ‘মড়ার খুলি’ এবং ‘বিশপের হস্টেল’ —এই সব দুর্বোধ্য শব্দের কোন অর্থ বের করা কি সম্ভব ?”

লিগ্র্যান্ড বললেন, “স্বীকার করছি, প্রথম নজরে ব্যাপারটা সেই রকমই বটে। কিন্তু আমার প্রথম প্রচেষ্টাই ছিল সাংকেতিক লিপি-বিশেষজ্ঞদের মত সমস্ত লেখাটাকে যথাযথভাবে ভাগ করা।”

“ছেদ-চিহ্ন বসিয়ে ভাগ করার কথা বলছেন তো ?”

“অনেকটা সেই রকমই।”

“কিন্তু কি করে সেটা করা সম্ভব ?”

“আমি ভেবে দেখলাম, এই লিপির লেখক ইচ্ছা করেই কোনরকম ভাগ না করে শব্দগুলিকে পর পর সাজিয়ে দিয়েছে যাতে সমাধানটা আরও কঠিন হয়। একজন স্বল্পবুদ্ধির মানুষ এ রকম একটা কাজ করতে গেলে স্বভাবতই কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। লেখাটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলে আপনিও

সহজেই ধরতে পারবেন যে পাঁচটি জায়গায় প্রয়োজনমত ছেদ-রেখা টানা হয় নি। এই সূত্র ধরেই আমি চিঠিখানাকে এইভাবে ভাগ করে নিলাম ঃ

“শয়তানের আসনস্থ বিশপের হস্টেলের একটি ভাল কাঁচ—একচল্লিশ ডিগ্রি ও ত্রিশ মিনিট—উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর—মূল শাখার সপ্তম ডাল পূর্ব দিক—মড়ার খুলির বাঁ চোখ থেকে গুলি কর—গাছ থেকে মৌমাছি-রেখায় পঞ্চাশ ফুট বাইরে।”

আমি বললাম, “এই ভাগের পরেও আমি কিন্তু সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।”

লিগ্র্যাণ্ড বললেন, “কয়েকটা দিন আমিও তিমিরেই ছিলাম ; সুলিভান দ্বীপের আশেপাশে “বিশপের হস্টেল” নামে কোন বাড়ি আছে কিনা কষ্ট করে তার খোঁজ-খবর করলাম ; অবশ্য অপ্রচলিত “হস্টেল” শব্দটাকে বাতিল করে দিলাম। একদিন সকালে হঠাৎই মনে পড়ে গেল, দ্বীপের উত্তর দিকে প্রায় মাইল চারেক দূরে “বেসপ” নামের যে প্রাচীন পরিবারটি একটি পুরনো জমিদার-বাড়ির মালিক ছিল, তার সঙ্গে তো “বিশপের হস্টেল” কথাটার যোগ থাকতে পারে। সেইমত সেখানে চলে গেলাম, এবং সেখানকার বৃদ্ধ নিগ্রোদের কাছে খোঁজ-খবর করলাম। শেষ পর্যন্ত একটি অতি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক বলল যে “বেসপ’স ক্যাস্‌ল্‌” নামক একটা জায়গার কথা সে শুনেছে এবং আমাকে সেখানে নিয়ে যেতেও পারে, কিন্তু সেটা দুর্গ-প্রাসাদও নয়, হস্টেলও নয়, একটা উঁচু পাহাড় মাত্র।

“পরিশ্রমের জন্য তাকে কিছু টাকা দেবার প্রস্তাব করতেই সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হল। সহজেই জায়গাটা পেয়ে গেলাম ; তখন বুড়ীকে ছেড়ে দিয়ে আমি একাই এগিয়ে গেলাম। ‘দুর্গ-প্রাসাদ’ বলতে সেখানে দেখলাম কেবল কতকগুলি খাড়া পাহাড়—তার মধ্যে একটির উচ্চতা এবং চেহারা দেখবার মত। অনেক কষ্টে তার চূড়ায় উঠলাম ; তারপর যে কি করব ভেবে পেলাম না।

“সাত-পাঁচ অনেক কথা ভাবছি এমন সময় আমার চোখ পড়ল চূড়ার গজখানেক নীচে পাহাড়ের পূর্বদিককার একটা সংকীর্ণ তাকের উপর। তাকটা প্রায় আঠারো ইঞ্চি বাড়ানো, চওড়ায় এক ফুটের বেশী নয়, আর তার ঠিক উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা কুলুঙ্গি থাকায় সমস্ত জিনিসটাকে দেখাচ্ছে একটা ফাঁপা-পিঠওয়ালা চেয়ারের মত যে রকমটা আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্যবহার করতেন। আর কোন সন্দেহ রইল না যে এটাই পাণ্ডুলিপিতে উল্লেখিত “শয়তানের আসন,” আর তখনই এই ধাঁধার গোপন কথাটি যেন আমার জানা হয়ে গেল।

“আমি জানতাম যে “ভাল কাঁচ” কথাটা দূরবীণ ছাড়া অন্য কিছুকে বোঝাতে পারে না, কারণ নাবিকরা “কাঁচ” শব্দটাকে অন্য কোন অর্থে ব্যবহার করে না। আর তখনই আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পেলাম একটা দূরবীণ, আর সেটাকে বসানো হয়েছে একটা নির্দিষ্ট ভঙ্গীতে ব্যবহারের জন্য। কোনরকম ইতস্তত না করেই আমি আরও বিশ্বাস করলাম যে “একচল্লিশ ডিগ্রি ও ত্রিশ মিনিট” এবং “উত্তর-পূর্ব ও উত্তর” কথাগুলি ব্যবহার করা হয়েছে দূরবীণটাকে বসাবার দিক-নির্দেশক হিসাবে। এই সব আবিষ্কারের ফলে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি গেলাম, এবং একটা দূরবীণ সঙ্গে নিয়ে আবার সেই পাহাড়ে ফিরে এলাম।

“পাহাড়ের তাকটার উপর নেমে বুঝলাম যে একটি মাত্র বিশেষ ভঙ্গীতে ছাড়া সেখানে বসাই যায় না। ব্যাপারটা আমার ধারণার সঙ্গে মিলে গেল। আমিও দূরবীণটাকে ব্যবহার করার কাজে লেগে গেলাম। “একচল্লিশ ডিগ্রি ও ত্রিশ মিনিট” কথা দুটি দিকচক্র-রেখা থেকে উচ্চতার পরিমাপ ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না, কারণ “উত্তর-পূর্ব ও উত্তর” কথা দুটি দিয়ে দিকচক্রের দিকটাই পরিষ্কারভাবে বোঝানো হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পকেট-কম্পাসের সাহায্যে দিকটা স্থির করে নিলাম, এবং দূরবীণটাকে একচল্লিশ ডিগ্রি কোণের উচ্চতায় ধরে সতর্কভাবে তুলতে-নামাতে লাগলাম। একসময় দূরের গাছপালার ভিতর থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো একটা বড় গাছের পত্র-পল্লবের মাঝখানে একটা বৃত্তাকার ফাঁকা জায়গার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হল। সেই ফাঁকা জায়গার ঠিক মাঝখানে দেখতে পেলাম একটা সাদা দাগ। সেটা যে আসলে কি তা প্রথমে বুঝতে পারলাম না। দূরবীণের ফোকাসটাকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত করে আর একবার তাকিয়েই বুঝতে পারলাম সেটা একটা মানুষের মাথার খুলি।

“এতটা আবিষ্কারের পরে আমি তো ভেবেই বসলাম যে ধাঁধার সমাধান হয়ে গেল; কারণ “মূল শাখা সপ্তম প্রশাখা, পূর্ব দিক” বলতে একমাত্র গাছের উপর খুলিটার অবস্থানের জায়গাটাকেই বোঝাতে পারে, আর “মড়ার খুলির বাঁ চোখ থেকে গুলি কর” কথাগুলির মাত্র একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে সন্ধানের ব্যাপারে। আমি ধরে নিয়েছিলাম যে মূল পরিকল্পনাটি ছিল খুলির বাঁ চোখের ভিতর দিয়ে একটা বুলেটকে নীচে ফেলে দিতে হবে এবং গাছটার গোড়া থেকে বুলেটটা যেখানে পড়বে সেই পর্যন্ত একটা “মৌমাছি-রেখা” অর্থাৎ সরল রেখা টেনে সেটাকে পঞ্চাশ ফুট বাড়িয়ে দিলে সেটাই হবে সেই নির্দিষ্ট বিন্দু যার নীচে লুকনো রয়েছে রত্ন-ভান্ডার।”

আমি বললাম, “সবই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম। ব্যাপারটা কৌশলপূর্ণ হলেও বেশ সরল ও স্পষ্ট। আপনি বিশপের হস্টেল ছেড়ে যাবার পরে কি হল?”

“বিশপের হস্টেল অভিযানে জুপিটার আমার সঙ্গেই ছিল। সে আমাকে তখন একা ছেড়ে দিত না। কিন্তু পরদিন খুব ভোরে উঠে আমি তাকে লুকিয়ে গাছটার খোঁজে পাহাড়ে চলে গেলাম। অনেক চেষ্টার পর সেটাকে পেলাম। রাতে ফিরে এলে জুপ তো আমাকে চাবুক মারবে বলেই শাসালো। বাকি অভিযানের কথা তো আমি যতটা জানি আপনিও ততটাই জানেন।”

“তাতো জানি; তবু বলব, আপনার বক্তৃতার বহর আর ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে নাচানোর ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত নয় কি? আমার তো নিশ্চিত ধারণা হয়েছিল যে আপনি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। আচ্ছা বলুন তো, মড়ার খুলির ভিতর দিয়ে বুলেটের বদলে ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে নীচে ফেলার জন্য আপনি এতটা পীড়াপীড়ি করলেন কেন?”

“দেখুন, আমি খোলাখুলিই বলছি, আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে আপনি এত বেশী সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলেন যে আমি তাতে খুবই বিরক্ত হলাম, এবং স্থির করলাম যে গোটা ব্যাপারটাকে বেশ রহস্যমণ্ডিত করে আমার মত করে

আপনাকে একটু শাস্তি দেব। এই কারণেই আমি ঝিঁঝিঁ পোকাটাকে নাচালাম, সেটাকেই গাছের উপর থেকে ফেলার ব্যবস্থা করলাম। পোকাটা খুব ভারী—আপনার এই মন্তব্য থেকেই ফন্দিটা আমার মাথায় ঢুকেছিল।"

"বুঝলাম; কিন্তু আরও একটা জিনিস কিন্তু এখনও আমার কাছে ধাঁধাই রয়ে গেছে। গর্তের মধ্যে নর-কংকাল এল কোথা থেকে এবং কেমন করে?"

"এ প্রশ্নের জবাব যেমন আপনি জানেন না, তেমনি আমিও জানি না। অবশ্য এটারও একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু সেটা এতই নৃশংস যে বিশ্বাস করা শক্ত। এত বড় একটা পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজে কিড-এর নিশ্চয় কয়েকজন সহকারী ছিল—অবশ্য যদি সত্য সত্য কিডই এই রত্ন-ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখে থাকে। কিন্তু কাজটা হয়ে যাবার পরে সে হয়তো ভেবেছিল যে এই গোপন কথার যারা সাক্ষী তাদের সকলকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সহকর্মীরা যখন গর্তের মধ্যে কর্মব্যস্ত ছিল তখন একটা খন্তার গোটা দুই আঘাতই সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল; হয় তো ডজনখানেক আঘাতও লেগে থাকতে পারে—কে তা বলে দেবে?"

জনৈক হান্স ফাল-এর অদ্বিতীয় অভিযান

The Unparalled Adventure of one HANS PFAALL

রটারডাম থেকে পাওয়া সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, ঐ শহরটি এখন দার্শনিক উত্তেজনায় উত্তাল। বস্তুত, সেখানে এমন সব ঘটনা ঘটেছে যা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত—একান্তই নতুন—প্রচলিত মতামতের সম্পূর্ণ বিরোধী—আর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই যে এর আগেই গোটা ইওরোপে হুলুস্থুল পড়ে গেছে, সকলেই উত্তেজনায় মেতে উঠেছে, সব বিচার-বিবেচনা ও জ্যোতির্বিদ্যা শিকেয় উঠেছে।

শোনা যাচ্ছে—মাসের—তারিখে (তারিখটা আমি সঠিক বলতে পারছি না) বহু মানুষের একটা প্রকান্ড ভিড়, কি উদ্দেশ্যে তা স্পষ্ট করে বলা নেই, সুনিয়ন্ত্রিত রটারডাম শহরের বড় এক্সচেঞ্জ স্কোয়ারটাতে সমবেত হয়েছিল। দিনটা ছিল গরম—এই ঋতুর পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক—এতটুকু বাতাস ছিল না; আকাশের পাকা ছাদে প্রচুর মেঘ জমছে, আর তা থেকে মাঝে-মাঝে ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টি ঝরিয়ে অগণিত মানুষের মনোরঞ্জনের চেষ্টা চলছে। তথাপি দুপুর নাগাদ সেই জন-সমাবেশে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা দেখা গেল; দশ হাজার জিহ্বার নিনাদ শোনা গেল, এবং একমুহূর্তে পরেই দশ হাজার মুখ আকাশের দিকে ঊর্ধ্বমুখী হল, দশ হাজার মুখের কোণ থেকে দশ হাজার বাঁশি একসঙ্গে ঝুলে পড়ল, আর একমাত্র নায়াগ্রার গর্জনের সঙ্গে তুলনীয় একটা চীৎকার-ধ্বনি গোটা শহরের বুকে এবং রটারডামের চতুষ্পার্শে উচ্চৈঃস্বরে ও ভয়ংকর-ভাবে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

এত হৈ-হল্লা কোথা থেকে আসছে সেটা অচিরেই বোঝা গেল। যে পুঞ্জ পুঞ্জ

মেঘের কথা আগেই বলা হয়েছে তারই একটার পিছনে দেখা গেল একটা আশ্চর্য, বিচিত্র, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে নিরেট পদার্থ ধীরে ধীরে নীল আকাশের বুকে ফুটে উঠছে; সে পদার্থটির আকৃতি এমন অদ্ভুত, আর এমন খাম-খেয়ালিভাবে একত্র সন্নিবদ্ধ যে নীচে হা করে তাকিয়ে থাকা অসংখ্য নগরবাসী তার কিছুই বুঝতে পারছে না, ফলে তার যথেষ্ট স্তুতিও করতে পারছে না। ওটা কি? রটারডামের সব ভূতের নামে তারা জানতে চাইছে, ওটা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে? কেউ তা জানে না; কেউ কল্পনাও করতে পারে না; একটি মানুষও—এমন কি নগর-প্রধান মিনহীর সুপারবাস ভন আণ্ডারডুকও এই রহস্য-সমাধানের তিলমাত্র খোঁজ জানেন না। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কোন কাজই কেউ করতে পারছে না; প্রতিটি মানুষ আবার নিজ নিজ বাঁশিটাকে ঠোঁটের কোণে ধরল, একটু থামল, একটু হাঁটল, যথেষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করল এবং পরিশেষে আবার হাঁটল, থামল, এবং শেষ পর্যন্ত—আবার বাঁশিতে ফুঁ দিল।

অবশ্য ইতিমধ্যেই সেই কৌতূহল-উদ্দীপক ও প্রচুর ধূম-উদগীরক পদার্থটি ক্রমেই শহরের আরও নীচে নামতে লাগল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেটা যথেষ্ট কাছে এসে গেল। তখন দেখে মনে হল—হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ওটা একটা বেলুনজাতীয় পদার্থ; তবে এ ধরনের বেলুন আগে কখনও রটারডামের আকাশে দেখা যায় নি। আমিও জানতে চাইছি, আগাগোড়া নোংরা খবরের কাগজ দিয়ে বানানো বেলুনের কথা কে কবে শুনেছে? নিশ্চয় হল্যাণ্ডের কোন মানুষ শোনে নি; অথচ এখানে জনসাধারণের নাকের সামনে, বরং তাদের নাক থেকে কিছুটা উপরে, ঐ ধরনের একটা বস্তুই তো হাজির হয়েছে, আর অত্যন্ত বিশ্বস্তসূত্রেই আমি অবগত আছি যে ওটা তৈরী করা হয়েছে এমন মাল-মশলা দিয়ে যা আগে কখনও অনুরূপ কাজে ব্যবহার করা হয় নি। রটারডামের নাগরিকদের শুভবুদ্ধির প্রতি এ এক বিষম অসম্মান। আর বস্তুটির যা আকৃতি সেটা তো আরও নিন্দনীয়। দেখতে তো উল্টো করে বসানো একটা বড় গাধার টুপির চাইতে ভাল কিছু নয়। বরং তার চাইতেও খারাপ।— এই অদ্ভুত যন্ত্রটির শেষ প্রান্তে নীল ফিতে দিয়ে অনেকটা মোটর গাড়ির মত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা মস্ত বড় নোংরা লোমের টুপি, আর তার মাথায় বসানো রয়েছে কালো ফিতে ও রুপোর বকলস বাঁধা অর্ধ-গোলাকার টুপি। অবশ্য এখানে উল্লেখ থাকে যে রটারডামের নাগরিকরা শপথ করে বলতে পারে যে এ রকম দৃশ্য তারা আগেও বার বার দেখেছে; বস্তুত, সমবেত সকলেই সেটাকে অভ্যস্ত চোখেই দেখছে; অথচ ভ্রাউ গ্রেটেল ফাল ওটাকে দেখেই সানন্দ বিস্ময়ে চীৎকার করে বলে উঠেছিল, তার আপন জনটিরও ওই রকম একটা টুপি ছিল। এখানে উল্লেখ থাকে যে প্রায় পাঁচ বছর আগে তিনজন সঙ্গীসহ উক্ত ফালও খুবই আকস্মিকভাবে এবং বিনা কারণে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছে, এবং এই বিবরণীর সময় পর্যন্ত তাদের সংবাদ সংগ্রহের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। আসলে কথা হল, সম্প্রতি এই শহরের পূর্বাঞ্চলের একটি নির্জন স্থানে বেশকিছু পরিমাণ অদ্ভুত রাবিশের মধ্যে এমন কিছু হাড় পাওয়া গেছে যাকে মানুষের কংকাল বলে মনে করা হচ্ছে; কিছু লোক এতদূর কল্পনা

করেছে যে ঐ স্থানে একটা জঘন্য রকমের খুন হয়েছে, আর সঙ্গীগণসহ হান্স ফালই হয়েছে তার শিকার।—কিন্তু এবার আসল কথায় ফিরে যাই।

বেলুনটা (এটা নিঃসন্দেহ) মাটির একশ' ফুটের মধ্যে নেমে আসার পরে ভিড়ের লোকেরা তার আরোহীকে বেশ স্পষ্ট করেই দেখতে পেল। সত্য সত্য লোকটি খুবই অদ্ভুত। তার দেহের উচ্চতা দুই ফুটের বেশী নয়; কিন্তু সামান্য উচ্চতায়ই সে হয় তো শরীরের ভারসাম্য হারিয়ে তার ছোট্ট গাড়ি থেকে পড়ে যেত, কিন্তু বুক সমান উঁচু একটা গোলাকার বেষ্টনী তাকে ঘিরে থাকায় এবং বেষ্টনীটা দড়ি দিয়ে বেলুনের সঙ্গে বাঁধা থাকায় সেটা ঘটল না। ছোট মানুষটির শরীর উচ্চতার তুলনায় বড় বেশী চওড়া হওয়ায় তার সমস্ত আকৃতিটাই কেমন যেন এক অবাস্তব বর্তুলাকার ধারণ করেছে। পা দুটো অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, তবে হাতদুটো অত্যাধিক লম্বা। মাথার চুল সাদা, আর পিছনে বেণীর মত করে বাঁধা। তার নাকটা অসম্ভব রকমের লম্বা, বাঁকানো ও উত্তেজক; চোখ দুটো বড় বড়, উজ্জ্বল, ও তীক্ষ্ণ; গাল ও চিবুক বয়সের ভারে কুঁচকানো হলেও চওড়া, ফোলা ও দুই ভাঁজ পড়া; কিন্তু মাথার কোথাও কান বলে কিছু নেই। তার পরনে আকাশ-নীল সাটিনের একটা ঢিলে ফ্রক-কোট, আর তার সঙ্গে মিলিয়ে একটা আঁটো ব্রীচেস রুপোর বকলস দিয়ে হাঁটুর সঙ্গে বাঁধা। আর আছে উজ্জ্বল হলুদ রং-এর ভেস্ট সাদা টুপি বাঁকা করে মাথায় বসানো, আর একখানা রক্ত-লাল রেশমি রুমাল জড়িয়ে মস্ত বড় একটা আশ্চর্য "বো-নেট" বেঁধে সুন্দরভাবে বুকের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পৃথিবীর সমতল থেকে একশ' ফুট পর্যন্ত নামবার পরে ক্ষুদ্রকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেলেন; মনে হল ভূমিতলের আরও কাছে তিনি আসতে চান না। তাই অনেক কষ্টে একটা ক্যানভাসের থলে তুলে নিয়ে তার ভিতর থেকে কিছু বালি ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে তিনি মুহূর্তের মধ্যে স্থির হয়ে গেলেন। তারপরই তাড়াতাড়ি ফ্রক-কোটের পকেট থেকে মরক্কো-বাঁধানো একটা বড় পকেট-বই বের করলেন। তারপর বইটাকে হাতের উপরে সন্দেহের সঙ্গে ওজন করে খুবই অবাক হয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন; বইটার ওজন দেখে স্পষ্টতই বেশ বিস্মিত হলেন। শেষ পর্যন্ত বইটাকে খুলে তার ভিতর থেকে লাল গালা দিয়ে সিল-করা এবং লাল ফিতে দিয়ে যত্ন করে বাঁধা একখানা লম্বা চিঠি বের করে বেশ তাক করে ফেলে দিলেন নগর-প্রধান সুপারবাস ভন আণ্ডারডুকের একেবারে পায়ের কাছে। হিজ এক্সেলেন্সি চিঠিটাকে তুলে নেবার জন্য মাথা নীচু করলেন। কিন্তু রটারডামে আর কোন কাজ না থাকায় বিমানচারী সেই মুহূর্তেই যাত্রার উদ্যোগ শুরু করলেন; পুনরায় উপরে উঠে যাবার জন্য বেলুনের কিছু বালি ফেলে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ায় আধা ডজন বালিভর্তি বস্তা একটার পর একটা টেনে বাইরে ফেলে দিলেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রত্যেকটা বস্তাই এসে পড়ল নগর-প্রধানের পিঠের উপর; আর রটারডামের প্রতিটি মানুষের চোখের সামনে তিনি অন্তত ছ'টি উল্টে পড়ে ডিগবাজী খেলেন। অবশ্য এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মহান আণ্ডারডুক ঐ ছোট বুড়ো মানুষটির এই বেয়াদপি মুখ বুজে সহ্য করলেন। বরং লোকে বলে, আধা ডজনবার ডিগবাজী খাওয়ার

সময় প্রতিবারই তিনি পাইপ থেকে প্রচন্ড বেগে ফুৎকার দিতে লাগলেন। আরও মনে হল তিনি বুঝি মৃত্যু পর্যন্ত এইভাবে ফুৎকার দিয়েই চলবেন।

ইতিমধ্যে বেলুনটা চাতক পক্ষীর মত উড়ে চলল; শহরের অনেক উঁচু দিয়ে ভাসতে ভাসতে শেষ পর্যন্ত নিঃশব্দে একটা মেঘের আড়ালে চলে গেল ঠিক যে রকম ভাবে মেঘের আড়াল থেকেই এক সময় বেরিয়ে এসেছিল; আর তারপরেই রটারডামের ভাল মানুষ নাগরিকদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে থেকে চিরদিনের মত উধাও হয়ে গেল। এবার সকলেরই মনোযোগ পড়ল চিঠিটার উপর যার অবতরণ ও তার ফলাফল হিজ এক্সেলেন্স ভন আণ্ডারডুকের শরীর ও মর্যাদাকে এতদূর বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। যতই গড়াগড়ি খেয়ে থাকুন পদস্থ ব্যক্তিটি কিন্তু চিঠিখানা হাতছাড়া করেন নি। ভাল করে লক্ষ্য করে বোঝা গেল, চিঠিখানা যথাযথ হাতেই পড়েছে; সত্য সত্য চিঠিটা লেখা হয়েছে "রটারডাম কলেজ অব অ্যাস্ট্রনমি"-র প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হিসাবে তার নিজের এবং অধ্যাপক রুবাদুব-এর নামে। অতএব দুই পদস্থ ব্যক্তি সেখানেই চিঠিটা খুললেন, এবং দেখলেন তাতে লেখা আছে নীচেকার অসাধারণ ও অত্যন্ত গুরুতর তথ্যঃ—

মহামান্য ভন আন্ডারডুক ও রুবাদুব,
রটারডাম শহরের স্টেটস কলেজ অব
অ্যাস্ট্রনমার্স-এর প্রেসিডেন্ট ও ভাইস
প্রেসিডেণ্ট মহোদয় সমীপেষু

মহামান্যদ্বয় হয় তো স্মরণ করতে পারবেন যে প্রায় পাঁচ বছর আগে পেশায় কামারশালের হাপর মেরামতকারী হান্স ফাল নামক জনৈক দীন কারিগর তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে রটারডাম থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল; কেন গিয়েছিল তা কেউ জানে না। মহামান্যদ্বয় জেনে খুশি হবেন যে এই চিঠির লেখক আমিই সেই হান্স ফাল। আমার সহ-অধিবাসীরা সকলেই ভাল করে জানে যে গত চল্লিশ বছর ধরে খোউয়ের ক্রাউট নামক গলির মাথায় অবস্থিত ছোট চতুষ্কোণ ইঁটের বাড়িটাতে আমি বাস করে আসছি, আর নিরুদ্দেশ হবার সময়ও আমি সেই বাড়িতেই ছিলাম। আমার পূর্বপুরুষরাও স্মরণাতীত কাল থেকে ওই বাড়িতে বাস করেছেন—তারা এবং আমি নিজেও হাপর মেরামতের সম্মানজনক ও লাভজনক ব্যবসাতেই আত্মনিয়োগ করে এসেছিঃ কারণ, সত্যি কথা বলতে হলে, ইদানিং বড় বড় সব মানুষরা রাজনীতি নিয়ে যেভাবে মেতে উঠেছে তাতে আমার মত রটারডামের একজন সৎ মানুষের কাছে আমার এই নিজস্ব ব্যবসা ছাড়া অন্য কোন ব্যবসা কাম্যও নয়, উপযোগীও নয়। জমার অংক ভাল, কাজের অভাব হয় না, আর টাকার বা সুনামেরও ঘাটতি নেই। কিন্তু, যা বলছিলাম, ক্রমেই আমরা স্বাধীনতা, দীর্ঘ বক্তৃতা, আমূল সংস্কারবাদ, এবং অনুরূপ সব কিছুর ফলাফলগুলি বুঝতে শিখলাম। আগে যারা ছিল পৃথিবীর সব সেরা খদ্দের, এখন আর আমাদের কথা ভাববার এতটুকু সময় তাদের নেই। সরকার যত দুর্বল হতে লাগল, চামড়া ও লোহার স্থায়িত্ব ততই বাড়তে লাগল—অল্প দিনের মধ্যেই সারা রটারডাম খুঁজে এমন একজোড়া হাপরও মিলল না যার কোনরকম সেলাই বা হাতুড়ির

ঘা দেবার দরকার হতে পারে। এ অবস্থা তো বেশী দিন সহ্য করা যায় না। অচিরেই আমি ইঁদুরের মত গরীব হয়ে গেলাম; স্ত্রী ও পুত্রকন্যার ভরনপোষণের ভার অসহ্য হয়ে উঠল; জীবনটাকে শেষ করে দেবার সব চাইতে সুবিধাজনক একটা উপায় বের করার চিন্তায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম। এদিকে পাওনাদারের তাগাদায় স্থির হয়ে বসে চিন্তা করার মত সময়টুকুও জোটে না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়িটা যেন চারদিক থেকে ঘেরাও হয়ে থাকত। বিশেষ করে তিনটি লোক আমাকে বড় বেশী ভোগাতে শুরু করল; তারা সব সময় আমার দরজায় বসে থাকে, আর আইনের ভয় দেখায়। আমিও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, যদি কোনদিন এই তিনজনকে হাতের মুঠোয় পাই তাহলে এই অপমান ও তাড়নার শোধ তুলব। সেই অনাগত শুভ মুহূর্তের প্রত্যাশাতেই আপাতত আত্মহত্যার পরিকল্পনা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম।

একদিন তাদের ফাঁকি দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। হতাশ হৃদয়ে অনেক সময় ধরে অকারণেই যত সব অলি-গলি দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত হঠাৎই মোড়ের একটা বই-বিক্রেতার দোকানের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। খদ্দেরদের জন্য পেতে রাখা একটা চেয়ার দেখতে পেয়ে শাঁ করে সোজা গিয়ে তাতে বসে পড়লাম, এবং কেন জানি না হাতের কাছে প্রথমেই যে বইটা পেলাম তারই পাতা ওল্টাতে শুরু করলাম। বইটা জ্যোতির্বিদ্যার উপর লেখা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা—লেখক হয় বার্লিনের অধ্যাপক এংকে, অথবা অনুরূপ নামের কোন ফরাসী। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কে কিছু খোঁজ-খবর আমি রাখতাম; অচিরেই বইটার মধ্যে একেবারে ডুবে গেলাম—চারদিকের সব কিছু ভুলে গিয়ে বইটাকে আগাগোড়া দুইবার পড়ে ফেললাম। সম্বিত ফিরে এলে বুঝলাম যে রাত হয়ে আসছে; অতএব বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। সারাটা পথ বইটার কথাই মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

বাড়ি পৌঁছিতে রাত হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়লাম। কিছুতেই ঘুম এল না; যত সব আজগুবি কথা ভাবতেই রাত কাবার হয়ে গেল। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই সেই বইয়ের দোকানে চলে গেলাম এবং পকেটে যৎসামান্য অর্থ যা ছিল তাই দিয়ে কয়েকখন্ড যন্ত্র-বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই কিনে ফেললাম। বই দুটি নিয়ে বাড়িতে ফেরার পর থেকে যখনই সময় পেতাম তখনই বই খুলে বসতাম। ক্রমে এই বিষয়ে এত বেশী জেনে ফেললাম যে একটা বিশেষ পরিকল্পনামত কাজ করার ইচ্ছাটা মাথায় ঢুকল; জানি না, শয়তান না আমার বাড়তি প্রতিভা এ ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছিল। এই অবসরে যে তিন উত্তমর্ণ এতদিন আমাকে এত বেশী ভুগিয়েছিল তাদেরই দলে টানতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টা সফলও হল—একদিকে বাড়ির আসবাব-পত্র বিক্রি করে যতটা পারা গেল তাদের পাওনা মিটিয়ে দিলাম, আর অপর দিকে তাদের কথা দিলাম, যে-প্রকল্পটি হাতে নিয়েছি সেটা শেষ হলেই বাকি সব টাকা মিটিয়ে দেব। তাছাড়া, ঐ কাজের ব্যাপারে তাদের সাহায্য ও সহযোগিতাও প্রার্থনা করলাম। তারা অশিক্ষিত লোক, আমার বোল-চাল শুনে সহজেই আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল।

এইভাবে এদিককার ব্যবস্থা ঠিক করে এবার আমার স্ত্রীর সহায়তায় অত্যন্ত

গোপনীয়তা ও সতর্কতার সঙ্গে বাকি সব বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে দিলাম, নানারকম অছিলায় নানান জনের কাছ থেকে দফায় দফায় অল্প অল্প টাকা ধার করলাম। এইভাবে কি করে এত টাকা পরিশোধ করব সে কথা না ভেবেই বেশ মোটা অংকের টাকা যোগাড় করে ফেললাম। তারপর ক্ষেপে ক্ষেপে কিনতে শুরু করলাম প্রতিটি বারো গজ মাপের অনেকগুলি অতি সূক্ষ্ম ক্যাম্ব্রিক মসলিনের টুকরো; পাকানো দড়ি; প্রচুর রবারের বার্নিশ; একটা বড় মাপের বেতের ঝুড়ি; এবং টুকিটাকি এমন আরও অনেক জিনিস যা দরকার হতে পারে একটা অসাধারণ বড় মাপের বেলুন তৈরী করতে। আমার স্ত্রীকে এই সব জিনিস তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিতে বললাম; সেই সঙ্গে কাজটা কি ভাবে করতে হবে তাও মোটামুটি জানালাম। তারপর রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে সব জিনিসপত্র নিয়ে জড় করলাম রটারডামের পূব দিকে একটা নির্জন অঞ্চলে। সেখানে অতিশয় গোপনে এমন একটা গ্যাস তৈরীর কাজে লেগে গেলাম যা আজ পর্যন্ত আমি ছাড়া আর কেউ তৈরী করে নি—অন্তত এ ধরনের কাজে ব্যবহার করে নি। এই গ্যাস তৈরীর গোপন কথাটা আমি অনায়াসেই খুলে বলতে পারতাম, কিন্তু ন্যায়ত-ধর্মত এই গোপন তথ্যটির মালিক ফ্রান্সের নাঁজ শহরের জনৈক নাগরিক, যিনি আমাকে শর্তসাপেক্ষে এই তথ্যগুলি জানিয়েছিলেন। তাছাড়া, আমার উদ্দেশ্য না জেনেই সেই ভদ্রলোকটি আমাকে আরও জানিয়েছিলেন, একটা বিশেষ জন্তুর ঝিল্লি থেকেও এ ধরনের বেলুন তৈরী করা যায়, কারণ সেই ঝিল্লি ভেদ করে কোন গ্যাস বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব। একে তো সেটা ছিল খুবই ব্যয়সাপেক্ষ, তাছাড়া ক্যাম্ব্রিক মসলিনের উপর রবারের আস্তরণ দিয়ে নিলে সেটাও বেলুন তৈরীর পক্ষে সমান উপযোগী হবে কি না সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত ছিলাম না। ঘটনাটা এখানে উল্লেখ করলাম, কারণ আমি মনে করি যে পরবর্তী কালে সেই ভদ্রলোকটি হয় তো এই ধরনের গ্যাস ও মাল-মশলার সাহায্যে বেলুনে চড়ে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করতে পারেন, আর এই বিশেষ আবিষ্কারের সম্মান থেকে আমি তাকে বঞ্চিত করতে চাই না।

যাই হোক, কঠোর পরিশ্রম ও নিরলস অধ্যবসায়ের ফলে অচিরেই আমার বেলুন তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হল।

এবার যাত্রার আয়োজন। স্ত্রীর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলাম যে প্রথম দিন বইয়ের দোকানে যাওয়া থেকে আমি যা কিছু করেছি সব সে গোপন রাখবে; আমিও তাকে কথা দিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। তারপর যৎসামান্য টাকা-পয়সা যা হাতে ছিল তার হাতে তুলে দিয়ে বিদায় নিলাম। আমার স্ত্রীটি ছিল যাকে বলে করিৎকর্মা মেয়েমানুষ; আমার সাহায্য ছাড়াই দুনিয়ার সব কাজ সে করতে পারত। সত্যি কথা বলতে কি—আমি নিজেও বিশ্বাস করি সে আমাকে সর্বদাই একটা আলসে লোক বলে মনে করত—নেহাৎই একটা বোঝা স্বরূপ—শূন্যে সৌধনির্মাণ ছাড়া অন্য কোন কাজের নয়—আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে বরং খুশীই হল। তার কাছ থেকে যখন বিদায় নিলাম তখন অন্ধকার রাত; যে তিন উত্তমর্ণ আমাকে এতদিন ধরে জ্বালিয়েছে তাদের সহকারী হিসাবে সঙ্গে নিয়ে চারজনে মিলে বেলুন, মোটর ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র বয়ে নিয়ে ঘোরা পথে যেখানে মালপত্র

জমা করা হয়েছিল সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। সব কিছু যথারীতি ঠিকঠাক থাকায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজে লেগে গেলাম।

বেলুনটাকে ফোলাবার সময় ছোট পিপেগুলি যেখানে রাখা হবে স্থির করেছিলাম আমি গোপনে সেখানে একটা ছোট গর্ত খুঁড়লাম ; এই ধরনের গর্তগুলিকে পঁচিশ ফুট ব্যাসের বৃত্তাকারে সাজানো হল। এই বৃত্তের কেন্দ্রেই বসবে পিপেটা ; সেখানে আমি অধিকতর গভীর আরও একটা গর্ত করলাম পাঁচটা ছোট গর্তের প্রত্যেকটার মধ্যে রেখে দিলাম পঞ্চাশ পাউন্ড বারুদ-ভর্তি একটা করে কেনেস্তারা, আর বড় গর্তটার মধ্যে রেখে দিলাম দেড়শ' পাউন্ড বারুদ-ভর্তি একটা ছোট পিপে। এই ছোট পিপে ও কেনেস্তারাগুলিকে যথাযথভাবে আচ্ছাদিত বারুদ দিয়ে যুক্ত করে দিলাম ; আর একটা কেনেস্তারার মধ্যে প্রায় চার ফুট লম্বা একটা ধীর-গতি দেশলাই-কাঠির একটা দিক ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর গর্তটাকে মাটি দিয়ে ভরে পিপেটাকে তার উপর এমন ভাবে বসিয়ে দিলাম যাতে দেশলাই-কাঠির অপর দিকটা মাত্র ইঞ্চিখানেক বেরিয়ে থাকে এবং কারও চোখে না পড়ে। তারপর বাকি গর্তগুলিকে বুজিয়ে দিয়ে পিপেগুলোকে যথাযথ স্থানে বসিয়ে দিলাম।

সেদিন পয়লা এপ্রিল। আগেই বলেছি, রাতটা ছিল অন্ধকার ; আকাশে একটা তারাও দেখা যাচ্ছিল না ; মাঝেমাঝেই ঝির-ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল ; ফলে কাজের বেশ অসুবিধাই হচ্ছিল। তিন স্যাঙাৎকে কঠোর পরিশ্রমের কাজে লাগিয়ে দিলাম। এত সব যন্ত্রপাতি দিয়ে আমি কি করব, এমন কাক-ভেজা ভিজে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে শেষ পর্যন্ত হবেটা কি—এমনি সব প্রশ্ন করে করে তারা আমাকে উত্যক্ত করে তুলল। আমার তো ভয়ই হল যে তারা হয় তো আমাকে ফেলে চলেই যাবে। তবু আমার এই কাজটা ভালোয় ভালোয় হয়ে গেলেই তাদের সব পাওনা-গন্ডা পাই-পাই মিটিয়ে দেব —এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের আপাতত শান্ত করলাম। তারাও নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল।

প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পরেই বেলুনটাকে যথেষ্ট ফোলানো হয়ে গেল। সুতরাং গাড়িটাকে তার সঙ্গে বেঁধে দিয়ে আমার সব যন্ত্রপাতি—দূরবীণ ; ব্যারোমিটার ; ইলেকট্রোমিটার ; কম্পাস ; চৌম্বক সূঁচ ; পকেট-ঘড়ি ; ঘন্টা ; ভেপু ; ইত্যাদি, ইত্যাদি—তাতে ভরলাম। তাছাড়া প্রচুর পানীয় জল এবং যথেষ্ট খাবার-দাবারও বোঝাই করা হল। আর গাড়িতে নিলাম একজোড়া পায়রা ও একটা বিড়াল।

ভোর হয়-হয়। এবার যাত্রা শুরু করতে হবে। যেন হঠাৎ পড়ে গেছে এই ভাব দেখিয়ে হাতের জ্বলন্ত চুরুটটাকে মাটিতে ফেলে দিলাম, এবং সেটা তুলে নেবার জন্য উপুড় হবার সুযোগে একটা ছোট পিপের নীচ থেকে ঈষৎ বের-করা ধীর-গতি দেশলাইয়ের মুখে আগুন ধরিয়ে দিলাম। তিন স্যাঙাৎ এই কৌশলটির কিছুই দেখতে পেল না। আর আমিও এক লাফে গাড়ির ভিতর ঢুকে মাটির সঙ্গে ধা একমাত্র দড়িটাকে কেটে দিলাম। কী মজা! অভাবিত দ্রুত বেগে অ অনায়াসে উপরের দিকে উঠে গেলাম একশ' পঁচাত্তর পাউন্ড ওজনের বালি-বোঝাই বস্তা নিয়ে ; বুঝিবা আরও সমপরিমাণ বোঝা নিয়েও উঠতে পারতাম। পৃথিবীর মাটি

ছাড়বার সময় ব্যারোমিটারে দেখলাম ত্রিশ ইঞ্চি, আর সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটারে ১৯° ডিগ্রি।

যাই হোক, পঞ্চাশ গজ উপরে উঠতে না উঠতেই প্রচণ্ড বেগে গড়্-গড়্ শব্দ করতে করতে আমার পিছন থেকে আগুন, পাথর-কুঁচি ও জ্বলন্ত অঙ্গার এবং জ্বলন্ত ধাতু ও ছিন্ন-ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন এক ভয়ংকর ঝড় ধেয়ে এল যে আমার হৃৎপিণ্ডটা থেমে যাবার উপক্রম হল, আতংকে কাঁপতে কাঁপতে আমি গাড়ির নীচে পড়ে গেলাম। তখন বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটাতে আমিই খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি ; আর তার ফলে আমার কপালে আরও অনেক দুর্ভোগ আছে। এক সেকেণ্ড সময়ের মধ্যেই মনে হল আমার শরীরের সব রক্ত বুঝি মাথায় চড়ে গেছে, আর ঠিক তার পরেই একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ অকস্মাৎ রাতের অন্ধকারকে বিদীর্ণ করে আকাশটাকে একেবারে ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলল। একটু ভাবতেই বুঝতে কষ্ট হল না যে এই ভয়ংকর বিস্ফোরণের কারণ আমি নিজে—আর আমিই এখন রয়েছি ওটার ঠিক উপরে এবং ওর সম্পূর্ণ কব্জার মধ্যে। কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার একমাত্র চিন্তা হল নিজের জীবন বাঁচানো। বেলুনটা প্রথমে ভেঙে গেল, তারপর ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়ল, তারপর তীব্র গতিতে পাক খেতে লাগল, এবং শেষ পর্যন্ত মাতালের মত টলতে টলতে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর মাথাটা নীচের দিকে এবং মুখটা বাইরের দিকে রেখে সেই ভয়ংকর উঁচুতে আমি ঝুলতে লাগলাম বেতের ঝুড়িটার সঙ্গে আটকে গিয়ে—ঘটনাচক্রে ঝুড়িটার নীচ থেকে ফুটতিনেক লম্বা একটা সরু দড়ি ঝুলছিল আর ঈশ্বরের কৃপায় ঠিক পড়বার মুহূর্তে আমার বাঁ পাটা সেই দড়িতে আটকে গিয়েছিল। তখন আমার সেই শোচনীয় অবস্থার ধারণা করা অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। একটু বাতাসের জন্য আমি মরিয়া হয়ে হাঁপাচ্ছি—শরীরের প্রতিটি স্নায়ু, প্রতিটি মাংসপেশী তীব্র যন্ত্রণায় থর্ থর্ করে কাঁপছে—চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে—একটা ভয়ংকর বমির ভাব আমাকে ক্রমেই কাহিল করে তুলছে—শেষ পর্যন্ত আমি জ্ঞান হারিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলাম সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ছিলাম, কারণ কিছুটা চেতনা ফিরে এলে দেখলাম, দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে, বেলুনটা ভেসে চলেছে সীমাহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে, দূরে ও নিকটে দূর-বিস্তার দিকচক্র-রেখার কোথাও স্থলভাগের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ছে না। অবশ্য এই পরিস্থিতিতে আমার যন্ত্রণার অনুভূতি যতটা তীব্র হবার কথা তা কিন্তু হয় নি। বেশ শান্তভাবেই অবস্থাটা বুঝতে চেষ্টা করলাম। একটার পর একটা দুটো হাতকেই চোখের সামনে তুলে ধরে অবাক হয়ে গেলাম ; কেমন করে হাতের শিরাগুলি এতটা ফুলে উঠেছে এবং আঙুলের নখগুলিতে এত ভীষণ কালসিটে দাগ পড়েছে ঠিক বুঝতে পারলাম না। মাথাটা নেড়েচেড়ে দেখলাম, সেটা তো বিশেষ ফোলে নি। তারপর ব্রীচেসের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলি ট্যাবলেট ও দাঁত-খড়কের বাক্সটা না পেয়ে সেগুলো কি ভাবে হারালো বুঝতে না পেরে বিরক্ত হলাম। এতক্ষণে মনে হল যে বাঁ পায়ের গোড়ালিতে একটা তীব্র অস্বস্তি বোধ করছি, আর আমার বর্তমান অবস্থার একটা অস্পষ্ট চেতনা মনের মধ্যে ঝিলিক দিতে লাগল। কিন্তু কী আশ্চর্য ! তাতে আমি অবাকও হলাম

না, ভয়ও পেলাম না। কয়েক মিনিটের জন্য গভীর চিন্তায় ডুবে গেলাম। পরিস্থিতিটাকে মোটামুটি অনুধাবন করার পরে হাত দুটোকে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে পাৎলুনের কোমরবন্ধের সঙ্গে আটকানো লোহার বকলসটাকে খুলে ফেললাম। বকলসের তিনটে দাঁতেই কিছুটা মরচে পড়ায় অনেক কষ্টে সেটাকে ঠিক জায়গায় এনে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে গলাবন্ধটাকে খুলতে চেষ্টা করলাম। খোলা হলে তার একটা প্রান্ত বেঁধে দিলাম বকলসের সঙ্গে এবং অন্য প্রান্তটাকে বেশ শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে বাঁধলাম। এবার মাংসপেশীর জোরে শরীরটাকে উপরের দিকে তুলে প্রথম প্রচেষ্টাতেই বকলসটাকে গাড়ির উপর দিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বেতের ঝুড়িটার সঙ্গে আটকে দিলাম।

তখন আমার শরীরটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কোণ সৃষ্টি করে গাড়ির বাইরে ঝুলতে লাগল। ভিতরে ঢুকবার কোনরকম চেষ্টা না করে প্রায় মিনিট পনেরো সেই ভাবেই ঝুলতে লাগলাম; মনের ভাবটা এমন যেন বেশ মজায়ই আছি। কিন্তু অচিরেই সে বোকামির অবসান ঘটল; পর পর মনে জাগতে লাগল আতংক, বিষাদ, হতাশা ও ধ্বংসের চিন্তা। ফলে সংযম এবং সাহসও হারিয়ে ফেললাম। তবে ভাগ্য ভাল যে এই দুর্বলতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। যথাসময়ে এক তীব্র হতাশার মনোভাবই যেন ফিরে এল আমাকে বাঁচাতে। পাগলের মত চীৎকার করতে করতে আপ্রাণ চেষ্টায় শরীরটাকে একটু একটু পরে ঝাঁকি দিয়ে উপরের দিকে তুলতে তুলতে এক সময়ে সাঁড়াশির মত শক্ত হাতে ঝুড়ির মুখটাকে চেপে ধরে গোটা শরীরকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে তার উপর দিয়ে তুলে সটান গাড়ির মধ্যে চিৎ হয়ে পড়ে থরথর করে কাঁপতে লাগলাম।

মোটামুটি সুস্থ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল। তারপর বেলুনটাকে ভাল করে দেখেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যন্ত্রটার কোন ক্ষতি হয় নি। যন্ত্রপাতিগুলিও নিরাপদ আছে; বালি ও পাথর-কুঁচির বস্তাগুলি এবং খাবার-দাবারও হারায় নি। ঘড়িতে দেখলাম ছ'টা বাজে। তখনও দ্রুতগতিতে উপরেই উঠছি। ব্যারোমিটারে দেখলাম পৌনে চার মাইল উচ্চতা। আমার ঠিক নীচেই সমুদ্র, তার বুকে ভাসছে খেলনার মত আকারের একটা আয়তাকার কালো বস্তু। তার উপর দূরবীণটা ফেলতেই বুঝলাম একটা কামানবাহী বৃটিশ জাহাজ পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মুখ করে ভীষণ ভাবে দুলছে। তাছাড়া সমুদ্র, আকাশ ও সূর্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

এবার মহোদয়গণকে আমার এই আকাশ-যাত্রার উদ্দেশ্যটি বুঝিয়ে বলার সময় হয়েছে। আপনারা মনে রাখবেন যে রটারডামে থাকতে দারিদ্র্যের তাড়নায় আমি আত্মহত্যার সংকল্প করেছিলাম। তাই বলে জীবনের প্রতি কিন্তু আমার বীতস্পৃহা ঘটে নি। মনের সেই অবস্থায় বাঁচতে চাই, অথচ জীবন দুর্বিষহ—পুস্তক-বিক্রেতার দোকানের সেই বইটি নাঁজের অধিবাসী আমার সম্পর্কিত ভাইয়ের আবিষ্কারের দ্বারা সমর্থিত হয়ে আমার কল্পনার সামনে একটা নতুন পথ খুলে দিল। তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম। স্থির করলাম, পৃথিবীটা ছেড়ে যাব ঠিকই, তবু বেঁচে থাকব—অনেকদিন বেঁচে থাকব—ধাঁধা ছেড়ে সহজ কথায় বলি, যা থাকে কপালে ক্ষমতায় যদি কুলোয় তো পাড়ি দেব সুদূর চাঁদে।

এবার আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি এই আপাতদৃষ্টিতে একান্ত দুঃসাহসিক অথচ মানুষের ইতিহাসের এক তুলনাবিহীন চন্দ্র-অভিযানের ফলাফল। যে উচ্চতার কথা আগেই উল্লেখ করেছি—অর্থাৎ পৌনে চার মাইল—সেখানে উঠেই গাড়ির ভিতর থেকে কতকগুলি পালক উড়িয়ে দিয়ে দেখলাম যে তখনও আমি অত্যন্ত দ্রুত উপরের দিকেই উঠছি; কাজেই বালি-ভর্তি বস্তাগুলি বাইরে ফেলে দেবার কোন দরকার নেই। তখনও পর্যন্ত কোনরকম অসুবিধাই বোধ করি নি, বেশ ভালভাবেই শ্বাস নিতে পারছি, মাথায়ও কোন যন্ত্রণা নেই। আমার খুলে-রাখা কোটটার উপর আরাম করে শুয়ে আছে বিড়ালটা, আর শান্তভাবে তাকিয়ে আছে পায়রাগুলোর দিকে। পায়ে দড়ি বাঁধা থাকায় পায়রাগুলিও উড়ে যেতে না পেরে গাড়ির মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়া শস্য-কণাগুলো খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

ছ'টা বেজে কুড়ি মিনিটে ব্যারোমিটারে দেখলাম উচ্চতা ২৬, ৪০০ ফুট, বা পাঁচ মাইলের মত। আরও কতদূর উঠতে হবে কে জানে। সাতটা বাজার কুড়ি মিনিট আগে বেলুনটা পর পর অনেকগুলি ঘন মেঘের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তাতে আমাকে বেশ অসুবিধায় ফেলল; কিছু যন্ত্রপাতির ক্ষতি হল, আর আমিও কাক-ভেজা ভিজে গেলাম। সে এক অদ্ভুত সহাবস্থান; আমি তো ভাবতেই পারি নি যে এত বেশী উচ্চতায় এ রকম মেঘ থাকা সম্ভব। দুটো পাঁচ পাউন্ড ওজনের বস্তা বাইরে ফেলে দিলাম; তখনও বেলুনে থাকল একশ' পঁয়ষট্টি পাউন্ড বোঝা। তার ফলে সেই মেঘের রাজ্য কাটিয়ে অতি দ্রুত বেগে আরও উপরে উঠে গেলাম। তার কয়েক সেকেন্ড পরেই একটা উজ্জ্বল বিদ্যুতের ঝলক মেঘের এ-পার থেকে ও-পারে তীরের মত ছুটে গিয়ে গোটা মেঘটাকে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বালিয়ে দিল। মনে রাখবেন, এটা ঘটেছিল দিনের আলোয়। অনুরূপ একটা ঘটনা রাতের অন্ধকারে ঘটলে যে কী মহান একটা ছবি ফুটে উঠত সেটা কল্পনাতেও ধারণা করা যায় না। হয়তো সেটা হত নরকেরই একটা উপযুক্ত প্রতিচ্ছবি। কিন্তু চোখে যা দেখলাম তাতেই আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল; নীচের দিগন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার গহ্বরের দিকে তাকিয়ে আমি সেই বীভৎস, অতল অগ্নির রূপ কল্পনা করতে লাগলাম। খুব অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছি। বেলুনটা যদি আরও অল্প কিছুক্ষণ সেই মেঘের মধ্যে থাকত, তাহলে আমার ধ্বংস ছিল অনিবার্য। অবশ্য ততক্ষণে আমি এতটা উপরে উঠে গেছি যে এ ধরনের কোন বিপদের আশংকাই আর ছিল না।

ক্রমেই অতি দ্রুত উপরে উঠছি। সাতটার সময় ব্যারোমিটারে উচ্চতা দেখলাম সাড়ে ন' মাইল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। মাথায়ও খুব যন্ত্রণা; ঠান্ডা বোধ হওয়ায় গালে হাত দিয়ে দেখলাম কানের ভিতর থেকে গল্-গল্ করে রক্ত ঝরছে। চোখেও খুব অস্বস্তি বোধ করছি। হাত দিয়ে দেখলাম, চোখের মণি কোটর থেকে অনেকটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে; গাড়ির ভিতরকার সব জিনিস, এমনকি বেলুনটাকেও বিকৃত দেখাচ্ছে। এ রকমটা হতে পারে ভাবি নি, তাই ভয় পেয়ে গেলাম। এই সময় অবিবেচকের মত কোন কিছু না ভেবেই তিনটে পাঁচ পাউন্ডের বস্তা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। তার ফলে ঊর্ধ্বগতির বেগ আরও বেড়ে গেল, এবং আমাকে পৌঁছে দিল

বাতাসের এমন একটি সূক্ষ্ম স্তরে যা এই অভিযানের পক্ষে এবং আমার নিজের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দেখা দিল। হঠাৎ আমার মাংসপেশীতে একটা খিঁচুনি শুরু হল; সেটা প্রায় পাঁচ মিনিট স্থায়ী হল; কিন্তু সেটা থেমে যাবার পরেও আমি বেশ অনেকক্ষণ পরে পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে শ্বাস নিতে পারছিলাম—সারাক্ষণ নাক ও কান দিয়ে, এবং কিছুটা চোখ দিয়েও রক্ত ঝরতে লাগল। মনে হল, পায়রাগুলোও খুব কষ্ট পাচ্ছে; প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছে; বিড়ালটা করুণ সুরে মিউ-মিউ করে ডাকছে; তার জিভটা বেরিয়ে পড়েছে; যেন বিষের ঘোরে এদিক-ওদিক টলছে। মৃত্যু ছাড়া আমারও আর কিছু আশা করার নেই, আর সে মৃত্যু ঘটবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। চিন্তা-ভাবনা করার শক্তিটুকুও নেই; মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়ছে। মনে হল, অচিরে সবগুলি ইন্দ্রিয়ই অকেজো হয়ে পড়বে। গাড়ির মেঝেতে শুয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। স্থির করলাম, নিজের উপরে রক্ত-মোক্ষণের পরীক্ষাটি একবার করে দেখতেই হবে। উপযুক্ত ছুরি সঙ্গে না থাকায় কলম-কাটা ছুরির ফলা দিয়েই বাঁ হাতের একটা শিরা কেটে ফেললাম। কিছুটা রক্ত বেরিয়ে যেতেই অনেকটা আরাম বোধ করলাম, আর আধা গামলা রক্ত বের হবার পর প্রায় সবগুলি খারাপ লক্ষণই সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে গেল। তবু তখনই উঠে দাঁড়াবার সাহস হল না। হাতের ক্ষতস্থানে একটা পট্টি বেঁধে নিয়ে মিনিট পনেরো চুপচাপ শুয়ে থাকলাম। তারপর উঠে দাঁড়াতেই মনে হল, সবরকম যন্ত্রণারই অনেকটা উপশম হয়েছে। অবশ্য শ্বাস-কষ্টটা খুব সামান্যই কমেছে। মনে হল অচিরেই “কনডেন্সার”টা ব্যবহার করার প্রয়োজন দেখা দেবে। অতএব “কনডেন্সার” যন্ত্রটাকে বের করে ব্যবহারের উপযোগী করে রাখলাম।

এইভাবে দিন কাটতে লাগল। ক্রমাগতই উপরে উঠছি। ঊর্ধ্বগতির বিরাম নেই। ৩-রা এপ্রিল—৪-ঠা এপ্রিল—৫ই এপ্রিল—থেকে ১৬ই এপ্রিলও পার হয়ে গেল। ১৭ই এপ্রিল সকালে দেখা দিল আমার আকাশ-ভ্রমণের এক মহাসন্ধিক্ষণ। বিঘ্নিত ঘুম থেকে জেগে উঠেই দেখলাম, আমার নীচেকার ভূ-স্তরের চেহারা আশ্চর্য রকমের বদলে গেছে। আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হল। যে তীব্র ত্রাস ও বিস্ময় আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল তাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল—দাঁতে দাঁত লাগল—মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। “তাহলে তো বেলুনটাই ফেটে গেছে!” এই ভয়ংকর ধারণাটাই সকলের আগে আমার মাথায় ঢুকল। “বেলুনটা নিশ্চয় ফেটে গেছে! —আমি নীচে নেমে যাচ্ছি—নেমে যাচ্ছি প্রচণ্ড গতিতে! ইতি-মধ্যেই এত অধিক দূরত্ব পার হয়ে এসেছি যে পৃথিবীর মাটি ছুঁতে আর দশ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না—আর সে ভাবে মাটিতে ছিটকে পড়লেই ধ্বংস অনিবার্য!” কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আমি যা ভেবে এত ভয় পেয়েছি তা তো হতে পারে না। এত তাড়াতাড়ি নেমে যাবার তো কারণ নেই। এইভাবে ভাবতে গিয়ে মন কিছুটা শান্ত হল; সমস্ত জিনিসটাকে একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারলাম। আসলে, অতি-বিস্ময়ই আমার বুদ্ধিকে আড়াল করে ফেলেছিল; আমার নীচের ভূ-স্তর এবং জননী পৃথিবীর ভূ-স্তরের

পার্থক্য আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। শেষোক্ত স্তরটি ছিল আমার মাথার উপরে, বেলুনটার সম্পূর্ণ আড়ালে, আর চাঁদ—তার পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতা নিয়ে—চাঁদ ছিল আমার নীচে, পায়ের তলায়।

অবতরণেই কেটে গেল আরও একটা দিন। ১৯-শে এপ্রিল আমার জীবনের একটা পরম আনন্দের দিন। সকাল ন'টা নাগাদ চাঁদকে মনে হল ভয়ংকরভাবে আমার অত্যন্ত কাছে। ভীষণ দ্রুতগতিতে আমি নীচে নামছি। আর বড় জোর আধ মাইলের দূরত্ব। কোট, টুপি ও বুট খুলে ফেললাম; বেলুনের দড়ি কেটে দিয়ে গাড়িটাকে বিচ্ছিন্ন করে দিলাম; সেটাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরে সারা দেশটাকে দুই চোখ ভরে দেখতে লাগলাম। তার পরেই ছিটকে পড়লাম একটা অদ্ভুত-দর্শন শহরের একেবারে মাঝখানে। চারদিকে কুৎসিত দর্শন ছোট ছোট মানুষের ভিড়; কারও মুখে একটা কথা নেই; কেউ এগিয়ে এল না আমাকে এতটুকু সাহায্য করতে; একপাল জড়বুদ্ধি জীবের মত তারা হাস্যকর ভঙ্গীতে মিটি মিটি হাসতে লাগল, আর দুই হাত ভাঁজ করে বুকের উপর রেখে আমার দিকে ও আমার বেলুনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আমি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিলাম; উপরের দিকে চোখ মেলে তাকালাম সদ্য ফেলে-আসা পৃথিবীর দিকে, যাকে হয়তো ফেলে এসেছি চিরদিনের মত; দেখলাম—যেন দুই ডিগ্রি ব্যাসের একটা প্রকাণ্ড তামার বর্ম মাথার উপরকার আকাশে স্থিরনিবদ্ধ; তার এক পাশের বঙ্কিম রেখাটি উজ্জ্বল সোনালী আলোয় ঝলমল করছে। স্থল বা জলের চিহ্নমাত্র চোখে পড়ল না. সবকিছুই স্তূপ স্তূপ মেঘে ঢাকা।

মহোদয়গণ শুনে সুখী হবেন, এইভাবে অনেক উদ্বেগ, অনেক অশ্রুতপূর্ব বিপদ ও তুলনাবিহীনভাবে রক্ষা পাবার পরে অবশেষে রটারডাম থেকে যাত্রা শুরু করার উনিশ দিনের দিন এমন একটা অভিযানকে নিরাপদে শেষ করলাম যা নিঃসন্দেহে যেমন অসাধারণ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি এর আগে পৃথিবীর কোন অধিবাসী কখনও মনেও আনে নি, বা বাস্তবে রূপান্তরিত করে নি। কিন্তু আমার অভিযানের কথাই তো এখনও বাকি আছে। বস্তুত, মহোদয়গণ নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারছেন যে আমি যেহেতু পাঁচটি বছর কাটিয়ে এসেছি এমন একটি গ্রহে যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই যথেষ্ট আকর্ষণীয় তো বটেই, বরং দ্বিগুণ আকর্ষণীয় উপগ্রহ হিসাবে তার সঙ্গে মানুষের বাসস্থান এই পৃথিবীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্য, সেই হেতু "স্টেট কলেজ অব অ্যাস্ট্রনমারর্স"-এর জন্য আমি আরও বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য নিয়ে এসেছি। আসলেও ব্যাপারটা তাই। আমি এমন অনেক—অনেক কিছু জেনে এসেছি যা জানাতে পারলে আমার খুশির অবধি থাকবে না। সেই গ্রহের আবহাওয়া; শীত ও আতপের আশ্চর্য আবর্তন; একপক্ষ কাল সূর্যের প্রচণ্ড জ্বলন্ত কিরণরশ্মি, আর পরবর্তী পক্ষেই মেরু প্রদেশের বরফ-শীতলতা; সেখানকার অধিবাসীরা; তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহ; তাদের কুৎসিত চেহারা; তাদের কানের অভাব; তার ফলে ভাষার অজ্ঞতা; ভাষার পরিবর্তে ভাব-বিনিময়ের এক বিশেষ পদ্ধতি; চাঁদের কোন কোন ব্যক্তির সঙ্গে পৃথিবীর কোন বিশেষ মানুষটির এক দুর্বোধ্য যোগাযোগ; আর সর্বোপরি চাঁদের বহিস্থ অঞ্চলের সেই সব অন্ধকার ও

বীভৎস রহস্য যা আজও মানুষের দূরবীণে ধরা পড়ে নি, বা কোনদিন পড়বেও না। এই সব কথা এবং আরও অনেক-অনেক কথাই আমি জানাতে চাই। কিন্তু—এটাই আমার শেষ কথা—তার আগে আমি চাই আমার পুরস্কার। আমার পরিবারের কাছে, আমার দেশে ফিরবার জন্য আমি বড়ই উৎসুক হয়ে পড়েছি; এবং আরও যে সব গুরুতর তথ্য আমার হাতে আছে তার বিনিময়ে আপনাদের কাছে আমার বিনীত নিবেদন, রটারডাম থেকে যাত্রার পরেই আমার তিন উত্তমর্ণের মৃত্যু ঘটাবার যে অপরাধে আমাকে অপরাধী করা হয়েছে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করা হোক। এটাই বর্তমান পত্রের উদ্দেশ্য। পত্রের বাহক চন্দ্রলোকের একজন অধিবাসী; আমি তাকে অনুরোধ করেছি, নির্দেশ দিয়েছি তিনি যেন পৃথিবীতে আমার দূত হিসাবে কাজ করেন। তিনি মহোদয়গণের জন্য অপেক্ষা করবেন, এবং কোন উপায়ে যদি আমার প্রার্থিত ক্ষমাটি পেয়ে যান তাহলে সেটা নিয়েই আমার কাছে ফিরে আসবেন।

আপনাদের একান্ত বিনীত সেবক
হান্স ফাল।

এই অসাধারণ পত্রখানি পড়ার পরে অধ্যাপক রুবাদুব নাকি অত্যধিক বিস্ময়ে তার পাইপটাই মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন, আর মীনহীর সুপারবাস ভন আণ্ডারডুক নাকি চোখের চশমা খুলে মুছে নিয়ে পকেটে ভরেছিলেন, এবং নিজেকে ও নিজের মর্যাদাকে এতদূর বিস্মৃত হয়েছিলেন যে বিস্ময়ে ও প্রশংসায় গোড়ালির উপর তিন পাক ঘুরে গিয়েছিলেন। ক্ষমার ব্যবস্থা করতেই হবে—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। অধ্যাপক রুবাদুব শপথ করে সে কথা ঘোষণা করলেন, আর শেষ পর্যন্ত খ্যাতিমান অধ্যাপক ভন আণ্ডারডুকও সেই কথাই ভাবলেন। কিভাবে সেটা করা যাবে সেটা স্থির করতে দুই বিজ্ঞানী হাত ধরাধরি করে বাড়ির পথ ধরলেন। অবশ্য নগর-প্রধানের বাড়ির দবজায় পৌঁছে তিনি জানালেন, দূতটি যখন এখান থেকে চলে গেছেন—রটারডামের নাগরিকদের অসভ্য চেহারা দেখে মৃত্যুর ভয়েই তিনি সরে পড়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তখন তো ক্ষমার ব্যবস্থা হলেও তাতে কোন লাভ হবে না, কারণ চাঁদের কোন লোক ছাড়া অন্য কেউ তো অত দূর পথে পাড়ি দিতে পারবে না। নগর-প্রধানও এ কথার সত্যতা মেনে নিলেন, সুতরাং ক্ষমার ব্যাপারটার সেখানেই সমাপ্তি ঘটল। অবশ্য গুজবের শেষ হল না। চিঠিটা ছাপা হওয়াতে নানারকম গুজব ও মতামত ছড়াতে লাগল। কিছু অতি-বুদ্ধিমান লোক সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা ধাপ্পা বলে নিন্দা করে নিজেরাই হাস্যকর প্রতিপন্ন হল। কিন্তু আমার তো বিশ্বাস, এ ধরনের লোকরা যা কিছু বুঝতে পারে না তাকেই ধাপ্পা বলে উড়িয়ে দিতে চায়। আমি তো বুঝতেই পারছি না কোন্ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তারা এ কথা বলছে। এবার দেখা যাক তারা কি বলছে ঃ

প্রথম কথা। রটারডামের কিছু রসিক মানুষের কতকগুলি বিশেষ বিরূপতা আছে কিছু কিছু পৌর-প্রধান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী সম্পর্কে।

দ্বিতীয়ত। কোনরকম অসদাচরণের দরুন দুটো কানই কেটে দেওয়া হয়েছে এমন

একটি মদ্যপায়ী বেঁটে বামন গত কয়েক দিন যাবৎ ব্রুজেস শহরের আশ-পাশের অঞ্চল থেকে নিখোঁজ হয়েছে।

তৃতীয়ত। যে সব খবরের কাগজ ছোট বেলুনটার গায়ে আগাগোড়া সেঁটে দেওয়া হয়েছিল সে সবই হল্যাণ্ডের সংবাদপত্র; সুতরাং সেগুলি চাঁদে ছাপা হতেই পারে না। কাগজগুলি নোংরা—খুবই নোংরা ছিল, আর মুদ্রাকর গ্লাক বাইবেল ছুঁয়েও শপথ করে বলতে রাজী যে সেগুলি রটারডামেই ছাপা হয়েছে।

চতুর্থত। মাতাল শয়তান হান্স ফাল স্বয়ং এবং তার উত্তমর্ণ বলে উল্লেখিত তিনটি অত্যন্ত আলস্যপরায়ণ ভদ্রলোককে মাত্র দু-তিন দিন আগেও শহরতলীর একটা দেশী মদের দোকানে দেখা গিয়েছিল; পকেটভর্তি টাকা নিয়ে তারা সদ্য ফিরে এসেছে সমুদ্রের ও-পার থেকে।

শেষ কথা। সাধারণত সকলেই মনে করেন, অথবা মনে করা উচিত, যে রটারডাম শহরের "কলেজ অব অ্যাস্ট্রনমার্স" এবং পৃথিবীর অন্য সব অঞ্চলের সব কলেজ—সাধারণভাবে সব কলেজ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কথা বলছি না—সম্পর্কেই খুব কম করে বললেও বলা যায় যে যা হওয়া উচিত তারা তার চাইতে তিলমাত্রও বেশী ভাল, বেশী বড়, বা বেশী জ্ঞানী নয়।

আর্থার গর্ডন পিম-এর বিবরণ

Narrative of A. Gordon Pym.

প্রাক-বাক

দক্ষিণ সমুদ্রে এবং অন্যত্র অনেকগুলি অভিযানের শেষে কয়েক মাস আগে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরেছি। সেই সময় আকস্মিকভাবেই ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত রিচমণ্ডে কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমি যে সব অঞ্চল দেখে এসেছি সে সম্পর্কে গভীরভাবে আগ্রহী হওয়ায় তারা আমাকে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন, আমি যেন আমার বিবরণগুলি জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করি। কয়েকটি কারণে সে কাজে আমার আপত্তি ছিল; তার মধ্যে কিছু কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত; অন্যগুলি ততটা নয়। অন্যতম একটি বাধা হল, আমার অনুপস্থিতিকালের বেশীর ভাগ সময়েরই কোনদিনলিপি রাখি নি; কাজেই আমার ভয় ছিল, কেবলমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে এ রকম একটা সূক্ষ্ম ও বিস্তারিত বিবরণ হয়তো ঠিকঠিক মত লিখে উঠতে পারব না। আরও একটি কারণ হল, যে সব ঘটনার বিবরণ আমাকে লিখতে হবে স্বভাবতই সেগুলি এত বেশী আশ্চর্যজনক যে কোনরকম সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া (একটিমাত্র দো-আঁসলা

আদিবাসীর সাক্ষ্যকে বাদ দিলে) কেবলমাত্র আমার পরিসরের লোকজন এবং সারা জীবনের বন্ধুবান্ধবদের বিশ্বাসই আমি আশা করতে পারি, আর বাদবাকি জনসাধারণ আমার সেই লেখাকে বে-আদপী ও মন-গড়া উপন্যাস বলেই ধরে নেবে। তথাপি আমার পরামর্শদাতা বন্ধুদের কথামত কাজ যে আমি করতে পারি নি তার অন্যতম প্রধান কারণটি কিন্তু লেখক হিসাবে নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাসের অভাব।

ভার্জিনিয়ার যে সব ভদ্রলোক আমার বিবরণের প্রতি, বিশেষ করে বিবরণের যে সব অংশে দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের কথা আছে তার প্রতি সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন তাদের একজন হলেন মিঃ পো ; সম্প্রতি তিনি রিচমণ্ড শহরে মিঃ টমাস ডব্লু, হোয়াইট কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা "সাদার্ন লিটারেরি মেসেঞ্জার"-এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন। অন্য অনেকের সঙ্গে তিনি বেশ জোর দিয়েই আমাকে বললেন, আমি যেন অবিলম্বে যা কিছু দেখেছি এবং যে সব ঘটনার অংশীদার হয়েছি তার একটা পূর্ণ বিবরণ লিখে ফেলি এবং জনসাধারণের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও সাধারণ জ্ঞানের উপর ভরসা রাখি—তিনিও আমাকে ভরসা দিলেন যে আমার বইয়ের ছাপা ও বাঁধাই যত খারাপই হোক—তা যদি হয়ও—সেটাই হবে সত্য ঘটনা হিসাবে গৃহীত হবার স্বপক্ষে তার তুরুপের তাস।

তাদের এত সুপারিশ সত্ত্বেও আমি সে বিষয়ে মনস্থির করতে পারি নি। এ নিয়ে আমাকে কোনরকম নড়ে-চড়ে বসতে না দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি প্রস্তাব করলেন, আমি যেন তাকে অনুমতি দেই যাতে তিনি আমার অভিযানের গোড়ার অংশের বিবরণ—আমার দেওয়া তথ্য অনুসারেই—তার নিজের কথায় লিখে উপন্যাসের ছদ্মবেশ পরিয়ে "সাদার্ন মেসেঞ্জার"-এ প্রকাশ করতে পারেন। এতে আমার কোন আপত্তি না থাকায় সম্মতি দিলাম, অবশ্য এক শর্তে যে আমার আসল নামটি রাখতে হবে। ফলে "মেসেঞ্জার"-এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি (১৮৩৭) দুই সংখ্যায় ভেকধারী উপন্যাসটির দুই কিস্তি প্রকাশিত হল। আর রচনাটাকে যাতে নিশ্চিতরূপেই উপন্যাস মনে করা হয় সেজন্য পত্রিকার সূচীপত্রে মিঃ পো-র নামটিই জুড়ে দেওয়া হল।

এই চাতুরিকে পাঠকরা যেভাবে গ্রহণ করল তাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আলোচ্য অভিযানগুলির নিয়মিত রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করেছি ; কারণ আমি লক্ষ্য করেছি আমার বিবরণের যে অংশটা "মেসেঞ্জার"-এ প্রকাশিত হয়েছে তার সর্বাঙ্গে অতি সুকৌশলে উপকথার আবরণ ছড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও পাঠক-সাধারণ তাকে মোটেই উপকথা বলে মনে করে নি ; বরং মিঃ পি-র ঠিকানায় লিখিত কয়েকখানি চিঠিতে তার বিপরীত ধারণাই দৃঢ়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অতএব আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে আমার বিবরণের ঘটনাগুলিই এমন যে সেগুলি নিজেরাই নিজেদের যাথার্থ্যতার যথেষ্ট প্রমাণ ; আর তাই জনসাধারণের অবিশ্বাসকে ভয় করার কোন কারণই আমার নেই।

এই খোলাখুলি স্বীকৃতি থেকেই বোঝা যাবে এই রচনার কতটা আমার নিজের লেখা ; আরও বোঝা যাবে যে প্রথম দিকের যে কয়েকটি পাতা মিঃ পো লিখেছেন সেখানেও কোন ঘটনাকে বিকৃত করা হয় নি। যে সব পাঠক "মেসেঞ্জার"কে চোখেও দেখেন নি

তাদেরও দেখিয়ে দেবার প্রয়োজনেই কোথায় তার লেখা শেষ হয়েছে এবং আমার লেখা শুরু হয়েছে; লিখন-শৈলীর ফারাকটা সহজেই চোখে পড়বে।

নিউইয়র্ক, জুলাই, ১৮৩৮ এ. জি. পিম

অধ্যায়—১

আমার নাম আর্থার গর্ডন পিম। আমার বাবা ছিলেন ন্যান্টাকেট-এর জাহাজী দ্রব্যাদির একজন সম্মানিত ব্যবসায়ী। সেখানেই আমার জন্ম হয়। আমার মাতামহ ছিলেন এটর্নি। তার আয়-উপার্জন ভালই ছিল। সব ব্যাপারেই ভাগ্য তার প্রতি প্রসন্ন ছিল; সেকালের "এড গার্টন নিউ ব্যাংক"-এর কোম্পানির কাগজের ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন। এই কাজে এবং অন্য আরও নানা উপায়ে তিনি প্রচুর টাকা করেছিলেন। পৃথিবীতে অন্য সকলের চাইতে আমাকেই তিনি বেশী ভালবাসতেন বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমি আশা করেছিলাম তার মৃত্যুর পরে তার বেশীর ভাগ সম্পত্তিরই উত্তরাধিকারী হব আমি। ছ' বছর বয়সের সময় আমাকে তিনি পাঠিয়েছিলেন বুড়ো মিঃ রিকেট্স্-এর স্কুলে। ভদ্রলোকের একটিমাত্র হাত ছিল; চাল-চলন ছিল খাম-খেয়ালী; নিউ বেডফোর্ড-এ যারা গেছে তারা সকলেই তাকে বেশ ভাল করেই চেনে। ষোল বছর পর্যন্ত আমি তার স্কুলেই ছিলাম; তারপরে গেলাম পাহাড়ের উপরকার মিঃ ই, রোনাল্ড-এর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। সেখানে নৌ-ক্যাপ্টেন মিঃ বার্নার্ড-এর ছেলের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়; সাধারণত তিনি লয়েড অ্যান্ড ভ্রেডেনবুর্গ-এর কর্মী হিসাবেই জাহাজে কাজ করতেন—মিঃ বার্নার্ডও বেডফোর্ড-এ সকলেরই পরিচিত, আর এডগার্টনেও তার অনেক আত্মীয়-স্বজন ছিল। তার ছেলের নাম ছিল অগাস্টাস, আমার চাইতে প্রায় দুই বছরের বড়। "জন ডোনাল্ডসন" জাহাজে চেপে সে তার বাবার সঙ্গে তিমি শিকারে গিয়েছিল। তাই সে সব সময়ই দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নানা অভিযানের গল্প শোনাত। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে তাদের বাড়ি যেতাম; সারা দিন, কখনও কখনও রাতেও থাকতাম। আমরা একই বিছানায় শুতাম; টিনিয়ান দ্বীপ এবং ভ্রমণকালে আর যে সব দেশে সে গিয়েছে সেখানকার আদিবাসীদের গল্প শুনিয়ে সে আমাকে সারা রাত জাগিয়ে রাখত। শেষ পর্যন্ত আমারও তার গল্প শোনার আগ্রহ বেড়ে গেল, আর ক্রমে ক্রমে আমার মনেও সমুদ্রযাত্রার প্রবল ইচ্ছা জাগল। আমার একটা পাল-তোলা ছোট জাহাজ ছিল। সেটার নাম 'এরিয়েল'। দাম পড়েছিল পঁচাত্তর ডলারের মত। তাতে একটা আধা-ডেক বা কামরা ছিল। জাহাজটা কত টনের ছিল তা ভুলে গেছি, তবে ঠাসাঠাসি না করেও তাতে দশজনের জায়গা হত। সেই জাহাজে চড়ে মাঝে মাঝেই আমরা পাগলের মত সব কাণ্ড-কারখানা করে বসতাম; এখন সে সব কথা ভাবলে মনে হয় আমি যে আজও বেঁচে আছি সেটা হাজার বার আশ্চর্য।

একটা দীর্ঘতর এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিবরণের ভূমিকা হিসাবে এখানে সেই সব অভিযানের একটির কথা বলব। এক রাতে মিঃ বার্নার্ড-এর বাড়িতে একটা পার্টি ছিল; পার্টির শেষদিকে অগাস্টাস ও আমি দুজনই নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিলাম। এ ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, বাড়ি ফিরে না গিয়ে আমি অগাস্টাসের বিছানাতেই শুয়ে পড়লাম। সেও শান্তভাবে ঘুমতে গেল (পার্টি ভেঙেছিল প্রায় একটার সময়); তার প্রিয় বিষয়টি সম্পর্কে একটি কথাও বলল না। বিছানায় শুয়ে আধঘণ্টা কেটে গেল; সবে ঘুমের আমেজ এসেছে, হঠাৎ সে উঠে বসল, ভয়ংকর একটা দিব্যি গেলে বলে উঠল, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এমন মধুর বাতাস বইছে, খৃস্টীয় রাজ্যের কে এক আর্থার পিমের জন্য এমন সময়টা আমি ঘুমিয়ে কাটাতে পারব না। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক! সে কি বলতে চায় বুঝতে পারলাম না; মনে হল মদের নেশায় তার জ্ঞান-গম্যি লোপ পেয়েছে। সে কিন্তু বেশ শান্তভাবেই কথা বলতে লাগল; বলল, সে জানে যে আমি তাকে মাতাল ভাবছি, কিন্তু জীবনে সে আর কোন দিন এত সুস্থ মাথায় থাকে নি। আরও বলল, এমন সুন্দর একটা রাতকে সে একটা কুকুরের মত বিছানায় শুয়ে কাটাতে পারবে না; উঠে গিয়ে সাজগোজ করে জাহাজটা নিয়ে মজা করতে বেরিয়ে পড়বে। আমাকে কিসে পেয়েছিল বলতে পারি না, কিন্তু তার মুখ থেকে কথা কয়টি খসে পড়ামাত্রেই পরম উত্তেজনা ও আনন্দের একটা শিহরণ জাগল আমার মনে, আর তার এই পাগলামিকেই মনে হল পৃথিবীর সব চাইতে আনন্দদায়ক যুক্তিপূর্ণ কাজ। বাইরে ঝড় বইছে, আবহাওয়াও অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা—সময়টা অক্টোবরের শেষ। তথাপি সোল্লাসে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বললাম, আমিও তার মতই সাহসী, তার মতই আমিও কুকুরের মত বিছানায় শুয়ে এমন রাতটা কাটাতে পারব না, আর ন্যাণ্টাকেট-এর অগাস্টাস বার্নার্ডের মতই যে কোনরকম কৌতুক বা মজা করতে প্রস্তুত।

কালবিলম্ব না করে পোশাকপত্র পরে ছুটলাম জাহাজের খোঁজে। জাহাজটা ছিল প্যাংকি এ্যান্ড কোং-র গুদামের পাশে কাঠের বড় বড় টুকরোগুলোর পাশে। অগাস্টাস জাহাজে উঠে সব জল ছেঁচে ফেলল; তারপর তিন কোণা পাল ও বড় পালটা তুলে দিয়ে আমরা সাহস করে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করলাম।

আগেই বলেছি, বাতাস বইছিল দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। রাতটা ছিল খুবই পরিষ্কার ও ঠাণ্ডা। জাহাজের ডেকে অগাস্টাস হাতে নিল হাল, আর আমি দাঁড়ালাম মাস্তুলের পাশে। তীব্র গতিতে আমরা উড়ে চললাম—জাহাজ ঘাটটা ছেড়ে আসার পর থেকে দুজনের কেউই একটা কথাও বলি নি। এবার আমি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কোন্ পথে জাহাজটাকে চালাতে চায়, আর কখন আমরা ফিরতে পারব বলে সে মনে করে। কয়েক মিনিট ধরে শিস দিয়ে তারপর কঠিন গলায় সে বলল, "আমি সমুদ্রে যাচ্ছি—তুমি ভাল বুঝলে বাড়িতে ফিরে যেতে পার।" তার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েই বুঝলাম, মুখে যতই বেপরোয়া ভাব দেখাক আসলে সে খুবই উত্তেজিত। চাঁদের আলোয় আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—তার মুখ শ্বেত

পাথরের চাইতেও বিবর্ণ, তার হাত এত বেশী কাঁপছে যে হালের কাঠটাকে ধরে রাখতে পারছে না। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে বুঝতে পেরে আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। সে সময় আমি নিজে জাহাজ চালানোর ব্যাপারে কিছুই জানতাম না, সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করছি বন্ধুর জাহাজ চালানোর কৌশলের উপর। বাতাসও হঠাৎ খুব বেড়ে গেছে, মাটির আশ্রয় ছেড়ে ক্রমেই আমরা দূরে চলে যাচ্ছি—তবু কোনরকম ভয়ের লক্ষণ দেখাতে আমার লজ্জা হল; প্রায় আধ ঘণ্টা সময় প্রাণপণ চেষ্টায় স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতে পারলাম না; অগাস্টাসকে বললাম এবার ফিরে যাওয়াই উচিত। আগের মতই এবারও সে মিনিটখানেক কোন কথা বলল না। শেষ পর্যন্ত উত্তর দিল "হবে—হবে, যথেষ্ট সময় আছে—বাড়ি তো যাবই।" এই রকম একটা জবাবই আমি আশা করেছিলাম; কিন্তু তার কথার মধ্যে এমন একটা সুর ছিল যাতে একটা বর্ণনাতীত আতংকে আমার মনটা ভারী হয়ে উঠল। বক্তার দিকে পুনরায় ভাল করে তাকালাম। তার ঠোঁট দুটি একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেছে, দুটো হাঁটু এত জোরে কাঁপছে যে মনে হল সে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। ভয়ার্ত অন্তরে আমি চীৎকার করে বললাম, "ঈশ্বরের দোহাই অগাস্টাস, বল তুমি কিসে কষ্ট পাচ্ছ?—ব্যাপার কি?—তুমি কি করতে চলেছ?" "ব্যাপার!" যেন খুবই অবাক হয়ে গেছে এমনিভাবে তো-তো করে কথা বলতে গিয়েই হালের কাঠটাকে ছেড়ে দিয়ে সে জাহাজের পাটাতনের উপর সটান পড়ে গেল—"ব্যাপার! ব্যাপার কিছুই না—বাড়ি যাচ্ছি—তু-তুমি দেখতে পাচ্ছ না?" এবার আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। ছুটে গিয়ে তাকে ধরে তুললাম। সে মাতাল হয়ে গেছে—পাড় মাতাল—এখন সে দাঁড়াতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না, কিছু দেখতেও পারছে না। তার চোখ দুটো চকচক করছে; আমাকে একেবারে হতাশ করে দিয়ে সে আবার এক-খণ্ড কাঠের মত ধপাস্ করে জাহাজের খোলের জলে পড়ে গেল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, সারা সন্ধ্যায় আমি যতটা আশংকা করেছিলাম তার চাইতে অনেক বেশী মদ সে গিলেছে, আর বিছানায় তার সব চাল-চলনই নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে যাওয়ার ফল। তার উপর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের একটা স্বাভাবিক প্রভাব তো আছেই। এখন সে একেবারেই বে-হেড হয়ে পড়েছে; বেশ কয়েক ঘন্টা এই অবস্থাতেই থাকবে।

আমার আতংক যে তখন কতটা চরমে উঠেছে সেটা অন্য কেউ ধারণাই করতে পারবে না। সম্প্রতি যে মদটা পেটে পড়েছে তার ধোঁয়া উঠে গেছে; আমার মনে বাসা বেঁধেছে ভয় আর অস্থিরচিত্ততা। আমি জানতাম, জাহাজ চালাতে আমি একেবারে অপারগ; এদিকে একটা প্রবল বাতাস ও জোরালো জোয়ার আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের দিকে। আমাদের পিছন থেকে ধেয়ে আসছে একটা ঝড়; সঙ্গে না আছে কম্পাস না আছে খাবার; এই ভাবে চলতে থাকলে ভোর হবার আগেই আমরা মাটি থেকে অনেক দূরে চলে যাব। জাহাজটা তীব্রগতিতে জল কেটে চলেছে—পিছনে প্রচণ্ড হাওয়া—তিন-কোণা পালে বা বড় পালে গুটানো বাড়তি কাপড় নেই—অগাস্টাস হাল ছেড়ে দিয়েছে, আর আমিও উত্তেজনাবশে সেটা হাতে নেই নি। জাহাজের গলুইটা একেবার ঢেউয়ের-নীচ দিয়ে চলেছে। অথচ হাজার

আশ্চর্যের এক আশ্চর্য—জাহাজটা বাতাসের অনুকূলে ছুটছে না। ভাগ্য ভাল, জাহাজটা তখনও ঠিকভাবেই চলেছে। ধীরে ধীরে আমিও কিছুটা মনোবল ফিরে পেলাম। তখনও বাতাস ভয়ংকরভাবে বেড়ে চলেছে; একটা ঢেউয়ের ভিতর থেকে মাথা তুলতেই পিছন থেকে আর একটা ঢেউ এসে আমাদের চুবিয়ে দিচ্ছে। আমারও হাত-প্য অবশ হয়ে আসছে, প্রায় অচেতন হবার অবস্থা। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বড় পালটার কাছে গিয়ে সেটাকে নামিয়ে দিলাম। যেমনটি আশা করেছিলাম, পালটা গলুইয়ের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে জলে ভিজে ভারী হবার দরুন মাস্তুলটাকেও ফেলে দিল। শেষ দুর্ঘটনাটিই আমাকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করল। তখন হালটাকে নিজের হাতে নিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম; বাঁচবার একটা শেষ সুযোগ হয়তো এখনও আছে। অগাস্টাস তখনও অজ্ঞান অবস্থাতেই পড়ে আছে। তাকে কিছুটা তুলে বসিয়ে দিয়ে কোমরের সঙ্গে একটা দড়ি জড়িয়ে বেঁধে দিলাম। তারপর যা থাকে কপালে বলে নিজের কাজে লেগে গেলাম।

ঠিক তখনই অকস্মাৎ যেন হাজার দৈত্যের গলা থেকে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘ সুউচ্চ আর্তনাদ—ছড়িয়ে পড়ল জাহাজের চারদিকের বাতাসে। সেই মুহূর্তে আতংকের যে তীব্র যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছিলাম তাকে যতদিন বেঁচে থাকব কখনও ভুলব না। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে—মনে হল শিরায়-শিরায় সব রক্ত জমে যাচ্ছে—বন্ধ হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ডের ধুক-পুকানি; একবার চোখ তুলে না তাকিয়েই অজ্ঞান হয়ে সটান শুয়ে পড়লাম বন্ধুটির শরীরের উপরে।

জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম, ন্যাণ্টাকেটগামী একটা বড় তিমি-শিকারী জাহাজ-এর (পেঙ্গুইন) কেবিনে আমি শুয়ে আছি। কিছু লোক আমার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, আর মৃত্যুর চাইতেও বিবর্ণ মুখে অগাস্টাস আমার হাত দুখানা ঘসছে গরম করার জন্য। আমাকে চোখ খুলতে দেখে সে কৃতজ্ঞতায় ও আনন্দে হৈ-চৈ শুরু করে দিল, আর তা দেখে উপস্থিত কঠোর দর্শন লোকগুলি কখনও হাসতে লাগল, কখনও চোখের জল ফেলতে লাগল। এবার জানতে পারলাম আমাদের বেঁচে থাকার রহস্য। তিমি-শিকারী জাহাজটা সবগুলি পাল তুলে দিয়ে ন্যাণ্টাকেট যাবার পথে আমাদের ছোট জাহাজটাকে চাপা দেয়। কয়েকজন সামনের দিকে দৃষ্টি রেখেছিল, কিন্তু আমাদের জাহাজটা যখন তাদের চোখে পড়ল তখন আর সংঘর্ষ এড়াবার কোন উপায় ছিল না—আমাদের সতর্ক করে দিতে তারা একযোগে যে চীৎকার করেছিল তা শুনেই আমরা ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। শুনলাম বড় জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাহাজের উপর দিয়ে অতি সহজেই চলে গেল, ঠিক যে রকম সহজে আমাদের ছোট জাহাজটা একটা পালকের উপর দিয়ে যেতে পারত। অসহায় ছোট জাহাজটির ডেক থেকে একটা আর্তনাদও উঠল না—কেবল শোনা গেল বাতাস ও জলের গর্জনের সঙ্গে মিশে-যাওয়া দুটো জাহাজের ঘর্ষণের একটা সামান্য আওয়াজ—বাস্, আর কিছু নয়। আমাদের জাহাজটাকে একটা তুচ্ছ ঝিনুক মনে করে বড় জাহাজের ক্যাপ্টেন (নিউ লণ্ডনের ক্যাপ্টেন ই, টি, ভি, ব্লক) সোজা বেরিয়ে যেতেই চেয়েছিলেন। ভাগ্যক্রমে পর্যবেক্ষক দলের দুটি মানুষ শপথ করে বলেছিল যে একটি লোককে তারা হাল ধরে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখেছে, এবং চেষ্টা করলে এখনও তাকে বাঁচানো সম্ভব। শুরু হল আলোচনা ; ব্লক রেগে গিয়ে বললেন, "ঝিনুক খুঁজে বেড়ানোটা তো তার কাজ নয় ; এ ধরনের বাজে অজুহাতে একটা জাহাজকে আটকে রাখা উচিত নয় ; কেউ যদি চাপা পড়েই থাকে সেটা তার নিজের দোষ—সে ডুবে যেতে পারে, মরতেও পারে, বা এই ধরনের কিছু কথা। এবার প্রথম মেট হেণ্ডারসন বেঁকে দাঁড়াল ; অন্য নাবিকরাও তার সঙ্গে যোগ দিল। সে স্পষ্টভাষায় ক্যাপ্টেনকে বলল, তার এ কাজ চরম হৃদয়হীনতার পরিচায়ক ; তার ফাঁসি হওয়া উচিত ; কোনক্রমেই সে ক্যাপ্টেনের এ আদেশ মানবে না, তার জন্য মাটিতে পা দিতেই যদি তাকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তো তাই সই। ব্লককে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সে নিজে গিয়ে জাহাজের হাল ধরল ; কঠিন কণ্ঠে সকলকে নির্দেশ দিল যার যার কাজে চলে যেতে। সকলের চেষ্টায় জাহাজটাকে কৌশলে সরিয়ে নেওয়া হল। এ সব করতে মিনিট পাঁচেক সময় লেগেছিল, আর পাঠকরা তো দেখতেই পাচ্ছেন অগাস্টাস ও আমি দুজনেই পেয়েছিলাম।

অবশ্য উদ্ধারের ব্যাপারটা এত সহজে ঘটে নি। বড় জাহাজটাকে আটকে রেখে দুজন সঙ্গীকে নিয়ে হেণ্ডারসন জালি-বোটটাকে জলে নামিয়ে তার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তারপর অনেক খোঁজাখুঁজি করে আমাকে আবিষ্কার করল "পেঙ্গুইন"-এর তলাকার তামার পাতের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আটকেপড়া অবস্থায়। জাহাজের একটা কাঠের হুড়কো অর্ধেক ভেঙে গিয়ে তামার পাতকে ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল, আর সেটা আমার জ্যাকেটের কলারের ভিতর দিকে ঢুকে ঘাড়ের পিছন দিক দিয়ে একেবারে কানের গোড়া পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। মৃতপ্রায় অবস্থায় আমাকে তারা সেখানে তুলে এনেছিল "পেঙ্গুইন"-এর ডেকে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। সেখানে কোন সার্জন ছিল না। ক্যাপ্টেন ব্লকই যথেষ্ট যত্ন করে আমার চিকিৎসা করলেন—হয়তো বা পূর্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তই করলেন।

ইতিমধ্যে হেণ্ডারসন পুনরায় ডেক থেকে নেমে গেল জালি-বোটে। ঝড়ের হাওয়া তখন হ্যারিকেনের রূপ ধারণ করেছে। কিছুদূর যেতেই আমাদের জাহাজের কিছু ভাঙা অংশ তার নজরে পড়ল। একসময় সঙ্গীরা বলল, ঝড়ের গর্জনের ভিতর থেকে তাদের কানে এসেছে কার যেন কাতর চীৎকার—কে যেন বলছে বাঁচাও। নতুন উৎসাহে সকলে মিলে নতুন করে চারদিক খুঁজতে শুরু করল। এই ভাবে আধা ঘণ্টা কেটে গেলে ক্যাপ্টেন ব্লক বার বার ফিরে যাবার সংকেত জানালেন ; অতএব সকলে জাহাজে ফেরাই স্থির করল। আর ঠিক তখনই পাশ দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা কালো বস্তুর ভিতর থেকে দুর্বল কান্নার শব্দ ভেসে এল। সকলে মিলে জালি-বোটটাকে সেই দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বস্তুটাকে ধরে ফেলল। ভেসে যাচ্ছিল "এরিয়েল" জাহাজের পুরো ডেকটাই। অগাস্টাস তখন শেষ যন্ত্রণায় ছটফট করছে আর কাতরাচ্ছে। তাকে ধরে ফেলতেই দেখা গেল ভাসমান কাঠের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে যে ওটা আমারই কাজ।

অগাস্টাসকেও জাহাজে তুলে নেওয়া হল। পুনরায় ধাতস্থ হতে তার ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। আমিও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলাম। একটা বড় রকমের

ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে পরদিন সকাল ন'টার সময় "পেঙ্গুইন" বন্দরে ঢুকল। অগাস্টাস ও আমি প্রাতরাশের পথে যথাযথ সময়েই মিঃ বার্নার্ডের বাড়িতে হাজির হলাম। পূর্ব রাতের পার্টির দরুন সকলেই এত ক্লান্ত ছিল যে আমাদের ঝড়ো কাকের মত চেহারা কারও চোখে পড়ল না। সেই থেকে আমরা দুজন মাঝে মাঝেই ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করেছি, আর প্রতিবারই আতংকে শিউরে উঠেছি। একদিন তো কথাপ্রসঙ্গে অগাস্টাস স্বীকারই করল, সেই রাতে আমাদের ছোট জাহাজে বসে সে যখন প্রথম বুঝতে পেরেছিল অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে সে নেশায় একেবারে আকণ্ঠ ডুবে গিয়েছে তখন তার মনে তীব্র যন্ত্রণার যে অনুভূতি জেগেছিল সে রকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে আর কখনও হয় নি।

অধ্যায়—২

এইমাত্র যে শোচনীয় ঘটনাটির উল্লেখ করলাম তার ফলে সমুদ্রের প্রতি আমার মনের টানটা কমে যাবে—এই অনুমানটাই স্বাভাবিক। অথচ অলৌকিকভাবে বেঁচে যাবার এক সপ্তাহের মধ্যেই নাবিক-জীবনের বেপরোয়া অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ মনে জাগল তেমনটি আগেও কখনও হয় নি। এই অল্প সময়ের মধ্যেই সে রাতের সব স্মৃতি মন থেকে মুছে গেল, আর সেই বিপজ্জনক দুর্ঘটনার কিছু উত্তেজক, যা কিছু সুন্দর সেটাই উজ্জ্বল হয়ে মনের পাতায় ফুটে উঠতে লাগল। অগাস্টাসের সঙ্গে আলোচনা আরও ঘন ঘন হতে লাগল, আর ক্রমেই তাতে আমার আগ্রহও বেড়ে চলল। সমুদ্রের গল্পগুলিকে সে এমন রং-চং লাগিয়ে বলত (এখন আমার সন্দেহ হয় তার অর্ধেকটাই বানানো) যে আমার কল্পনার সঙ্গে ঠিক-ঠিক মিলে যেত। আরও আশ্চর্যের কথা, যখনই তার সমুদ্রযাত্রার দুঃখ-কষ্ট ও হতাশার মুহূর্তগুলির বর্ণনা সে দিত তখনই আমার মন চলে যেত নাবিক-জীবনের পক্ষে। আমি সব সময়ই স্বপ্ন দেখতাম জাহাজ-ডুবি ও দুর্ভিক্ষের; অসভ্য মানুষদের হাতে মৃত্যু বা বন্দীদশার; অজ্ঞাত, দুর্গম, সমুদ্রের কোন ধূসর পাহাড়ের বুকে দুঃখ ও অশ্রুজলে ভরা দীর্ঘ দিনের।

"এরিয়েল"-দুর্ঘটনার প্রায় আঠারো মাস পরে "লয়েড অ্যান্ড ভ্রেডেনবার্গ" নামক প্রতিষ্ঠানটি তিমি-শিকারে যাত্রার উদ্দেশ্যে "গ্র্যামপাস" নামক দুই-মাস্তুলের জাহাজটাকে মেরামত করে যাত্রার উপযোগী করার কাজে লেগে গেল। জাহাজ পুরনো ও জীর্ণ; সমুদ্রযাত্রার মোটেই উপযোগী নয়; তবু যা কিছু করার ছিল সবই করা হল। মিঃ বার্নার্ডকেই জাহাজের পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছিল। অগাস্টাসও তার সঙ্গে যাবে। সেও মাঝে মাঝেই আমাকে বোঝাতে লাগল—আমার সমুদ্রযাত্রার বাসনা পূর্ণ করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। আমিও তো যেতেই চাই—তবু ব্যবস্থা

করাটা তো সহজ কাজ নয়। আমার বাবা সারারাত বাধা দিলেন না ; কিন্তু সমুদ্র-যাত্রার কথা শুনেই মা কেঁদে একেবারে আকুল ; কিন্তু আমার ঠাকুর্দা—যার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু পাবার আশা রাখি—তো দিব্যি করে বলে দিলেন এ-প্রস্তাব যদি আর কোন দিন মুখে আনি তাহলে তিনি আমাকে মাত্র একটা শিলিং দিয়ে বিদায় করবেন। কিন্তু এত সব বাধা আমার ইচ্ছার আগুনকে নেভাতে তো পারলই না, বরং ঘৃতাহুতি দিয়ে তাকে দ্বিগুণ বেগে জ্বালিয়ে তুলল। স্থির করে ফেললাম, বিঘ্ন-বাধা যতই আসুক আমি যাবই। কথাটা অগাস্টাসকে জানালে সেও যাত্রার প্রস্তুতির কাজে লেগে গেল। আমিও আত্মীয়-স্বজন কাউকে এ কথা না বলে পড়া-শুনাতেই মন দিলাম, যাতে সকলেই ধরে নেয় যে সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছাটা আমি পরিত্যাগ করেছি।

অগাস্টাস সারাটা দিন "গ্র্যাম্পাসেই" কাটায় ; কেবিনে ও তৎসংলগ্ন খোলে বাবার ও নিজের থাকার ব্যবস্থাদির তদারক করে। অবশ্য রাত হলেই আমরা দুজন একত্র হই এবং আমাদের একমাত্র আশা নিয়ে আলোচনা করি। একটা মাস এইভাবে কেটে গেল। কোনরকম ফন্দিই বের করতে পারলাম না। নিউ বেডফোর্ডে মিঃ রস নামে আমার এক আত্মীয় বাস করতেন ; মাঝে মাঝেই সেখানে গিয়ে আমি দু-তিন সপ্তাহ কাটিয়ে আসতাম। জুন মাসের (১৮২৭) মাঝামাঝি জাহাজটা ছাড়বে। ঠিক হল, সেটা সমুদ্রে পড়ার দু'-একদিন আগে আমার বাবা মিঃ রস-এর কাছ থেকে একটা চিঠি পাবেন ; তাতে তিনি অনুরোধ জানাবেন আমি যেন পক্ষকালের জন্য তার বাড়িতে গিয়ে তার দুই ছেলে রবার্ট ও এমেট-এর সঙ্গে কাটিয়ে আসি। চিঠি লেখা ও যথাস্থানে পেঁৗছে দেবার দায়িত্ব অগাস্টাসই নিল। নিউ বেডফোর্ডের উদ্দেশে যাত্রা করেই আমি বন্ধুকে একটা খবর দেব, আর সেও "গ্র্যাম্পাস"-এ আমার জন্য লুকিয়ে থাকার মত একটা জায়গার ব্যবস্থা করে রাখবে। সে আমাকে আশ্বাস দিল, লুকোবার জায়গাটাকে যথাসম্ভব আরামদায়ক করা হবে যাতে অনেক দিন সেখানে কাটানো যায়, কারণ ঐ সময়ে আমার প্রকাশ্যে বের হওয়া চলবে না। জাহাজটা যখন সমুদ্রে এত বেশী দূর চলে যাবে সেখান থেকে আমাকে ফিরিয়ে দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, তখন আমাকে আরাম করে কেবিনে থাকতে দেওয়া হবে। এই চালাকিটুকুর কথা শুনলে তার বাবা নিশ্চয়ই খুশিতে হো-হো করে হাসবেন। তারপর এমন অনেক জাহাজ পাওয়া যাবে যার সাহায্যে আমার অভিযানের কথা জানিয়ে বাবাকে একটা চিঠি লিখে দিলেই হবে।

অবশেষে জুনের মাঝামাঝি দিনটা এসে গেল। আমাদের ফন্দি-ফিকিরও পাক্কা। চিঠি লেখা ও পেঁৗছে দেবার কাজ সম্পূর্ণ। এক সোমবারের সকালে আমি তথাকথিত নিউ বেডফোর্ড-এর উদ্দেশে বাড়ি থেকে বের হলাম। অবশ্য আমি সোজা গেলাম অগাস্টাসের কাছে। সে রাস্তার মোড়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ঘন হয়ে কুয়াসা পড়েছে ; লুকিয়ে পালাবার মতই আবহাওয়া। অগাস্টাস পথ দেখিয়ে জাহাজঘাটার দিকে চলতে লাগল, আর আমি কিছুটা দূরে থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। একটা নাবিকদের আলখাল্লায় আমার সারা শরীর ঢাকা যাতে

দেখে ফেললেও কেউ সহসা চিনতে না পারে। দ্বিতীয় মোড়টা পার হওয়া মাত্রই যে লোকটি আমার ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি আমার ঠাকুরদা বৃদ্ধ মিঃ পেটারসন ছাড়া অন্য কেউ নন। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বলে উঠলেন, "আরে, কী আশ্চর্য, গর্ডন তুমি! আরে—কেন—কার একটা নোংরা ক্লোক গায়ে চড়িয়েছ?" সবিস্ময় আপত্তির সুরে গলায় নতুন স্বর এনে আমি বলে উঠলাম, "মহাশয়, আপনি ভুল করছেন—প্রথমত, আমার নাম "গর্ডন টর্ডন" নয়; তাছাড়া, আমি আপনাকে চিনি না; আর আমার নতুন ওভারকোটটাকে নোংরা বলার আপনি কে?" আমার এই মিষ্টি বকুনিটা সেই বুড়ো ভদ্রলোকটি যেরকম অদ্ভুত মুখ করে গ্রহণ করলেন তা দেখে আমি তো অট্টহাসিতে একেবারে ফেটে পড়লাম। তিনি দু' তিন পা পিছিয়ে গেলেন, তার মুখ প্রথমে পাণ্ডুর ও পরে রক্তবরণ ধারণ করল; চশমা জোড়া চোখ থেকে খুলে নামিয়ে নিলেন; তারপর ছাতাটা খুলে ছুট দিলেন। কিছুদূর গিয়েই হঠাৎ কি মনে পড়ায় ঘুরে দাঁড়ালেন—রাগে কাঁপতে কাঁপতে আর চলতে চলতে দাঁতে দাঁত চেপে বলতে লাগলেন, "চলবে না—নতুন চশমা—ভেবেছিলাম ছেলেটি গর্ডন না, এ চশমা চলবে না।"

কোনরকমে ঠাকুর্দার হাত এড়িয়ে আরও সতর্ক হয়ে নিরাপদেই যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। জাহাজে দু'একজন যারা ছিল সামনের দিকেই কাজ করছিল। ক্যাপ্টেন বার্নার্ডও লয়েড অ্যাণ্ড ভ্রেডেনবার্গে গেছেন, সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। কাজেই দুজন বেশ নিশ্চিন্তেই জাহাজে ঢুকলাম। কেবিনেও কেউ ছিল না। সেখানকার আরামদায়ক ব্যবস্থাদি দেখে আমি তো অবাক। তিমি-শিকারী জাহাজে সাধারণত এত ভাল কেবিন থাকে না। কিন্তু পাছে কেউ দেখে ফেলে, তাই বেশীক্ষণ সেখানে থাকা হল না। পাশেই অগাস্টাসের ঘর হয়ে গুপ্ত দরজা খুলে অনেক গলি-ঘুঁজি পার হয়ে পৌঁছলাম আমার লুকিয়ে থাকার আস্তানায়। চার ফুট উঁচু, দু' ফুট লম্বা, একটা সরু লোহার বাক্সের মধ্যেই আমার থাকার ব্যবস্থা। চারদিকে এবং বাক্সের ভিতরেও অনেক টুকিটাকি, ভাঙা-চোরা জিনিসপত্র ছড়ানো। কিন্তু ভিতরটা দেখে আমার তো ভালই লাগল। মেঝেতে কেবিনের বার্থ থেকে আনা একটা মাদুর পাতা; দরকারি জিনিসপত্র মোটামুটি সবই সাজানো রয়েছে। তাছাড়া আছে কিছু বই, কলম, কালি, কাগজ; তিনটে কম্বল, এক কুঁজো জল, এক কৌটো বিস্কুট, অনেক সসেজ, প্রচুর শুয়োরের মাংস, রোস্ট করা ছাগলের ঠ্যাং, আর আধা ডজন মদের বোতল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ঘরটার দখল নিয়ে নিলাম। মন খুশিতে ভরপুর। কোন রাজা প্রথম নতুন রাজপ্রাসাদে ঢুকে আমার চাইতে বেশী খুশি হয় নি। আমাকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে, একটা লণ্ঠন, অনেক বাতি ও ফসফরাস রেখে, মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অগাস্টাস চলে গেল। এটা সতেরোই জুনের ঘটনা।

যতদূর মনে পড়ে এই গুপ্তস্থানে লুকিয়ে ছিলাম তিনদিন, তিনরাত; একবারও

ঘরের বাইরে যাই নি। এই তিনদিন অগাস্টাসেরও দেখা পাই নি। মনে মনে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছি, এমন সময় অগাস্টাসের গলা শুনতে পেলাম। সে ফিস্ ফিস্ করে জানতে চাইছে, সব ঠিক আছে কিনা, আর আমার কিছু চাই কি না। আমি বললাম, "কিচ্ছু না; তোফা আরামে আছি; জাহাজটা ছাড়বে কখন?" "আধা ঘণ্টার মধ্যেই। শোন, আরও তিন চার দিন তোমার কাছে যেতে পারব না। সেজন্য চিন্তা করো না। উপরে সবই ঠিকঠাক চলছে। জেনে রাখো, আজ বিশ তারিখ। মাত্র তিন দিন হল তুমি এখানে আছ।" এই কথা বলেই সে উপরে উঠে গেল।

সে চলে যাবার ঘন্টাখানেক পরেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, জাহাজটা চলতে শুরু করেছে। শেষ পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রাটা শুরু হওয়ায় মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল। মনে মনে স্থির করলাম, এবার চুপচাপ এই লোহার ঘরে শুয়েই কাটিয়ে দেব যতদিন না এই খাঁচাটাকে ছেড়ে একটা বড়সর কেবিনে জায়গা পেয়ে যাই। লুইস ও ক্লার্কের কলাম্বিয়ার মোহনা অভিযানের বইটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একটু পরেই ঘুম পেয়ে গেল। বাতিটা নিভিয়ে চোখ বুজতেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙে জেগে উঠতেই মনে হল, সব যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য একটু-একটু করে সে ভাবটা কেটে গেল। হাতে-পায়ে যেন খিল ধরে গেছে। বাক্সের মধ্যে বসেই খানিকটা আড়মোড়া ভাঙলাম। আলোটা ধরালাম। বেশ ক্ষিদে পেয়েছে। ঠাণ্ডা মাংসটা বের করতেই বুঝতে পারলাম সেটা পচে গেছে। কী আশ্চর্য! আমি কি এত বেশী সময় ঘুমিয়েছি? মাথাটাও খুব ধরেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। আবার শুয়ে পড়লাম।

আরও চব্বিশ-ঘন্টা কেটে গেল। কারও দেখা নেই। অগাস্টাসের উপর রাগ হতে লাগল। তার তো একবার অন্তত দেখা করে যাওয়া উচিত ছিল। বিপদের উপর বিপদ—কুঁজোর জলও ফুরিয়ে এসেছে। জলতেষ্টাও খুব বেড়ে গেছে। ভীষণ ঘুম পাচ্ছে, অথচ এই দমবন্ধকরা বাক্সের মধ্যে ঘুমতেও ভরসা হচ্ছে না। ইতিমধ্যে জাহাজের দুলুনি থেকেই বুঝতে পারছি মধ্য সমুদ্রের অনেক দূরে এসে পড়েছি। বহুদূরাগত একটা অস্পষ্ট সোঁ-সোঁ শব্দ শুনেই বোঝা যাচ্ছে সমুদ্রে বেশ বড় ধরনের ঝড় উঠেছে। অথচ অগাস্টাসের দেখা নেই। যতদূর মনে হচ্ছে সমুদ্রপথে যতটা দূর এসে পড়েছি তাতে তো আমার জাহাজের ডেকে উঠে যাবার সময় হয়ে গেছে। তবে কি বন্ধুর কোনরকম বিপদ ঘটেছে? হঠাৎ মৃত্যু ঘটেছে কি? না কি জাহাজ থেকে নীচে পড়ে গেছে? এতসব দুশ্চিন্তা মাথায় থাকা সত্ত্বেও কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখলাম। বিপদের পর বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে। ভয়ংকর আর হিংস্র দৈত্য-দানবরা বড় বড় বালিশ দিয়ে চেপে ধরে আমাকে মেরে ফেলতে চাইছে। লম্বা লম্বা সাপ আমাকে পেঁচিয়ে ধরে চকচকে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখের সমুখে দূর-বিস্তার সীমাহীন মরুভূমির মধ্যে আমি একা। যতদূর দৃষ্টি চলে পত্রপল্লবহীন ধূসর সব গাছের সারি দাঁড়িয়ে

আছে। তারা যেন মানুষের মত কংকাল-ক্ষীণ হাত বাড়িয়ে আর্তকন্ঠে জল ভিক্ষা করছে। দৃশ্য বদলে গেল। সাহারার জ্বলন্ত মরুভূমিতে আমি দাঁড়িয়ে আছি একাকি—উলঙ্গ। পায়ের কাছে শুয়ে আছে একটা ভয়ংকর সিংহ। হঠাৎ সে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। সবগুলি দাঁত বের করে উঠে দাঁড়াল। পরমুহূর্তে তার গলা থেকে বেরিয়ে এল আকাশ-কাঁপানো এক বজ্র-হুংকার। আমি সবেগে মাটিতে পড়ে গেলাম। আতংকের রেশ কেটে যেতেই বুঝলাম, আমি জেগে উঠেছি। আর এতক্ষণ যা দেখেছি তার সবটাই স্বপ্ন নয়। একটা সত্যিকারের প্রকান্ড থাবা আমার বুকটাকে চেপে ধরেছে—তার গরম নিঃশ্বাস পড়ছে আমার কানে—আবছা অন্ধকারেও তার সাদা দাঁতগুলি চক্-চক্ করছে।

হাজার মানুষের প্রাণ-শক্তি যদি তখন আমার হাত-পা অথবা জিভের উপর ভর করত তবু আমি একতিল নড়তে পারতাম না—একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারতাম না। পশুটি কিন্তু যেমন ছিল তেমনি বসে আছে; আমাকে শেষ করে দেবার কোন চেষ্টাই করছে না। তথাপি আমি একান্ত অসহায়ভাবে পড়ে আছি—মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছি। মনে হল, দেহ-মনের সব শক্তি আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে—এক কথায়, আমি মরছি, আর মরছি কেবল ভয়ে। মাথাটা ঘুরে গেল—দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল—মুখের উপরকার ঝক্ঝকে অক্ষি-গোলক দুটিও যেন ঝাপসা হয়ে যেতে লাগল। একবার শেষ চেষ্টা করে ঈশ্বরকে ডাকলাম। আমার কন্ঠস্বর যেন পশুটার সুপ্ত জিঘাংসাকে জাগিয়ে তুলল। হাত-পা ছড়িয়ে সে সটান শুয়ে পড়ল আমার শরীরের উপর। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! একটা করুণ কুই-কুই শব্দ করতে করতে সে আমার মুখ ও হাত চাটতে লাগল অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে—তাতে কত যে স্নেহ ও আনন্দের ছোঁয়া আমি পেলাম। আমি বিস্মিত, বিমূঢ়, হতবুদ্ধি—কিন্তু আমার পোষা কুকুর "বাঘা"-র কুই-কুই শব্দ তো আমি ভুলতে পারি না; তার আদর জানাবার অদ্ভুত ভঙ্গী তো আমি ভাল করেই জানি। এই তো আমার বাঘা! হঠাৎ আমার মাথায় যেন রক্ত উঠে গেল—মুক্তি ও পুনর্জীবনের অনুভূতি আমাকে দিশেহারা করে দিল। অতি দ্রুত উঠে বসলাম; বিশ্বস্ত অনুচর ও বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরলাম: আবেগাপ্লুত চোখের জলে ধুয়ে ফেললাম বুকের সব যন্ত্রণার বোঝা।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভেবে পেলাম না—বাঘা এখানে এল কেমন করে? আকাশ-পাতাল অনেক ভাবলাম, কুল কিনারা পেলাম না। যাকগে. সে সব ভাবনা-চিন্তা। আপাততঃ আমার এই দুঃসহ নির্জনতায় বাঘাকে সঙ্গী পেয়েছি—আর পেয়েছি তার সেবাযত্নের আশ্বাস; এই তো যথেষ্ট। কুকুরকে অনেকেই ভালবাসে, কিন্তু বাঘার প্রতি আমার মনের টান সাধারণের উপরে, আর বাঘা তার যোগ্যও বটে। সাত বছর ধরে সে আমার নিত্যসঙ্গী; একটা কুকুরের মধ্যে মানুষ যে যে গুণ আশা করে তার অজস্র প্রমাণ বাঘা দিয়েছে। একেবারে বাচ্চা অবস্থায় ন্যান্টাকেটের এক ক্ষুদে শয়তানের হাত থেকে আমি তাকে উদ্ধার করেছিলাম, আর বছর তিনেক পরেই পথ চলতে এক ডাকাতের লাঠির আঘাত থেকে আমাকে রক্ষা করে সে তার ঋণ শোধ করেছিল।

এক দৃষ্টিতে বাঘার দিকেই তাকিয়েছিলাম। ঘরের আবছা আলোয় দুর্দিনের বন্ধুকেই দেখেছিলাম ভাল করে। হঠাৎ মনে হল, তার পেটের লোমের সঙ্গে সুতো দিয়ে কি যেন বাঁধা রয়েছে। ভাল করে নজর দিয়ে বুঝলাম একটুকরো কাগজ।

অধ্যায়—৩

চকিতেই মনে হল, এই কাগজের টুকরোটা নিশ্চয় অগাস্টাসের চিঠি। কোন অজানা দুর্ঘটনার ফলে নিজে এসে আমাকে এই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে না পেরে সে এই ভাবে আসল অবস্থাটা আমাকে জানাতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু আমার ঘরটা এতই অন্ধকার যে নিজের হাতটাও ভাল দেখা যায় না। উপর দিকের একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেটুকু বাইরের আলো বাঁকা হয়ে ভিতরে এসেছে তার সামনে কাগজটাকে মেলে ধরলাম। এটা যে একটুকরো সাদা কাগজ সেটাই শুধু বোঝা গেল। প্রথমে কোন লেখাই চোখে পড়ল না। কাগজটাকে উল্টে নিয়ে আঙুল দিয়ে ভাল করে ঘসতেই লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা কয়েকটা লাইন আমার চোখে পড়ল। ঠিক সেই সময়ই ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আসা আলোর ঝিলিকটা ঈষৎ সরে গেল; আমিও তাড়াহুড়োর মধ্যে সে চিঠির তিনটে লাইনও ভাল করে পড়তে পারলাম না, কোনরকমে পড়ে নিলাম তার শেষের কয়েকটি শব্দ। তাতে লেখা ছিল—"রক্ত—তোমার জীবন নির্ভর করছে কাছাকাছি শুয়ে থাকার উপর।"

সমস্ত চিঠিটা পড়তে পারলে হয় তো বা বন্ধুর এই সতর্ক-বাণীটা ঠিক ঠিক বুঝতে পারতাম, কিন্তু এই ক'টামাত্র শব্দ পড়ে এক অজ্ঞাত আশংকায় আমি বড়ই মুসড়ে পড়লাম। বিশেষ করে এই "রক্ত" শব্দটা—এটা তো সব সময়ই রহস্য, যন্ত্রণা ও আতংকের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত—আমার বন্ধ ঘরের অন্ধকারকে যেন আরও ঠাণ্ডা, আরও ভয়ংকর ভারী করে তুলল। এ অবস্থায় কী যে করব কিছুতেই বুঝতে পারছি না। জানা-অজানা বিপদের নানা রূপ, নানা ভ্রূকুটি, নানা ভঙ্গীতে মনটাকে ক্রমেই অবসাদে জড়িয়ে ফেলতে লাগল। অনন্যোপায় হয়ে একসময়ে গভীর ক্লান্তিতে আবার মাদুরে শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম।

কানের কাছে একটা হিস্‌-হিস্‌ শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। চোখ মেলে দেখি, বাঘা দাঁড়িয়ে আছে। তীব্র উত্তেজনায় সে হাঁপাচ্ছে আর সাঁই-সাঁই শব্দ করছে; অন্ধকারেও তার চোখ দুটি জ্বল জ্বল করছে। বাঘাকে আদর করে কাছে ডাকলাম; সে কিন্তু নিচু গলায় গর্‌র্‌-গর্‌র্‌ শব্দ করেই চুপ করে গেল। জানি না কখন আবার তন্দ্রা নেমে এসেছিল চোখের পাতায়, বাঘার অনুরূপ গোঙানির শব্দে আবার ঘুম ভেঙে গেল। বার বার তার মুখ থেকে একই ধরনের গজরানি শুনে আমিও খুব ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল বুঝি বা তৃষ্ণার জলের অভাব আর এই খুপড়ির বন্ধ

আবহাওয়ায় বাঘার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আমিই বা কি করি। তাকে মেরে ফেলার কথা আমি ভাবতেই পারি না, অথচ নিজের নিরাপত্তার জন্য সেটাই যে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, যে দৃষ্টি দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তাতে ফুটে উঠেছে ভয়ংকর শত্রুতার আক্রোশ; যে কোন মুহূর্তে সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এ হেন সংকটজনক অবস্থা বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না; শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেললাম—যে ভাবেই হোক এই লোহার বাক্স থেকে আমাকে বেরুতেই হবে; তার জন্য যদি বাঘাকে সরিয়ে দিতে হয় তো তাও করতে হবে। অগাস্টাসের দেওয়া বাঁকানো ছুরিটা সঙ্গে নিলাম; আর নিলাম শুয়োরের মাংস ও মদের বোতল, তারপর আলখাল্লাটা দিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব জড়িয়ে নিয়ে বাক্সের মুখের দিকে এগোতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে বিকট গর্জন করে কুকুরটাও আমার গলা লক্ষ্য করে লাফ দিল। সে সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ডান কাঁধের উপর; তার ধাক্কা সামলাতে না পেরে আমি বাঁদিকে ভর করে উপুড় হয়ে পড়ে গেলাম; ক্রুদ্ধ কুকুরটা আমার পিঠ জুড়ে সটান শুয়ে পড়ল। ভাগ্যিস আমার মাথাটা বিছানার কম্বলের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল, তাই সে যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলাম। বাঘা তার ধারালো দাঁত কম্বলের উপর বসাতে চেষ্টা করল, কিন্তু কম্বলের সবগুলি ভাঁজ পার হয়ে সে দাঁত আমার গলা পর্যন্ত পৌঁছতে পারল না। আমি তখন কুকুরটার নীচে সম্পূর্ণ অসহায়ভাবে পড়ে আছি। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমাকে কব্জা করে ফেলবে। হতাশাই আমাকে নতুন করে শক্তি জোগাল। এক ঝটকায় বাঘাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম; কম্বল দিয়ে তাকে ঢেকে দিয়ে দরজার দিকে ছুটে গেলাম। বাঘা কম্বল থেকে মুক্ত হবার আগেই দরজা পার হয়ে ভাল করে সেটাকে বন্ধ করে দিলাম। এইভাবে কুকুরের হাত থেকে বেঁচে গেলাম, কিন্তু ফেলে আসতে হল শেষ সম্বল মাংসটাও। তখন আহার্য বলতে হাতে আছে শুধু মদের বোতলটা। সেটাকেই উপুড় করে গলায় ঢেলে সবটা শেষ করে ফেলে বোতলটাকে সজোরে মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

বোতল ভাঙার শব্দটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই কানে এল—কে যেন চাপা গলায় আমার নাম ধরে ডাকছে। ডাকটা এতই অপ্রত্যাশিত, আর আমিও উত্তেজনায় এতই অভিভূত যে একটা জবাব পর্যন্ত দিতে পারলাম না। আমার বাকশক্তি বুঝিবা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বন্ধু যদি মনে করে যে আমি মরে গেছি, আমার কাছে আসার চেষ্টা না করেই যদি সে ফিরে যায়—এই আশংকায় ভীত-ত্রস্ত হয়ে একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণের জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু হায়! সব চেষ্টাই বিফল হল। আমার সামনের দিকে কোথা থেকে যেন একটা পায়ের শব্দ কানে এল। তীব্র প্রত্যাশায় কান পাতলাম। সে শব্দ ক্রমেই আরও-আরও অস্পষ্ট হতে লাগল। সেই মুহূর্তে আমার মনের অবস্থার কথা কি আমি কোন দিন ভুলতে পারব? সে চলে যাচ্ছে—আমার বন্ধু, আমার সাথী, যার কাছ থেকে কত কিছুই পাবার ছিল—সে আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে। তার চলে যাওয়া মানেই আমার শোচনীয় মৃত্যু—এই নরকের অন্ধকারে তিল তিল করে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া! অথচ

একটি শব্দ—মাত্র একটি শব্দ আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, আর সেই শব্দটি আমার জিহ্বা উচ্চারণ করতে পারছে না। এই অনুভূতি মৃত্যু-যন্ত্রণার চাইতে দশ হাজার গুণ তীব্রতর যন্ত্রণায় আমার বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগল। মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম; মৃত্যু বুঝি শিয়রে এসে দাঁড়াল!

মেঝেতে পড়ে যাবার সময় আমার পাৎলুনের পকেট থেকে ছিটকে পড়ে গেল বাঁকানো ছুরিটা। তাতেই মেঝেতে একটা খট্-খট্ আওয়াজ হল। আহা! সেই কর্কশ শব্দ যেন আমার কানে সুরের মধু ঢেলে দিল! আবার কান পাতলাম—এই শব্দ শুনে অগাস্টাস কি করে সেটা শোনার আশায়। আমি জানতাম, এই নির্জন জাহাজে যে আমার নাম ধরে ডেকেছে সে অগাস্টাস ছাড়া অন্য কেউ হতে পারে না। কিছুক্ষণ সব নীরব! চুপচাপ। তারপরই আবার কানে এল সেই চাপা ডাক—"আর্থার!" পুনরুজ্জীবিত আশা এবার ফিরিয়ে দিল আমার বাকশক্তি। প্রাণপণে চীৎকার করে ডাকলাম. "অগাস্টাস! হেই অগাস্টাস!" উত্তেজনায় থর-থর কাঁপা গলায় সে বলল, "চুপ! ঈশ্বরের দোহাই, চুপ কর! আমি যাচ্ছি।" তার এগিয়ে আসার শব্দ শুনতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত তার হাত আমার কাঁধকে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা জলের বোতল সে ধরল আমার ঠোঁটে। সে জলপানের যে কী আনন্দ, আর কী তৃপ্তি তা একমাত্র তারাই বুঝবে যারা কবরের অন্ধকার থেকে হঠাৎ ফিরে এসেছে জীবনের আলোয়।

আকণ্ঠ তৃষ্ণা কিছুটা মিটবার পরে অগাস্টাস পকেট থেকে বের করল তিন-চারটে ঠাণ্ডা সিদ্ধ আলু। তাই গোগ্রাসে গিললাম। তার সঙ্গে ছিল একটা কালি-পড়া লণ্ঠন। খাদ্য-পানীয় অপেক্ষা সেটাও কিছু কম তৃপ্তিদায়ক নয়। কিন্তু আমি তখন সব কিছুর আগে জানতে চাইলাম, তার এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ কি। আমার সংকট-সময়ে জাহাজে কি কি ঘটেছে তারও একটা বিবরণ সে আমাকে শোনাল।

অধ্যায়—৪

দুই মাস্তুলের জাহাজটা জেটি ছাড়বার এক ঘন্টার মধ্যেই সমুদ্রে পড়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে যে, তিনদিন আমি খাঁচাটায় বন্দী ছিলাম। সেই সময় উপরে এত বেশী হৈ-চৈ হচ্ছিল আর লোকজনরা সব ইতস্তত ছুটাছুটি করছিল যে পাছে কেউ আমার গোপন আস্তানাটা দেখে ফেলে এই ভয়ে সেই সময়ে অগাস্টাস আমার সঙ্গে দেখা করার ঝুঁকি নেয় নি। এই ভাবে আরও দুদিন কেটে যাবার পরে সে নীচে নেমে এসেছিল। তখন আমি গভীর ঘুমে সমানে নাক ডাকাচ্ছিলাম। প্রথমে সে আমাকে আস্তে আস্তে ডাকল। তাতেও আমার ঘুম না ভাঙায় খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে বেশ জোর গলায় ডাকল। তাতেও আমার ঘুম না ভাঙায় সে খুব মুস্কিলে পড়ে গেল।

বেশী জোরেও আমাকে ডাকতে পারে না, পাছে কেউ শুনতে পায় ; আবার অনেক সময় এখানে থাকলে ক্যাপ্টেন বার্নার্ডের মনে সন্দেহ জাগতে পারে—ছেলেটা গেল কোথায়। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে সে যখন কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না এমন সময় কেবিনের দিক থেকে ভেসে-আসা একটা অস্বাভাবিক গোলমাল তার কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে সে বাক্সের ফাঁদ থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাদের ঘরের দরজাটা খুলে ভিতরে পা দিতেই তার মুখের সামনে একটা পিস্তল ঝলমল করে উঠল। পরমুহূর্তেই একটা লোহার রডের আঘাত তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল।

একটা শক্ত হাত সবলে তার গলা চেপে ধরল। সেই অবস্থায়ই সে দেখল, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার বাবা চিত হয়ে পড়ে আছে ; কপালের গভীর ক্ষত থেকে প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। তার মুখে একটিও কথা নেই ; বুঝতে পারল, বাবার মৃত্যু আসন্ন। এদিকে পৈশাচিক ঘৃণার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে জাহাজের প্রথম মেট। বাবার পকেট হাতড়ে সে লোকটি টেনে বের করল একটা বড় টাকার থলে আর একটা ক্রণোমিটার। জাহাজের সাতজন নাবিক (তার মধ্যে একজন নিগ্রো পাচক) কেবিনের সর্বত্র খুঁজে পেতে অনেক গাদা বন্দুক ও বারুদ সংগ্রহ করে নিল ; তারপর আমার বন্ধুকে পিঠমোড়া করে বেঁধে তাকে নিয়ে ডেকের উপর চলে গেল। তারা গেল জাহাজের গলুইয়ের দিকে। সেখানে কুড়ুল হাতে মোতায়েন ছিল চার বিদ্রোহী নাবিক। মেট জোর গলায় হাঁক দিল, যারা নীচে আছ তারা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ? একে একে উপরে উঠে এস—খুব সাবধান, কোনরকম হৈ-হল্লা করবে না। কিছুক্ষণ কারও দেখা নেই ; শেষ পর্যন্ত উঠে এল এক ইংরেজ। বেচারি নতুন জাহাজে এসেছে ; করুণভাবে কাঁদছে, আর প্রাণভিক্ষা চাইছে। জবাবে পেল কপালের উপর কুড়ুলের এক ঘা। টঁু শব্দটি না করে বেচারি মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, আর কালো রাঁধুনিটা তাকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আঘাতের শব্দ ও মৃতদেহটা জলে পড়ার শব্দ শুনে বাকি যারা নীচে ছিল সকলে একবাক্যে গর্জে উঠল। তখন তাদের সতর্ক করে দেওয়া হল, যারা উপরে না উঠবে তাদের তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। তখন সকলেই সিঁড়ির দিকে ধাওয়া করল। এক সময় মনে হল, জাহাজটা বুঝি এবার বিদ্রোহীদের কবল থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু মাত্র ছ'জন উপরে উঠতে না উঠতেই সিঁড়ির দরজা উপর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। উপায়ন্তর না দেখে সেই ছ'টি নিরস্ত্র মানুষ আত্মসমর্পণ করল। বাদ বাকি যারা নীচে ছিল তারাও মেটের আহ্বান-বাক্যে ভুলে একে একে উপরে উঠে এল, আর প্রত্যেকেই বেয়নেটে বিদ্ধ হয়ে আবার নীচে নিক্ষিপ্ত হল। যে ছ'জন আগেই উপরে এসেছিল তাদেরও সেই একই দশা হল। বিদ্রোহে যোগ না দেওয়া নাবিকের মোট সংখ্যা ছিল সাতাশ।

তারপর শুরু হল এক নৃশংস হত্যাকান্ড। হাত-পা বেঁধে নাবিকগুলোকে গ্যাংওয়েতে টেনে নিয়ে রাঁধুনিটা তাদের মাথায় বসাল কুড়ুলের একটা করে কোপ,

আর বাকিরা তাদের তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রে। এইভাবে বাইশ জনকে নিকেশ করার পরে অগাস্টাসের পালা এল। হয়তো তাকে মৃতপ্রায় মনে করে, অথবা হয়তো এই নৃশংস কাটাকাটিতে বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহী নাবিকরা তাদের কুকর্মে ক্ষান্তি দিল। আমার বন্ধুসহ বাকি চার নাবিক ভাগ্যক্রমে রেহাই পেয়ে গেল। মেট তখন নীচে নেমে গেল তৃষ্ণা মেটাতে; আর খুনে বিদ্রোহীরা দল বেধে হুল্লোড়বাজি করেই দিনটা কাটিয়ে দিল। তারপরেই বাকি পাঁচ বন্দীকে নিয়ে কি করা যায় এই নিয়ে তাদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হল। হয়তো বা মদের প্রভাবেই একটা দলের মন কিছুটা নরম হয়ে এসেছিল; তারা প্রস্তাব করল, বন্দীরাও বিদ্রোহে যোগ দিয়ে লুটের মালের ভাগ নেবে—এই শর্তে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। কিন্তু কালা রাঁধুনিটা ডাহা শয়তান; দলের উপর তার প্রভাবও মেটের চাইতে বেশী ছাড়া কম নয়। সে বার বার বলতে লাগল, কোনরকম দয়ামায়া না করে বাকিগুলোকেও সাবাড় করে দেওয়া হোক। ভাগ্য ভাল যে মদের নেশায় সেও তখন টলমল করছিল। তাই শেষ পর্যন্ত প্রথম দলের রায়ই টিকে গেল। জাহাজের লাইন-ম্যানেজারটিও সেই দলের লোক। তার নাম ডার্ক পিটার্স। লোকটি আপসারোকা উপজাতির এক নিগ্রো নারীর ছেলে; মিসৌরি নদীর উৎপত্তি-স্থলের নিকটবর্তী কৃষ্ণ পর্বতমালায় তাদের বাড়ি। যতদূর জানি, তার বাবা ছিল পশুলোম ব্যবসায়ী। অথবা লিউইস নদীর তীরবর্তী কোন বাণিজ্যিক-সংস্থার সঙ্গে জড়িত। পিটার্সের মত এমন হিংস্র-দর্শন মানুষ আমি জীবনে দেখি নি। খাটো মাপের মানুষ; উচ্চতা চার ফুট আট ইঞ্চির বেশী নয়; হাত-পাগুলি হারকিউলিসের মত শক্ত-সমর্থ, কিন্তু এমন অদ্ভুতভাবে বাঁকানো যে দেখে মনে হয় তাদের সোজা করাই যায় না। প্রকাণ্ড মাথাটার গড়নও অস্বাভাবিক; অধিকাংশ নিগ্রোর মতই মাথার মাঝখানে একটা গর্ত, আর সারা মাথা জুড়ে টাক। আর সেই টাক ঢাকতে মাথায় একটা মস্ত বড় পরচুলা 'পরে—সেটা হয় স্প্যানিশ কুকুরের বা মার্কিন ভালুকের চামড়া দিয়ে তৈরী। যে সময়কার কথা বলছি তখন তার মাথায় ছিল ভালুকের লোমের পরচুলা। তাতে তার মুখের স্বাভাবিক হিংস্রতা যেন আরও বেড়ে গিয়েছিল। মুখটা ছিল কান থেকে কান পর্যন্ত বিস্তৃত; ঠোঁট দুটি বেশী রকম পাতলা; ফলে অত্যন্ত লম্বা বেরিয়ে আসা দাঁতগুলি মোটেই ঠোঁটের নীচে ঢাকা পড়ত না। সে মুখকে হঠাৎই এক নজর দেখলে মনে হবে বুঝিবা উৎকট হাসিতে বিস্ফারিত; কিন্তু দ্বিতীয় নজরেই সভয়ে স্বীকার করতেই হবে যে সে-মুখ যদি হাসির প্রতীক হয় তাহলে সেটা কোন দানবের হাসি। কিন্তু ডার্ক পিটার্সকে দেখতে যতই হিংস্র হোক, তারই দৌলতেই যে অগাস্টাসের জীবন রক্ষা পেয়েছিল সে কথা তো আমি ভুলতে পারি না।

যাই-হোক, অনেক তর্কাতর্কি ও দু'তিনটে সংঘর্ষের পরে শেষ পর্যন্ত স্থির হল, সব ক'জন বন্দীকেই (একমাত্র অগাস্টাস ছাড়া—পিটার্স মাঝে মাঝেই তাকে নিজের কেরানি বলে তামাসাও করত) তিমি-শিকারের সব চাইতে ছোট নৌকোতে চাপিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। ক্যাপ্টেন বার্নার্ড তখনও বেঁচে আছে কিনা দেখার জন্য মেট নীচের কেবিনে নেমে গেল। একটু পরেই দুজন উপরে উঠে এল; ক্যাপ্টেনের

মুখ মরার মত সাদা হলেও আঘাত-জনিত কষ্টকে অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে। অত্যন্ত দুর্বল গলায় সে নাবিকদের কাছে মিনতি জানাল—তাকে যেন সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া না হয়; সে তাদের কথা দিচ্ছে তারা যেখানে বলবে সেখানেই তাদের জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া হবে, আর তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। দুই শয়তান তাকে দুই হাত ধরে তুলে জাহাজের পাশে নামিয়ে রাখা নৌকোর উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। বাকি চার বন্দীর হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে নীচে নেমে যেতে হুকুম করা হল। বিনা প্রতিবাদে তারা বিদ্রোহীদের পিছন পিছন নেমে গেল। একে একে নৌকোয় উঠে বসল। একমুঠো বিস্কুট ও এককুঁজো জল সঙ্গে দেওয়া হল। সঙ্গে একটা মাস্তুল নয়, পাল নয়, বৈঠা নয়, কম্পাস নয়। তারপর নৌকোর দড়ি কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হল অকুল সমুদ্রে। ততক্ষণে নেমে এসেছে কালো রাত; চাঁদ নেই, তারা নেই, আছে শুধু অন্ধকার সমুদ্র। সঙ্গে সঙ্গে নৌকোটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হতভাগ্য আরোহীদের বাঁচবার কোন আশাই রইল না। তবু ঘটনাটি ঘটল লঘিমা ৩৫° ৩০´ উত্তর এবং দ্রাঘিমা ৬১° ২০´ পশ্চিম অক্ষাংশে; অতএব জায়গাটা বারমুড়া দ্বীপপুঞ্জ থেকে খুব বেশী দূরে নয়। তাই অগাস্টাসের মনে তখনও আশা জেগে রইল, নৌকোটা হয়তো তীরে পৌঁছতে পারবে, অথবা উপকূলের কাছাকাছি 2কন জাহাজের হাতে পড়বে।

এবার জাহাজের পাল তুলে দেওয়া হল—জাহাজ ভেসে চলল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। অগাস্টাসকে নিয়ে কারও কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। সব বাঁধন খুলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল ইচ্ছামত চলাফেরা করতে। আমার কথা সে ভোলে নি। সুযোগ খুঁজতে লাগল সকলের অলক্ষ্যে আমার সঙ্গে যাতে দেখা করতে পারে। আরও দুই দিন, দুই রাত কেটে গেল। তৃতীয় দিন রাতে পূর্বদিক থেকে ধেয়ে এল প্রবল বাতাস। সকলেই পালের দড়িতে হাত লাগাল। সেই গোলমালের সুযোগে অগাস্টাস সকলের অলক্ষ্যে তাদের ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের হতশ্রী অবস্থা দেখে তার কান্না পেয়ে গেল। তাদের সব জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে আজেবাজে মালপত্র দিয়ে ঘরটাকে বোঝাই করা হয়েছে; আর যত রাজ্যের মোটা মোটা দড়ি ও শিকল এনে স্তূপীকৃত করা হয়েছে ঠিক লোহার খাঁচাটার উপর। সেসব টানাটানি করতে গেলেই ধরা পড়বার সমূহ আশংকা। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে আবার ডেকে ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মেট তার গলা টিপে ধরে জানতে চাইল, এতক্ষণ সে কেবিনে বসে কী করছিল। বন্ধুর মুখে কথাটি নেই। মেট আরও রেগে গিয়ে তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেই ডার্ক পিটার্সের হস্তক্ষেপে সে যাত্রা সে প্রাণে বেঁচে গেল। এবার অগাস্টাসের হাতে হাত-কড়া ও পায়ে দড়ি বাঁধা হল। তারপর তাকে জাহাজের হালের কাছে একটা বার্থে শুইয়ে দিয়ে বলা হল, "যখন জাহাজটা আর জাহাজ থাকবে না" ততদিন পর্যন্ত সে যেন ডেকে পা না দেয়। কথাটা বলল রাঁধুনিটা; সে যে কি বলতে চেয়েছিল তা বোঝা শক্ত। অবশ্য এই ব্যবস্থাটাই শেষ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়েছিল। সে কথা পরে বলছি।

www.banglaboi.blogspot.com

অধ্যায়—৫

বাঁধুনিটা চলে যাবার পরে বেশ কয়েক মিনিট অগাস্টাস হতাশায় ভেঙে পড়ল। এই বার্থ থেকে সে যে জীবন্ত ফিরে যেতে পারবে তার কোন আশাই নেই। ফলে সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল, যে লোকই নীচে নেমে আসবে তাকেই সে আমার অসহায় অবস্থাটা জানিয়ে দেবে—খাঁচার মধ্যে বসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিল তিল করে মরার চাইতে সে ক্ষেত্রে আমি অন্তত বিদ্রোহীদের সঙ্গে বেঁচে যাবার মত একটা সমঝোতায় তো আসতে পারব। সঙ্গে সঙ্গেই তার আরও মনে হল, সে নিজেও তো একবার আমার সঙ্গে যোগাযোগের একটা চেষ্টা করতে পারে। সেক্ষেত্রে আসল সমস্যাটা হল তার হাতকড়া। প্রথমে তার মনে হল লোহার হাতকড়া খোলার চেষ্টা একেবারেই অবাস্তব কল্পনা। কিন্তু কিছুটা টানাটানির পরেই সে বুঝতে পারল, একটু কষ্ট সহ্য করে হাতটাকেই চেপে হাতকড়ার ভিতর দিয়ে গলিয়ে বের করা যেতে পারে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। ডান হাতটা হাতকড়া থেকে বের করে নিয়ে একটু একটু করে পায়ের দড়ির বাঁধনও খুলে ফেলল। ঠিক সেই সময় বাইরে কার যেন গলা শুনতে পেয়ে অগাস্টাস ধরা পড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি ডান হাতে হাতকড়াটা আবার পরে নিল, আর দড়ি দিয়ে পাও বেঁধে ফেলল। নীচে নেমে এল ডার্ক পিটার্স। সঙ্গে বাঘা কুকুর। বাঘার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অগাস্টাস ভালই জানত। তাই আমাকে জাহাজের খাঁচার মধ্যে লুকিয়ে রেখে পরদিনই সে আমাকে বাড়িতে গিয়ে বাঘাকে নিয়ে জাহাজে ফিরে আসে এবং সকলের অলক্ষ্যে তাকে ভাল করে লুকিয়ে রাখে। ডার্ক পিটার্স বাঘাকে দেখতে পেয়ে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দেয়, আর সেই সঙ্গে কিছু নোনা মাংস, আলু, আর এক কলস জলও দিয়ে গেল। বলে গেল, আরও কিছু খাবার নিয়ে সে পরদিন আবার আসবে।

পিটার্স চলে গেলে অগাস্টাস তার হাত-পা খুলে নিয়ে পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করে তার ধার পরীক্ষা করে দেখল। তারপর মেঝের মাদুরটা সরিয়ে ছুরি দিয়ে তলাকার কাঠের পাটাতনটা কাটতে শুরু করল। সে জানত, সেই পাটাতনের ঠিক নীচেই আছে আমার লোহার খাঁচা। সারাদিন আর কেউ ঘরে ঢুকল না। সেও সারা দিন ও সারা রাত কাজ করে পাটাতনের কাঠ কাটা শেষ করল। কোন মতে একটা লোক যাতে নীচে নেমে যেতে পারে ততটা মাপের একটা চৌকো ফোঁকর কাটা হয়ে গেল। তার ভিতর দিয়ে গলে অগাস্টাস নীচে নেমে গেল। এখানে বলা দরকার যে বিদ্রোহের পর থেকেই কোন নাবিক জাহাজের গলুইএর দিকটায় রাতে ঘুমত না; সকলেই রাত কাটায় কেবিনের মধ্যে আরাম করে, আর ক্যাপ্টেন বার্নার্ডের সঞ্চিত খাদ্য ও পানীয় নিয়ে মজা লুটত। এটাই আমার ও অগাস্টাসের পক্ষে ভাল কাজ ছিল। কারণ অন্যথায় নাবিকদের সকলের চোখ এড়িয়ে অগাস্টাস আমার কাছে আসতেই পারত না। যাই হোক, অনেক কষ্ট করে হামাগুড়ি দিয়ে সে এগোতে লাগল। দুই পাশে ডাঁই করা সব সারি সারি তেলের পিপে। তার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে সে দরজাটার কাছেও পৌঁছে গেল। তখনই সে প্রথম বুঝতে পারল যে

বাঘাও তার পিছন পিছন এসেছে। তখন দিনের আলো ফুটতে আর দেরী ছিল না। তাই তখনকার মত নিজের বার্থে ফিরে গিয়ে আবার রাতের বেলায় আমার কাছে ফিরে আসবে—এই কথা ভেবে সে স্থির করল, কোনরকমে খাঁচার দরজাটা একটু ফাঁক করে আমার অবস্থাটা একবার দেখে নিয়েই সে ফিরে যাবে। কিন্তু দরজাটা একটু ফাঁক করতেই বাঘা কি যেন শুঁকতে শুঁকতে গরর্-গরর্ করতে লাগল, আর দরজাটাকে আঁচড়াতে লাগল। তখনই অগাস্টাসের মনে হল, বাঘার সঙ্গে একটা চিঠি পাঠিয়ে সে যদি আমাকে সতর্ক করে দিতে পারে যাতে আমি এখন তার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা না করি, তাহলে সব দিক থেকেই ভাল হবে।

কিন্তু সমস্যা হল, এই মুহূর্তে চিঠি লেখার কাগজ-কলম-কালি কোথায় পাবে? একটা দাঁত-খড়কে দিয়ে না হয় কলমের কাজটা করা যাবে। প্যান্টের পকেটে একটা পুরনো চিঠি পাওয়া গেল, তার উল্টো পিঠেই চিঠিটা লেখা চলবে। আর কালি? একটা আঙুলের ডগায় ছুরিটা বসিয়ে দিলেই অনেক রক্ত পাওয়া যাবে। বাস, লেখার ব্যবস্থা হয়ে গেল। অন্ধকারেই কোনরকমে চিঠিটাও লেখা হল। তাতে জানানো হল ঃ জাহাজে একটা বিদ্রোহ হয়েছে—ক্যাপ্টেন বার্নার্ডকে নৌকোতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে—অবিলম্বেই কিছু খাবার-দাবার আমি আশা করতে পারি, কিন্তু আমি যেন নিজের থেকে কিছু করার চেষ্টা না করি। চিঠির উপসংহারে লেখা হল ঃ ‘চিঠিটা লিখলাম রক্তে—তোমার জীবন নির্ভর করছে কাছাকাছি শুয়ে থাকার উপর।”

কাগজের টুকরোটা বাঘার লোমের সঙ্গে বেঁধে দিয়ে অগাস্টাস সেটাকে ছেড়ে দিল খাঁচায় যাবার পথের উপর, আর নিজে সটান চলে গেল তার নিজের বার্থে। কাঠের ফোঁকরটাকে মাদুর দিয়ে ঢেকে দিয়ে নিজের হাতে হাতকড়া ও পায়ে দড়ি পরে শুয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল ডার্ক পিটার্স মদে একেবারে চুর হয়ে। কিন্তু তখন তার মেজাজ খুব খুশ। আমার বন্ধুটির জন্য সে নিয়ে এসেছে একডজন সিদ্ধ আইরিশ আলু আর এক কুঁজো জল। একটা বাক্সের উপর আরাম করে বসে মেটও জাহাজের ব্যাপার নিয়ে অনেকক্ষণ বক বক করল। তার অদ্ভুত হাবভাব দেখে অগাস্টাস গোড়ায় বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পরদিন বন্ধুর জন্য ভাল ডিনার আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দিনের বেলায় দুজন হার্পুনওয়ালাকে নিয়ে ঘরে এল রাঁধুনিটা। তিন জনেরই নেশা তখন চরমে উঠেছে। তারাও মন খুলে বক্‌বক্‌ শুরু করে দিল। তাদের কথা থেকেই বোঝা গেল জাহাজের লোকজনেরা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। একদলের পাণ্ডা মেট, অপর দলের পাণ্ডা রাঁধুনি। প্রথম দল চাইছে, যেকোন জাহাজ দখল করে জলদস্যুদের মত লুঠ-তরাজে বেরিয়ে পড়বে ; আর অপর দল—তারাই দলে ভারী, আর ডার্ক পিটার্সও তাদেরই দলে—চাইছে, মূল ব্যবস্থামত দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যাবে তিমি-শিকারে, বা অবস্থা বুঝে অন্য কোন কাজে। পিটার্স আগে অনেকবার ঐ অঞ্চলে ঘুরেছে ; তাই তার মুখে নানান আমোদ-আহ্লাদের গল্প শুনে নাবিকরা তার দিকেই বেশী ঝুঁকে পড়েছে।

ঘন্টাখানেক কাটিয়ে একসময় তিনজনই চলে গেল। সারাদিন আর কেউ ঘরে ঢুকল না। রাত পর্যন্ত অগাস্টাস চুপচাপ শুয়ে কাটিয়ে দিল। তারপর হাত-পায়ের বেড়ি খুলে আবার তার কাজে লেগে গেল। একটা বোতল খুঁজে পেয়ে তাতে কুঁজো থেকে জল ভরে নিল। পকেটভর্তি করে নিল ঠাণ্ডা আলু। চর্বি-বাতিসহ একটা লণ্ঠন দেখতে পেয়ে তার খুশির সীমা রইল না। যে কোনসময় সে একটা আলো ধরাতে পারবে, কারণ তার পকেটে একটা ফসফরাসের দেশলাই ছিল। চারদিক অন্ধকার হতেই সে আমার খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। খাঁচাটার কাছাকাছি এসে সে বার বার আমার নাম ধরে ডাকল। সে ডাক আমার কানেও এল, কিন্তু একটা মানসিক জড়তার ফলে আমি তার কোন জবাবই দিতে পারলাম না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তখন সে ধরেই নিল যে আমি আর বেঁচে নেই। খাঁচার মধ্যেই খাদ্য-পানীয়ের অভাবে আমার মৃত্যু ঘটেছে। অসহায় শিশুর মত সে ডুকরে কেঁদে উঠল। ঠিক সেই মুহূর্তে আমার ছুরিটার কর্কশ শব্দ তার কানে গেল। সেও প্রাণপণে চীৎকার করে আবার আমার নাম ধরে ডাকল। এবার আমিও তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখনও আমি বেঁচে আছি বুঝতে পেরে নতুন উৎসাহে সব বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করে ক্লান্ত দেহে সে আমার বিছানার পাশে এসে হাজির হল।

অধ্যায়—৬

দুজনেই স্থির করলাম, যেমন করে হোক এই খাঁচা থেকে বেরিয়ে যেতেই হবে। জাহাজের ডেকে আমি কোথাও লুকিয়ে থাকব, আর অগাস্টাস ঘুরে-ফিরে খুঁজবে পালাবার পথ। কিন্তু সমস্যা হল বাঘাকে নিয়ে। তাকে এই খাঁচার মধ্যে রেখে যাওয়ার কথা আমরা কেউ ভাবতেই পারলাম না। কিন্তু তাকে নিয়েই বা উপরে যাব কেমন করে? তাকিয়ে দেখলাম, বাঘা চিৎ হয়ে পড়ে আছে নেশাগ্রস্তের মত, তবে বেঁচেই আছে। নষ্ট করার মত সময়ও হাতে নেই। অগাস্টাসই বাঘাকে পাঁজাকোলে করে তুলে মালপত্রের ভিতর দিয়ে অতি কষ্টে এগিয়ে চলল। দুর্বল শরীর নিয়ে এত বড় বোঝা কোলে করে আমি অন্তত এই অন্ধকার পথে চলতে পারতাম না। নিরাপদে পেঁৗছে গেলাম অগাস্টাসের বার্থের ঠিক নীচে। ঠিক হল, আমি ফোঁকরটার কাছেই থাকব, যাতে সে তার প্রতিদিনের খাবারের একটা অংশ আমাকে সেই ফোঁকর দিয়ে নামিয়ে দিতে পারে।

বন্ধুটি বুদ্ধিমান ছেলে। নিজের বার্থে ঢুকেই যথারীতি হাতকড়া ও দড়ি হাতে-পায়ে পরে নিল। ততক্ষণে বেশ বেলা হয়ে গেছে। সে যাত্রা খুব বেঁচে গেলাম। কারণ তার একটু পরেই ডার্ক পিটার্সও রাঁধুনিকে সঙ্গে নিয়ে মেট তার ঘরে ঢুকল। চারজনের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হল। নীচ থেকে আমি সবই শুনতে

পেলাম। ভাউস অন্তরীপ থেকে যাত্রাকারী একটা জাহাজের জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কয়েক মিনিট পরেই মেট ও রাঁধুনি উপরে উঠে গেল। ডার্ক পিটার্স নিজের জায়গা ছেড়ে এসে বসল ঠিক যেখানে মেট এতক্ষণ বসেছিল। বন্ধুর সঙ্গে সে বেশ জমিয়ে আলাপ জুড়ে দিল। তার নেশার ঘোরও বেশ কেটে গেছে। খোলামেলাভাবেই বন্ধুর সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। বলল, নিশ্চয়ই তার বাবাকে কোন জাহাজ তুলে নিয়েছে, কারণ যেদিন তাকে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় সেই দিনই সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত পাঁচটা পাল সে নিজের চোখে দেখেছে; আরও নানাভাবে তাকে সান্ত্বনাও দিল। তার কথাবার্তা শুনে আমার মনেও আশা জাগল, হয়তো পিটার্সের সহায়তায়ই আমরা আবার এই জাহাজের দখল ফিরে পাব। সুযোগমত সে কথা আমার বন্ধুকেও বললাম। সেও জানাল, সেটা সম্ভব হলেও হতে পারে, তবে সে চেষ্টা চালাতে হবে খুবই সতর্কতার সঙ্গে। কারণ আমাদের একমাত্র ভরসা পিটার্সের মতিগতি বোঝাই তো ভার। ঘন্টাখানেক পরে পিটার্স ডেকে উঠে গেল। দুপুরে আমাদের জন্য নিয়ে এল অনেকটা মাংস ও পুডিং। সে চলে যাবার পরে অনেকদিন পরে দুজনে পাশাপাশি বসে আরাম করে খেলাম। তারপরই আমি নীচে নেমে গেলাম। সারাদিন আর কেউ এল না দেখে রাতে আমি আবার অগাস্টাসের বার্থে গিয়ে আরাম করে ঘুমিয়ে নিলাম। ভোরের আলো ফুটতেই ডেকের উপর একটা হৈ-চৈ শুনতে পেয়ে সে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল। আমিও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লুকিয়ে পড়লাম। একদিনেই বাঘা বেশ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। জলাতংকের কোন লক্ষণই তার মধ্যে দেখতে পেলাম না। একপাত্র জল এগিয়ে দিতেই সাগ্রহে সেটা খেয়ে ফেলল। ভাগ্যিস বাঘাকে খাঁচার ভিতর থেকে তুলে এনেছিলাম। সেখানে থাকলে বাঘা হয়তো মরেই যেত। এ ঘটনা ৩০শে জুন তারিখের। “গ্র্যামপাস” জাহাজটা ন্যান্টাকেট ছেড়ে আসার পরে আজ ত্রিশতম দিন।

জুলাইয়ের দুই তারিখে মেট আবার নীচে নামল। যথারীতি মদে চুর, আর মেজাজে খোশ। অগাস্টাসের বার্থে ঢুকেই তার পিঠে একটা আলতো চাপড় মেরে বলল, তাকে মুক্ত করে দিলে সে ভালভাবে চলবে কি না, এবং কথা দেবে কি না যে আর কখনও কেবিনে ঢুকবে না। বন্ধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। শয়তানটা তখন তার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল; কোটের পকেট থেকে রামের বোতল বের করে তাকে পান করতে দিল। তারপর দুজনই ডেকে উঠে গেল। ফিরে এল তিন ঘন্টা পরে। এসেই আমাকে সুসংবাদ দিল যে জাহাজের যেকোন জায়গায় চলাফেরার এবং রাতে যথারীতি গলুইয়ের দিকে ঘুমবার অনুমতি সে পেয়েছে। আমার জন্য নিয়ে এসেছে ভাল ডিনার ও প্রচুর জল। আমাদের জাহাজটা তখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে ভাউস অন্তরীপ থেকে আগত জাহাজটাকে। এইমাত্র দূরে একটা পাল চোখে পড়েছে। সেটাই সম্ভবত তাদের প্রার্থিত জাহাজের পাল। পরবর্তী আট দিন কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে নি, এবং আমার এই বিবরণের মূল ঘটনার সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ

যোগসূত্রও নেই। তবু সেগুলিকে একেবারে বাদ না দিয়ে একটা দিনপঞ্জীর আকারে লিপিবদ্ধ করলাম।

৩রা জুলাই। অগাস্টাস আমাকে তিনটে কম্বল দিল। তাই দিয়ে আমার লুকোবার জায়গায় একটা আরামদায়ক বিছানা করে ফেললাম। বন্ধু ছাড়া দিনমানে আর কেউ নীচে আসত না। টাইগার বার্থেই ঘুমোয়। রাতে প্রচণ্ড ঝড় হল। তাতে বড় পালটা ছিঁড়ে যাওয়া ছাড়া জাহাজের আর কোন ক্ষতি হল না। অগাস্টাসের প্রতি ডার্ক পিটার্সের ব্যবহার ক্রমাগত ভাল হচ্ছে। প্রশান্ত মহাসাগর এবং সেই অঞ্চলের যেসব দ্বীপ সে ঘুরেছে তা নিয়ে সে বন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করে। প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, ঐ সব অঞ্চলে অভিযানকালে অগাস্টাস তাদের সঙ্গী হতে চায় কি না। আরও জানায়, দলের লোকরা ক্রমেই মেটের দলেই ভিড়ছে।

৪ঠা জুলাই। যে জাহাজটা দেখা গিয়েছিল সেটা লিভারপুল থেকে আসছিল। কাজেই সেটাকে বিনা আক্রমণেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। খবরাখবর জানবার জন্য অগাস্টাস বেশীরভাগ সময় ডেকেই কাটায়। বিদ্রোহীদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়। জিম বোনার নামে এক হারপুনওয়ালাকে তো জাহাজ থেকে ফেলেই দেওয়া হয়েছে। সে ছিল রাঁধুনির দলের লোক। পিটার্সও তাদের একজন।

৫ই জুলাই। ভোরের দিকে পশ্চিম থেকে একটা বাতাস উঠে এল। দুপুর নাগাদ সেটা ঝড়ে পরিণত হল। সামনের বড় পালটা নামাবার সময় রাঁধুনির দলের সিমস্ নামক আর এক নাবিক নেশার ঘোরে জলে পড়ে ডুবে গেছে। তাকে বাঁচাবার কোন চেষ্টাই হয় নি। এখন জাহাজের মোট যাত্রীর সংখ্যা তেরো, যথা : ডার্ক পিটার্স; নিগ্রো রাঁধুনি সেমুর; —জোনস;—গ্রীলি; হার্টম্যান রোজার্স; উইলিয়াম এলেন (এরা সকলেই রাঁধুনির দলের); মেট (তার নামটা আমি কোন দিনই জানতে পারি নি); এব্সালম্ হিক্স;—উইলসন; জন হাণ্ট ও রিচার্ড পার্কার (এরা মেটের দলের)—তাছাড়া অগাস্টাস ও আমি নিজে।

৭ই জুলাই। সারাদিন সমুদ্র উথাল-পাথাল; জাহাজটা ভয়ানক দুলছে; উপরে-নীচে অনেক জিনিসপত্র সশব্দে ভাঙছে। আমি সামুদ্রিক অসুখে ভুগছি। অগাস্টাসের সঙ্গে পিটার্সের দীর্ঘ আলোচনা; তার দলের দুজন গ্রীলি আর এলেন মেটের দলে যোগ দিয়েছে; তারা জলদস্যু হতে বদ্ধপরিকর।

৮ই জুলাই। সূর্যোদয়ের পরে পূর্বদিক থেকে একটা হাল্কা বাতাস এল। মেটও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দিল; তার উদ্দেশ্য পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও কোথাও লুট-তরাজ চালানো। পিটার্স বা রাঁধুনি কেউ তাকে বাধা দেয় নি। অন্তত অগাস্টাস সেরকম কিছু শোনে নি।

৯ই জুলাই। চমৎকার আবহাওয়া। সকলেই জাহাজের মেরামতি কাজে ব্যস্ত। পিটার্স পুনরায় অগাস্টাসের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করল। জানাল, সে কিছুতেই মেটের সঙ্গে একমত হবে না। এমন কি জাহাজটাকে মেটের হাত থেকে ছিনিয়ে

নেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করল। বন্ধুকে প্রশ্ন করল, সেক্ষেত্রে পিটার্স তার সহায়তা পাবে কি না। বন্ধু বিনা দ্বিধায় বলে দিল—"হ্যাঁ, পাবে।" পিটার্স চলে গেল। সারা দিন তার সঙ্গে অগাস্টাসের আর দেখা হয় নি।

অধ্যায়—৭

১০ই জুলাই। অস্পষ্ট আবহাওয়া। পূব দিক থেকে একটা এলোমেলো হাল্কা হাওয়া। আজ হার্টম্যান রোজার্স মারা গেল; ৮ তারিখে ঠাণ্ডা মদ খাওয়ার পর থেকেই তার খিঁচুনি শুরু হয়েছিল। সেও ছিল রাঁধুনির দলের লোক। পিটার্স অগাস্টাসকে বলেছে, মেট তাকে বিষ খাইয়েছে; খুব সতর্ক না থাকলে তার নিজের পালাও শিগগিরই আসবে। এখন তার দলে আছে কেবল সে নিজে, জোন্স ও রাঁধুনি—অপর দলে আছে পাঁচজন। বিকেলে রাঁধুনিও মেটের দলে ভিড়ে গেল। জোন্স পিটার্সের সঙ্গে একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে কেটে পড়ল। স্পষ্টতই হাতে আর সময় নেই। পিটার্স জানাল, অগাস্টাস যদি তার পাশে দাঁড়ায় তাহলে যে কোন ঝুঁকি নিয়ে সে জাহাজ দখলের চেষ্টা করবে। বন্ধু সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিল, এবং এই সুযোগে জাহাজে আমার উপস্থিতির কথাটাও তাকে জানিয়ে দিল। খবরটা জেনে পিটার্স যত না অবাক হল খুশি হল তার চাইতে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে সে নীচে নেমে গেল। অগাস্টাস আমাকে ডেকে নিয়ে পিটার্সের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। স্থির হল, ভাল সুযোগ পাওয়া মাত্রই আমরা তিনজন মিলে জাহাজটা দখল করে নেব; যদি সফল হই তো প্রথমে যে বন্দর পাব সেখানেই জাহাজটাকে নিয়ে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব। প্রশান্ত মহাসাগর পরিক্রমার যে পরিকল্পনা পিটার্সের মাথায় ছিল সেটা আপাতত স্থগিত থাকবে; যদি কখনও সুযোগ আসে তখন দেখা যাবে কতদূর কি করা যায়। এমন সময় "সকলে পালে হাত লাগাও"—এই মর্মে একটা চীৎকার আমাদের আলোচনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করল। পিটার্স ও অগাস্টাস ছুটে ডেকে উঠে গেল।

যথারীতি নাবিকরা প্রায় সকলেই মদে চুর হয়ে ছিল। জাহাজের পাল ঠিকমত গুটিয়ে ফেলার আগেই একটা প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এসে জাহাজটাকে একদফা নাকানি-চুবানি খাইয়ে দিল। পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই আর এক ধাক্কা—তার ঠিক পর মুহূর্তেই আবার ধাক্কা। সত্যি সত্যি উত্তর ও পশ্চিম থেকে ধেয়ে এল প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড়। রাত যত বাড়তে লাগল, ঝড়ের বেগও ততই প্রচন্ডতর হয়ে উঠল। সমুদ্র উথাল-পাথাল। অগাস্টাসকে সঙ্গে নিয়ে পিটার্স এল গলুইতে। আবার আমাদের আলোচনা শুরু হল।

আমরা একমত হলাম যে আমাদের পরিকল্পনামত কাজ হাসিল করার এর চাইতে উপযুক্ত সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কারণ এ রকম একটা বিপদের মুহূর্তে কেউই এ ধরনের একটা আক্রমণের আশংকা করবে না। কিন্তু আসল অসুবিধা দেখা দিল আমাদের শক্তির তারতম্য নিয়ে। আমরা মাত্র তিনজন, আর কেবিনে ওরা পাঁচজন। অস্ত্রশস্ত্র সবই তাদের দখলে ; আমাদের সম্বল শুধু পিটার্সের লুকিয়ে-রাখা দুটো ছোট পিস্তল আর তার পাৎলুনের কোমরবন্ধে একটা নাবিকদের ছুরি। তবু যা করার এখনই করতে হবে ; তার ঝুঁকিও বড় বেশী।

পিটার্স প্রস্তাব করল, আমরা সকলেই ডেকে উঠে যাব, আর পিটার্স প্রহরারত এলেনের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিয়ে সুযোগ বুঝে তাকে ধাক্কা মেরে সমুদ্রে ফেলে দেবে ; তারপর আমি আর অগাস্টাস উপরে উঠে যা পারি কিছু অস্ত্রশস্ত্র হাতিয়ে নেব ; তারপর তিনজন একসঙ্গে ছুটে গিয়ে কেউ বাধা দেবার আগেই সংকীর্ণ যোগাযোগ-পথটাকে দখল করে নেব।

প্রস্তাব তো গৃহীত হল, কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া কি সহজ হবে? বিশেষ করে যেখানে সশস্ত্র পাঁচের বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র তিনের সংঘর্ষ। হঠাৎই আমার মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেল। স্মরণ থাকতে পারে যে জাহাজের অন্যতম নাবিক হার্টম্যান রজার্স সকালেই মারা গেছে, আর পিটার্সের বদ্ধমূল ধারণা মেটই তাকে বিষ খাইয়ে খুন করেছে। রজার্সের মৃতদেহটা এখনও ডেকের উপরেই পড়ে আছে। তাকে যদি কোনরকমে জীবন্ত করে তুলে রাতের আলো-আঁধারিতে মেটের চোখের সামনে হাজির করা যায় তাহলে কি তার অপরাধী বিবেক ও অশিক্ষিত কুসংস্কারপ্রবণ মন আতংকে শিউরে উঠে তার নিজেরই ভবলীলা সাঙ্গ করে দেবে না? দেবে কি না—সেটাই হবে আজ রাতে আমাদের চরম পরীক্ষা। আর সে পরীক্ষার মুখোমুখি আমাদের হতেই হবে।

ঘটনাচক্রে এই ফন্দিকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে আরও একটা সুযোগ আমাদের স্বপক্ষে ঘটে গেছে। রজার্সের মৃত্যুর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার মৃতদেহটা এমন ভয়ংকর ও কুৎসিত আকৃতি ধারণ করেছে যে সেরকম কোন মৃতদেহ আমি আজ পর্যন্ত দেখি নি। তার পেটটা ঢাক হয়ে ফুলে উঠেছে, হাত দুটোরও হয়েছে অনুরূপ গতি, মুখটা শুকিয়ে, কুঁচকে, চকের মত সাদা হয়ে গেছে, আর সারা মুখে ফুটে উঠেছে দগদগে ঘায়ের মত অনেকগুলি লাল লাল ছোপ। সেইরকম বিকৃত অবস্থায় মৃতদেহটাকে যখন কেবিন থেকে বের করে ডেকের উপর আনা হল সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্য তখনই তাকে একনজর দেখামাত্রই স্বকৃত অপরাধের অনুতাপের জন্যই হোক, আর সেই ভয়ংকর দৃশ্য দেখার আতংকেই হোক মেট সঙ্গে সঙ্গেই হুকুম দেয়—মৃতদেহটাকে ক্যানভাসের মধ্যে ভরে ভাল করে সেলাই করে মুখ বন্ধ করে দিয়ে সামুদ্রিক কবরের প্রথাগত অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হোক। হুকুম জারি করেই মেট যেন সেই দৃশ্য সহ্য করতে না পেরেই তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। তারপর যখন মৃতের সৎকারের এই সব উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল, তখনই প্রচন্ড বেগে ধেয়ে

এল ঘূর্ণি-ঝড়। আর মেটের ডাকে সকলেই সে সব ফেলে ছুটে চলে গেল জাহাজের পাল নামাতে। মৃতদেহটা জাহাজের দুলুনির সঙ্গে সেখানেই গড়াগড়ি খেতে লাগল।

পরিকল্পনামাফিক কাজে নেমে পড়লাম। পিটার্স ডেকে উঠে গেল। পাহারারত এলেন তাকে কাছে ডাকল। পিটার্সও এগিয়ে গিয়ে হঠাৎই তার গলাটা টিপে ধরল, এবং টুঁ শব্দটি করার আগেই তাকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তার ডাকে আমরা উপরে উঠে গেলাম এবং অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজ করে দুটো পাম্পের হাতল ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। তাই দুজনে দুটো হাতে নিলাম। তারপর মৃতের গা থেকে শার্টটা খুলে নিলাম। অগাস্টাসকে ডেকের উপর পাহারায় রেখে পিটার্স ও আমি নীচে নেমে গেলাম। কেবিনে যাবার পথের দিকে পিঠ দিয়ে অগাস্টাস এলেনের জায়গাটাতেই বসে পড়ল, যাতে মেটের দলের কেউ হঠাৎ এসে পড়লে তাকে এলেন বলেই ভুল করে।

নীচে নেমেই এমন ছদ্মবেশ ধরার কাজে লেগে গেলাম যাতে আমাকে ঠিক রজার্সের প্রতিমূর্তি বলেই মনে হয়। যে শার্টটা তার গা থেকে খুলে নিয়েছিলাম সেটা খুব কাজে লাগল। সেটাকে গায়ে চড়িয়ে ফুলে-ওঠা শবের ভয়ংকর বিকৃতির অনুকরণে কিছু বিছানার চাদর জড়িয়ে একটা নকল ভুঁড়ি বানিয়ে ফেললাম। একজোড়া সাদা পশমের মোজা হাতে ঢুকিয়ে হাত দুটোকেও ফুলোফুলো করে ফেললাম। আর পিটার্স দিল তাতে শেষ তুলির টান—প্রথমে সারা মুখে চকখড়ি ঘসে দিল, তারপর একটা আঙুল কেটে সেই রক্ত দিয়ে দগদগে ঘায়ের ছোপ লাগিয়ে দিল সারা মুখে। তখন আমাকে হঠাৎ দেখে শিউরে উঠবে না এতবড় বুকের পাটা ক'জনের আছে?

অধ্যায়—৮

লণ্ঠনের মৃদু আলোয় কেবিনে ঝোলানো আয়নায় নিজের চেহারা দেখে নিজেই ভয়ে আঁতকে উঠলাম; বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল। কিন্তু সামনে অনেক কাজ। পিটার্স ও আমি ডেকে উঠে গেলাম।

সেখানে সব কিছুই ঠিকঠাক আছে দেখে তিনজনই হামাগুড়ি দিয়ে সরু পথটা পার হয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম। সকলেই বেশ সজাগ আছে। কেবল একজন ঘুমিয়ে আছে; তার বন্দুকটাও পাশেই রয়েছে। বাকি সকলেই মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসে আলোচনা করছে। দুটো খালি মগ পাশে পড়ে আছে; তবে কাউকেই খুব নেশাগ্রস্ত বলে মনে হল না। সকলের হাতেই ছুরি আছে; দু'একজনের কাছে পিস্তলও আছে; তাছাড়া হাতের কাছে বার্থের উপরে অনেকগুলি বন্দুক আছে।

আমার দুই সঙ্গী সাহসে ভর করে ভিতরে ঢুকে গেল। পিটার্স দরজাটাকে আগের মতই বন্ধ করে দিল। মেট দুজনকেই বেশ সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করল। অগাস্টাসকে বলল, যেহেতু ইদানিং সে খুবই ভাল ব্যবহার করছে তাই এখন থেকে সে কেবিনে এসেই থাকতে পারে, এবং ভবিষ্যতে তাদের দলের একজনও হয়ে যেতে পারে। এ সবই আমি দেখলাম ও শুনলাম। পাম্পের হাতল দুটো সঙ্গে করেই এনেছিলাম; একটাকে হাতের কাছেই রেখে দিলাম, যাতে দরকার হলেই ব্যবহার করতে পারি। পূর্ব ব্যবস্থা-মত আমি তৈরী হয়েই আছি, পিটার্সের সংকেত পেলেই বিদ্রোহীদের আসরে আবির্ভূত হব। পিটার্স ইতিমধ্যেই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বিদ্রোহের রক্তাক্ত কাণ্ডকারখানার দিকে এবং ক্রমে নাবিকরাও বলতে শুরু করেছে নাবিকদের মধ্যে প্রচলিত হাজার রকম কুসংস্কারের নানা কাহিনী। তাদের সব কথা আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু তাদের চোখে-মুখে সে সব কথার প্রভাব বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। মেটই উত্তেজিত হয়েছে সব চাইতে বেশী। একজন ন্যাবিক যখন রজার্সের বিকৃত মৃত-দেহের কথা উল্লেখ করল তখন তো আমার মনে হল সে বুঝি তখনই মূর্ছা যাবে। তখন পিটার্স প্রস্তাব করল, বীভৎস ও ভয়ংকর শবদেহটাকে অবিলম্বে সমুদ্রে ফেলে দেওয়াই ভাল। তা শুনে শয়তান মেটটা যেন হাঁসফাঁস করতে লাগল; ধীরে ধীরে চারদিকের সঙ্গীদের দিকে তাকাতে লাগল, যেন তাদের প্রত্যেককেই অনুরোধ জানাল —তারা উপরে গিয়ে কাজটা সেরে আসুক। কিন্তু কেউ এক পা নড়ল না; স্পষ্টই বোঝা গেল যে গোটা দলই মানসিক উত্তেজনার একেবারে চরমে উঠেছে। এই সময় পিটার্স আমাকে সংকেত করল। সঙ্গে সঙ্গে আমি দরজাটা হাট করে খুলে মুখে একটা কথাও না বলে সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম দলের একেবারে মাঝখানে।

এই পরিবেশে একটা ভূতের আকস্মিক আবির্ভাবে উপস্থিত সকলের মধ্যেই যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সেটা যেমন ভয়ংকর তেমনি অপ্রত্যাশিত। মেট মাদুরের উপর আধা-শোয়া অবস্থা থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল; তার মুখ থেকে একটা কথাও বের হল না; পরমুহূর্তেই সে সটান চিৎ হয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর; সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। জাহাজের প্রচণ্ড দোলায় পাথরের মত শক্ত দেহটা গড়াগড়ি খেতে লাগল। বাকি চারজন অচল হয়ে বসেই রইল—তীব্র ভয় ও চূড়ান্ত হতাশার এমন সকরুণ শিকার আমি আর কখনও দেখি নি। তারই মধ্যে জন হান্ট ও রিচার্ড পার্কার কিছুটা বাধা দিতে চেষ্টা করল। দুজন পিটার্সের গুলিতেই শেষ হয়ে গেল। পাম্পের হাতলের এক মোক্ষম আঘাত আমি হানলাম পার্কারের মাথায়। ইতিমধ্যে অগাস্টাস মেঝে থেকে একটা বন্দুক কুড়িয়ে নিয়ে উইলসনের বুকটা এক গুলিতে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল। বাকি তিনজন বিদ্রোহী প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে প্রচণ্ড লড়াই চালাতে লাগল। প্রভূত শক্তিশালী পিটার্স না থাকলে শেষ পর্যন্ত হয়তো তারাই জিতে যেত। এই তিনজন হল—জোন্স, গ্রীলি ও এবসালুম্ হিক্স। জোন্স এর মধ্যেই অগাস্টাসকে মেঝেতে ফেলে তার ডান বাহুতে বার কয়েক ছুরি চালিয়েছে; হয়তো তাকে শেষ করেই ফেলত (কারণ পিটার্স ও আমি তখন অন্য শত্রুদের নিয়ে

ব্যস্ত ছিলাম) যদি না আমাদের অপর এক বন্ধু এসে যথাসময়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত। সে বন্ধুটি হল বাঘা কুকুর। হুংকার দিয়ে বাঘা একলাফে কেবিনে ঢুকে পড়ল অগাস্টাসের পক্ষে এক চরম সংকটের মুহূর্তে ; জোন্সের উপর লাফিয়ে পড়ে তাকে সটান মাটিতে ফেলে দিল। আমার বন্ধুটি তখন এমনভাবে আহত হয়েছে যে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নয়। আমিও নিজের ছদ্মবেশ নিয়ে এতই বিব্রত ছিলাম যে বিশেষ কিছুই করতে পারলাম না। বাঘার দুই থাবা চেপে ধরেছে জোন্সের গলা। তার অবস্থা একেবারে নট-নড়ন-চড়ন। ওদিকে হাতের কাছে একটা ভারী টুল পেয়ে পিটার্স তারই এক আঘাতে গ্রীলির মাথাটাকে ফাটিয়ে দিল, আর পরমুহূর্তেই জাহাজের দোলায় হিক্সের গায়ে ছিটকে পড়তেই তার গলাটাকে টিপে ধরে নিছক গায়ের জোরেই তার দফা রফা করে দিল। এইভাবে কথাগুলি বলতে আমার যতটা সময় লাগল তার চাইতে অনেক অল্প সময়ে আমরা জাহাজটার মালিক হয়ে গেলাম।

শত্রুপক্ষের মধ্যে জীবিত রইল কেবলমাত্র রিচার্ড পার্কার। পাম্পের হাতলের আঘাতে সে নিশ্চল হয়ে পড়েছিল দরজার সামনে। পিটার্স পা দিয়ে ঠেলা দিতেই সে চিঁ-চিঁ করে মার্জনা ভিক্ষা করল। তার মাথাটা সামান্য কেটে গেছে মাত্র ; আসলে হাতের আঘাতেই সে জ্ঞান হারিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে উঠে দাঁড়াল ; আপাতত তার দুই হাত পিঠ-মোড়া করে বেঁধে রাখা হল। বাঘা তখনও জোন্সের বুকের উপর বসে গজরাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল সেও মরে কাঠ হয়ে গেছে ; কুকুরের ধারালো দাঁতের কামড়ে তার গলার গভীর ক্ষত থেকে তখনও রক্ত ঝরছে।

এখন সময় সকাল একটা। এখনও প্রবল বেগে ঝড় বইছে। জাহাজের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অবিলম্বেই একটা কিছু করা দরকার। ঝড়ের এক এক ধাক্কায় ঢেউ এসে জাহাজটাকে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। মূল মাস্তুলটাও কড়-কড় শব্দ করছে। কখন ভেঙে পড়বে বলা যায় না। অতএব নাবিকদের শবগুলিকে কেবিনের মধ্যে রেখেই আমরা জাহাজের জল সেঁচে ফেলার কাজে লেগে গেলাম। আমাদের কাজে সাহায্য করার জন্য পার্কারের বাঁধন খুলে দেওয়া হল। পট্টি-বাঁধা হাত নিয়ে অগাস্টাসও যতটা পারছে করছে। একটা পাম্পকে সারাক্ষণই চালিয়ে রাখা হল। তবু চারজনের পক্ষে কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য।

এইভাবে দারুণ উৎকণ্ঠা ও ক্লান্তির ভিতর দিয়ে রাতটা কাটল। সকাল হল। ঝড়ের প্রচণ্ডতা কমল না বা কমবার কোন লক্ষণও দেখা গেল না। এবার মৃতদেহগুলিকে টানতে টানতে ডেকে এনে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হল। পরবর্তী কাজ মাস্তুলটার ব্যবস্থা করা। একটা কুড়ুল জোগাড় করে পিটার্স মাস্তুলে কোপ বসাল। আমরা রশারশি টেনে ধরলাম। একসময় সব দড়ি-দড়া নিয়ে মাস্তুলটা সশব্দে জলের মধ্যে পড়ে গেল। জাহাজটার বিশেষ কোন ক্ষতি হল না। জাহাজের অবস্থা আগের থেকে কিছুটা ভাল হলেও একটা পাম্প চালিয়ে জল ওঠা বন্ধ করা গেল না। এভাবে চলতে থাকলে জাহাজ-ডুবি হতে বেশী সময় লাগবে না।

বিকেল চারটে নাগাদ ঝড়ের বেগ এত বেড়ে গেল যে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকাই

অসম্ভব। নেমে এল কালো রাত। সকাল পর্যন্ত জাহাজটা যে জলের উপর ভেসে থাকবে তার তিলমাত্র আশাও আমার মনে রইল না। মধ্যরাত্রেই আমাদের হাঁটু পর্যন্ত জল দাঁড়িয়ে গেল। তারপরই আচম্বিতে একটা ঢেউ এসে আমাদের উপর আছড়ে পড়ল; তার পথে যা কিছু পড়ল সব ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে দিল।

অধ্যায়—৯

ভাগ্য ভাল যে রাত হবার আগেই আমরা চারজনই ডেকের উপর প্রায় সমতল হয়ে পড়ে থাকা চরকি-কলটার ভগ্নাবশেষের সঙ্গে নিজেদের শক্ত করে বেঁধে রেখেছিলাম। এইটুকু সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম বলেই আমরা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। নাহলে আমরা তো জলের তলে একেবারেই তলিয়ে গিয়েছিলাম। সে জল যখন সরে গেল ততক্ষণে আমরা তো জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। প্রথমে আমিই চীৎকার করে সঙ্গীদের ডাকলাম। একমাত্র অগাস্টাসই উত্তরে বলল, "আমরা তো শেষ হয়ে গেছি; ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে রক্ষা করুন।" ক্রমে অপর দুজনও কথা বলল—"সাহস হারিও না; এখনও আশা আছে; এ জাহাজ কখনও ডুবতে পারে না; সকাল নাগাদ ঝড়ও থেমে যাবে।" কী আশ্চর্য! এমন সহজ সত্যটা এতক্ষণ একবারও আমার মনে উদয় হয় নি! কেবলমাত্র খালি তেলের পিপে বোঝাই একটা জাহাজ যে জলে ডুবতে পারে না, ঝড়ের প্রচণ্ডতায় এই কথাটাই আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে নিজেকে আরও ভাল করে চরকি-কলের সঙ্গে বাঁধতে শুরু করলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, আমার সঙ্গীরাও সেই একই কাজে ব্যস্ত! রাতটা এত বেশী অন্ধকার, আর চতুর্দিকের হৈ-হট্টগোল এতই ভয়ংকর যে তা বর্ণনার অতীত। আমাদের ডেক সমুদ্রের সঙ্গে সমতল হয়ে আছে। আমাদের চারদিকে ফেনার পাহাড়; প্রতি মুহূর্তেই তার কিছুটা অংশ আমাদের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য, আমাদের মাথাগুলো প্রতি তিন সেকেন্ডে এক সেকেন্ডের বেশী সময় জলের উপরে থাকছে না। আমরা চারজন কাছাকাছিই আছি, অথচ কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না; এমন কি যে জাহাজের উপর মাঝে মাঝেই আমরা নিক্ষিপ্ত হচ্ছি তাকেও দেখতে পাচ্ছি না।

দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের সময় কাটল। বরং দিনের আলোয় পরিস্থিতির ভয়াবহতা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল। জাহাজটা একখণ্ড কাঠের রূপ ধরে প্রতিটি ঢেউয়ের কৃপায় অবিরাম উঠছে আর নামছে। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বাড়ছে। এ তো এক পরিপূর্ণ হারিকেন। এর হাত থেকে উদ্ধারের কোন সম্ভাবনাই নেই। কয়েকটি ঘণ্টা পরিপূর্ণ নৈঃশব্দের মধ্যে কেটে গেল; প্রতিটি

মুহূর্তেই আশংকা করছি হয় আমাদের দড়িগুলো ছিঁড়বে, ভাঙা চরকি-কলটা জাহাজ থেকে বিচ্যুত হবে, অথবা চারদিকের গর্জায়মান ঢেউগুলি একসময় জলের এত বেশী নীচে আমাদের ডুবিয়ে দেবে যে পুনরায় মাথা তুলবার আগেই আমরা দম বন্ধ হয়ে মরে যাব। কিন্তু ঈশ্বরের অপার করুণায় সেই আসন্ন বিপদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেলাম ; দুপুর নাগাদ পবিত্র সূর্যের আলো আমাদের আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম ঝড় কমে আসছে, এবং আগের সন্ধ্যার পর থেকে এই প্রথমবার অগাস্টাস পার্শ্ববর্তী পিটার্সকে ডেকে জানতে চাইল, আমাদের বেঁচে যাবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না। কোন জবাব শুনতে না পেয়ে প্রথমে আমরা ধরেই নিলাম যে সে ব্যাটা ডুবে মরেছে ; কিন্তু তখনই তার দুর্বল গলা শুনতে পেয়ে আমাদের সে কী আনন্দ ; সে জানাল তার পেটের উপরে দড়িগুলো এমনভাবে কেটে বসে গেছে যে তার যন্ত্রণা সে আর সহ্য করতে পারছে না ; হয় তার বাঁধনগুলো ঢিলে করে দেওয়া হোক, নয় তো তার মৃত্যু হোক। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাকে কোনরকম সাহায্য করা যে আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই আমরা তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, সে যেন ধৈর্য ধরে সব কষ্ট সহ্য করে, সুযোগ পেলেই আমরা তাকে সাহায্য করব। সে বলল, তখন যে অনেক দেরী হয়ে যাবে, তার আগেই সে মরে যাবে। তারপর কয়েক মিনিটের আর্তনাদের পর সব চুপ হয়ে গেল ; আমরা ধরেই নিলাম, সে মরে গেল।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। সমুদ্র অনেক শান্ত হয়ে এল। প্রতি পাঁচ মিনিটে একটার বেশী ঢেউ জাহাজের খোলের উপর দিয়ে আর বইছে না। সঙ্গীদের কারও হাঁক-ডাক শুনতে না পেয়ে আমিই অগাস্টাসকে ডাকলাম। এত দুর্বল গলায় সে সাড়া দিল যে তার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তখন আমি পিটার্সকে ডাকলাম। পার্কারকে ডাকল্যাম, কেউ সাড়া দিল না।

কিছুক্ষণ পরেই আমি কেমন যেন একটা অবচেতনার মধ্যে ডুবে গেলাম ; কল্পনায় চোখের সামনে ভেসে এল অনেক আনন্দের ছবি ; যেমন, সবুজ গাছপালা, পাকা ধানের ঢেউ-খেলানো মাঠ, নৃত্যপর মেয়েদের মিছিল, অশ্বারোহী সেনাদল, এবং আরও অনেক আজগুবি স্বপ্ন। এখনও মনে পড়ে, তখন যা কিছু দেখেছিলাম সে সবকিছুর মধ্যেই প্রধান বিষয় ছিল—গতি। মনের সেই ঘোর যখন কেটে গেল তখন সূর্য প্রায় এক ঘণ্টা হল উঠেছে। কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত পরিবেশটাকে ধরতে পারছিলাম না। তখনও মনে হচ্ছিল, আমি সেই জাহাজের খোলের মধ্যেই রয়েছি, সেই খাঁচার মধ্যে আর পার্কারের দেহটা আসলে বাঘা।

শেষ পর্যন্ত যখন পূর্ণ চেতনা ফিরে এল তখন বুঝলাম, বাতাস স্বাভাবিকভাবেই বইছে, সমুদ্র অনেক শান্ত হয়েছে। আমার বাঁ হাতের বাঁধন খুলে গেছে, তবে কনুইয়ের কাছে অনেকটা কেটে গেছে ; ডান হাতটা পুরোপুরি অবশ, আর দড়ির চাপে হাত ও কব্জিটা অসম্ভব ফুলে উঠেছে। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, পিটার্স তখনও বেঁচে আছে, তবে তার কোমরের চারদিকে এমন একটা ঘন দাগ হয়ে গেছে যেন কেউ কেটে দুভাগ করে দিয়েছে। আমাকে নড়াচড়া করতে দেখে সে হাতের ইসারায় আমাকে

www.boikhoi.blogspot.com

দড়িটা দেখাল। অগাস্টাসের মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই দেখলাম না ; চরকি-কলের একটা ভাঙা কাঠের সঙ্গে লেপ্টে একেবারে “দ” হয়ে পড়ে আছে। পার্কার জানাল, তাকে উদ্ধার করতে কোনরকম সাহায্য করার শক্তি আমার আছে কি না। তাকে বললাম মনে সাহস রাখতে, আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। পাঁৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট ছুরিটা পেয়ে গেলাম। কয়েক বারের চেষ্টায় তার ফলাটাও খুললাম। বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের বাঁধন ও অন্য সব দড়ি কেটে ফেললাম। কিন্তু নড়াচড়া করতে গিয়ে বুঝলাম, পা দুটো অবশ হয়ে গেছে, দাঁড়াতেই পারছি না ; ডান হাতটাকেও কোন দিকে নড়াতে পারছি না। পার্কারকে একথা জানাতে সে আমাকে বলল, কয়েক মিনিট চুপচাপ শুয়ে থাকলেই রক্ত-চলাচলটা ঠিক হয়ে যাবে। সত্যি তাই হল ; ক্রমে-ক্রমে দুই পা ও হাতের জোর ফিরে পেলাম। এবার খুব সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে পার্কারের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার সব বাঁধন কেটে দিলাম। একটু পরেই সে তার হাত-পায়ের অর্ধেক বল ফিরে পেল। আর কালক্ষেপ না করে আমরা পিটার্সের কোমরের দড়ি খুলে দিলাম। দড়ির প্যাঁচ পাঁৎলুন ও শার্টের ভিতর দিয়ে কোমরের মধ্যে এমনভাবে কেটে বসে গেছে যে প্রচুর রক্তপাত হতে লাগল।

অগাস্টাস যে ভাল হয়ে উঠবে সেটা আমরা আশাই করি নি ; তার মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই ছিল না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলাম, অত্যধিক রক্তপাতের ফলেই সে মূর্ছা গেছে ; ঢেউয়ের আঘাতে তার হাতের পট্টি খুলে গেছে বলেই এ রকমটা ঘটেছে। নইলে তার শরীরের কোন বাঁধনই খুব একটা কসে বসে নি। তিনজন মিলে তাকে একটা শুকনো খোলা জায়গায় নিয়ে সারা শরীর ভাল করে টিপে দিতেই সে অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠল।

এবার আমাদের সর্বপ্রধান কষ্ট হল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার হাত থেকে মুক্তিলাভের কোন পথ তো কারও চোখে পড়ছে না। তবু আশা জেগে রয়। হয় তো অনতিবিলম্বেই কোন জাহাজ আমাদের তুলে নেবে। এই আশা নিয়েই একে অন্যকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। নতজানু হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম এ বিপদ হতেও তিনি আমাদের উদ্ধার করুন।

অধ্যায়—১০

কিছুক্ষণ পরেই এমন একটি ঘটনা ঘটল যাকে আমি আমার জীবনে অত্যন্ত অর্থবহ বলে মনে করি, কারণ সেই ঘটনা প্রথমে নিয়ে এল প্রচুর আনন্দ এবং পরে প্রবল আতংক। সকলে ডেকের উপর শুয়েছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়ল অগাস্টাসের উপর। তার মুখটা মরার মত সাদা হয়ে গেছে ; ঠোঁট দুটো অস্বাভাবিক ভাবে কাঁপছে। ভীষণ ভয় পেয়ে তাকে ডাকলাম, সে কোন সাড়া দিল না। মনে হল সে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার চোখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় বুঝলাম, আমার পিছন দিকে কোন

www.allbanglaboi.blogspot.com

কিছুর দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সমস্ত শরীর যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে শিহরিত হল তা আমি কোন দিন ভুলব না। দেখলাম, একটা বড় পাল-তোলা জাহাজ মাইল দুই দূর থেকে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। লাফ দিয়ে উঠে দুই হাত সেই দিকে বাড়িয়ে আমি নিশ্চল, নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। পিটার্স পাগলের মত ডেকময় নেচে বেড়াতে লাগল, আর পার্কার বেশ কয়েক মিনিট ধরে ছোট শিশুর মত কাঁদতে লাগল।

জাহাজটা বেশ বড়, হল্যাণ্ডে তৈরী, কালো রং করা। দেখেই বোঝা যায়, ঝড়ে তারও খুব ক্ষতি হয়েছে। শান্ত বাতাস বইছে, অথচ সবগুলো পাল তুলে দেওয়া হয় নি; জাহাজটা খুবই ধীরে চলছে। তাতে আমাদের উৎকণ্ঠাও বাড়ছে। আমরা গলা ছেড়ে চীৎকার শুরু করে দিলাম। জাহাজট যখন আমাদের সিকি মাইল দূরে চলে এল তখন তিনটি নাবিককে দেখতে পেলাম। পোশাক দেখে তাদের হল্যাণ্ডের লোক বলেই মনে হল। দুজন শুয়েছিল গলুইয়ের কাছে ছেঁড়া পালের উপর। তৃতীয় জন গভীর আগ্রহে আমাদের দিকেই তাকাচ্ছিল। লোকটি শক্ত-সমর্থ, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ। অবিরাম হাসিতে তার সাদা দাঁতগুলি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। জাহাজটা আরও কাছে এলে তার মাথার লাল ফ্লানেলের টুপিটা জলে পড়ে গেল, কিন্তু সে একবার সেদিকে তাকিয়েও দেখল না। অদ্ভুতভাবে হাসতে হাসতে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করতে লাগল। তখন যেরকম দেখেছিলাম হুবহু সেই রকম বর্ণনাই দিলাম।

জাহাজটা ধীর স্থির গতিতে এগোতে লাগল, আর আমাদের বুকের ভিতরটা আনন্দে নাচতে শুরু করে দিল। এই প্রত্যাসন্ন অপ্রত্যাশিত মুক্তির জন্য ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ জানাতে লাগলাম। তখনই হঠাৎ—একেবারে অকস্মাৎ সেই বিস্ময়কর জাহাজ থেকে সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে এল একটা গন্ধ—এমন একটা দুর্গন্ধ সারা পৃথিবীতে যার কোন নাম নেই, কোন ধারণা নেই—নারকীয়—শ্বাসরোধকারী—অসহ্য—ধারণার অতীত। বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে করতে সঙ্গীদের দিকে তাকালাম; তাদের মুখ শ্বেতপাথরের চাইতেও পান্ডুর। তখন আর প্রশ্ন করার বা বিবেচনা করার সময় নেই—জাহাজটা পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে এসে পড়েছে। দেখে মনে হল, আমাদের জাহাজ থেকে নামবার পথের পাশেই সেই জাহাজটাকে ভিড়িয়ে দেওয়া হবে, যাতে নৌকো ছাড়াই আমরা সেই জাহাজে উঠে যেতে পারি। আনন্দে আমরা ছুটে এগিয়ে গেলাম। জাহাজটা বিশ ফুটের মধ্যে এসে গেল। আর তখনই সমস্ত ডেকটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পেলাম। সেই ভয়ংকর দৃশ্য কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব? ডেকের উপর সারি সারি পড়ে আছে পঁচিশ-ত্রিশটা নরনারীর গলিত পচা শব। পরিষ্কার দেখলাম জাহাজে একটিও জীবিত মানুষ নেই। তবু সেই মৃত মানুষগুলোর কাছেই আমরা চীৎকার করে সাহায্য ভিক্ষা করতে লাগলাম। আতংকে ও হতাশায় আমরা তখন উন্মাদের অধম।

আমাদের আতংকিত কণ্ঠের প্রথম চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নবাগত জাহাজের পালদন্ডের কাছ থেকে কি যেন সাড়া দিল। সে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে মানুষের আর্তনাদের

এত বেশী মিল যে অতি দক্ষ শ্রবণ বিলাসীকেও তা চমকিত ও বিভ্রান্ত করতে পারে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই সে কণ্ঠস্বরের উৎসও আবিষ্কৃত হল। সেই দীর্ঘ, শক্ত-সমর্থ মূর্তিটি তখন জাহাজের রেলিং-এর উপরে ঝুঁকে আছে, কিন্তু তার মুখটা ফেরানো বলে আমরা দেখতে পেলাম না। তার হাত দুটো রেলিংয়ের উপর দিয়ে ঝুলে আছে, হাঁটু দুটো শক্ত দড়ি দিয়ে পালদণ্ডের সঙ্গে আটকানো। তার গায়ের শার্টের পিঠের দিকের ছেঁড়া জায়গাটায় বসে আছে একটা প্রকাণ্ড গাং-চিল; ঠোঁট ও নখগুলোকে পিঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই পচা মাংস ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে; সাদা পালকগুলি রক্তে লাল হয়ে গেছে। জাহাজটা আরও একটু ঘুরে গেলে আরও ভালভাবে দেখতে পেলাম, পক্ষিটা বেশ কষ্ট করে রক্ত মাখা মাথাটাকে বের করে নিল; মুহূর্তকাল আমাদের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে সুস্থে লোকটার পিঠ থেকে উড়ে গিয়ে আমাদের ডেকের উপর পাক খেতে লাগল; তার ঠোঁটে তখন ঝুলছে একটা দলাপাকানো লিভারের মত বস্তু। শেষ পর্যন্ত সেই ভয়ংকর খাদ্যবস্তুটি ছিটকে এসে পড়ল একেবারে পার্কারের পায়ের কাছে। ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করুন—এই প্রথম আমার মনের মধ্যে একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল—সে চিন্তার কথা আমি এখানে বলব না—আমার ইচ্ছা হল সেই রক্তমাখানো জায়গাটার দিকে এক পা এগিয়ে যাই। পরক্ষণেই বুঝি আমার স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে এল; একলাফে সামনে এগিয়ে গিয়ে কম্পিত বুকে সেই ভয়ংকর বস্তুটিকে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

যে দেহ থেকে ঐ বস্তুটি খুবলে তুলে নেওয়া হয়েছিল সেটা দড়ির উপর ঝুলে থাকায় রাক্ষুসে পাখিটার ঠোঁটের ধাক্কায় সেটা সহজেই এদিক-ওদিক দুলছিল; আর তা দেখেই প্রথম আমরা তাকে জীবিত ভেবেছিলাম। কিন্তু পাখিটা তাকে ঠুকরে ঠুকরে খেয়ে হাল্কা করে দেওয়ায় এবার সে কিছুটা উল্টে গেল, আর তার পুরো মুখটাই আমরা দেখতে পেলাম। কোন মুখ কি এত ভয়ংকর বীভৎস হতে পারে! চোখ দুটো গেছে, মুখের চারদিককার সব মাংস অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় দাঁতগুলি একেবারে বেরিয়ে পড়েছে। এই কি তাহলে সেই হাসি যা দেখে আমরা নতুন আশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলাম। এই কি—কিন্তু সে কথা থাক। জাহাজটা ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। সেই সঙ্গে অপসৃত হল আমাদের মুক্তি ও আনন্দের সব স্বপ্ন।

যে ভয়ংকর অনিশ্চয়তার অন্ধকারে সেই জাহাজটার এই পরিণতির কারণটা ঢাকা পড়ে গেল তাকে জানবার ও বুঝবার অনেক ব্যর্থ চেষ্টা আমি সেই দিন থেকেই করে যাচ্ছি। আগেই বলেছি, জাহাজটার গড়ণ ও আকৃতি দেখে সেটাকে ওলন্দাজ বাণিজ্য জাহাজ বলেই মনে হয়েছিল। একটু চেষ্টা করলেই জাহাজের গায়ে লেখা নামটা, বা আরও কিছু জ্ঞাতব্য আমরা সহজেই জেনে নিতে পারতাম; কিন্তু সেই মুহূর্তের তীব্র উত্তেজনায় আমরা বুঝি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যে মৃতদেহগুলি তখনও একেবারে পচে-গলে যায় নি তাদের গায়ের হলুদ বর্ণ দেখে আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে তারা সকলেই পীত জ্বরের শিকার হয়েছিল। তা যদি হয়েও থাকে তাহলেও তো প্রশ্নটা থেকেই যায়ঃ মৃতদেহগুলির অবস্থান দেখে বিচার করলে মনে হয় যে

প্রচন্ড আকস্মিকতার মধ্যে মৃত্যু এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ; কিন্তু একটা মহামারী যত মারাত্মকই হোক তা কখনও এভাবে হঠাৎই হানা দেয় না। বস্তুত, এটা ভাবাই অধিকতর যুক্তিসম্মত যে তাদের সমুদ্র-যাত্রার খাদ্য-ভান্ডারে কোন না কোন ভাবে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল ; অথবা কোন অজ্ঞাত বিষাক্ত মাছ, বা অন্য সামুদ্রিক প্রাণী অথবা সামুদ্রিক পাখি সেই বিষ বয়ে এনেছিল—কিন্তু সব কিছুই যেখানে এক ভয়ংকর অতলস্পর্শ রহস্যে ঢাকা এবং চিরকাল ঢাকা থাকবে সেখানে এসব ভাবনা-চিন্তা তো একেবারেই অর্থহীন।

অধ্যায়—১১

জাহাজটা দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। সেই দিকে তাকিয়ে বাকি দিনটা চুপচাপ কেটে গেল। কোন কাজকর্মেই মন বসল না। তারপরই ফিরে এল ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সেই পুরনো কষ্ট। কিন্তু সকাল হবার আগে তো আর কিছুই করার নেই। অতএব সকলেই একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলাম। সে ঘুম ভাঙল সঙ্গীদের ডাকাডাকিতে। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

চারদিক শান্ত। সমুদ্র নিস্তরঙ্গ। আবহাওয়া মনোরম। কিন্তু খাদ্য নেই। পানীয় নেই। নেই—কিছুই নেই।

অনেক খুঁজে-পেতে একটামাত্র বোতল পাওয়া গেল। তাতেই আমাদের খুশির সীমা নেই। প্রত্যেকেই এক চুমুক করে পেটে ঢেলে অপার সুখ অনুভব করলাম। কিন্তু সে সুখ আর কতক্ষণ ? এ যে খা-খা মরুভূমিতে বারিবিন্দু মাত্র। চোখের সামনে জ্বল জ্বল করছে অনিবার্য মৃত্যুর ভয়াল ছবি।

তীব্র ক্ষুধায় পেট জ্বলছে। সহ্যের অতীত যন্ত্রণা। যেমন করেই হোক এ জ্বালা মেটাতেই হবে। পকেট-ছুরিটা বের করে একটা ভাঙা চামড়ার ট্রাংক কেটে তারই কয়েক টুকরো মুখে পুরে চিবোতে লাগলাম, কিন্তু কিছুতেই একটা টুকরোও গিলতে পারলাম না। থু-থু করে ফেলে দিলাম। মাঝ রাতে সঙ্গীরা একে একে ঘুম থেকে উঠে অবর্ণনীয় কাতর সুরে হাহাকার শুরু করল। তাদের সর্বশরীর থর-থর করে কাঁপছে। জল-জল করে হাপুস নয়নে কাঁদছে। আজ ছয়দিন হয়ে গেল কারও কপালে খাদ্য-পানীয় জোটে নি—অবশ্য সেই এক বোতল মদ ছাড়া। বেশ বুঝতে পারছি, এ ভাবে আরও কিছু সময় চলতে থাকলে কারও প্রাণে বাঁচার আশা নেই। পিটার্স ও অগাস্টাস এমন ভয়ানকরকম শুকিয়ে গেছে যে তাদের দিকে তাকানোই যায় না। মুখ-চোখের আদলই সম্পূর্ণ বদলে গেছে—তারা যে আমারই অতি পরিচিত মানুষ সেটা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে-পড়েছে।

ক্ষিধের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পিটার্স ও অগাস্টাসও চামড়ার টুকরো গিলবার ব্যর্থ চেষ্টা করল বারকয়েক। আমি তাদের পরামর্শ দিলাম। চিবিয়ে-

চিবিয়ে থু-থু করে ফেলে দিতে ; তাতে কিছুটা সুফল মিলবে। কিন্তু তারা তখন এতই কাবু হয়ে পড়েছে যে সেটুকুও করতে পারল না। এমন সময় অনেক দূরে একটা জাহাজের পাল দেখতে পেয়ে সকলেরই মন বাঁচিবার নতুন আশায় নেচে উঠল। কিন্তু হায়! সে আশাও মরীচিকা হয়ে গেল। আমাদের উৎসুক চোখের সামনে জাহাজটা গতি-পরিবর্তন করে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। একদৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় পার্কার হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল যে ভয়ে আমি শিউরে উঠলাম। সে ঠোঁট খুলবার আগেই যেন আমি বুঝতে পারলাম সে কি বলতে চায়। অল্প কথায় সে প্রস্তাব করল, অন্য সকলকে বাঁচাতে আমাদের মধ্যে একজনকে মরতেই হবে।

অধ্যায়—১২

গত কয়েকদিন আগে এই সর্বশেষ ভয়ংকর বিকল্প পথটির কথা আমার মনেও এসেছিল, এবং সংগোপনে নিজের মনেই স্থির করে ফেলেছি যে-কোন রূপে, যে-কোন পরিস্থিতিতেই মৃত্যু আসুক না কেন তাকেই বরং বরণ করে নেব, তবু এই পথে পা বাড়াব না। এই প্রস্তাবটা এখনও পিটার্স বা অগাস্টাসের কানে যায় নি। অতএব পার্কারকে এক পাশে ডেকে নিয়ে অনেক করে তাকে বোঝালাম, অনেক অনুনয়-বিনয় করলাম, যাতে এই চরম বিকল্পের কথা সে ভুলে যায়। এবং বাকি দুজনের কাছে কখনও এই প্রস্তাব না তোলে।

সে মুখ বুজে আমার সব কথা শুনল। কিন্তু আমার কথা শেষ হতেই বলল, সে জানে আমি যা বললাম সে সবই ঠিক ; এ রকম পথ অবলম্বন করার কথা মানুষের মনে আসে একমাত্র চরম বিকল্প হিসাবেই ; কিন্তু যতদিন সম্ভব সব কষ্ট সে সহ্য করেছে ; যখন একজনের মৃত্যুতে বাকি ক'জনের প্রাণরক্ষার এতবড় একটা সম্ভাবনা রয়েছে তখন সকলের মৃত্যু ঘটানোটা কোন কাজের কথাই নয়।

তখন আমি তাকে মিনতি করলাম, সে যদি এই পথ ত্যাগ করতে নাই চায় তাহলেও সে অন্তত আরও একটা দিন অপেক্ষা করুক, দেখা যাক ইতিমধ্যে কোন জাহাজ এসে আমাদের সকলকে উদ্ধার করে কি না। জবাবে সে জানাল, এ ব্যাপারে একেবারে শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত অপেক্ষা করে তবেই সে মুখ খুলেছে ; এ অবস্থায় আর বেঁচে থাকা যাবে না ; অতএব আরও একটা দিন অপেক্ষা করতে গেলে বড় বেশী দেরী হয়ে যাবে ; অন্তত তার নিজের বেলায় তো বটেই।

যখন বুঝলাম যে তাকে কোনমতেই সংকল্পচ্যুত করা যাবে না, তখন আমি অন্য পথ ধরলাম। তাকে ভয় দেখালাম। বললাম, সে যেন ভুলে না যায় যে এই মুহূর্তে তার চাইতে, এমন কি পিটার্স বা অগাস্টাসের চাইতেও আমার শরীর-স্বাস্থ্য অনেক বেশী সক্ষম ; কাজেই দরকার হলে আমি সেই গায়ের জোরের আশ্রয় নিতে বাধ্য হব ;

সে যদি তার .এই রক্তলোলুপ নরমাংসাশী পরিকল্পনার কথা অপর দুজনের কাছে প্রকাশ করার চেষ্টামাত্রও করে তাহলে আমি তাকে জোর করে তুলে সমুদ্রে ফেলে দিতে দ্বিধা করব না। কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে আমার গলাটা চেপে ধরে ছুরি বের করে আমার পেটে সেটা বসিয়ে দেবার কয়েকটা ব্যর্থ চেষ্টা করল। ইতিমধ্যে আমিও ভীষণ রেগে গিয়ে তাকে জাহাজের এক পাশে টেনে নিয়ে গেলাম সমুদ্রে ফেলে দেবার জন্য। কোথা থেকে পিটার্স'ই ছুটে এসে তাকে বাঁচিয়ে দিল; ব্যাপার কি জানতে চাইল। আমি কিছু বলার আগেই পার্কার তাকে সব কথা বলে দিল।

তার কথার প্রতিক্রিয়া যে এতদূর ভয়ংকর হবে তা আমি ভাবতেও পারি নি। মনে হল, অগাস্টাস এবং পিটার্স'ও এই রকম একটা ধারণা মনে মনে পোষণ করছিল, এতদিন মুখ ফুটে বলতে পারে নি। এবার তারাও পার্কারের দলে যোগ দিল, এবং তাদের পরিকল্পনামত কাজ করতে পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম তাদের তিনজনের বিরুদ্ধে গেলে আমার নিজেরই সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। তাই বললাম, আমি তাদের প্রস্তাবকেই মেনে নিচ্ছি, তবে অন্তত আরও এক ঘন্টা সময় অপেক্ষা করা হোক; দেখা যাক, ইতিমধ্যে কুয়াসাটা সরে গেলে দূরে কোন জাহাজ চোখে পড়ে কি না। অনেক বুঝিয়ে তাদের রাজী করলাম। ঠিক সেই সময় একটা মৃদু বাতাস উঠে আসায় এক ঘন্টার মধ্যেই কুয়াসাও কেটে গেল, কিন্তু কোন জাহাজই চোখে পড়ল না। অগত্যা আমরা ভাগ্য পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম।

তারপর যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল—পরবর্তী কালের কোন ঘটনাই সে দৃশ্যকে আমার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারবে না—যতদিন বেঁচে থাকব সেই নির্মম স্মৃতি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিক্ততায় ভরিয়ে তুলবে। তাই আমার এই বিবরণের সেই অংশটুকু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করতে চাই। স্থির হল, লটারি হবে খড় টানার পদ্ধতিতে। চারটি বিভিন্ন মাপের খড়ের টুকরো একজনের হাতের মধ্যে ধরা থাকবে। সব চাইতে ছোট টুকরোটা যার হাতে উঠবে তারই মৃত্যু ঘটবে। অতএব প্রত্যেকেই বেঁচে থাকার একটা করে সুযোগ পাবে। আরও ঠিক হল—টুকরোগুলো থাকবে আমার হাতে। জাহাজে খড় কোথায় পাওয়া যাবে? তার বদলে খুঁজে পাওয়া গেল কয়েকটা কাঠের টুকরো। টুকরোগুলোকে নিয়ে আমি চলে গেলাম এক কোণে, আর আমার সঙ্গীরা দাঁড়াল আর এক কোণে আমার দিকে পিঠ দিয়ে। প্রথমে এগিয়ে এল পিটার্স। আমি কাঠের টুকরোশুদ্ধ হাতটা এগিয়ে দিলাম। সেও একটা টুকরো টেনে নিল। সে বেঁচে গেল—তার হাতের টুকরোটা সব চাইতে ছোট নয়। এবার অগাস্টাসের পালা; সেও বেঁচে গেল। এবারই স্থির হয়ে যাবে—আমি বাঁচব না মরব। ভাগ্যের পাল্লা সমান সমান। সেই মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে যেন একটা বাঘের হিংস্রতা জেগে উঠল; বেচারা পার্কারের প্রতি আমার নৃশংস বিদ্বেষ যেন চরমে উঠল। কিন্তু সে অনুভূতি ক্ষণিকের মাত্র। শেষ পর্যন্ত কম্পিত বুকে দুই চোখ বুজে বাকি দুটো কাঠের টুকরো তার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম। মনস্থির করতে পার্কার পুরো পাঁচ মিনিট সময় নিল। তার মধ্যে একটি বারের জন্যও আমি চোখ মেলে তাকাতে পারলাম না। আমার হাত থেকে সে একটা টুকরো টেনে নিল।

ভাগ্যের পরীক্ষা শেষ হল; আমি তখনও জানি না আমার পক্ষে হল, কি বিরুদ্ধে। কারও মুখে কথা নেই। নিজের হাতের দিকে তাকাবার সাহসটুকুও হল না। শেষ পর্যন্ত পিটার্স আমার হাতটা চেপে ধরতে আমি চোখ খুললাম। পার্কারের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝলাম, আমি বেঁচে গেছি আর তার মাথায় নেমেছে মৃত্যুদণ্ড। দম বন্ধ হয়ে আমি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম।

মূর্ছা ভাঙতেই আমার চোখের সামনে সংঘটিত হল সেই হতভাগ্যের এক জীবনান্ত নাটক যার প্রযোজনায় সেই ছিল প্রধান অংশীদার। সেও তিলমাত্র বাধা দিল না। পিটার্স ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল তার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গেই তার মৃত্যু হল। তারপর যা ঘটল তাকে কল্পনা হয়তো করা যায়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, নিহতের রক্তে আমাদের আকন্ঠ তৃষ্ণাকে কিছুটা মিটিয়ে নিয়ে সকলের সম্মতিক্রমে হাত, পা, মাথা, এবং নাড়িভুঁড়িগুলো কেটে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে দেহের বাকি অংশটাকে ছোট ছোট করে কেটে খেয়ে মাসের সতেরো, আঠারো, ঊনিশ ও বিশ এই চারটি চিরস্মরণীয় দিনকে কাটিয়ে দিলাম।

ঊনিশ তারিখে পনেরো—বিশ মিনিটের জন্য বেশ জোর একপশলা বৃষ্টি হল। বুদ্ধি করে একটা পাত্রে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হল। তার মোট পরিমাণ আধা গ্যালনের বেশী হবে না; তবু তাতেই আমাদের শরীরের তাকত ও মনের জোর অনেকটা বেড়ে গেল।

একুশে তারিখে আবার সেটা তলানিতে গিয়ে ঠেকল। আবহাওয়া তখনও গরম এবং আরামদায়ক। মাঝে মাঝে কুয়াসা ও মৃদু বাতাস বইছে উত্তর থেকে পশ্চিমে।

বাইশে তারিখ। বিষণ্ণ মনে গোল হয়ে বসে নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় নতুন আশার ঝিলিক খেলে গেল আমার মনে। বড় মাস্তুলটা যখন কেটে ফেলা হয় তখন একটা কুড়ুল আমার হাতে দিয়ে পিটার্স বলেছিল সেটাকে কোথাও ভালভাবে লুকিয়ে রাখতে যাতে ঢেউয়ের তোড়ে সেটা ভেসে না যায়। এখন আমার মনে হল, জলে ডুবে যাওয়া ভাঁড়ার ঘরের উপরকার ডেকের তক্তাকে কেটে ফেলতে পারলে তো তার ভিতর থেকে কিছু খাবার-দাবার জোগার হতে পারে।

ফন্দিটা সঙ্গীদের বলতেই তারা সানন্দে সেটা লুফে নিল। নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলাম। পিটার্স ও আমি বদলাবদলি করে কুড়ুল চালাতে লাগলাম। অগাস্টাসের হাতে ঘা হওয়ায় তাকে কোন কাজ করতে দেওয়া হল না। আমরা দু'জনও খুবই দুর্বল। বেশ বুঝতে পারলাম, একজনের নেমে যাবার মত একটা ফোঁকর কেটে বের করতে দুজনের অনেক সময় কাজ করতে হবে। তাতে অবশ্য আমরা মোটেই নিরুৎসাহ হলাম না। চাঁদের আলোয় সারা রাত কাজ করে তেইশ তারিখ সকালের আগেই তক্তা কাটার কাজ শেষ হল। পিটার্স স্বেচ্ছায় জলভর্তি ভাঁড়ার ঘরে নেমে গেল। একটু পরেই উঠে এল জলপাই-ভর্তি একটা ছোট কলসি নিয়ে। তিনজন মিলে গোগ্রাসে সেগুলি খেয়ে শেষ করলাম। পিটার্সকে আবার নীচে নামিয়ে দেওয়া হল। অপ্রত্যাশিতভাবে এবার সে উঠে এল অনেকটা

শূকর মাংস ও এক বোতল মদিরা মদ নিয়ে। একবারে বেশী খেতে সাহস হল না বলে সকলেই এক চুমুক করে মদ খেয়ে তৃষ্ণা মেটালাম। হাড়-সংলগ্ন পাউন্ড দুই ছাড়া বাকি মাংসটা খাবার অযোগ্য বলে ফেলে দেওয়া হল। ভাল মাংসটা তিনজনে ভাগ করে নিলাম। ক্ষিধের মুখে পিটার্স ও অগাস্টাস তখনই সবটা মাংস খেয়ে ফেলল; আমি কিছুটা খেয়ে বাকিটা তুলে রাখলাম। কঠোর পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত দেহে সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

দুপুর নাগাদ আরও কিছুটা তাজা হয়ে নতুন করে খাদ্য সংগ্রহে লেগে গেলাম। পিটার্স ও আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত বার বার ওঠা-নামা করে মোট সংগ্রহ করলাম চার কলস জলপাই, আর একটা বড় টুকরো শূকর-মাংস, প্রায় তিন গ্যালন উৎকৃষ্ট মদিরা মদ, এবং যেটা সব চাইতে আনন্দের কথা—গ্যালিপাগো জাতের একটা ছোট কচ্ছপ। “গ্রামপাস” বন্দর ছাড়বার আগে ক্যাপ্টেন বার্নার্ডই সেটা সংগ্রহ করেছিল প্রশান্ত মহাসাগর থেকে সদ্য প্রত্যাগত “মেরিপিটস” জাহাজ থেকে।

এই বিবরণের পরবর্তী অংশে এ ধরনের কচ্ছপের কথা অনেক বারই উল্লেখ করা হবে। এ ধরনের কচ্ছপ প্রধানত পাওয়া যায় গ্যাসিপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জে। এই জীবটির অদ্ভুত আকৃতি ও কাজকর্মের দরুন তাকে হাতি-কচ্ছপও বলা হয়। এগুলি আকারে খুব বড়; বারো থেকে পনেরো শ' পাউন্ড ওজনের গ্যালিপাগো আমি নিজেই দেখেছি। দেখতে অনেকটা মরুভূমির উটের মত। গলার কাছে একটা থলেতে প্রচুর জল জমা রাখতে পারে। আমরা যে কচ্ছপটা পেলাম সেটা খুব বড় নয়; ওজন হয়তো পঁয়ষট্টি বা সত্তর পাউন্ড হবে। এটা মেয়ে কচ্ছপ, শরীরে যথেষ্ট চর্বি জমেছে, আর থলেতে জল ছিল এক কোয়ার্টেরও বেশী। এই সংকটময় যাত্রাপথে এ তো একটা সম্পদ বিশেষ। এক সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তিনজনই নতজানু হয়ে ঈশ্বরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালাম।

অধ্যায়—১৩

জুলাই ২৪। আজ সকালে সকলেই আশ্চর্য রকমের সতেজ হয়ে উঠেছি। ভাঁড়ার ঘর থেকে আরও কিছু খাদ্যবস্তু তোলার চেষ্টা করব এমন সময় বিদ্যুৎসহ একপশলা জোর বৃষ্টি নামল। আগের দিনের মতই বৃষ্টির জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করছি এমন সময় উত্তর দিক থেকে প্রবল বাতাস উঠে এল। ফলে জাহাজের খোলটা এমনভাবে দুলতে লাগল যে পা স্থির রাখাই শক্ত হয়ে উঠল। অতএব জল ধরার ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হল। দুপুরে বাতাসের বেগ আরও বাড়ল, এবং রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঝড়ের রূপ নিল।

জুলাই ২৫। সকালে ঝড়ের বেগ কমে গেল। সমুদ্রের জলও অনেকটা নেমে গেছে।

এখন আর উত্তাল ঢেউ আমাদের শরীরের উপর আছড়ে পড়ছে না। দুঃখের বিষয়, অত্যন্ত যত্ন করে রাখা সত্ত্বেও দুই কলস জলপাই এবং সবটা শুকের-মাংসই ঝড়ের ধাক্কায় পাটাতনের উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে। অল্প কয়েকটা জলপাই এবং জল-মেশানো মদ দিয়ে প্রাতরাশ শেষ করলাম। সমুদ্র এখনও উথাল-পাথাল। দুপুরে সূর্য একেবারে মাথার উপর উঠে এল। বুঝতে পারছি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাতাসের টানে আমরা বিষুবরেখার কাছাকাছি এসে পড়েছি। সন্ধ্যার দিকে কয়েকটা হাঙ্গর চোখে পড়ল। একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর যেভাবে আমাদের দিকে তেড়ে এল তাতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম।

জুলাই ২৬। সমুদ্র অনেক শান্ত। উত্তর ও পশ্চিম থেকে মৃদু বাতাস বইছে। ভাঁড়ার ঘরের ভিতর থেকে অনেক চেষ্টা করেও খাবার জিনিস বিশেষ কিছু জুটল না। আবার আমরা নৈরাশ্যে ডুবে গেলাম।

জুলাই ২৭। একই অবস্থা। বিকেলে প্রচণ্ড রোদ নিয়ে সূর্য ওঠায় আমরা পোশাকপত্র শুকিয়ে নিলাম। সমুদ্রে স্নান করে খুব আরাম পেলাম। অবশ্য হাঙ্গরের ভয়ে খুব সাবধানে স্নান করতে হয়েছে।

জুলাই ২৮। আবহাওয়া এখনও ভাল। জাহাজটা আরও কাত হয়ে পড়েছে। একেবারে উল্টে যাবে না তো? এই পরিস্থিতিতে কচ্ছপ, জলের জগ, জলপাইয়ের দুটি কলস সব কিছু ভাল করে বেঁধেছেঁদে রাখা হল। সমুদ্র সারাদিন শান্ত।

জুলাই ২৯। একই আবহাওয়া। অগাস্টাসের বাহুর ক্ষতে পচনের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সে তন্দ্রালুতা ও অত্যাধিক তৃষ্ণার কথা বলছে, কিন্তু তীব্র বেদনা বোধ করছে না। তার জন্য কিছুই আমাদের করার নেই; কেবল তার প্রাপ্য জলের পরিমাণ কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

জুলাই ৩০। দিনটা অত্যাধিক গরম। বাতাস নেই। সারা সকাল একটা প্রকাণ্ড হাঙর জাহাজের খোলের কাছাকাছি ঘুরছে। বার কয়েক সেটাকে ফাঁস লাগিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হই নি। অগাস্টাসের অবস্থা আরও খারাপ; পুষ্টির অভাব আর ক্ষতের দরুণ সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আজ সন্ধ্যায় শেষ জলপাইগুলি খেলাম; জগের জল এত পচে গেছে যে মদ না মিশিয়ে মুখেই দেওয়া গেল না। স্থির হল সকালেই কচ্ছপটাকে কাটতে হবে।

জুলাই ৩১। জাহাজের খোলের অবস্থার কথা ভেবে দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় রাতটা কাটিয়ে সকালেই কচ্ছপটাকে মেরে কেটে ফেললাম। আসলে কচ্ছপটা তার চাইতেও ছোট—সবটা মাংসের ওজন দশ পাউণ্ডের বেশী নয়। তার একটা অংশকে যতদিন সম্ভব সঞ্চয় করে রাখার জন্য মাংসটাকে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে তিনটে জলপাইয়ের কলস ও একটা মদের বোতলে ভর্তি করে রাখা হল। এই ভাবে তিন পাউণ্ডের মত কচ্ছপ-মাংস তুলে রাখা হল; বাকিটা খেয়ে শেষ না করা পর্যন্ত সেগুলিতে হাত দেওয়া হবে না। স্থির হল, আমরা দৈনিক চার আউন্স মাংস খাব; এই ভাবে সবটা মাংসে আমাদের তের দিন চলে যাবে। সন্ধ্যার আগে বজ্র-বিদ্যুৎসহ

কিছুটা বৃষ্টি হল; কোনরকমে আধা পাঁইট মত জল ধরা গেছে। তার সবটাই অগাস্টাসকে দেওয়া হল। সে একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। বৃষ্টিতেও তার কোন উপকার হল না। কব্জি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সমস্ত বাহুটাই একেবারে কালো হয়ে গেছে; পা দুটো বরফের মত ঠাণ্ডা। যেকোন মুহূর্তে তার শেষ নিঃশ্বাসটি পড়বে। সে ভীষণ শুকিয়ে গেছে; ন্যাণ্টাকেট ছেড়ে আসার সময় তার ওজন ছিল একশ সাতাশ পাউণ্ড; এখন ওজন হবে বড় জোর পঁয়তাল্লিশ বা পঞ্চাশ পাউণ্ড। চোখ দুটো মাথার মধ্যে বসে গেছে; প্রায় দেখাই যায় না; গালের চামড়া এত ঝুলে পড়েছে যে কোন খাবার চিবোতে পারে না এমন কি জল গিলতেও কষ্ট হয়।

অগস্ট ১। সেই একই শান্ত আবহাওয়া; তবে সূর্যের তাপ বড় বেশী। তৃষ্ণায় খুব কষ্ট হচ্ছে; জগের জল সম্পূর্ণ দূষিত, পোকা কিলবিল করছে। তবু মদ মিশিয়ে তাই খাচ্ছি, কিন্তু তৃষ্ণা মিটছে না। সমুদ্রে স্নান করে কিছুটা আরাম হল; কিন্তু হাঙরের ভয়ে তাও বেশীক্ষণ ধরে করা যায় না। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, অগাস্টাসকে বাঁচানো যাবে না; তার মৃত্যু আসন্ন। কয়েক ঘণ্টা চুপচাপ পড়ে থেকে বেলা বারোটা নাগাদ সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলল। তার মৃত্যুতে আমরা কেমন যেন ভেঙে পড়লাম। সারাটা দিন মৃতদেহ ঘিরে বসে রইলাম। অন্ধকার হবার পরে সাহসে ভর করে তার দেহকে সমুদ্রে ফেলে দিলাম।

অগস্ট ২। একই ভয়ংকর রকমের শান্ত ও গরম আবহাওয়া। ভাঙা মন ও ক্লান্ত শরীরে ভোরকে দেখলাম। জগের জল ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। সব জল ফেলে দিয়ে জগটা সমুদ্রের জলে ভাল করে ধুয়ে নিলাম। তেষ্টার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মদ খেতে শুরু করলাম। তাতে হিতে বিপরীত হল; তেষ্টা তো মিটলই না, উপরন্তু খুব নেশা হল। শেষটায় সাগরের জলে মদ মিশিয়ে খেলাম; তাতে বড় বেশী বমির ভাব দেখা দিল। অতএব সে চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। সমুদ্রে স্নান করে যে একটু আরাম পাব তারও উপায় নেই; কাল রাতে বন্ধুর মৃতদেহ সমুদ্রে ফেলে দেবার পর থেকেই জাহাজটাকে ঘিরে হাঙ্গরের উৎপাত খুবই বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তারা যেন আর একটা মৃতদেহ পাবার আশায় ওঁৎ পেতে আছে; নাগালের মধ্যে পেলেই ছিঁড়ে খাবে। একদিকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা, অন্যদিকে ক্ষুধার্ত হাঙ্গরের উৎপাত—সারাটা রাত কেউ ঘুমতে পারলাম না।

অগস্ট ৩। দুঃখের অবসানের কোন সম্ভাবনা নেই। জাহাজটা এতবেশী কাত হয়ে আছে যে ডেকের উপর পা রাখাই কষ্টকর। সারাদিন তৃষ্ণায় ছটফট করছি। হাঙ্গরের ভয়ে সমুদ্রেও স্নান করতে পারছি না। ঘুমনো অসম্ভব।

অগস্ট ৪। ভোরের কিছু আগে বুঝতে পারলাম জাহাজটা উল্টে যাচ্ছে। নিজেদের বাঁচাবার সবরকম চেষ্টা করলাম। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর হঠাৎ জাহাজটা পুরোপুরি উল্টে গেল, আর আমরাও ছিটকে সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম, কারণ প্রকাণ্ড খোলটার নীচে চাপা পড়ায় আমরা তখন বেশ কয়েক বাঁও জলের তলায়। আমি তখন জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর

গুণেছি : তখন তো ভাবতেও পারি নি যে ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজটা আবার সহজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাবে। কিন্তু তখন আমি ছিটকে গেছি জাহাজ থেকে প্রায় বিশ গজ দূরে। চারদিকে সমুদ্র উথাল-পাথাল। পিটার্সকেও দেখতে পাচ্ছি না। আমার কয়েক ফুটের মধ্যে একটা তেলের পিপে ভাসছে ; জাহাজের নানা জিনিস ইতস্তত ছড়িয়ে আছে।

তখন আমার সব চাইতে বড় ভয় হাঙ্গরের। তারা তো আশেপাশেই আছে। তাদের দূরে সরিয়ে রাখার জন্য হাতে পায়ে প্রচুর জল ছিটিয়ে, ফেনা তুলে সাঁতার কেটে জাহাজের দিকে এগোতে লাগলাম। ভাগ্যের জোরে নিরাপদেই জাহাজের কাছে পোঁছে গেলাম, কিন্তু তখন ক্লান্তিতে শরীর এতই অবশ হয়ে পড়েছিল যে সময় মত পিটার্সের সাহায্য না পেলে আমি হয়তো জাহাজে উঠতেই পারতাম না। আমার বিপরীত দিক থেকে জাহাজের খোলের উপর উঠে সে দড়ি ঝুলিয়ে দিল, আর সেটা ধরে আরও উপরে উঠে গেলাম।

আপাতত বিপদের হাত থেকে তো উদ্ধার পেলাম। এবার প্রধান সমস্যা হল পরিপূর্ণ অনাহার। ডেকে খাবার-দাবার যা কিছু সব ঢেউয়ের ঝাপটায় সাগরের জলে ভেসে গেছে। আবার যে কিছু মিলবে সে আশা সুদূর পরাহত। গভীর হতাশায় দুজনই ছোট শিশুর মত কাঁদতে লাগলাম।

সব মন্দেরই বোধ হয় একটা ভাল দিক থাকে। অন্তত এক্ষেত্রে ছিল। হঠাৎই আমরা আবিষ্কার করলাম, একেবারে তলা থেকে জাহাজের খোলটার দুই-তিন ফুট পর্যন্ত জায়গা ঘন হয়ে ঢেকে দিয়েছে এক ধরনের সামুদ্রিক গেঁড়ি ; খাদ্য হিসাবে সেগুলি খুবই ভাল, আর তার পুষ্টিগুণও যথেষ্ট। অপ্রত্যাশিতভাবে এই যা খাবার জুটে গেল তাতে ফেলে ছড়িয়ে খেলেও আমাদের এক মাস চলে যাবে।

এইভাবে খাবার সমস্যা মিটলেও জলের সমস্যা তীব্রতর হল। রাতে পিটার্স কোনক্রমে ঘন্টাখানেকের জন্য চোখ বুজলেও তীব্র জলকষ্টের ফলে এক মুহূর্তের জন্যও আমি চোখের পাতা এক করতে পারলাম না।

অগস্ট ৫। আজ মৃদু মৃদু বাতাস বইছে। তারই টানে আমরা ভেসে চলেছি প্রচুর পরিমাণ সামুদ্রিক শেওলার ভিতর দিয়ে। ভাগ্যক্রমে সেই শেওলার ভিতর থেকে আমরা এগারোটা ছোট কাঁকড়া ধরে ফেললাম। বেশ আরাম করে সেগুলিকে খোসাশুদ্ধ খেয়ে ফেললাম। এগুলি খাবার পরে গেঁড়ির মত অত বেশী তেষ্টাও পেল না। শেওলার মধ্যে হাঙ্গর দেখতে না পেয়ে সাহসে ভর করে চার-পাঁচ ঘন্টা ধরে স্নানও করলাম। কী আশ্চর্য, তাতে তৃষ্ণাটাও বেশ কমে গেল। ফলে রাতটা বেশ ভালই কাটল। কিছুটা ঘুমও হল।

অগস্ট ৬। আজ দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হল। সঙ্গে জগ ও কলস না থাকায় খুবই আপশোষ হতে লাগল। যাই হোক, গায়ের শার্ট খুলে জলে ভিজিয়ে নিয়ে তাই নিঙড়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ঠোঁটে ফেলে তৃষ্ণা মেটালাম। এইভাবে দিনটা কেটে গেল।

অগস্ট ৭। ভোর হবার ঠিক আগে দুজন একই সঙ্গে পূর্বদিকে একটা পাল দেখতে পেলাম। সেটা আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে আমরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলাম। সাধ্যমত নানাভাবে ইসারা করলাম, বাতাসে শার্ট উড়িয়ে দিলাম; সাধ্যমত লাফাতে লাগলাম, ফুসফুস ফাটিয়ে চীৎকার শুরু করে দিলাম। জাহাজটা তখনও মাইল পনেরো দূরে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই জাহাজটা স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হল। একটা পাল তোলা জাহাজ, বড় পালের উপর একটা কালো বল, যাত্রী বোঝাই। হঠাৎ দেখলাম, নবাগত জাহাজের ডেকে সকলেই উত্তেজিতভাবে চলাফেরা করছে। পরমুহূর্তেই একটা বৃটিশ পতাকা উড়িয়ে দিয়ে জাহাজটা আমাদের দিকে এগোতে লাগল। আধা ঘন্টার মধ্যেই আমরা আশ্রয় পেলাম নতুন জাহাজের কেবিনে। জাহাজটা লিভারপুলের "জেন গাই"; ক্যাপ্টেন গাই তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণ সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে—সীল মাছ শিকার ও বাণিজ্যিক যাত্রায়।

অধ্যায়—১৪

"জেন গাই" একটি সুদৃশ্য একশ' আশি টনের বহু-পাল জাহাজ। এমন দ্রুতগতি জাহাজ আমি আগে কখনও দেখি নি। জাহাজের নাবিকের সংখ্যা পঁয়ত্রিশ, তাছাড়া আছে ক্যাপ্টেন ও মেট; তবে বাণিজ্য জাহাজের সম্ভাবিত বিপদের দিক থেকে বিচার করলে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নয়।

ক্যাপ্টেন গাই অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। দক্ষিণ অঞ্চলের সমুদ্রযাত্রায় যথেষ্ট অভিজ্ঞ; জীবনের বেশীরভাগ সময় সেই কাজেই কেটেছে। তবে যে কাজ নিয়ে তিনি যাত্রা করেছেন তার পক্ষে প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার কিছু অভাব আছে তার চরিত্রে। যে জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেছেন তিনি তার আংশিক মালিক, আর যেকোন রকমের মালপত্র নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রের সর্বত্র চলাফেরা করার ক্ষমতা তাঁর আছে। সেই মতেই জাহাজে বোঝাই করা হয়েছে নানারকম পুঁতি, আয়না, কাঠের জিনিস, কুড়ুল, বেলচা, করাত, বাইশ, র‍্যাঁদা, বাটালি, তুরপুণ, উখা, চাকি-দণ্ড, হাতুড়ি, কাঁটা, ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর, সূঁচ, সুতো, চিনেমাটির বাসন, কাপড়, সুলভ অলংকার ও অনুরূপ নানা জিনিসপত্র।

জাহাজটা লিভারপুল থেকে যাত্রা করেছে ১০ই জুলাই, কর্কটক্রান্তি পার হয়েছে পঁচিশ তারিখে, ভার্ড দ্বীপপুঞ্জে পৌঁচেছে উনত্রিশে; সেখানে বোঝাই করেছে নুন ও অন্যান্য দরকারী জিনিস। তেশরা অগস্ট ভাউস অন্তরীপ থেকে যাত্রা করে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল বরাবর ব্রাজিলের দিকে এগিয়েছে সেখান থেকেই বিষুবরেখাকে অতিক্রম করার উদ্দেশ্য নিয়ে। ইওরোপ থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ যেতে, অথবা সেই পথে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছতে জাহাজগুলো সাধারণত সেই পথেই চলে।

ক্যাপ্টেন গাইয়ের ইচ্ছা ছিল প্রথম যাত্রাবিরতি করবেন "কেরগুলেন্স ল্যান্ড"-এ—কেন, তা আমি জানি না। যেদিন আমাদের তুলে নেয়, সেদিন জাহাজটা ছিল সেণ্ট রোখ্ অন্তরীপে, পশ্চিমে একত্রিশ ডিগ্রি দ্রাঘিমায়; তার অর্থ আমরা তখন কম করেও পঁচিশ ডিগ্রি উত্তর থেকে দক্ষিণে ভেসে এসেছিলাম।

"জেন গাই" জাহাজে আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করা হল। পক্ষকালের মধ্যেই পিটার্স ও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলাম। এতদিন যে দুঃখ-কষ্ট ঘটেছিল আমাদের জীবনে এখন তাকে মনে হতে লাগল একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র; যেন আমাদের জীবনে বাস্তবে ঘটে নি। কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নি। ষোলই সেপ্টেম্বর উত্তমাশা অন্তরীপের কাছাকাছি পেঁাছবার পর জাহাজটা এই প্রথম একটা বড় ঝড়ের মুখে পড়ল। সারাটা রাত প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে কেটে গেল। সকালের দিকে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। ক্যাপ্টেন গাই বললেন, আমাদের ভাগ্য ভাল যে এত অল্পের উপর দিয়েই ঝড়টা কেটে গেল। সাধারণত এ অঞ্চলের ঝড় খুব ভয়ংকর হয়।

তেরোই অক্টোবর আমরা দূরে থেকে দেখতে পেলাম লঘিমা ৪৫°৫৩´ দক্ষিণ, দ্রাঘিমা ৩৭°৪৬ পূর্বে অবস্থিত প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ। দুই দিন পরে পার হলাম ক্রোজেট দ্বীপ, আর আঠারোই তারিখে পেঁাছলাম দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের ফেরগুলেন বা নির্জন দ্বীপে, আর সেখানেই ক্রিস্টমাস বন্দরে নোঙর ফেললাম।

এই দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জটি উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্রায় আটশ' লীগ দূরে অবস্থিত। ১৭৭২ সালে ফরাসী নাবিক ব্যারণ ডি কারগুলেন এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। তার মনে হয়েছিল এই দ্বীপ একটি বিস্তীর্ণ দক্ষিণ মহাদেশের অংশবিশেষ। তিনি এই খবর দেশে পেঁাছে দিলে সেখানে খুবই হৈ-চৈ পড়ে যায়। সরকার ব্যাপারটা হাতে নেয় এবং ব্যারনকে পুনরায় সেখানে পাঠায় দেশটাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে একটা বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য। তখনই ভুলটা ধরা পড়ে। পরে ১৭৭৭ সালে ক্যাপ্টেন কুক আবার সেই দ্বীপে হাজির হয়ে তার নাম রাখেন নির্জন দ্বীপ। অঞ্চলটা পাহাড়ে ঘেরা; তবে কোন পাহাড়ই খুব উঁচু নয়। শিখরগুলি সর্বদাই বরফে ঢাকা থাকে। সেখানকার অনেকগুলি বন্দরের মধ্যে ক্রিস্টমাস বন্দরই সব চাইতে সুবিধাজনক।

সেখানে পেঁাছেই প্রধান মেট নৌকো নিয়ে সীল মাছের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাপ্টেন ও তার এক যুবক আত্মীয় সেখানেই থেকে গেলেন। দ্বীপের অভ্যন্তরে তাদের কি একটা কাজ ছিল আমি জানি না। তবে দেখলাম ক্যাপ্টেন একখানা সিল-করা চিঠি বোতলের মধ্যে ভরে সেটাকে সঙ্গে নিয়ে সব চাইতে উঁচু পাহাড়টার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিটার্স ও আমি সঙ্গে সঙ্গেই উপকূলের পথ ধরে বেরিয়ে পড়লাম সীল মাছের সন্ধানে। প্রায় তিন সপ্তাহের চেষ্টায় আমরা সংগ্রহ করলাম মাত্র তিন শ' পঞ্চাশটি সীল মাছের চামড়া। এগারো দিন পরে আমরা জাহাজে ফিরে এসে

ক্যাপ্টেন গাই ও তার ভাইপোকে পেলাম। তারা জানালেন, এ দেশটা একেবারেই জনহীন ও অনুর্বর। পরদিনই আমরা সেখান থেকে জাহাজ ছেড়ে দিলাম।

অধ্যায়—১৫

উত্তর দিকে চলতে চলতে নানা দ্বীপ ঘুরে পনেরো দিনে আমরা ত্রিস্তান ডি' আকুনহা দ্বীপে পৌঁছলাম। তিনটি গোলাকার দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই দ্বীপপুঞ্জটি প্রথমে আবিষ্কার করে পর্তুগিজরা, পরে সেখানে যায় ওলন্দাজরা ১৬৪৩ সালে, এবং ফরাসীরা ১৭৬৭ সালে। তিনটি দ্বীপ মিলিয়ে গড়ে উঠেছে একটি ত্রিভুজ ভূভাগ, একটা থেকে আর একটার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। দ্বীপগুলি বেশ উঁচু, সব চাইতে উঁচু দ্বীপটাকে আশী-নব্বই মাইল দূর থেকেও বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

এই সব দ্বীপের উপকূল অঞ্চলে নানা প্রজাতির সীল মাছ এবং সামুদ্রিক পাখি প্রচুর দেখা যায়। হাঙ্গরও যথেষ্ট চোখে পড়ে। এই কারণেই গোড়ার দিকে ওলন্দাজ ও ফরাসীরা বার বার এখানে এসেছে। ১৭৯০ সালে ফিলাডেল্‌ফিয়ার ক্যাপ্টেন প্যাটেন "ইন্ডাস্ট্রি" নামক জাহাজ নিয়ে সাত মাস এখানে ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি কম করেও পাঁচ হাজার ছয়শ' সীলমাছের চামড়া সংগ্রহ করেছিলেন এবং তিন সপ্তাহের মধ্যেই তেল দিয়ে একটা বড় জাহাজ ভর্তি করে দিতে পারতেন বলে জানিয়েছেন।

তার কিছুদিন পরেই এসেছিলেন মার্কিন জাহাজ "বেট্‌সির" মালিক ক্যাপ্টেন কলকুহোন। সেখানে তিমি, পেয়াঁজ, আলু, কপি, এবং অন্য অনেক রকম শবজির চাষ করেছিলেন। এখন সেখানে সে সব শবজি প্রচুর পাওয়া যায়।

১৮১১ সালে "নেরেয়ুস" জাহাজ নিয়ে ত্রিস্তান-এ এসেছিলেন ক্যাপ্টেন হেউড। তিনি তিনজন মার্কিন অধিবাসীকে দেখেছিলেন যারা এখানে সীল-চামড়া ও তেলের ব্যবসা করত। গ্লাস নামক বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্পোরাল তো এক সময় এই দ্বীপসমূহের সুপ্রিম গভর্নরই ছিলেন ; তার অধীনে ছিল বিশজন পুরুষ ও তিনজন নারী। আমরা যখন সেই দ্বীপে গেলাম গ্ল্যাস তখনও সেখানে বাস করতেন ; তবে তার সংসার তখন বেড়ে গিয়ে ষাট-সত্তরে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপ্টেন গাই তার কাছ থেকে পাঁচশ' সীল-চামড়া এবং কিছু হাতির দাঁত কিনলেন।

পাঁচই নভেম্বর আমরা আরও দক্ষিণে ও পশ্চিমে অরোরা দ্বীপপুঞ্জের দিকে যাত্রা করলাম। তিন সপ্তাহ ধরে আমাদের জাহাজ ক্রমাগত এগিয়ে চলল। আবহাওয়া পরিষ্কার ও মনোরম। কুয়াসার চিহ্নমাত্র নেই। এই দীর্ঘ পথে আমরা তখন আর কোন দ্বীপের অস্তিত্ব খুঁজে পাই নি ; অবশ্য আমাদের যাবার আগে সেখানে আর কোন দ্বীপ ছিল কি না তা আমি জানি না। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখছি,

১৮২২ সালে ক্যাপ্টেন জনসন "হেনরি" নামক মার্কিন জাহাজ নিয়ে, এবং ক্যাপ্টেন মেরেল "ওয়াস্প" নামক মার্কিন জাহাজ নিয়ে সেই অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছিলেন—তবে উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল হয়েছিল আমাদেরই মত।

অধ্যায়—১৬

প্ল্যাসের কথামত ৬০° দক্ষিণ এবং দ্রাঘিমা ৪১°২০′ পশ্চিমের সমান্তরালে অবস্থিত কয়েকটা ছোট ছোট দ্বীপ আবিষ্কারের আশায় ক্যাপ্টেন গাই বারোই ডিসেম্বর সেই দিকে জাহাজ চালাতে লাগলেন। আঠারোই তারিখে সেই অঞ্চলে পৌঁছে তিন দিন অবিরাম ঘুরেও সেরকম কোন দ্বীপের হদিস পাওয়া গেল না। একুশ তারিখেও আবহাওয়া অস্বাভাবিক রকমের ভাল হওয়ায় আমরা দক্ষিণ দিকে যতদূর এগিয়ে যাওয়া চলে ততদূরই যাব বলে স্থির করলাম। আমার বিবরণের এই অংশটি শুরু করার আগে এতদিন পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের যে কয়েকটি প্রচেষ্টা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলে বোধ হয় পাঠকের পক্ষে সুবিধা হবে।

এ ধরনের প্রথম অভিযানে অবতীর্ণ হন ক্যাপ্টেন কুক। ক্যাপ্টেন ফানের "অ্যাডভেঞ্চার" জাহাজকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাপ্টেন কুক ১৭৭২ সালে "রেজোলিউশন" নামক জাহাজে দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ডিসেম্বর মাসে তিনি পৌঁছে যান অষ্ট-পঞ্চাশৎ সমান্তরাল দক্ষিণ লঘিমা ও ২৬°৫৭′ পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত। এইখানে তিনি আট-দশ ইঞ্চি পুরু বরফের সম্মুখীন হন। সেখানকার বরফের চাঙড়গুলি এত শক্ত যে জাহাজের পক্ষে এগিয়ে চলা খুবই কঠিন। তখন আকাশে অসংখ্য পাখি দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন কুক অনুমান করলেন, নিশ্চয় কাছেই স্থলভূমি আছে। তিনি দক্ষিণ দিকেই এগিয়ে চললেন। আবহাওয়া অতিমাত্রায় ঠাণ্ডা। তার মধ্যেই পৌঁছে গেলেন দ্রাঘিমা ৩৮°১৪′ পূর্বের চতুঃষষ্টি সমান্তরালে। এখানকার আবহাওয়া ভাল, বাতাস মৃদু, থার্মোমিটার ছত্রিশে। এই ভাবে পাঁচ দিন কাটল। ১৭৭৩-এর জানুয়ারিতে জাহাজ দক্ষিণ মেরু বৃত্তকে অতিক্রম করলেও আর অগ্রসর হতে পারল না। লঘিমা ৬৭°১৫′ তে পৌঁছবার পরে তারা দেখলেন, যতদূর চোখ যায় দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে প্রসারিত এক সীমাহীন বরফ-প্রাচীরে অগ্রগমনের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ। অগত্যা ক্যাপ্টেন কুক অনিচ্ছা সত্ত্বেও উত্তর দিকে ফিরে গেলেন।

পরবর্তী নভেম্বর মাসে তিনি নতুন করে দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারে যাত্রা করলেন। ডিসেম্বরে জাহাজ যখন ৬৭°৩১′ লাঘিমা, ১৪২°৫′৪ পশ্চিম দ্রাঘিমায় পৌঁছল তখন

তীব্র ঠাণ্ডা পড়ল, দেখা দিল ভারী ঝড় ও কুয়াসা। এখানেও প্রচুর পাখি—অ্যালব্যাট্রস, পেঙ্গুইন ও প্রেট্রেলের তো কথাই নেই। লঘিমা ৭০°২৩-এই দেখা দিল বড় বড় বরফের দ্বীপ; দক্ষিণের মেঘ বরফ-সাদা; বোঝা গেল কাছেই বরফের দেশ। লঘিমা ৭১°১০′, দ্রাঘিমা ১০৬°৫৪′ পশ্চিমে দক্ষিণ দিগন্তজোড়া এক জমাট বরফের প্রান্তরে যাত্রাপথ অবরুদ্ধ হল। সে প্রান্তরের উত্তর ভাগ বন্ধুর ও ভাঙা ভাঙা; বড় বড় সব বরফের ধারালো গোঁজ এমনভাবে মাথা তুলে আছে যে তাকে ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। সেই বরফ প্রান্তরের পশ্চাৎপটে দাঁড়িয়ে আছে বরফের পাহাড়—একটার পর একটা। ক্যাপ্টেন কুক অনুমান করলেন দিগন্তবিস্তৃত এই প্রান্তর হয় দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত পৌঁছেছে, নতুবা কোন মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পরবর্তী কালে মেরু অঞ্চল আবিষ্কারের উদ্দেশে সংগঠিত জাতীয় অভিযানের পুরোধা মিঃ জে, এন, রেনন্ডস রেজোলিউশন-এর প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছেন ঃ ক্যাপ্টেন কুক যে ৭১°১০′ অতিক্রম করতে পারেন নি তাতে আমরা বিস্মিত হই নি, কিন্তু তিনি যে ১০৬°৫৪′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যরেখায় পৌঁছতে পারেন নি তাতেই আমরা অবাক হয়েছি। "পামার্সল্যাণ্ড" শেটল্যাণ্ডের দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে আরও দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে; সেখানে আজও পর্যন্ত কোন নাবিক পৌঁছতে পারে নি। সেখানেই বরফের জন্য কুকের অভিযান অবরুদ্ধ হয়েছিল।"

১৮০৩ সালে রাশিয়ার আলেকজাণ্ডার বিশ্ব পরিক্রমায় পাঠিয়েছিলেন ক্রুৎজেনস্টার্ন লিসিওস্কি ক্যাপ্টেনদ্বয়কে। আরও দ্রাঘিমা ৭০°১৫′ পশ্চিমের লঘিমা ৫৯°৫৮′-র বেশী অগ্রসর হতে পারেন নি।

১৮২২ সালে বৃটিশ নৌবাহিনীর ক্যাপ্টেন জেমস ওয়েডেল দুটি ছোট জাহাজ নিয়ে দক্ষিণে আরও ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন; কোন বড় রকমের বাধার সম্মুখীন তাকে হতে হয় নি।

১৮২৩ সালের ১১ই জানুয়ারি ক্যাপ্টেন বেঞ্জামিন মোরেল মার্কিন জাহাজ "ওয়াস্প্"-এ কেরগুলেনস ল্যান্ড থেকে যাত্রা করেন দক্ষিণ মেরু অভিযানে। চোদ্দই মার্চের দিনপঞ্জীতে লেখা হয়েছে ঃ "বিভিন্ন মধ্যরেখায় আমি বারকয়েক দক্ষিণ মেরু-বৃত্তের মধ্যে ঢুকেছি; বাতাস ও জলের তাপমাত্রা প্রায় একই রকম পেয়েছি; বরং যতই এগিয়েছি আবহাওয়া ততই ভাল পেয়েছি। লঘিমা ষাট এবং পঁয়ষট্টি ডিগ্রির মধ্যে অসংখ্য বড় বড় বরফের দ্বীপ থাকায় জাহাজ চালাতে খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। কোন কোন বরফ-দ্বীপের ব্যাস এক থেকে দুই মাইল এবং সমুদ্র-রেখা থেকে পাঁচশ' ফুটেরও বেশী উঁচু।" এই সময় জ্বালানি ও জলের অভাব দেখা দেওয়ায় এবং উপযুক্ত যন্ত্রপাতি সঙ্গে না থাকায় সম্মুখে অবারিত সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন মোরেল ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি নিজেই বলে গেছেন, এই অনিবার্য কারণে ফিরে আসতে না হলে তিনি দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত না যেতে পারলেও অন্তত পঁচাশিতম সমান্তরাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারতেন।

১৮৩১-এ লণ্ডনের তিমি-শিকারী জাহাজ কোম্পানির চাকরি নিয়ে ক্যাপ্টেন ব্রিস্কো বড় জাহাজ “লাইভ্‌লি” ও একমাস্তুল জাহাজ “টুলা” নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে যাত্রা করেন। আঠাশে ফেব্রুয়ারি তারিখে লঘিমা ৬০°৩০′ দক্ষিণ এবং দ্রাঘিমা ৪৭°১৩′ পূর্বে পৌঁছে তিনি ভূভাগ দেখতে পান এবং “পূর্ব-দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এক পর্বতমালার কালো শিখরগুলি স্পষ্ট দেখতে পান।” এই অঞ্চলে তিনি পরবর্তী পুরো মাসটাই কাটিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য উপকূলে নামতে পারেন নি।

১৮৩২-এর গোড়ার দিকে তিনি আরও দক্ষিণে অগ্রসর হন এবং চৌঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে একটা মূল ভূখণ্ডে পদার্পণ করেন। ঐ মাসের একুশ তারিখে তিনি চতুর্থ উইলিয়ামের নামে সে দেশটি দখল করেন এবং রাণীর সম্মানে তার নাম রাখেন এডেলেড দ্বীপ। লণ্ডনের রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এই সব তথ্য জানতে পেরে সিদ্ধান্ত করে যে, সেখান থেকে বহুদূরে অভ্যন্তর পর্যন্ত একটা ভূখণ্ডের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। এ সম্পর্কে মিঃ রেনল্ডস্ বলেছেন “এই বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারছি না; ব্রিস্কোর আবিষ্কারও এ ধরনের অনুমানকে সমর্থন করে না।”

দক্ষিণ মেরু আবিষ্কারের এই ক’টিই প্রধান অভিযান। একটু পরেই বোঝা যাবে, “জেন”-এর সমুদ্রযাত্রার আগে প্রায় তিন শ’ ডিগ্রি দ্রাঘিমা পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু বৃত্তের মধ্যে কেউ প্রবেশ পর্যন্ত করে নি। আমাদের সম্মুখেও প্রসারিত ছিল এক অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। গভীর আগ্রহের সঙ্গে আমি ক্যাপ্টেন গাইকে বলতে শুনেছি, সাহসে ভর করে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যেতে তিনি স্থিরসংকল্প।

অধ্যায়—১৭

গ্লাস-এর দ্বীপপুঞ্জের খোঁজ বন্ধ করে আমরা চার দিন ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে গেলাম। কোথাও বরফ চোখে পড়ল না। ছাব্বিশ তারিখ দুপুরে কয়েকটি বরফের দ্বীপ দেখতে পেলাম; তবে সেগুলি খুব বড় নয়। দক্ষিণ-পূর্ব বা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মৃদু বাতাস বইছে। প্রতিদিনই কম-বেশী বরফ চোখে পড়ছে। সাতাশ তারিখে থার্মোমিটার পঁয়ত্রিশে দাঁড়াল।

জানুয়ারি ১, ১৮২৮। আজ আমরা সম্পূর্ণভাবে বরফে অবরুদ্ধ। অতএব ভবিষ্যৎ নিরানন্দ। দুপুরের আগে বেশ কিছুটা ঝড় বয়ে গেল। সন্ধ্যার দিকে ঝড় আরও বাড়ল। তার ফলে বরফের চাঙড় ভেঙে সামনে অনেকটা জায়গা খোলা হয়ে গেল। জাহাজে পাল তুলে দেওয়া হল।

জানুয়ারি ২। আবহাওয়া মোটামুটি ভাল। দুপুরে দক্ষিণ মেরুবৃত্ত অতিক্রম করলাম। পিছনে অনেক বরফ থাকলেও সামনে অল্পই বরফ চোখে পড়ে। ঘণ্টায় সিকি মাইল গতিতে স্রোত বইছে দক্ষিণ দিকে। বাতাসের তাপমাত্রা প্রায় তেত্রিশ।

জানুয়ারি ৫। সকালে লঘিমা ৭৩ঃ১৫´ পূর্ব, দ্রাঘিমা ৪২°১০´ পশ্চিমে পেঁছে আবার বিস্তীর্ণ কঠিন বরফে বাধা পেলাম। তখনও দক্ষিণে অনেকটা খোলা সমুদ্র ; একসময় সেখানে পেঁছে যেতে পারবই। প্রায় মাইলখানেক চওড়া একটা পথ খুঁজে পেয়ে তার ভিতর দিয়ে এগোতে লাগলাম সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আজ দলে দলে অ্যালব্যাট্রস পাখি উড়ে গেল দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে।

জানুয়ারি ৭। সমুদ্র এখনও খোলা ; অতএব এগিয়ে যেতে কোন অসুবিধা ঘটে নি। পশ্চিম দিকে কয়েকটি বিরাট হিমশৈল দেখতে পেলাম। বিকেলে তারই একটার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় দেখলাম সেটার উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে চার শ' বাঁওয়ের কম হবে না ; একেবারে নীচে তার ব্যাস হবে তিন-পোয়া লীগ ; তার গা বেয়ে নেমে এসেছে বেশ কয়েকটি ঝর্ণাধারা। সেটাকে দু'দিন পর্যন্ত দেখা গেল ; তার পরেই কুয়াসায় ঢেকে গেল।

জানুয়ারি ১০। আজ সকালে আমাদের একটি লোককে হারালাম। লোকটির বাড়ি নিউ ইয়র্কে, নাম পিটার ভ্রেন্ডেনবার্গ, খুবই কাজের লোক। পা পিছলে দুটো বরফ খণ্ডের ফাঁকের মধ্যে পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারল না। দুপুরে লঘিমা ৭৮°৩০´ দ্রাঘিমা ৪০°১৫´ পশ্চিমে প্রবেশ করলাম। বড় বেশী ঠাণ্ডা। উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে ঝড়ো বাতাস বইছে। নানা ধরনের অনেক পাখি উড়ছে।

জানুয়ারি ১২। আজ আবার দক্ষিণের পথ অবরুদ্ধ হয়ে আছে সীমাহীন বরফের প্রাচীরে। খোলা পথের আশায় চোদ্দই পর্যন্ত পশ্চিম দিকটাতে অপেক্ষা করলাম।

জানুয়ারী ১৪। আজ সকালে পশ্চিম দিক ঘুরে আবার খোলা সমুদ্রে পড়লাম। সেখানে একটুকরো বরফও নেই। সকলেরই মনে আশা জাগল, এবার মেরুতে পেঁছতে পারব।

জানুয়ারি ১৭। আজকের দিনটা ঘটনাবহুল। দক্ষিণ থেকে উড়ে এল অসংখ্য প্যাখি। ডেকের উপর থেকে গুলি করে কয়েকটাকে মারা হল। তার মধ্যে পেলিকান জাতীয় একটা পাখি খেতে খুব সুস্বাদু। দুপুরে মাস্তুল থেকে দেখা গেল একটা বড় জানোয়ার এক চাঙড় বরফের উপর ভাসতে ভাসতে আসছে। আবহাওয়া ভাল থাকায় ক্যাপ্টেন গাই দুটো নৌকো পাঠিয়ে দিলেন ওটা কি জন্তু জেনে আসতে। ডার্ক পিটার্স ও আমি মেটের সঙ্গে বড় নৌকোটাতে গেলাম। কাছে গিয়ে বুঝলাম, সেটা মেরু-ভালুক প্রজাতির একটা বৃহদাকার প্রাণী ; কিন্তু আকারে অতিশয় অতিকায়। আমরা সশস্ত্রই ছিলাম ; পরপর কয়েকটা গুলি ছুঁড়লাম ; প্রায় সব ক'টা গুলিই মাথায় ও পেটে লাগল। রাক্ষুসে প্রাণীটা কিন্তু তাতে মোটেই ঘাবড়ে গেল না ; বরফের উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে আমাদের নৌকোর দিকে হাঁ করে এগিয়ে এল। সেই সমূহ বিপদে পিটার্সই আমাদের রক্ষা করল। প্রকাণ্ড জন্তুটার পিঠের উপর ল্যাফিয়ে পড়ে ধারাল ছুরিটা আমূলে বসিয়ে দিল তার গলার মধ্যে। জন্তুটা কাত হয়ে সমুদ্রে পড়েই মরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিটার্সও জলে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তার দিকে একটা দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হল ; সেই দড়ি দিয়ে মরা জন্তুটাকে বেঁধে পিটার্স

সাঁতার কেটে নৌকোতে উঠে এল। শিকার নিয়ে আমরা বিজয়ীর মত জাহাজে ফিরে এলাম। জন্তুটার নরম মাংস সকলে পেট ভরে খেলাম।

খাওয়া-দাওয়া সবে শেষ হয়েছে এমন সময় মাস্তুলের উপর থেকে একজন আনন্দে চীৎকার করে বলল, "গলুইয়ের ডান দিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে।" সকলেই ব্যস্ত হয়ে যার যার কাজে লেগে গেল। অচিরেই আমরা উপকূলের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। একটা ছোট পাহাড়ি দ্বীপ; একরকম কাঁটা ঝোপ ছাড়া প্রায় গাছপালাহীন। পশ্চিম দিকে একটা ছোট উপসাগর থাকায় নৌকো ভেড়াতে বেশ সুবিধাই হল। দ্বীপটাকে মোটামুটি ঘুরে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না।

এবার আমরা আরও দক্ষিণে এগিয়ে গেলাম আরও আট ডিগ্রি; আমাদের আগে কোন নাবিক এতদূর পর্যন্ত আসতে পারে নি। সমুদ্র এখনও সম্পূর্ণ শান্ত। আশ্চর্যের কথা, আমরা যত এগিয়ে চলেছি বাতাস ও জলের তাপমাত্রা ততই মৃদুতর হচ্ছে। আকাশ বেশ পরিষ্কার; মাঝে মাঝে দক্ষিণ দিগন্তে একটা ক্ষীণ কুয়াসা চোখে পড়ছে—অবশ্য সেটা খুবই ক্ষণস্থায়ী। কেবলমাত্র দুটো অসুবিধা দেখা দিল; আমাদের জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে, আর কয়েকজন নাবিকের মধ্যে স্কার্ভিরোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ক্যাপ্টেন গাই বারবারই আমাদের ফিরে যাবার কথা বলছেন। আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস যে অচিরেই আমরা ভাল জমি দেখতে পাব; তাই আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম যে অন্তত আরও কয়েকটা দিন যাত্রাকে অব্যাহত রাখা হোক। ক্যাপ্টেন শেষ পর্যন্ত আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন। সুতরাং একদিকে আমার পরামর্শের ফলে অচিরেই যে দুর্ভাগ্যজনক রক্তাক্ত ঘটনাগুলি ঘটল তার জন্য যেমন আমার অনুশোচনার শেষ নেই, অন্য দিকে তেমনি এ কথা ভেবেও আমার আত্মতুষ্টির অবধি নেই যে বিজ্ঞানের চোখের সামনে একটি প্রগাঢ় উত্তেজনাপূর্ণ গোপন তথ্যকে তুলে ধরার কাজে আমারও একটা পরোক্ষ ভূমিকা ছিল।

অধ্যায়—১৮

জানুয়ারি ১৮। আজ সকালে আগেকার মতই মনোরম আবহাওয়ায় আমরা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছি। সমুদ্র পুরোপুরি শান্ত, বাতাস ঈষৎ উষ্ণ, জলের তাপ তিপ্পান্ন। একশ' পঞ্চাশ বাঁও নীচে জলের স্রোত ঘণ্টায় এক মাইল গতিতে মেরুর দিকেই বইছে। বাতাস ও স্রোত দুইয়েরই এই দক্ষিণমুখী গতি নিয়ে জাহাজের কোণে-কোণে কিছু আলোচনার, এমন কি ভয়েরও সূত্রপাত হল; আর তা নিয়ে ক্যাপ্টেন গাইয়ের মনে কিছুটা অস্বস্তির ভাব দেখতে পেলাম। সারা দিন কয়েকটা বড় তিমি দেখতে পেলাম; অসংখ্য অ্যালব্যাট্রস পাখি জাহাজের উপর দিয়ে উড়ে গেল। হথর্নের

মত একরকম লাল ফুলের একটা ঝোঁপ এবং অদ্ভুত-দর্শন স্থল-জন্তুর একটা মৃতদেহও আমরা তুলে নিলাম। মৃতদেহটা তিন ফুট লম্বা, ছয় ইঞ্চি উঁচু, চারটে ছোট ছোট পায়ে প্রবাল-রংএর চকচকে লম্বা নখর; দেহটা একেবারে সাদা রেশমি লোমে ঢাকা; ফুট দেড়েক লম্বা লেজটা ইঁদুরের মত; মাথাটা বিড়ালের মত, কান দুটো কুকুরের মত ঝোলানো; দাঁতগুলো নখরের মত উজ্জ্বল লাল।

জানুয়ারি ১৯। আজ লঘিমা ৮৩°৫´ ও দ্রাঘিমা ৪৩°৫´ পশ্চিমে পৌঁছে (সমুদ্রের রং অস্বাভাবিক কালো) মাস্তুলের উপর থেকে আবার মাটি দেখতে পেলাম—একটা দ্বীপ-সমষ্টি। তীরটা খাড়া উঠে গেছে, আর ভিতরে অনেক গাছপালা আছে বুঝতে পেরে আমাদের খুব আনন্দ হল; চার ঘন্টার মধ্যেই দশ বাঁও জলে নোঙর ফেলা হল। দুটো বড় নৌকো নিয়ে একটা সশস্ত্র দলকে পাঠানো হল (সেই দলে পিটার্স ও আমিও ছিলাম) পাহাড়ি তীরভাগকে ভালভাবে দেখার জন্য। কিছুক্ষণ খোঁজার পরেই ভিতরে ঢোকার মত একটা খাঁড়ি দেখতে পেয়ে ভিতরে ঢুকতে যাব এমন সময় দেখতে পেলাম চারটে বড় শালতি উপকূল থেকে যাত্রার উদ্যোগ করছে; শালতিগুলো সশস্ত্র লোকজনে ভর্তি। আমরা তাদের এগিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম; কিন্তু তারা অত্যন্ত দ্রুত-গতিতে কাছাকাছি এসে পড়ল। ক্যাপ্টেন গাই তখন একটা দাঁড়ের মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে উড়িয়ে দিল। তা দেখে অপরিচিত লোকগুলি হঠাৎ থেমে গিয়ে সকলে মিলে হৈ-হল্লা শুরু করে দিল; তার মধ্যে দুটো কথা আমরা বার বার শুনতে পেলাম—"আনামু—মু" আর "লামা—লামা!" এইভাবে তারা অন্তত আধঘন্টা ধরে চেঁচাতে লাগল, আর সেই অবসরে আমরা তাদের চেহারাগুলো ভাল করে দেখে নিলাম।

পঞ্চাশ ফুট লম্বা ও পাঁচ ফুট চওড়া শালতিগুলোতে মোট একশ' দশটি অসভ্য মানুষ ছিল। মোটামুটিভাবে ইওরোপীয়দের মতই লম্বা, তবে আরও বেশী পেশীবহুল ও মাংসল গঠন। গায়ের রং আবলুস কালো, মাথায় ঘন, লম্বা চুল। সারা দেহে লোমশ দিকটা ভিতরে রেখে জড়ানো কোন অজানা কালো জন্তুর চামড়া; কেবল গলা, কব্জি ও গোড়ালির কাছে উল্টো করে ভাঁজ করা। অস্ত্র বলতে প্রধানত কালো ভারী কাঠের গদা, আর কিছু বর্শা। শালতির খোলের মধ্যে ডিমের মত বড় আকারের কালো পাথর স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে।

চীৎকার-চেঁচামেচি শেষ করে তাদের সর্দার শালতির গলুইতে দাঁড়িয়ে আমাদের নৌকোকে তার শালতির পাশে ভিড়িয়ে দেবার ইশারা করল। তাদের কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা তার ইশারা না বোঝার ভান করলাম। তখন সর্দার তিনটে শালতি সেখানে রেখে নিজের শালতি নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল। একেবারে কাছে এসেই সে লাফিয়ে আমাদের বড় নৌকোটাতে উঠে ক্যাপ্টেন গাইয়ের পাশে বসে জাহাজটাকে দেখিয়ে বার বার বলতে লাগল আনামা—মু! আর লামা—লামা! এবার আমরা জাহাজে ফিরে গেলাম; শালতি চারটেও কিছুটা দূরত্বে থেকে আমাদের পিছু নিল।

জাহাজের কাছে পৌঁছবার পরে সর্দারের চোখে-মুখে বিস্ময় ও খুশির ঝিলিক খেলে গেল; দুই হাতে তালি বাজিয়ে, উরু ও বুক চাপড়ে সে দম-ফাটা হাসি হাসতে

লাগল। দলের অন্য সকলেও তার সঙ্গে ফূর্তিতে যোগ দিল। ফলে কয়েক মিনিটেই আমাদের কানে তালা ধরার উপক্রম হল। একে একে সকলে চুপ করলে ক্যাপ্টেন গাই আমাদের নৌকোটা দেখিয়ে সর্দারকে (শীঘ্রই জানতে পারলাম যে তার নাম টু-উইট) বোঝাবার চেষ্টা করল যে একসঙ্গে তার দলের বিশ জনের বেশী লোক জাহাজে তোলা যাবে না। যে করেই হোক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সে সেইমতই ব্যবস্থা করল। একটা শালতি এগিয়ে এল ; বাকি ক'টা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে থাকল। বিশটি অসভ্য মানুষ জাহাজে উঠে সর্বত্র ঘুরে-ফিরে, এটা-ওটা ধরে টানাটানি করে গভীর কৌতূহলের সঙ্গে সব কিছুকে জানতে-বুঝতে চেষ্টা করতে লাগল।

পরিষ্কার বোঝা গেল, আগে কখনও তারা সাদা মানুষ দেখে নি। তাদের বিশ্বাস, "জেন" একটা জীবন্ত প্রাণী ; তাই তারা হাতের বর্শা তার গায়ে কোথাও ঠেকাল না। একবার তো টু-উইটের কাণ্ড দেখে আমাদের লোকরা খুবই মজা উপভোগ করল। এক জায়গায় আমাদের রাঁধুনি কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছিল। হঠাৎ কুড়ুলের একটা কোপ ডেকের উপর পরে বেশ কিছুটা তক্তা ফাঁক হয়ে গেল। তা দেখে সর্দার এক লাফে ছুটে গিয়ে রাঁধুনিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে সেই কাটা জায়গাটার উপর সযত্নে হাত বুলোতে লাগল, আর একটা বালতি থেকে সাগরের জল ঢেলে জায়গাটাকে ভাল করে ধুয়ে দিল।

ডেকের উপরটা দেখা হয়ে গেলে তাদের নীচে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে যা দেখে তাতেই তাদের চোখ বিস্ময়ে চকচক করে ওঠে। বিশেষ করে বন্দুক-কামান দেখে তো তারা একেবারে হতবাক। হাত দিতেও যেন ভয়। কেবিনে দুটো বড় আয়না আছে। তা দেখে তাদের বিস্ময় বুঝি চরমে উঠল। প্রথমে টু-উইটই সেদিকে এগিয়ে গেল। সে দাঁড়াল কেবিনের মাঝখানে—একটা আয়নার দিকে তার মুখ, অপরটার দিকে পিঠ। চোখ তুলে নিজেকে আয়নার মধ্যে দেখতে পেয়েই মনে হল সে বুঝি পাগল হয়ে গেল। পালাতে গিয়ে মুখ ফেরাতেই দ্বিতীয়বার নিজেকে দেখতে পেয়েই আমার ভয় হল সে বুঝি তখনই মারা যাবে। অনেক বুঝিয়েও তাকে আর একবার আয়নার দিকে মুখ ফেরাতে রাজী করানো গেল না। মেঝের উপর উপুড় হয়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে সে চুপচাপ পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত আমরা বাধ্য হয়ে তাকে টানতে টানতে ডেকের উপরে নিয়ে গেলাম।

এই ভাবে একবারে বিশজন করে সব অসভ্য লোকগুলিকেই জাহাজে চড়ানো হল। টু-উইট অবশ্য সব দলের সঙ্গেই ছিল। সকলেই সারাক্ষণ বন্ধুর মত ভাল ব্যবহার করল। অবশ্য কয়েকটা জিনিসের বেলায় তাদের অদ্ভুত আচরণের কোন অর্থই আমরা বুঝতে পারলাম না। যেমন—জাহাজের পাল, ডিম, খোলা বই, অথবা এক বাটি ময়দা—এ সব জিনিসের কাছে তাদের কোন মতেই নিয়ে যাওয়া গেল না। এই দ্বীপে আমরা গ্যালিপাগোস প্রজাতির বড় বড় কচ্ছপ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পেলাম। টু-উইটের শালতিতেও একটা দেখলাম।

এই সব নানা ব্যাপার দেখে ক্যাপ্টেন গাই ভাবলেন, এই অঞ্চলটাকে ভাল করে ঘুরে দেখবেন যাতে তার এই আবিষ্কারের সঙ্গে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে

www.[illegible].blogspot.com

পারেন। আর আমি তো এ ব্যাপারে একপায়ে খাড়া। এককথায় রাজী হয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেন জল ও জ্বালানির কথা তুললে তাকে বোঝালাম ফেরবার পথে এই দ্বীপ থেকেই ও সব জিনিস প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে নেওয়া যাবে। সেই ব্যবস্থাই পাকা হল। টু-উইটের নির্দেশমত "জেন"-কে মাইলখানেক ঘুরিয়ে নিয়ে দ্বীপের দক্ষিণ-পূব কোণে আগাগোড়া বালুমাটির সৈকতসহ একটা চমৎকার উপসাগর পাওয়া গেল। সেখানে দশ বাঁও জলের নীচেই ভাল কালো বালির তলভূমিও মিলল। উপকূলের মাথায় তিনটে ভাল জলের ঝর্ণা এবং কাছেই প্রচুর কাঠও ছিল। তাই সেখানেই জাহাজ নোঙর করা হল। টু-উইট নিজে আমাদের জাহাজেই ছিল। দ্বিপের ভিতরে তার গ্রামে যাবার আমন্ত্রণ জানাল। ক্যাপ্টেন গাই সম্মত হলেন। দশজন অসভ্যকে জামিন-স্বরূপ আমাদের জাহাজে রেখে আমরা বারোজনের একটা দল সর্দারের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। মনে কোনরকম সন্দেহ না থাকলেও ভালরকম অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিলাম। প্রধান মেটকে হুকুম দেওয়া হল আমাদের অনুপস্থিতিতে যেন কাউকে জাহাজে উঠতে দেওয়া না হয়, এবং আমরা যদি বারো ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে যেন আমাদের খোঁজে ঘূর্ণ্যমান কামানসহ এক-মাস্তুল জাহাজটা উপকূল বরাবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ভিতরে যত ঢুকছি ততই আমাদের মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠছে যে আমরা এমন একটা দেশে এসেছি যা সভ্য মানুষের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আগে যা দেখেছি বা জেনেছি সেরকম কিছুই এখানে দেখতে পাচ্ছি না। গাছগুলো সম্পূর্ণ অন্য রকম; পাহাড়ের রং, গঠন ও স্বরভেদও একেবারে নতুন; নদী-নালাগুলোরও অন্যসব জায়গার নদী-নালার সঙ্গে কোনরকম মিল নেই। পথে একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা দেখতে পেয়ে টু-উইট ও তার অনুচররা জল খেতে থামল। জলের চেহারা দেখেই আমাদের মনে হল জলটা দূষিত; আমরা সে জল খেতে অস্বীকার করলাম; অবশ্য শেষ পর্যন্ত বুঝলাম যে এখানকার সব জলই এই রকম দেখতে। জলটা বর্ণহীন নয়, কোন একরকম রংয়েরও নয়—যখন বয়ে চলে তখন দেখলে মনে হয় পরিবর্তনশীল বর্ণের রেশমের মত এই জলেরও আছে লালের নানা মাত্রা। তা দেখে আমরা ঠিক ততখানি বিস্মিত হলাম যতখানি বিস্মিত হয়েছিল টু-উইট আমাদের আয়না দেখে। তখন একটা পাত্রে খানিকটা জল রেখে তাকে ভালভাবে থিতিয়ে যেতে দিলাম। তখন দেখলাম, সমস্ত তরল পদার্থটা অনেকগুলি স্বতন্ত্র রসনালী সমন্বয়ে গঠিত; প্রত্যেকটি রসনালীর আলাদা আলাদা রং; কেউ কারও সঙ্গে মিশে যায় না, কিন্তু নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহত। শেষ পর্যন্ত আপাত অলৌকিক ঘটনার যে বিরাট শৃংখল আমাকে ঘিরে ধরেছিল তারই প্রথম স্পষ্ট অংশ এই জলের ঘটনা।

অধ্যায়—১৯

অসমান গ্রাম্য পথ ধরে নয় মাইলের বেশী দূরের সেই গ্রামে পৌঁছতে আমাদের প্রায় তিন ঘণ্টা লাগল। আমরা যত এগিয়ে চলেছি ততই ছ' সাত জনের নতুন নতুন দল

বিভিন্ন রাস্তা ধরে এসে টু-উইটের মূল বাহিনীর একশ' দশজন অসভ্যের দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। তাদের এই সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যবস্থাটা এতই সুশৃংখল যে দেখলেই মনে হয় সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্বপরিকল্পিত; আর তাই আমার মনে একটা সন্দেহ জাগল। ক্যাপ্টেন গাইকে সে কথাটা বললাম কিন্তু তখন আর ফিরে যাওয়া চলে না; তাই আমরা স্থির করলাম, এই পরিস্থিতিতে টু-উইটের বিশ্বস্ততার উপর পুরোপুরি নির্ভর করাটাই সবচাইতে নিরাপদ। এইভাবে একটা খাড়া পাহাড়ি খাত বেয়ে চলতে চলতে দ্বীপের একমাত্র বসতিতে পৌঁছে গেলাম। সেই বসতিগুলি দেখেই সর্দার চীৎকার করে কি যেন বলতে লাগল; তার মধ্যে একটি শব্দ "ক্লক-ক্লক" বার বারই শুনতে পেলাম; হয় তো ওটা গ্রামটির নামে, অথবা গ্রামেরই প্রতিশব্দ।

বসতিগুলির চেহারা অতিশয় শোচনীয়। অত্যন্ত নীচু স্তরের অসভ্য জাতির মানুষরাও অত খারাপ ঘর-বাড়িতে বাস করে বলে কখনও শুনি নি। তার কতকগুলির মালিক গ্রামের ওয়ামপু বা ইয়াম্পুরা, অর্থাৎ প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা। বাড়িগুলি তৈরী করা হয়েছে একটা গাছকে শেঁকড় থেকে চার ফুট উপরে কেটে ফেলে তার উপর একটা বড় মাপের কালো চামড়া ছড়িয়ে দিয়ে। সেটাই তাদের ঘর-বাড়ি। আবার কতকগুলি তৈরী করা হয়েছে একটা মাটির স্তূপের উপর পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ করে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু করে গাছের ডালপালা সাজিয়ে তার উপর শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিয়ে। আবার কতকগুলি তৈরী হয়েছে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার উপর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে; সেগুলিকে সরিয়ে দিয়ে বাসিন্দারা ঘরের মধ্যে ঢুকে আবার যথাযথভাবে বসিয়ে দেয়। এ ছাড়া আরও অনেক রকম উদ্ভট ধরনের বসতিও আছে।

এই গ্রামের —যদি এটাকে গ্রাম বলা যায়—পথে পথে কয়েক রকম বিচিত্র জীবজন্তু দেখতে পেলাম। হাবভাবে মনে হল সেগুলি পোষা প্রাণী। নানারকম মুরগিও দেখতে পেলাম। কিছু পোষা অ্যালব্যাট্রস পাখি দেখে আমরা বেশ অবাক হলাম। তারা খাবারের খোঁজে সমুদ্রে চলে যায়, আবার যথাসময়ে গ্রামে ফিরে আসে। মাছও দেখলাম অনেক রকমের। পথের পাশে অনেক শুঁটকি মাছ স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে। গ্যালিপাগো কচ্ছপও অনেক দেখতে পেলাম।

টু-উইটের সঙ্গে গ্রামের কাছাকাছি পৌঁছতেই অনেক মানুষ ভিড় করে ছুটে এল আমাদের দেখতে। তাদের মুখে সেই একই ধ্বনিঃ "আনাসু-মু! লামা-লামা!" আরও অবাক হলাম, দু'একজন বাদে বাকি সব নবাগতরাই সম্পূর্ণ উলঙ্গ। কেবল শালতিতে যারা ছিল তাদেরই পরনে আছে চামড়া। গ্রামবাসীদের হাতে অস্ত্রশস্ত্রও কিছু নেই। টু-উইটের বসতিটা গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত। ঘরগুলির গঠন-শৈলী সেই একই রকম; তবে এ ক্ষেত্রে গাছটাকে কাটা হয়েছে বারো-তেরো ফুট উঁচুতে, আর তার ঠিক নীচেই কিছু ডালপালাকে অক্ষত রাখা হয়েছে যাতে চামড়ার ছাউনিটাকে বেশ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং উপরকার চামড়াগুলোকেও সেলাই করে কাঠের খোঁটা দিয়ে মাটিতে আটকে দেওয়া হয়েছে, অনেকটা ঠিক তাঁবু খাটানোর মত করে। মেঝেতে শুকনো পাতা ছড়িয়ে দিয়ে গালচে বানানো হয়েছে।

গুরুগম্ভীরভাবে অভ্যর্থনা করে আমাদের সেই ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল।

গ্রামবাসীরাও যে যেমন পারল ঘরের ভিতর ঢুকে ভিড় করল। টু-উইট নিজে পাতার আসনে বসে আমাদেরও ইসারায় বসতে বলল। আমাদের অস্বস্তির মাত্রা এবার চরমে উঠল। মেঝেতে বসেছি আমরা মাত্র বারোজন, আর অসভ্যরা সংখ্যায় অন্তত চল্লিশ জন। এ অবস্থায় হঠাৎ কোন গোলযোগ দেখা দিলে আমরা তো বন্দুকও ব্যবহার করতে পারব না, এমন কি উঠে দাঁড়াবার মত জায়গাও পাব না। ঘরের বাইরে তো জনতার ভিড় অনেক বেশী। টু-উইট বার বার চীৎকার করে হঠিয়ে না দিলে তাদের পায়ের নীচে চাপা পড়েই আমরা মারা যেতাম। বেশ বুঝতে পারলাম আমাদের মাঝখানে টু-উইটের উপস্থিতিই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। তাই আমরা যথাসম্ভব তার খুবই কাছাকাছি থাকলাম।

যাইহোক, অসভ্যদের রীতি অনুযায়ী অতিথি-সৎকারের নানারকম ব্যবস্থাদির পরে আমরা গ্রাম ছেড়ে সমুদ্র তীরে পেঁছিলাম। সারা পথে তাদের কারও কাছ থেকেই শত্রুতা দূরে থাক কোনরকম বিরূপ ব্যবহারও পেলাম না। বরং টু-উইটের নির্দেশে তারা অনেক বুনো হাঁস ও গ্যালিপাগো কচ্ছপ আমাদের নৌকোতে তুলে দিল।

অধ্যায়—২০

সর্দারের নির্দেশে দ্বীপের বাসিন্দারা অনেক রকম খাবার-দাবার এনে আমাদের জাহাজ ভর্তি করে দিল। ভাল ভাল কচ্ছপ আর এমন সব বন-মুর্গি যা যেমন নরম ও রসালো, তেমনি সুস্বাদু। নানারকম আকার-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেবার পরে এনে দিল প্রচুর পরিমাণ সেলেরি ঘাস ও স্কার্ভি ঘাস, এবং শালুতি-বোঝাই শুট্‌কি ও তাজা মাছ। সে সব খেয়ে সকলেরই শরীর-স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল; রোগীর তালিকায় একজনেরও নাম রইল না।

এইভাবে একটা মাস কেটে গেল। এবার আমাদের যাত্রার পালা। সকলে মিলে স্থির করলাম, যাত্রার আগে গ্রামে গিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসব। টু-উইটও এ ব্যাপারে এত বেশী পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে তার মনে ব্যথা দেওয়াটা কারোরই সঙ্গত মনে হল না। তাছাড়া, এই একটা মাস তারা সকলেই আমাদের সঙ্গে এত ভাল ব্যবহার করেছে, নানাভাবে আমাদের এত সাহায্য করেছে যে আমাদের মনে গোড়ায় যেটুকু সন্দেহ জেগেছিল তা সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে। অথচ অচিরেই যথেষ্ট প্রমাণ পেলাম যে এই অযাচিত সদয় ব্যবহার আমাদের ধ্বংস করার একটা সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রেরই ফলমাত্র; আর যে দ্বীপবাসীদের জন্য আমাদের মনে জেগেছিল এত অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তারা আসলে পৃথিবীর একটি অতি-অসভ্য, নীচবুদ্ধি ও রক্তপিপাসু হতভাগ্য জীবমাত্র।

পয়লা ফেব্রুয়ারি আমরা তীরে নামলাম গ্রাম-পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। আগেই বলেছি, গ্রামবাসীদের প্রতি আমাদের মনে তখন তিলমাত্র সন্দেহও ছিল না; তবু যথাযথ

সতর্কতা অবলম্বন করতে ভুলে যাই নি। ছয়জন নাবিককে জাহাজেই রেখে গেলাম ; তাদের নির্দেশ দেওয়া হল, আমাদের অনুপস্থিতিতে কোন অজুহাতেই যেন কোন অসভ্য অধিবাসীকে জাহাজের কাছে ঘেঁসতে দেওয়া না হয়, আর তারা যেন সর্বদাই ডেকের উপরে থাকে। জাহাজটা নোঙর করে রইল তীর থেকে প্রায় একমাইল দূরে, যাতে কোন শালতি তাদের অগোচরে জাহাজের কাছে ভিড়তে না পারে।

বাদবাকি আমরা মোট বত্রিশজন তীরে নামলাম। সঙ্গে নিলাম গাদা বন্দুক, পিস্তল, বাঁকা তলোয়ার ও নাবিকদের ছুরি। সমুদ্রতীরে একশ' কালো যোদ্ধা আমাদের এগিয়ে নিতে এল। অবাক হয়ে দেখলাম, এবার তারা সকলেই সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। এ ব্যাপারে টু-উইটকে প্রশ্ন করা হলে সে জবাব দিল —"মাটি নন্ উই পা পা সি"—অর্থাৎ যেখানে সকলেই ভাই-ভাই সেখানে অস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। তার কথাগুলিকে ভাল মনে গ্রহণ করে আমরা এগিয়ে চললাম। কয়েকটা ঝর্ণা ও নদী-খাত পার হয়ে একটা সংকীর্ণ গিরি-খাতে পড়লাম। গিরি-খাতটা লম্বায় দেড়-দুই মাইল হবে ; অষ্টাবক্র গলির মত অবিরাম এঁকেবেঁকে চলেছে তো চলেছেই। সাধারণভাবে খাতটি প্রায় চল্লিশ ফুট চওড়া, কিন্তু জায়গায় জায়গায় এতই সরু যে পাঁচ-ছয়জনের বেশী পাশাপাশি চলাই যায় না। আজ যখন আমাদের সেদিনের মহামূর্খামির কথা ভাবি তখন সব চাইতে বেশী অবাক হয়ে যাই যে, সেই সংকীর্ণ গিরি-খাতের মধ্যে আমাদের সম্মুখে ও পিছনে এতগুলি অজ্ঞাত অসভ্য মানুষকে নির্বিবাদে চলতে দিয়ে নিজেদের ভাগ্যকে সম্পূর্ণ তাদের কব্জায় তুলে দিয়েছিলাম কিসের ভরসায়! অথচ সেই পথেই আমরা সেদিন অন্ধের মত পা ফেলেছিলাম নির্বোধের মত আমাদের দলের শক্তির উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসের জোরে, টু-উইট ও তার দলের লোকদের অস্ত্রহীন থাকার ভরসায়, আমাদের আগ্নেয়-অস্ত্রের নিশ্চিত সাফল্যের বিশ্বাসে, এবং সর্বোপরি এখানকার কুখ্যাত মানুষগুলির দীর্ঘ দিনের নকল বন্ধুত্বের অভিনয়ে ভুলে। তাদেরই পাঁচ-ছয় জন চলেছে আগে আগে পথের বড় বড় পাথর ও জঞ্জাল সরাতে সরাতে। তারপর আমাদের দল। আমরা পাশাপাশি হাঁটছি যাতে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না যাই। আমাদের পিছনে চলেছে বাকি অসভ্যরা। অসাধারণ শৃংখলাবোধ ও সৌজন্যের সঙ্গে।

ডার্ক পিটার্স, উইলসন এলেন, আর আমি নিজে চলেছি আমাদের দলের ডান দিক ধরে, আর ভাল করে লক্ষ্য করছি পাশের খাড়া পাহাড়ের স্তরগুলি। নরম পাথরের মধ্যে একটা ফাটল আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা মানুষ কোনরকমে সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকতে পারে ; ফাটলটা পাহাড়ের পিছন দিকে আঠারো-বিশ ফুট সোজা চলে বাঁ দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দেখে মনে হল, গিরি-খাতের দুই পাশের উচ্চতা ষাট-সত্তর ফুট হবে। খাঁড়ির গায়ে দু'চারটে ঝোঁপ-ঝাড় জন্মেছিল ; তাতে এক ধরনের ফল দেখতে পেয়ে একটানে পাঁচ-ছটা গাছ উপড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে এলাম। মুখ ঘুরিয়েই দেখি, পিটার্স ও এলেনও আমার পিছনে এসেছে। ফাটলের মধ্যে দুজন হাঁটার জায়গা হবে না জানিয়ে দিয়ে হাতে কয়েকটা ফল গুঁজে দিয়ে তাদের দুজনকে ফিরে যেতে বললাম। সে কথা শুনে তারাও ফিরে গেল। এলেন সবে ফাটলের মুখের কাছে পৌঁছেছে এমন সময় একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ আমার কানে এল। এ রকম শব্দ

আমি আগে কখনও শুনি নি। মনে হল, নিরেট পৃথিবীর ভিত্তিটাকে কে যেন সহসা ছিঁড়ে ফালা-ফালা করে দিয়েছে—পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ের ক্ষণটি বুঝি সমাসন্ন।

অধ্যায়—২১

বিক্ষিপ্ত অনুভূতিগুলি যখন পুনরায় একত্র সঞ্চিত হল তখন বুঝতে পারলাম আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে আসার মত অবস্থা ; একরাশ ধুলো-মাটির মাঝখানে অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি ; তখনও প্রবল বেগে মাথার উপর ঝরে পড়ছে আলগা মাটি ; আমাকে বুঝিবা জীবন্তেই কবর দেবে। আতংকে শিউরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম ; শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়ালাম। কয়েক মিনিট নিশ্চল দাঁড়িয়ে ভাবতে চেষ্টা করলাম আমার কি হয়েছিল, আমি কোথায় আছি। এই সময় একটা গভীর আর্তনাদ কানে এল ; পরে শুনতে পেলাম, ঈশ্বরের নামে পিটার্স চাপা গলায় আমাকে ডাকছে সাহায্যের আশায়। হামাগুড়ি দিয়ে দু'এক হাত এগোতেই সঙ্গীর মাথা ও গর্দানের উপর সটান পড়ে গেলাম ; অচিরেই বুঝলাম, কোমর পর্যন্ত আলগা মাটিতে প্রোথিত হয়ে নিজেকে ছাড়াবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দুই হাতে সাধ্যমত চারদিকের মাটি সরিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে উদ্ধার করলাম।

ভয় ও বিস্ময়ের প্রাথমিক চাপ কেটে যাবার পরে দুজনই সহজভাবে কথাবার্তা বলে এই সিদ্ধান্ত করলাম যে, কোন প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে যে ফাটলের মধ্যে আমরা ঢুকেছিলাম সেটা উপর থেকে ভেঙে পড়েছে, আর তার ফলে আমাদেরও দফা রফা হয়েছে, এখানেই জীবন্তে সমাধিস্থ হতে হবে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তীব্র যন্ত্রণা ও হতাশায় আমরা একেবারে ভেঙে পড়লাম। বেঁচে থাকার ক্ষীণতম আশার আলোও দেখতে পেলাম না। শেষ পর্যন্ত পিটার্স প্রস্তাব করল, যেমন করেই হোক এই অন্ধকার নরক থেকে বের হবার চেষ্টা করতেই হবে। তার কথায় উজ্জীবিত হয়ে আলগা মাটি সরিয়ে এক পা অগ্রসর হতেই একঝলক আলো এসে চোখে লাগল। মনে আশা জাগল, আর যাই হোক, বাতাসের অভাবে দমবন্ধ হয়ে আমরা এখনই মরছি না। দুজন দুজনকে নতুন করে বাঁচার আশ্বাস দিলাম। জঞ্জালের ভিতর দিয়ে আর একটু এগোতেই চারদিকের সব কিছু দেখতে পেলাম ; বুঝতে পারলাম যে আমরা ফাটলের সোজা অংশের শেষ প্রান্তে পেঁাছে গেছি ; তারপরেই ফাটলটা বাঁদিকে বাঁক নিয়েছে। বার কয়েকের চেষ্টায় বাঁকের মুখে পেঁাছেই মন আনন্দে নেচে উঠল ; একটা লম্বা ফাটল উপরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত উঠে গেছে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে। ফাটলের শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু উপর থেকে যথেষ্ট আলো এসে পড়ায় পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে এই ফাটলের মাথায় পেঁাছতে পারলে অবশ্যই খোলা হাওয়ায় শ্বাস টানতে পারব।

এতক্ষণে মনে পড়ল, আমরা তিনজন এই ফাটলে ঢুকেছিলাম ; আর আমাদের সঙ্গী এলেন এখনও নিখোঁজ ; তখনই দুজন স্থির করলাম, পিছনে ফিরে গিয়ে তার খোঁজ

করতেই হবে। অনেকক্ষণ খোঁজ করলাম ; যে কোন মুহূর্তে মাথার উপরকার মাটি ভেঙে পড়তে পারে ; শেষ পর্যন্ত পিটার্স চেঁচিয়ে জানাল, সে সঙ্গীটির একটি পা টেনে ধরেছে, কিন্তু তার বাকি শরীরটাই ধুলো-বালি মাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে ; তাকে টেনে তোলা অসম্ভব। অচিরেই বুঝতে পারলাম, পিটার্সের কথাগুলি কত সত্য ; অনেকক্ষণ আগেই তার জীবনের আলো নিভে গেছে। দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সঙ্গীর দেহটাকে ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিয়ে আমরা আবার বাঁকের দিকে এগোতে লাগলাম।

অনেক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে দুলতে, অনেক কষ্ট সহ্য করে শেষ পর্যন্ত দুজনই পৌঁছে গেলাম ফাটলের শেষ প্রান্তে একটা স্বাভাবিক সমতল স্থানে ; সেখান থেকেই চোখ মেলে দেখলাম একখণ্ড নীল আকাশ। একটু দম নিয়ে বিশ্রাম করে পিছন ফিরে তাকালাম সেই ফাটলটার দিকে যেটা বেয়ে আমরা উপরে উঠে এসেছি। বুঝলাম যে ফাটলটা সদ্য সদ্য সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকেই বুঝতে পারলাম, যে সংঘর্ষের শব্দ শুনে আমরা একেবারে হতচকিত হয়ে পড়েছিলাম সেই সংঘর্ষই আমাদের উদ্ধারের পথটাও তৈরী করে দিয়েছিল। দুজনেরই দেহ-মন ক্লান্ত, অবসন্ন। আর উঠে দাঁড়াতে পারছি না, কথাও বলতে পারছি না। পিটার্স প্রস্তাব করল, কোমরের পিস্তল ছুঁড়ে শব্দ করে বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়া হোক আমাদের খবর, তাহলেই তারা এগিয়ে আসবে আমাদের উদ্ধার করতে। পরবর্তী ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছিল যে আমরা যদি তখন পিস্তলের আওয়াজ করতাম তাহলে সেজন্য পরে আমাদের অনুতাপ করতে হত। ভাগ্য ভাল যে এই সময়ের মধ্যেই একটা হীন চক্রান্তের আবছা আভাষ আমার মনে জেগেছিল ; তাই আমাদের গতিবিধির কোন সন্ধানই এখন অসভ্য লোকগুলিকে দেওয়া চলবে না। অতএব গুলির শব্দ করা হল না।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে গিরিখাত বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। কিছুটা যাবার পরেই পর পর প্রচণ্ড আর্তনাদ কানে এল। শেষ পর্যন্ত আমরা পৃথিবীর সমতলে পৌঁছে গেলাম। খুব সাবধানে একটা সংকীর্ণ পথে চোখ রেখে চারদিকের সব কিছু পরিষ্কার দেখতে পেলাম ; আর সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে একই সঙ্গে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উন্মোচিত হল কিছুক্ষণ আগেকার সেই বিস্ফোরণের ভয়াবহ রহস্য। আমাদের দলের এই ভয়ংকর বিপদের পিছনে আছে এই দ্বীপেরই সেই অসভ্য মানুষদের এক নারকীয় চক্রান্ত যারা এতদিন আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভান করে এসেছে। এই চুনা পাথরের পাহাড়ের মধ্যে অসংখ্য কাঠের খুঁটি পুঁতে তার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে লম্বা কাঠের কড়ি বেঁধে দিয়ে তারা দিনের পর দিন স্তূপীকৃত করেছে ধুলো, বালি, ময়লা, মাটি, পাথরের কুচি—যখন যা পেয়েছে। এইবার নানা কৌশলে আমাদের সকলকে ঐ গিরি-খাতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই কাঠের খুঁটি ও কড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে ; তারই ফলে সেগুলি পুড়ে ভেঙে পড়ছে এবং সেই সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত ধুলো-বালি-মাটির স্তূপ সশব্দে ভেঙে পড়েছে গিরি-খাতের মধ্যে আমাদের সকলের মাথার উপরে, আমাদের অসহায় সঙ্গীদের পরিণতির ব্যাপারে আর কোন অনিশ্চয়তাই রইল না। এই সর্বাত্মক ধ্বংসের হাত থেকে একমাত্র আমরা দুজনই রক্ষা পেয়েছি। এই দ্বীপে এখন একমাত্র আমরাই জীবন্ত সাদা মানুষ।

অধ্যায়—২২

এখন তো মনে হচ্ছে, আমাদের বর্তমান অবস্থা চিরকালের মত সমাধিস্থ হয়ে থাকার চাইতে কিছু কম ভয়াবহ নয়। হয় অসভ্যদের হাতে মৃত্যু, নয় তো চিরজীবন তাদের বন্দী হয়ে কাটানো—এর চাইতে ভাল ভবিষ্যৎ তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আপাতত হয় তো বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে তাদের নজর এড়াতে পারি ; কিন্তু সে ক্ষেত্রেও তো মেরু অঞ্চলের শীতে ও অনাহারেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু ঘটবে, অথবা তাদের হাতেই ধরা দিতে হবে।

আমাদের চারদিকে দলে দলে অসভ্যরা এসে ভিড় করে আছে ; নিশ্চয় তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য "জেন"কে আটক করে লুট-তরাজ চালানো। আমাদের জাহাজটা হয়তো এখনও উপসাগরেই নোঙর করে আছে ; সেখানকার সঙ্গীরা জানেও না কী বিপদ তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আহা, এখনও যদি আমরা তাদের কাছে থাকতে পারতাম ! হয় সকলে মিলে পালিয়ে যেতাম, না হয় একসঙ্গেই মরতাম। একবার মনে হল, পিস্তলের একটা আওয়াজ করে তাদের জানিয়ে দেই আমাদের দুর্গতির কথা। কিন্তু তাতে তো হিতের চাইতে বিপরীত হবে বেশী। আমাদের দ্বিতীয় চিন্তা হল, যে কোন প্রকারে জাহাজে ফিরে যাবার চেষ্টা করা ; সকলের অলক্ষ্যে উপসাগরের মাথায় পেঁছে তাদেরই একটা শালতি নিয়ে চলে যাব নিজেদের জাহাজে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, এই অসমসাহসিক প্রচেষ্টায়ও সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। চতুর্দিকে পাহাড়ের ঝোপে-ঝাড়ে জাহাজের অলক্ষ্যে আছে দলে দলে আদিবাসীরা। আমাদের আশেপাশেও পথ অবরোধ করে অপেক্ষা করছে দলবল নিয়ে টু-উইট নিজে। অতএব একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে আসন্ন সংঘর্ষের নীরব দর্শক হয়েই আমাদের থাকতে হবে।

দেখতে দেখতে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই ষাট-সত্তরটা ডোঙা বোঝাই করে হাজির হল দলে দলে আদিবাসী। তাদের সঙ্গে একমাত্র অস্ত্র কাঠের গদা আর ডোঙাভর্তি পাথরের টুকরো। মুহূর্তকাল পরেই বিপরীত দিক থেকে এসে হাজির হল আর এক দল, সেই একই অস্ত্র নিয়ে। চারটে শালতি ভর্তি লোকজনও অতি দ্রুত এগিয়ে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। কথাগুলি বলতে যে সময় লাগল তার চাইতেও অল্প সময়ের মধ্যেই যেন জাদুর মন্ত্রে অসংখ্য অসভ্য লুঠেরা "জেন" কে ঘিরে ফেলল দখল করে নেবার জন্য।

সে কাজে তারা যে সফল হবেই তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। জাহাজে রেখে-আসা ছয় নাবিক যত বাধাই দিক শেষ পর্যন্ত এত বেশী অসভ্যের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। আমি তো ভাবতেই পারি নি যে তারা কোনরকম বাধা দিতেই পারবে। কিন্তু এখানেই আমার ভুল হয়েছিল। দূর থেকেই দেখলাম, তারা জাহাজটাকে আড়াআড়িভাবে শালতিগুলোর মুখোমুখি নিয়ে এল পিস্তলের আওতার মধ্যে, আর ডোঙাগুলো থেকে প্রায় সিকি মাইল দূরে। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে, অথবা সেই সংকটময় পরিস্থিতিজনিত উত্তেজনার ফলে আমাদের অসহায় বন্ধুদের আক্রমণ রাপুরি ব্যর্থ হল। একটা শালতির গায়েও গোলাগুলি লাগল না, বা একজন অসভ্যও আহত

হল না ; গুলি-বারুদ হয় তাদের আগেই জলের মধ্যে পড়ল, না হয় তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। তবু তাতে একটা ফল হল। গোলা-গুলির অপ্রত্যাশিত আওয়াজ শুনে আর প্রচুর ধোঁয়া দেখে তারা একান্ত বিস্ময়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে এক সময় আমার মনে হল, তারা আক্রমণ বন্ধ করে তীরে ফিরে যাবে। আমাদের লোকজনরা যদি আক্রমণটা অব্যাহত রাখত তাহলে তারা হয় তো সেই পথই ধরত, আক্রমণ বন্ধ করে অবিলম্বেই ফিরে যেত ; তাছাড়া, এতক্ষণে শাল্‌তিগুলো এত কাছে এসে পড়েছিল যে এবার তাদের আক্রমণও লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। কিন্তু তার বদলে তারা জাহাজকে ঘুরিয়ে নিল ডোঙাগুলোকে লক্ষ্য করে, আর সেই অবসরে শাল্‌তির লোকগুলো তাদের প্রাথমিক বিস্ময় ও ভয়কে কাটিয়ে ওঠার সময় পেয়ে গেল।

এদিকে জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত গোলাগুলির আক্রমণে ডোঙার অসভ্যদের দুর্দশা হল ভয়ঙ্কর। সাত-আটটা চামড়ার ডোঙা সম্পূর্ণ ফেঁসে গেল, সত্তর আশীজন সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল ; অন্তত শ'খানেক জলে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল ; তাদের মধ্যেও বেশ কিছু লোক গুরুতরভাবে আহত হল। বাকিরা ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাল ; আহত ও জলমগ্ন সঙ্গীদের দিকে ফিরেও তাকাল না। আমাদের সঙ্গীদের বাধাদান সফল হল, কিন্তু তাতেও তাদের বিপদ কাটল না। এই অবসরে দেড়শ'র বেশী শাল্‌তির লোকজন যে যে ভাবে পারল, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে, দড়ি-দড়া বেয়ে জাহাজের ডেকে উঠে পড়ল। বারুদে আগুন দেবার সময়টাও তারা পেল না। এবার অসভ্যদের জিঘাংসা সাধনের পথে কোন বাধাই রইল না। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের লোকগুলিকে টেনে হিঁচড়ে, মাটিতে ফেলে, লাথি-গুঁতো মেরে ছিন্নভিন্ন করে মেরে ফেলল।

তা দেখে ডোঙার অসভ্যরা সব ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে হৈ-হৈ করে জাহাজে উঠে পড়ল। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে "জেন"-এর বুকে হিংসা ও উন্মত্ততার এক শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা হল। ডেকের পাটাতন কেটে-ছিঁড়ে খান-খান করে দিল ; জাহাজের দড়ি-কাছি, পাল, সব কিছু যেন জাদুমন্ত্রে উধাও হয়ে গেল ; তারপর হাজার হাজার অসভ্য মানুষ মিলে জাহাজটাকে টানতে টানতে তীরে নিয়ে টু-উইটকে উপহার দিল। এতক্ষণ সর্দার পাহাড়ের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে থেকে সব কিছু দেখছিল ; এবার কালো চামড়ার যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে রাজকীয় মর্যাদায় নীচে নেমে এসে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করল।

টু-উইট সদলে পাহাড় থেকে নেমে যাওয়ায় আমরা গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এসে কাছাকাছি অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। ফাটল থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরেই একটা ছোট ঝর্ণা দেখতে পেয়ে তার জলে আকণ্ঠ তৃষ্ণা মেটালাম। সেখান থেকে সামান্য দূরেই অনেকগুলি হেজেল-বাদামের ঝোপ চোখে পড়ল। কয়েকটা বাদাম মুখে দিয়ে বেশ সুস্বাদু মনে হল ; তার স্বাদ অনেকটা বিলিতি হেজেল-বাদামের মত। অনেক বাদামে টুপি ভর্তি করে নিয়ে খাঁড়িতে রেখে আরও বাদাম সংগ্রহের জন্য আবার সেখানে ফিরে গেলাম। বেশ কিছু বাদাম সংগ্রহ করে ফিরবার মুখেই পাখা ঝটপটানির আওয়াজ শুনে চোখ ফেরাতেই একটা বড় কালো পাখি দেখতে পেলাম।

পিটার্স কালবিলম্ব না করে ছুটে গিয়ে সেটার গলা চেপে ধরল। পাখিটা ডেকে উঠতেই ছুরির এককোপে তার গলাটা কেটে টানতে টানতে গিরিখাতের দিকে নিয়ে চলল। মন খুব খুশি। যাই হোক, অন্তত এক সপ্তাহের জন্য খাবার ভাবনাটা দূর হল।

পাখিটাকে নিয়ে আমাদের আস্তানায় ঢুকলাম। তারপর ফাটলের মুখটাকে ভাল করে ডালপালা দিয়ে ঢেকে রেখে দুজন বেরিয়ে পড়লাম পাহাড়ের ফাঁক-ফোকড়ের ভিতর দিয়ে জাহাজের দুরবস্থাটা দেখতে। দেখলাম, জাহাজের ভাঙ-চুরের কাজ শেষ হয়েছে ; এবার তাতে আগুন ধরাবার আয়োজন চলছে। একটু পরেই ধোঁয়ার-কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আগুনের লেলিহান শিখা। দড়ি-কাছি, পাল ও মাস্তুলের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল ক্রমে তাতেও আগুন ধরে গেল। তখনও বহুসংখ্যক অসভ্য মানুষ বড় পাথর, কুড়ুল ও কামানের গোলা দিয়ে জাহাজের নাট-বল্টু, ও নানারকম তামার ও লোহার জিনিসপত্র ঠোকাঠুকি করছে। জাহাজের খুব কাছাকাছি সমুদ্রের তীরে, শালতি ও ডোঙায় যত মানুষ ভিড় করে আছে তাদের সংখ্যাও দশ হাজারের কম হবে না। যে কোন মুহূর্তে একটা বড় রকম অঘটনের আশংকা আমরা করছিলাম। আমাদের নিরাশ হতে হল না। প্রথমে একটা ধাক্কা খেলাম, কিন্তু কোনরকম বিস্ফোরণের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। অসভ্য মানুষগুলিও চমকে উঠে মুহূর্তের জন্য কাজকর্ম বন্ধ করল। আবার সকলে কাজ শুরু করবে এমন সময় ঝড়ের ঘন কালো মেঘের মত একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি ডেকের উপর থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠে এল—তারপর যেন তারই পেটের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত আগুনের লম্বা স্রোত—উঠে গেল প্রায় সিকি মাইল উঁচুতে—সেই আগুন হঠাৎ চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল—পরমুহূর্তেই সমস্ত বায়ুমণ্ডল যেন জাদুমন্ত্রে কাঠ, ধাতু ও মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এক বিশৃংখল আবর্জনায় ভরে গেল—আর সব শেষে ঘটল সেই প্রচণ্ড সংঘাত যার ধাক্কায় আমরা মাটিতে পড়ে গেলাম, একটা ভয়ংকর শব্দ পাহাড় থেকে পাহাড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, এবং ধ্বংসস্তূপের অসংখ্য টুকরো ঘন বৃষ্টিধারার মত আমাদের চারদিকে বর্ষিত হতে লাগল।

অসভ্য মানুষদের মধ্যে এই মহাধ্বংস যে রূপে আত্মপ্রকাশ করল সেটা আমাদের সব প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল—এতদিনে বুঝি তারা পেল তাদের হীন চক্রান্তের যথাযোগ্য প্রতিফল। সেই বিস্ফোরণে প্রাণ হারাল হাজারখানেক অসভ্য মানুষ, আর চিরদিনের মত বিকৃত-দেহ হয়ে গেল অন্তত আরও সমসংখ্যক মানুষ। সমস্ত উপকূল জুড়ে কত মানুষ যে তখন খাবি খাচ্ছে আর প্রাণ বাঁচাবার জন্য সাঁতার কাটছে তার কোন লেখা-জোখা নেই। তীরভূমির অবস্থা আরও শোচনীয়। সমূহ বিপদের আকস্মিকতায় তারা এতই হতভম্ব হয়ে পড়েছে যে কেউই অন্যকে এতটুকু সাহায্য করতেও এগোচ্ছে না। তারপরেই তাদের আচরণে একটা আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। হতচকিত ভাবটা কাটিয়ে হঠাৎই যেন তারা উত্তেজনার একেবারে চরমে উঠে গেল। পাগলের মত এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি করতে করতে একসময় তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল আতংক, ক্রোধ ও তীব্র কৌতূহলের একটা মিশ্র প্রকাশ ; উচ্চকণ্ঠে তারা চীৎকার করতে লাগল—“টেকেলি—লি ! টেকেলি—লি !”

ইতিমধ্যে দেখতে পেলাম, একটা বড় দল পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে গেল এবং একটু পরেই ফিরে এল একটা করে কাঠের খোটা হাতে নিয়ে। তারা যেখানে গেল সেখানে ইতিমধ্যেই বেশ ভিড় জমে গেছে। সেখানে মাটির উপর একটা সাদা কি যেন পড়ে আছে। ভাল করে নজর করতে বুঝলাম, গত আঠারোই জানুয়ারি লাল দাঁত ও নখর সমন্বিত যে বিচিত্র জন্তুটিকে জাহাজে তোলা হয়েছিল এটি তারই মৃতদেহ। ক্যাপ্টেন গাই সেটাকে সুরক্ষিত করে রেখেছিলেন খড় ভর্তি করে ইংলণ্ডে নিয়ে যাবেন বলে। বিষ্ফোরণের ফলে সেটাই উৎক্ষিপ্ত হয়ে এখানে এসে পড়েছে। কিন্তু এই মৃতদেহটাকে নিয়ে অসভ্য মানুষগুলোর এত কৌতূহল কেন হয়েছে সেটা বুঝতে পারলাম না। তারা সকলেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে ভিড় করেছে, কিন্তু কেউই কাছে যেতে চাইছে না। এক সময় খোঁটাধারী লোকগুলি হাতের খোঁটাকে চক্রাকারে মৃতদেহটার চারদিকে পুঁতে দিয়ে সকলে সবেগে দ্বীপের ভিতর দিকে চলে গেল—তাদের মুখে কেবল একটি ধ্বনি—"টেকেলি—লি। টেকেলি—লি!"

অধ্যায়—২৩

এই ঘটনার পর ছয়-সাত দিন আমরা পাহাড়ের উপরকার গোপন আস্তানাতেই থাকি; মাঝে মাঝে জল আর হেজেল—বাদাম আনতে বাইরে যাই। দু'টুকরো শুকনো কাঠ ঘসে আগুন জ্বালাই। সুযোগমত যে পাখিটা পেয়ে গেছি একটু শক্ত হলেও সেটা খেতে বেশ ভাল। গিরি-খাতের কাছেই ওই রকম আরও তিনটে পাখি দেখেছি, কিন্তু সেগুলি মাটিতে নামে নি বলে ধরতে পারি নি। ক্রমে খাদ্যের অভাব দেখা দিল। একঘেয়ে বাদাম চিবোতে আর ভাল লাগে না। তাই স্থির করলাম, একবার নীচে নামবার চেষ্টা করব।

…[ভাষান্তরিকের সংযোজন ঃ এর পর থেকে অধ্যায়—২৪-এরও বেশ কয়েক পাতা পর্যন্ত লেখা হয়েছে সেই পাহাড়-জঙ্গলের নানা পথ-বিপথ ধরে খোলা জায়গায় যাবার জন্য গর্ডন পিম ও পিটার্সের ব্যর্থ চেষ্টার বহু বিস্তারিত বিবরণ। মিঃ পোর বর্ণনা-কুশলতা, পরিস্থিতি-রচনার দক্ষতা এবং মেরু-অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে পাঠক-সাধারণের একান্ত কৌতূহল সত্ত্বেও সে বর্ণনার একঘেয়েমি পাঠকের আগ্রহকে স্তিমিত করে তুলতে পারে, এবং এই অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনীর দুরন্ত গতিকে শিথিল করে দিতে পারে, এই আশংকায় উপন্যাসটির শেষ পর্বের সেই অংশটির অনুবাদ বর্জন করা হল। "জেন গাই" জাহাজের শেষ দুই জীবিত অভিযাত্রী গর্ডন পিম ও পিটার্স যখন ক্ষুধার দুর্বার তাড়নায় বেপরোয়া হয়ে গুপ্ত স্থান থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার চেষ্টা করতে গিয়ে নতুন করে স্থানীয় অসভ্য মানুষের একটা দলের মুখোমুখি হয়ে পড়ল, তখন থেকে এই কাহিনীর মূল ধারাটিকে পুনরায় একইভাবে অনুসরণ করা হল।]…

তখন খাদ্যই আমাদের দিনরাতের একমাত্র চিন্তা। তাই স্থির করলাম, মাইল দেড়েক দূরে অবস্থিত সাগর-তীরে যেতেই হবে। পাহাড়ের উপরকার গুপ্ত আস্তানা থেকেই

লক্ষ্য করেছি সেখানে বেশকিছু কচ্ছপ চলাফেরা করছে। বড় বড় পাথর ও মাটির স্তূপের ভিতর দিয়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চললাম। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই একটা ছোট গুহার ভিতর দিকে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাঁচজন অসভ্য। গদার এক আঘাতে পিটার্সকে ধরাশায়ী করল। সে মাটিতে পড়ে যেতেই পুরো দলটাই তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ফলে আমি প্রাথমিক বিস্ময়টা কাটিয়ে ওঠার সময়টুকু পেলাম। সঙ্গে ছিল দুটো পিস্তল। তাই নিয়েই পাল্টা আক্রমণ করলাম। পরপর দুই গুলিতে দুটোকে সাবাড় করে দিলাম; তৃতীয় জন পিটার্সকে লক্ষ্য করে বর্শা তুলতেই সে চকিতে সরে গেল। তার কাছেও পিস্তল ছিল; কিন্তু সেটা ব্যবহার না করে সে নিজের দৈহিক শক্তিকেই কাজে লাগাল; একজন নিহত অসভ্যের গদা তুলে নিয়ে একের পর এক তিনজনের মাথাকেই গদার আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল।

জয়ের আনন্দে কয়েক মিনিট সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল বহু কণ্ঠের চীৎকার। পিস্তলের শব্দ শুনে বাকি অসভ্যরা ভয় পেয়ে শব্দ লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। এবার আমরা ধরা পড়ে যাব। পাহাড়ে পালাতে গেলে তাদের দিকেই এগোতে হবে; এমন কি নীচে নামতে গেলেও তাদের চোখ এড়াতে পারব না। এ পরিস্থিতিতে কি করা যায় ভাবছি এমন সময় আমার গুলি খেয়ে যে মরে গেছে বলে ভেবেছিলাম সে হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সবেগে পালাতে চেষ্টা করল। কয়েক পা যেতে না যেতেই আমরা তাকে ধরে ফেললাম। তাকে মেরে ফেলতেই গিয়েছিলাম, কিন্তু বাধা দিল পিটার্স; সে বলল, তাকে যদি জোর করে আমাদের সঙ্গে নিতে পারি তাহলে আমাদের পালাবার ব্যাপারে সে আমাদের অনেক সাহায্য করতে পারবে। বাধা দিলেই গুলি করব এই বলে শাসিয়ে তাকে টানতে টানতে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চললাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে আমাদের সম্পূর্ণ বশ হয়ে গেল। আমরা পাহাড় ডিঙিয়ে ছুটতে লাগলাম সমুদ্র-তীরের দিকে। আর সেও দৌড়তে লাগল আমাদের পাশে থেকে।

বন-পাহাড় পেরিয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছে দেখলাম, সমুদ্র তখনও প্রায় দু'শ' গজ দূরে। সভয়ে আরও দেখতে পেলাম, গ্রাম থেকে—দ্বীপের নানাদিক থেকে—হাজার হাজার অসভ্য মানুষ প্রচণ্ড রোষে অঙ্গভঙ্গী করতে করতে আর বুনো জানোয়ারের মত গর্জন করতে করতে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। তা দেখে ফিরে যাব বলে মুখ ঘোরাতেই একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে-আসা দুটো শালতির গলুই চোখে পড়ল। প্রাণপণে সেইদিকে ছুটতে লাগলাম। কাছে পৌঁছে দেখলাম, শালতি দুটো সম্পূর্ণ অরক্ষিত, শুধু তিনটে বড় গ্যালিপাগো কচ্ছপ আর ছয়টি দাঁড় ছাড়া শালতিতে আর কেউ নেই। সঙ্গে সঙ্গে দুজনই একটা শালতিতে লাফিয়ে উঠলাম; বন্দীটাকেও জোর করে তুলে নিলাম; তারপর যতদূর শক্তিতে কুলোয় শালতিটাকে সাগরে ভাসিয়ে দিলাম।

তীর থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ যাবার পরেই বুঝতে পারলাম, বাকি শালতিটাকে অসভ্যদের হাতে ফেলে এসে কী মারাত্মক ভুলই করেছি! সেই শালতিটাকে লক্ষ্য করে অসভ্যরা ছুটছে আমাদের চাইতে দ্বিগুণ গতিতে। একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট করা

চলবে না। এখন আমাদের বাঁচার একটিমাত্র পথ—ওদের আগেই ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় শালতিটাকে দখল করা। সেটা কতদূর সম্ভব হবে জানি না, তবে এটা জানি, সে চেষ্টাটা সফল হলেই আমরা বাঁচব, আর সে চেষ্টাটাও না করার অর্থ অনিবার্য নরবলির শিকার হওয়া। অতএব আমাদের শালতি ছুটল দ্রুততর গতিতে, আর অসভ্যদের পা চলল অধিকতর দ্রুতগতিতে। ফলে দৌড়-প্রতিযোগিতায় আমরা ঈষৎ পিছিয়ে পড়লাম। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার আগেই একাধিক অসভ্য সেখানে পৌঁছে গেল। পিটার্সের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল। মাথায় গুলি লেগে দুইজন অসভ্যের একজন মুখ থুবড়ে জলে পড়ে গেল। অপর অসভ্যটি ভয়ে সরে গেল। দলের বাকিরা তখনও শালতিটা থেকে বিশ-তিরিশ পা দূরে; ঝড়ের গতিতে ছুটে গিয়ে আমরা শালতিটাকে দখল করে নিয়ে নতুন উৎসাহে দাঁড়ে হাত লাগালাম। তবু দুই অসভ্য সাঁতরে এসে আমাদের শালতি ধরে ঝুলে পড়ল। আমরাও তিলমাত্র ইতস্তত না করে ছুরির দুই কোপে তাদের ইহলীলা সাঙ্গ করে দিলাম। না এভাবে দুটো শালতিকে নিয়ে এগোনো যাবে না। পিছনে ছুটে আসছে অসভ্য পঙ্গপালের দল। পিটার্স তখনই বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে দ্বিতীয় শালতির দাঁড়গুলো ভেঙে ফেলল, ভেঙে ফেলল তার গলুই এবং একটা দিক। তারপর সেটাকে সম্পূর্ণ অকেজো করে রেখে আমরা বার-সমুদ্রে ভেসে গেলাম। তখনও শুনতে পেলাম ভাঙা শালতির পাশে দাঁড়িয়ে তারা কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করে চীৎকার করতে করতে ছুটছে।

আপাতত বিপদের হাত থেকে মুক্তি পেলেও আমাদের ভবিষ্যৎ তখনও অজ্ঞতার অন্ধকারে ঢাকা। অসভ্যদের মোট চারটে শালতির একটা আমাদের দখলে, একটা ভেঙে ফেলেছে পিটার্স, বাকি দুটোও "জেন গাই"-য়ের বিস্ফোরণে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে (এ খবর আমরা জেনেছি বন্দী অসভ্যটির মুখে)। কাজেই এবার অসভ্যরা নিশ্চয় আমাদের তাড়া করবে ডোঙাগুলো নিয়ে। সেগুলি এখনও রয়েছে এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। অতএব তারা এখানে আসার আগেই আমাদের এ দ্বীপ থেকে বহুদূরে চলে যেতে হবে। আমরা সকলেই বৈঠা হাতে নিলাম। বন্দীর হাতেও বৈঠা তুলে দিলাম। আধঘণ্টা পরে আরও পাঁচ-ছয় মাইল দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে দেখলাম, একঝাঁক ডোঙা আমাদের পিছু নেবার জন্য উপসাগর থেকে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আমরা তখন বার-দরিয়ায় ভেসে পড়েছি দেখে হতাশ হয়ে তারা সেখানেই থেমে গেল। আমরা দূর থেকে আরও দূরে সাগরের বুকে ভেসে চললাম।

অধ্যায়—২৫

একটা সাধারণ শালতিকে সম্বল করে আমরা ভেসে চলেছি দক্ষিণ মেরু সাগরের বুকে। সঙ্গে খাবার বলতে মাত্র তিনটে কচ্ছপ। মেরুবৃত্তের দীর্ঘ শীতঋতুও বেশী দূরে নয়। তাই এবার আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে—কোন্ পথে চলব। পথে ছয়-সাতটা একই ধরনের দ্বীপ চোখে পড়ল; একটার থেকে আর একটার দূরত্ব পাঁচ-ছয় লীগ; কিন্তু তার কোনটাতেই নামার সাহস হল না। উত্তর দিক থেকে এতদূর

আসতে যে বিপদসংকুল বরফের রাজ্য পার হয়ে এসেছি, সেই পথে আবার ফিরে যাবার চেষ্টা করা হবে বুদ্ধিহীনতারই পরিচায়ক। অতএব একটিমাত্র পথই আমাদের সামনে খোলা আছে। স্থির করলাম, দক্ষিণ দিকেই এগিয়ে যাব ; কে জানে হয় তো সামনে পাব অন্য কোন দেশ—আরও ভাল আবহাওয়া।

এতদিন পর্যন্ত দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আমরা পেয়েছি ঝড়-ঝঞ্ঝামুক্ত আবহাওয়া। তবু আমাদের শালতিটা বেশ বড় হলেও তার অবস্থাও খুবই সঙ্গীণ। তাই সাধ্যমত সেটাকে মেরামত করতে লেগে গেলাম। মাস্তুল বসালাম, পাল লাগালাম। তারপর পাল উড়িয়ে দিলাম দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব দিক লক্ষ্য করে। অনুকূল বাতাস বইতে লাগল। সারা দিন রোদ ঝলমল করছে। সমুদ্রও শান্ত। কোথাও একটুকরো বরফও চোখে পড়ছে না। বড় কচ্ছপটাকে মেরে প্রচুর খাদ্য তো পাওয়া গেলই, তাছাড়া পেলাম প্রচুর জল তার খোল থেকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে আবার যাত্রা শুরু হল দক্ষিণ অভিমুখে।

মার্চ ১ ; অনেক অসাধারণ ঘটনা থেকে মনে হল আমরা যে অঞ্চলে পৌঁছেছি তা নতুনত্ব ও বিস্ময়ে ভরা। দক্ষিণ দিগন্তে সততই দেখা দিতে লাগল একটা হাল্কা ধূসর বাষ্পের উঁচু স্তর ; মাঝে মাঝেই তার বুকে জ্বলে উঠছে একটা আলোর রেখা—কখনও সেটা ছুটছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, আবার কখনও পশ্চিম থেকে পূবে। বুঝলাম, এ সবই "অরোরা বোরিয়ালিস"-এর খেলা। সমুদ্রের তাপমাত্রা মাঝে মাঝেই বাড়ছে ; রংয়েরও উল্লেখযোগ্য হের-ফের ঘটছে।

মার্চ ২। আজ বন্দীটিকে বার বার প্রশ্ন করে ফেলে-আসা খুনে দ্বীপটার সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারলাম। কিন্তু এখন আর সে সব কথা পাঠকদের শুনিয়ে কি হবে ? শুধু এইটুকু বললেই হবে যে সে অঞ্চলটা মোট আটটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত—সকলেই একই রাজার শাসনাধীন। তার নাম সালেমন বা সালেমুন। সেই সব দ্বীপের অধিবাসীরা চামড়ার ডোঙা ছাড়া আর কোনোরকম নৌকো তৈরী করে না ; ঐ চারটি শালতিই তাদের সবেধন নীলমণি—আকস্মিকভাবেই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কোন বড় দ্বীপ থেকে সেগুলি তাদের হাতে এসে পড়েছিল। আমাদের বন্দীটার নাম নু-নু, আর যে দ্বীপটা আমরা ছেড়ে এলাম সেটার নাম সালাল।

মার্চ ৩। জলের তাপ সত্যি বেশ বেড়েছে ; তার রংও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। সমুদ্র বেশ শান্ত হলেও আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে, বেশ কিছুটা দূরে দূরে হঠাৎ খানিকটা জায়গায় বেশ উথাল-পাথাল অবস্থা দেখে আমরা বিস্ময় বোধ করছি।

মার্চ ৪। আজ উত্তরের বাতাস হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় পালটাকে তুলবার সময় পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করেছিলাম। নু-নু আমার পাশেই বসেছিল। রুমালটা হঠাৎই তার মুখে লেগে যেতেই তার সারা দেহে প্রচণ্ড খিঁচুনি দেখা দিল। তারপরেই সে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে মাঝে মাঝেই বিড়-বিড় করে বলতে লাগল "টুকেলি-লি ! টুকেলি-লি ?"

মার্চ ৫। বাতাস একেবারেই পড়ে গেছে, কিন্তু প্রবল স্রোতের টানে আমরা দ্রুতগতিতে দক্ষিণ দিকেই চলেছি। মনে হচ্ছে, যেকোন সময়েই বিপদ দেখা দিতে পারে, কিন্তু বাস্তবে সেরকম কিন্তু ঘটে নি। পিটার্সের মুখেও কোন ভাবান্তর দেখছি না,

তবে মাঝে মাঝে তার মুখে এমন একটা ভাব ফুটে উঠছে যা আমার বোধের অতীত। মনে হচ্ছে মেরু-শীত এগিয়ে আসছে, কিন্তু তার কোন ভ্রূকুটি দেখতে পাচ্ছি না। দেহ ও মনের কেমন যেন একটা অসারতা অনুভব করছি—একটা স্বপ্নালু অনুভূতি—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়।

মার্চ ৬। ধূসর বাষ্পটা এখন দিগন্ত থেকে অনেক ডিগ্রি উপরে উঠে এসেছে; ধীরে ধীরে তার ধূসর রংটাও ফিকে হয়ে আসছে। জলের তাপ অত্যন্ত বেড়েছে; হাত দেওয়া যায় না; দুধসাদা ভাবটাও বেশ বেড়েছে। আজ শাল্তির খুব কাছেই জলের মধ্যে একটা তোলপাড় চোখে পড়ল। সেই সঙ্গে বাষ্পের উপরের দিকটাও ভীষণভাবে জ্বলে উঠল। বাষ্পের আগুন নিভে গেলে এবং জলের উচ্ছ্বাস থেমে গেলে ছাইয়ের মত দেখতে একটা মিহি সাদা গুঁড়ো শাল্তির উপর এবং অনেকটা জলের উপর ছড়িয়ে পড়ল। নু-নু এবার শাল্তির নীচে উপুড় হয়ে পড়ে রইল, কিছুতেই তাকে ওঠানো গেল না।

মার্চ ৭। তার দেশের মানুষরা আমাদের সঙ্গীদের কেন মেরে ফেলতে চেয়েছিল—বার বার এ প্রশ্ন করেও নু-নু-র কাছ থেকে কোন সদুত্তর পেলাম না। আতংকগ্রস্ত অবস্থায় সে শাল্তির নীচেই পড়ে রইল। অনেক পীড়াপীড়ির পরে কিছু অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী করল মাত্র; যেমন, তর্জনী দিয়ে উপরের ঠোঁটটা ঠেলে তুলে দিয়ে দাঁতগুলি দেখাল। সব দাঁত কালো। এর আগে সালালের কোন আদিবাসীর দাঁত আমরা দেখি নি।

মার্চ ৮। আজ একটা সাদা জন্তু আমাদের পাশ দিয়ে ভেসে গেল। সালালের সাগরতীরে এইরকম একটা জন্তুকে নিয়েই অসভ্যদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। জন্তুটাকে নৌকোয় তুলে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা নিষ্ক্রিয়তা আমাকে যেন পেয়ে বসল; কিছুই করা হল না। জলের তাপ আরও বেড়েছে; হাত রাখাই যায় না। পিটার্সের মুখেও কথা নেই; তার এই উদাসীনতার কারণ কি তাও বুঝি না। নু-নুর নিঃশ্বাস পড়ছে, তার বেশী কিছু নয়।

মার্চ ৯। ছাইয়ের মত পদার্থটা এখন প্রচুর পরিমাণে চারদিকেই পড়ছে, অনবরতই পড়ছে। বাষ্পের আবরণটা দিগন্ত থেকে বেশ কিছুটা উপরে উঠে এসেছে; একটা সুস্পষ্ট আকারও নিচ্ছে। একটা সীমাহীন জলপ্রপাত যেন আকাশের কোন বহুদূরবর্তী প্রকাণ্ড প্রাচীরের উপর দিয়ে নিঃশব্দে সমুদ্রের বুকে ঝরে পড়ছে—এ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সঙ্গে আমি এটার তুলনা করতে পারছি না। একটা প্রকাণ্ড পর্দা যেন গোটা দক্ষিণ দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে। কোন শব্দ হচ্ছে না।

মার্চ ২১। এখন একটা বিষণ্ণ অন্ধকার আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে—কিন্তু সমুদ্রের দুগ্ধাভ গভীরতা থেকে একটা আগুনের শিখা যেন শাল্তির পাশে পাশেই চলেছে। ছাইয়ের মত সাদা গুঁড়োগুলো আমাদের শরীরে এবং শাল্তির উপর জমছে, অথচ জলে পড়লেই গলে যাচ্ছে দেখে আমরা অভিভূত হয়ে পড়ছি। জলপ্রপাতের চূড়া দূর অস্পষ্টতার মধ্যে সম্পূর্ণ মিলিয়ে গেছে। অথচ ভয়ংকর বেগে আমরা সেই দিকেই এগিয়ে চলেছি। তার মধ্যে মাঝে মাঝেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে কিছু

বড় বড় হাঁ-করা সাময়িক ফাটল। ফাটলের মধ্যে চোখে পড়ছে দ্রুতপরিবর্তনশীল নানা আবছা মূর্তি ; আর প্রবল বাতাসে নিঃশব্দে অথচ প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে এসে জ্বলন্ত সমুদ্রকে যেন ছিঁড়ে ফালা-ফালা করে দিচ্ছে।

মার্চ **২২**। অন্ধকার আরও বেড়েছে, তবে আমাদের সম্মুখের সাদা পর্দা থেকে বিক্ষিপ্ত জলের উজ্জ্বলতা সে অন্ধকারকে কিছুটা সহনীয় করছে। সেই যবনিকার অন্তরাল থেকে অবিরাম উড়ে আসছে বিরাটকায় হালকা সাদা সব পাখির দল। সেই চিরন্তন "টেকেলি-লি !" বলে ডাকতে ডাকতে তারা মিলিয়ে যাচ্ছে আমাদের দৃষ্টির বাইরে। তারপরেই শালতির নীচে নু-নুর দেহটা নড়ে উঠল ; হাত দিয়ে বুঝলাম, তার প্রাণ-পাখিও উড়ে গেছে। আর এতক্ষণে সেই জলপ্রপাতের ভিতর থেকে একটা ফাটল যেন এগিয়ে এল আমাদের দিকে, আর আমরাও ছুটে গিয়ে জলপ্রপাতের আলিঙ্গনের মধ্যে জড়িয়ে গেলাম। কিন্তু আমাদের পথের সামনে সহসা আবির্ভূত হল একটি আবৃতদেহ মানুষের মূর্তি—মনুষ্যলোকের যে কোন অধিবাসীর তুলনায় সে অনেক—অনেক গুণ বড়। আর সেই মূর্তির ত্বকের রং নিখাদ তুষারশুভ্র।

॥ টীকা ॥

সম্প্রতি যে পরিস্থিতিতে মিঃ পিমের আকস্মিক ও শোচনীয় মৃত্যু ঘটেছে তার বিবরণ দৈনিক সংবাদপত্রের মারফতে জনসাধারণ ইতিমধ্যেই জেনেছেন। আশংকা করা হচ্ছে, বাকি যে কয়টি অধ্যায়ে তার বিবরণটি সম্পূর্ণ হয়েছিল, এবং সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি টাইপ করার সময় যা তিনি সংশোধনের উদ্দেশ্যে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন, দুর্ঘটনার ফলে তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলিও চিরদিনের মত হারিয়ে গেছে। অবশ্য বাস্তবে সেটা নাও হতে পারে ; পাণ্ডুলিপির সেই পাতাগুলি যদি কখনও পাওয়া যায় তাহলে জনসাধারণের কাছে অবশ্যই হাজির করা হবে।

এই বিবরণীর সেই ত্রুটি সংশোধন করতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নি। প্রাক-বাকে যে ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এবং যার কথা অনুসারে মনে হতে পারে যে এই শূন্যতাটুকু তিনিই পূর্ণ করতে পারেন, তিনি নিজেই সে কাজটি করতে রাজী হন নি—রাজী হন নি তার কারণ যে সব তথ্য তার হাতে আছে সেগুলি সঠিক নয়, এবং এই বিবরণের শেষাংশের পূর্ণ সত্যতা সম্পর্কে তার নিজেরও অবিশ্বাস আছে। পিটার্সের কাছ থেকে কিছু তথ্য হয়তো আশা করা যেত ; সে এখনও জীবিত আছে এবং ইলিনয়তে বাস করছে ; কিন্তু তার সঙ্গে আপাতত দেখা করা সম্ভব হয় নি। হয়তো পরবর্তীকালে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে, এবং মিঃ পিমের বিবরণীকে সম্পূর্ণ করার মত উপাদানও সংগৃহীত হবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

॥ সমাপ্ত ॥

দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।

যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।

আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।

বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।

এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900